শ্রীভূমির বাণভট্ট

মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য

অক্ষর পাবলিকেশনস্
প্রধান কার্যালয় ঃ জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা

Sreebhumir Banabhatta
(an historical notation on Sreehatta District in
corelation with Banabhata)
by. Manabendra Bhattacharjee.

ISBN-81-86802-94-0

প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা-২০০৫
প্রচ্ছদ ঃ রূপা নন্দী ঘোষ

অক্ষর সংস্থাপন ও মুদ্রণ ঃ ক্যাক্সটন প্রিন্টার্স, আগরতলা, ত্রিপুরা

অক্ষর পাবলিকেশনস্-এর পক্ষে শুভব্রত দেব কর্তৃক জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা এবং ২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন কলকাতা-১২ থেকে একযোগে প্রকাশিত।

আগরতলায় নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র ঃ 'বইঘর' ও অক্ষর সেলস্ কাউন্টার জে বি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা
কলকাতা কেন্দ্র ঃ ২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২
৮ বি ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৭৩

সার্বিক যোগাযোগ
অক্ষর পাবলিকেশনস, জে বি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা
দূরভাষ ২৩০-৭৫০০, ২৩২-৪৫০০, email : akshar@.yahoo. com

মূল্য ১৭৫ টাকা

সোনেয়ন
এবং দেবলীনা ভারতীকে

অ নু ক্র ম

চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রম, এমনি পরিবেশে সৃষ্ট একটি মহাবিদ্যাশ্রম। বাণভট্ট এবং কালিদাসের সাহিত্যে, ঋষি আশ্রমের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা মূলত সেই সময়কালের চন্দ্রপুরাদি সুবৃহৎ বিদ্যাশ্রমের চিত্ররূপ।

হর্ষচরিত গ্রন্থে, বাণভট্ট তাঁর বংশপরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। বাণের পূর্বপুরুষগণ, এমনিভাবে প্রাচীন বৃহত্তর শ্রীভূমির আধুনিক লঙ্গাই নদীর অববাহিকা অঞ্চলে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বাণভট্টের সমকালে এবং তাঁর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীকালে, এই অঞ্চলে বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নাট্যকার সাহিত্যিক এবং দার্শনিকের আবির্ভাব হয়েছিল।

* * *

ইতিপূর্বে লিখিত হয়েছে, শ্রীপঞ্চমীর অপরাহ্নে বাণ এবং অন্যান্য নব-স্নাতক বিদ্যার্থীগণের সমাবর্তন উৎসব সমাপ্ত হয়েছে। এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে, চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমের পশ্চিম প্রান্তের একটি বিশাল, সবুজ দূর্বাঘাসে আচ্ছাদিত প্রাঙ্গণে। প্রাঙ্গণটি শোনবিলের পূর্বতীরের গায়ে গায়ে লেগে আছে। শোনবিলের পশ্চিমতীরে প্রাচীন জনপদ। অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ এবং প্রাচীন জনপদের মাঝখানে, প্রায় চার ক্রোশ দীর্ঘ শোনবিলের তরঙ্গমুখর জলরাশি।

শোনবিলের পশ্চিম তীরের প্রাচীন জনপদের দক্ষিণে বিন্ধ্যারণ্য। বাণের সমকালে, আধুনিক উত্তর ত্রিপুরার পাহাড়শ্রেণী, বিন্ধ্যারণ্য নামে পরিচিত ছিল। এই বিন্ধ্যারণ্যের উত্তর সীমা থেকে এক ফালি ক্ষীণ ভূভাগ ক্রমশ উত্তর দিকে এগিয়ে এসে গঙ্গিনিকার জলরাশিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ক্ষীণ তনুর এই দীর্ঘ একফালি ভূমিভাগের প্রায় শেষ উত্তর মাথায় বাণের পৈতৃক বাড়ী প্রীতিকূট।

প্রীতিকূটের গায়ে গায়ে কুতকুট্ট দেবীমন্দির। মন্দির থেকে ক্ষীণতনু ভূমিভাগের প্রায় ক্রোশ দুই দক্ষিণে কালিকাশ্বভ্র তীর্থক্ষেত্র। কালিকাশ্বভ্রের সংলগ্ন দক্ষিণ ভূমিতে কাদম্বরী দেবকুলিকা। আরো দক্ষিণে ভয়াল চণ্ডিকারণ্য। অরণ্যের দক্ষিণ সীমায় চণ্ডিকা মন্দির। চণ্ডিকামন্দিরের আরো দক্ষিণে, ক্ষীণতনুদেহী ভূমিভাগের শেষ মাথায় বিন্ধ্যারণ্যের পাদদেশ। পাদদেশে মস্ত মস্ত সব কাণ্ডকারখানা। সেখানে আছে সহস্র সহস্র দেবদেবীর অজস্র মন্দিরসহ, সর্বধর্মের এক সম্মিলিত তীর্থক্ষেত্র।

হিউয়েন-সাং কামরূপ ভ্রমণে এসে দেখেছিলেন এই সহস্র মন্দির শোভিত দেবস্থান। কাদম্বরী গ্রন্থে বাণ দিয়েছেন এর বর্ণনা।

তীর্থস্থানের আশেপাশে আছে সম্রাট বুধগুপ্তের শাসনকালের ধনাঢ্য বণিক রিভুপালের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের মন্দির, অগ্রহার শাসনব্যবস্থার গোপপ্রধানের প্রশাসনকেন্দ্র গোপপল্লী, বর্মন রাজবংশের কুলাচল রাজপ্রাসাদ। সেই ভূমিভাগের গা বেয়ে প্রবাহিত বিন্ধ্যগিরি নিঃসৃত অভিরাবতী নদী।

বর্তমানকালে, উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর শহরের কাছে, ছোট্ট একটি গ্রামের বুকে দেখা যায়, প্রায় দুই কিলোমিটার স্থানব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, প্রাচীন রাজবাড়িসহ অজস্র অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ এবং বহু খণ্ড বিখণ্ডিত কৃষ্ণপ্রস্তরের দেবমূর্তি। প্রাচীন কুলাচলের স্মৃতিবাহী এই গ্রামের নাম কালাছড়া। এই অঞ্চলের কাছাকাছি আছে, বাণের হর্ষচরিত গ্রন্থে উল্লেখিত অভিরাবতী

নামগন্ধী জুরি নদী।

বাণভট্টের সময়কালের প্রায় দেড়-দুই শতাব্দীকাল পূর্বে, এই বিন্ধ্য পাদমূলে, বিপুল সভ্যতা সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হয়েছিল। এই অঞ্চলে, বিপুল পরিমাণের ভূমির উপর, একাধিক নৃপতি, নানা মন্দিরাদি স্থাপন করেছিলেন। এরমধ্যে শিবলিঙ্গ, কোকামুখদেবী, যজ্ঞবরাহ সূর্যদেবতা, প্রদ্যুম্নেশ্বরদেব, নানা বৌদ্ধবিহার প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ক্ষীণতটভূমির পূর্বদিকে শোনবিল। সেই কালের সাহিত্য শোন বিল নানা নামে উল্লেখিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ্য নাম হল, পম্পা-পদ্ম-আচ্ছোদ-সরোবর এবং পূর্ব সমুদ্র। তনুদেহী ভূমির পশ্চিমে এবং সর্বশেষ উত্তর সীমান্তে গঙ্গিনিকা। গঙ্গিনিকার ধারায় মিলিত হয়েছে লোহিত্য, গঙ্গা, বরাক এই সাথে বহু নদী উপনদীর জলপ্রবাহ। সমুদ্রের মতো বিশাল জলধারা, মৃদু মন্দগতিতে সমর্পিত হচ্ছে দক্ষিণসমুদ্রে। এই গঙ্গিনিকা 'পশ্চিম সমুদ্র' নামেও চিহ্নিত ছিল।

বাণ তার জন্মভূমির মহিমা গানে লিখেছেন, তাঁর জন্মভূমির দক্ষিণ অংশের বিন্ধ্যারণ্যের দণ্ডক বনে, রামসীতা তাঁদের বনবাস জীবনকাল কাটিয়ে ছিলেন। তিনি আরো লিখেছেন, তাঁর সময়কালেও কাঠুরিয়া এবং বনরক্ষকগণ, সেই অরণ্যে, রামসীতার বনবাসকালের পর্ণকুটির দেখতে পায়। তারা সেই কুটিরে দেখতে পায়, রামের স্বহস্তে অঙ্কিত সীতাদেবীর আলেখ্য।

রামসীতা প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বাণ তাঁর গ্রন্থভূমিকায় তাঁর পূর্ববর্তী কালের বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকগণের নাম এবং তাদের সৃষ্ট কাব্য সাহিত্যের উল্লেখ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু এই নামের তালিকায় বাল্মীকির নাম নেই।

রামকাহিনি প্রসঙ্গে তিনি, কামরূপের লেখক প্রবরসেনের নাম উল্লেখ করে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। কামরূপের প্রবরসেন, রামসীতা প্রসঙ্গে প্রাকৃত ভাষায় ক্ষুদ্র একটি কাব্য কাহিনি লিখেছিলেন। এই কাব্যের 'নাম রাবণবধ বা সেতু বন্ধাখ্য।'

বাণ, কাদম্বরী গ্রন্থে বর্তমান শ্রীলঙ্কার নাম, লঙ্কা লিখেননি। তিনি লিখেছেন সিংহল। অন্যদিকে বাণের সময়কালে হিউয়েন-সাং, তাঁর কামরূপ ভ্রমণ প্রসঙ্গে লিখেছেন, তিনি কামরূপের কামলঙ্কা পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছেন। বর্তমানকালের চন্দ্রপুর গ্রামের সন্নিকটে 'কামরঙ্গা' নামক একটি স্থান আছে।

* * *

বাণ, হর্ষচরিত গ্রন্থে যেমন তার পূর্বপুরুষগণের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন, তেমান লিখেছেন তার বন্ধুবান্ধবীর নাম এবং তাদের বৃত্তি। বন্ধুবান্ধবীর তালিকায়, বাস্তব জীবনমুখী বিচিত্র বৃত্তি সম্পন্ন, বহু ব্যক্তির নাম অমর হয়ে আছে। এই তালিকায় আছে, পণ্ডিত জ্ঞানী গায়ক বাদক লেখক কবি চিত্রশিল্পী নট নর্তকী অভিনেতা অভিনেত্রী নাটক পরিচালক স্বর্ণকার খনি ব্যবসায়ী পরিব্রাজক কাপালিক বৌদ্ধ ভিক্ষু - ভিক্ষুণী যাদুকর চিকিৎসক কুম্ভকার জুয়াড়ি জুয়াচোর চোর প্রাসাধিকা সংবাহিকা প্রভৃতি বহুবিধ বৃত্তির ব্যক্তিনাম। প্রাসাধিকা সংবাহিকা হচ্ছে, বর্তমানকালের বিউটি পার্লারের নারীকর্মীর মত এক শ্রেণীর নরসুন্দরীকর্মী।

অন্যদিকে আরো কিছু পরিচিত ব্যক্তিনাম, তার রচিত সাহিত্যের মধ্যে সুকৌশলে ঢুকিয়ে দিয়ে, সংস্কৃত সাহিত্য জগতে তার নিজস্ব সাহিত্য বৈশিষ্ট্যের চমক সৃষ্টি করেছেন। বাণের সাহিত্যে একই শব্দ একাধিক অর্থে-বিকশিত হয়ে হীরকদ্যুতি বিকিরণ করছে।

বাণ তার আত্মপরিচয়ে লিখেছেন, তিনি সোমপায়ী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। বাণের সময়কালে, ভারতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে জাতিভেদপ্রথা তীব্রভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু তিনি নিঃসঙ্কোচে তার প্রিয় দুই জেঠতুতো ভাইয়ের নাম লিখেছেন। এদের নাম চন্দ্রসেণ এবং মাতৃসেণ। এরা দুজন, বাণের পারশব ভ্রাতা। পারশব অর্থ, যাদের পিতা ব্রাহ্মণ কিন্তু মাতা শূদ্রাণী।

তিনি সাহিত্যে নিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন, সেই কালের গ্রাম্য লৌকিক আচার অনুষ্ঠান। সেসব আচার অনুষ্ঠানের রেশ, বর্তমানকালে ও শ্রীভূমি অঞ্চলে দেখা যায়।

তার সাহিত্যের সর্বশ্রেণীর চরিত্র, তাম্বুলবিলাসী। তার সাহিত্যে নানা বিলাসী উপকরণ সহ তাম্বুল আহার বিশেষ আভিজাত্যপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ও দেখা যায়, তাম্বুল গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

বর্তমানকালেও শ্রীহট্টাদি অঞ্চলের সামাজিক জীবনে, তাম্বুল গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এখানে বিবাহাদি উৎসবে, দেবতার উদ্দেশে পান উৎসর্গ করে, দেবতাকে আমন্ত্রণ করা হয়। 'পানখিলি' বিবাহাদির একটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।

*　　　*　　　*

শ্রীভূমির বাণভট্ট উপন্যাসের সময়কাল, বাণের জীবনকালের সীমায় আবদ্ধ। তিনি তাঁর জন্মকালের কোনও হদিশ লিখে যাননি। বাণের লিখিত সাহিত্যে, ঐতিহাসিক নানা ঘটনার সংবাদ লিপিবদ্ধ। অন্যদিকে, তাঁর সময়কালের নানা ঘটনা এবং সংবাদ হিউয়েন সাং এর ভ্রমণবৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বাণের সাহিত্যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে, বহু রাজা মহারাজার নাম এবং কীর্তিকাহিনি লিখিত হয়েছে। এরমধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধন এবং তার দুই পুত্র এবং কন্যা, যথাক্রমে রাজ্যবর্দ্ধন, হর্ষবর্দ্ধন এবং রাজ্যশ্রী। রাজ্যশ্রীর শ্বশুর এবং স্বামী যথাক্রমে অবন্তীবর্মা এবং গ্রহবর্মা। মালবরাজ দেবগুপ্ত। অন্যদিকে পরোক্ষভাবে আছেন আন্য রাজা ভাস্করবর্মন, জয়নাগ প্রমুখ।

এসব ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষিতে, 'শ্রীভূমির বাণভট্ট' গ্রন্থের কালকে, সাধারণভাবে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষ দশক থেকে, সপ্তম শতকের মধ্যাংশ পর্যন্ত বিস্তারিত করা যায়।

*　　　*　　　*

ভারতবর্ষের সুবিস্তারিত ক্ষেত্র ব্যাপী ছিল বাণের পরিক্রমাস্থল। প্রাচীন শ্রীভূমির আন্তর্জাতিক বন্দর কাটিগড়ার দক্ষিণের, সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির থেকে, পশ্চিম ভারতের গুর্জরপ্রদেশের, সোমনাথ শিবমন্দির পর্যন্ত তাঁর পরিক্রমার ক্ষেত্র বিস্তারিত ছিল। বাণের এই সুদীর্ঘ পরিক্রমার অনুসরণে গ্রন্থকাহিনির বিচরণ।

*　　　*　　　*

বাণ প্রকৃতির রূপমুগ্ধ কবি। প্রিয়তম ছিল তার জন্মভূমির প্রাকৃতিক রূপ। ক্ষীণতনুদেহী জন্মভূমির দুদিকেসমুদ্র। পূর্বসাগর এবং পশ্চিমসাগর। তিনি কাদম্বরীতে লিখেছেন, তার ক্ষীণতনুদেহী জন্মভূমি যেন, সমুদ্রের হীরক খচিত কটিবন্ধনী।

বাণের সময়কালে, উত্তর ত্রিপুরা থেকে করিমগঞ্জ পর্যন্ত আধুনিক লঙ্গাই অববাহিকা অঞ্চল, সমুদ্রগর্ভ থেকে সম্পূর্ণভাবে প্রসবিত হয়নি। সেই কালে ক্ষীণতনুদেহী ভূভাগের পূর্ব এবং পশ্চিমে ছিল মরুভূমির মত সুবিস্তারিত চরভূমি। নোনা বালির এই চরভূমি, তার সাহিত্যে ভীষণ ভয়াল রূপে চিত্রায়িত হয়েছে।

জন্মভূমির সর্বত্র, এই সাথে কাছাকাছি অঞ্চলে ছিল তার নিত্য পরিক্রমা। মৃন্ময়ী প্রকৃতি, তাঁর অনুভূতিতে চিন্ময়ী সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। জন্মভূমির অখ্যাত এবং কাব্যে উপেক্ষিত ফুল গুল্ম পাখি তাঁর সাহিত্যে বাঙময় হয়ে উঠেছে।

মাতৃভূমিকে ভালোবেসে, মাতৃভূমির প্রকৃতিকে প্রাণে প্রতিষ্ঠিত করতে, বাণের মত কোনও শিল্পী সাহিত্যিককে ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। বাণের দেখা, মাতৃভূমি এবং তার খুব কাছাকাছি নগর গ্রাম গঞ্জ বন্দর নদী পাহাড় সব কিছু, তাঁর হৃদয় আবেগে, প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, সাহিত্যকে মুখর করে তুলেছে।

তার প্রিয় চন্দ্রপুর, কাদম্বরী দেবকুলিকা, পালিতক, যাবা, ইন্দ্রঘর, পিণ্ডার, হরিনগর, মেঘনা, বরাক, পুষ্পভদ্রা, কালিন্দী, গন্ধমাদন এই সাথে আরো অনেক সুন্দরী প্রকৃতির ভৌগোলিক নাম, তার কাদম্বরী গ্রন্থে, প্রাণবন্ত চরিত্ররূপে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কাদম্বরী গ্রন্থে এমনি আছে চরিত্রাবলী — চন্দ্রাপীড় , কাদম্বরী, কুমার পালিত, যাবালী, ইন্দ্রায়ূধ, পুণ্ডরীক, হারীত, মেঘনাদ, বলাহক, ভদ্রাদেবী কালিন্দী, গন্ধমাদন প্রমুখ।

উদ্ধৃত স্থানের নামগুলি বাণের সাহিত্যে, শ্রীভূমি কেন্দ্রিক নানা ভূমিদান তাম্রপত্রে, গ্রীকসূত্রে এবং কিছু পরিমাণ আলোচ্য আধুনিক ভৌগোলিক অঞ্চলে বিদ্যমান।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে দীর্ঘ গবেষণায়, উপরোক্ত তথ্যাদির সত্যমূল্য, নানা ইতিহাসগ্রন্থ তাম্রপত্র চৈনিক গ্রীক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নানা বিবরণ, ভাষাতাত্ত্বিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, বাণভট্টের এবং নানা ধর্মীয় গ্রন্থাদির আলোকে উন্মোচিত হয়েছে। এসব বিস্তারিত উৎসমূলের অজস্র উদ্ধৃতি সহ তথ্যাবলী, বহু মানচিত্র এবং পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনাদির ফটোসহ, এই উপন্যাস লেখকের রচিত 'উত্তরপূর্ব ভারতের লঙ্গাই অববাহিকা এবং বাণভট্ট প্রাচীন ইতিহাসের বিস্ময়' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে, নানা তথ্যের নিদর্শনে প্রদর্শিত হয়েছে, বাণভট্টসহ বহু বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং সাহিত্যিক, প্রাচীন শ্রীভূমি অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষ দশক থেকে, সপ্তম শতকের মধ্যাংশ পর্যন্ত উপন্যাসের সময়কালের ভূমিতে সম্পূর্ণ নির্ভর করার উপযুক্ত পদভূমি নেই। চোরা মৃত্তিকার উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে কিছু নুড়ি পাথর।

এমনি ধরণের নিদর্শন হচ্ছে, বাণভট্টের হর্ষচরিত চণ্ডীশতক স্তোত্র কাদম্বরী গ্রন্থ। নানা বৈদিক সংস্কৃত পালি প্রাকৃত ধর্ম সাহিত্য দর্শন গ্রন্থাদি। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ।

বৈদেশিক গ্রন্থাদি সূত্রে প্রাপ্ত কিছু তথ্য। এরমধ্যে আছে মেগাস্থিনিস, অজ্ঞাতনামা গ্রীক বণিক, ফা হিয়ান, হিউয়েন-সাং ও বহু চৈনিক বৌদ্ধসন্ন্যাসীর বিবরণাদি।

প্রাচীন তথ্যাদির নিদর্শন যুক্ত, বৈনেয়গুপ্ত , বুধগুপ্ত , কুমার গুপ্ত , জয়নাগ, ভাস্করবর্মন, হর্ষবর্দ্ধন, ধর্মপাল, শ্রীচন্দ্র প্রমুখ নৃপতিগণের তাম্রপত্রাদি উল্লেখযোগ্য।

গ্রীক চৈনিক বিবরণ, তাম্রপত্রাদি এবং ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বিষয়াদি সম্পর্কে পণ্ডিত বর্গের বহু নিবন্ধ ও গ্রন্থরাজির নিকষিত সত্য, এই উপন্যাসের প্রাণ।

প্রাণের প্রবাহে গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে নিয়ে গেছে, বাণের প্রিয় প্রকৃতি এবং মানুষের মাঝখানে। জন্মভূমি নদী পাহাড় গ্রামগঞ্জ এই সাথে রাজামহারাজ থেকে, জীবনের সর্বস্তরে ব্যাপৃত মানুষের কলগানে, তাঁর জীবন কলমন্ত্র মুখরিত।

গ্রন্থে, বেদ বাণভট্টের এবং পালি-প্রাকৃত গ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধৃতি এই সাথে গ্রন্থের অধিকাংশ চরিত্রাবলীর নাম, বাণভট্টের গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

স্থান-কাল-পাত্র নিয়ে কিছু কথা হল। এবারে শ্রীপঞ্চমীর অপরাহ্নে, নরম দূর্বাঘাসে আচ্ছাদিত আশ্রম প্রাঙ্গণের ধারে কাছে, কোনও এক আকাশছোঁয়া রক্তচন্দন গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আমরা শ্রীমান বাণকে দেখব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীপঞ্চমী। তৃতীয় প্রহর। সূর্য পশ্চিম আকাশে। চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমে ছাত্র-শিক্ষকের জটলা। একটি জটলার মধ্যমণি বাণ। বাণ, অপেক্ষাকৃত খাটো এবং বয়সে ছোটো। সব জটলার বিষয়বস্তু সবেমাত্র শেষ হওয়া সমাবর্তন অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল প্রথম প্রহরের শেষভাগে। চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমের কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ দিনগুলির মাঝে যে কটি খোলামেলা দিন আছে এরমধ্যে সমাবর্তন অনুষ্ঠান তিথি একটি।

কিছুক্ষণ আগে উৎসব শেষ হয়েছে। চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমের কুলপতি আচার্য ঋষি জাবালি সমাবর্তন উৎসবে আমন্ত্রিত কৃতী ছাত্রদের গঙ্গাজলে অভিষিক্ত করে মাঙ্গলিক মন্ত্র পাঠ করে অভিজ্ঞানপত্র দিয়েছেন। কৃতী ছাত্রদের মধ্যে একজন বাণ।

সাধারণত নয়-দশ বছর বয়সে ছাত্রগণ চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমে প্রবেশ করে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায়। বাণ তীক্ষ্ণ মেধা এই সাথে প্রাথমিক শিক্ষা অল্প বয়সে শেষ করে মাত্র সাত বৎসর বয়সে, এখানে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছিল।

নরম দূর্বাঘাসের প্রাঙ্গণে মণ্ডপ। চারদিকে মস্ত মস্ত গাছ সব। অধিকাংশ রক্তচন্দন গাছ। গাছের গোড়ায় আলবাল। আলবাল সবুজ ঘাসে ঢাকা। মণ্ডপের পশ্চিম দিকের একটি আলবালে অগস্তি মুনি পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। ছাত্ররা তার সাথে কথা বলেছে। বাণ, অগস্তি মুনিকে প্রণাম করে। গ্রীক অগস্তি মুনি অন্ধ। অনেক দিন আগে, অজানাকে জানার আকাঙ্ক্ষায় মিশর থেকে এসেছিলেন। বহু বছর এখানে অধ্যাপনা করেছেন। বিদ্যাশ্রমে অন্ধ মুনি নামে পরিচিত।

অগস্তি মুনি বাণকে আশীর্বাদ করে বলেন, তার অধীত বিদ্যা তাকে যেন পূর্ণতা প্রদান করে।

অগস্তি মুনির আলবালের পশ্চিমে গুল্মের ঝোপঝাড়। ঝাড় থেকে দুটি হরিণ বের হয়। হরিণের পিছনে ময়ূর। ময়ূর আলবালের ভিতর ঢুকে কিছু খোঁজাখুঁজি করে।

বিস্মিত বাণ দেখে হরিণ ময়ূরের পথ ধরে ঝোঁপের ভিতর থেকে চন্দ্রসেন হাজির হয়েছে। চন্দ্রসেন বাণের পারাশব দাদা। বাণের জেঠু জাতবেদার শবর স্ত্রীর পুত্র। বাণ বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বলে— "ভ্রাত! তুমি একটু আগে এলে দেখতে পেতে আমাদের সমাবর্তন উৎসব।" চন্দ্রসেন বাণের উচ্ছ্বাস থামিয়ে বলে — বাণকে এখনই প্রীতিকূটে যেতে হবে। বাণের বাবা চিত্রভানু ভীষণ অসুস্থ।

বাণ, আচার্য ঋষি জাবালিকে জানিয়ে চন্দ্রষেণকে অনুসরণ করে। চন্দ্রষেণ বলে, অবস্থা

গুরুতর তাই বিদ্যাশ্রমের ঘাটে নৌকা না লাগিয়ে সরাসরি বিদ্যাশ্রমের পাশে এসে গেছে।

চন্দ্রষেণ দুহাতে গুল্মের ঝোপ সরিয়ে পশ্চিমে এগিয়ে চলে। বাণ তার পিছনে চলে চলে শোনবিলের তীরে পৌঁছায়। তীরে বালুর চর। গরম বালির উপর দিয়ে নৌকায় উঠে। ছিপ নৌকা। সাতজন মাল্লা। নৌকা চলতে শুরু করে। শোনবিলের তীরের কাছাকাছি জলে পদ্মবন। শীতের পদ্মবনে ফুল নেই। গভীর জলে পদ্মবন নেই। স্বচ্ছজলে ছিপের গতি তীব্র হয়।

ছিপ উত্তর-পশ্চিম মুখে এগিয়ে চলেছে। চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমের উত্তর-পশ্চিম কোণে ময়ূর-শাল্মলী। ময়ূর শাল্মলীর পূর্ব সীমায় বাণের পিতৃভূমি প্রীতিকূট। প্রীতিকূটের গায়ে গায়ে ব্রাহ্মণ্যাধিবাসের কৃতকুট্ট দেবীমন্দির।

চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রম এবং প্রীতিকূটের মাঝখানে বিশাল শোনবিল। টকটকে সূর্য। সূর্য শোন বিলের পশ্চিম তীরের চণ্ডিকা অরণ্যের মাথায় নেমে এসেছে। হিসহিস শব্দে জল কেটে নৌকা তীব্র বেগে এগিয়ে চলেছে। বাণ স্তব্ধ। বিড় বিড় করে আপন মনে প্রতি প্রভাতের যজ্ঞের ঋক মন্ত্র উচ্চারণ করে —

"পশ্চাৎ পুরস্তাদ ধরা দুদক্তাৎ কবি কাব্যেন পরি পাহি রাজন্।
সখে-সখায়ম জরো জরিম্নে হগ্নে মাঁর্তা অমর্ত্যা স্তং নঃ।"

হে প্রদীপ্ত অগ্নি! হে কবি! রক্ষা করো।
পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ-রক্ষা করো।
হে অমর সখা! মৃত্যু থেকে রক্ষা করো।

নৌকার তীব্র গতি। হালের মাঝির মন্তব্য বাণের কানে আসে। মাঝি বলে — "শীতে মরে গিয়েও শালা ছিনা শেষ হয় না।" মাঝিরা শোন বিলকে ছিনা বলে বাণের মনে পড়ে, অন্ধমুনি অগস্তি বলেছিলেন, হাজার বছর আগে গ্রীক নাবিকগণ বাণিজ্য করতে আসতেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের অনেক স্থানের নামকরণ করা হয়েছিল গ্রীক ভাষায়। এমনি একটি নাম ছিল 'সিনাই'। গ্রীক সিনাই শব্দ অন্যান্য অর্থসহ মূলত উপসাগরকে জড়িয়ে সৃষ্ট হয়েছে। তারপর সিনাই নানা অবস্থায় শোন ছিনা ছন চন্দ্র হয়েছে।

অন্ধকার নামে। পশ্চিম আকাশে শুক্লাপঞ্চমীর বাঁকা চাঁদ। হঠাৎ হালের মাঝি চিৎকার করে উঠে। ছয়টি দাঁড় থামে। ধীরে ধীরে নৌকার গতি রুদ্ধ হয়। মাঝি উত্তর পশ্চিম আকাশে আগুনের শিখা দেখায়। ওদের বিশ্বাস ভূতুড়ে আগুন। মাঝিরা জলের ভূতকে মক্কল বলে। মক্কল আলো দেখিয়ে, নৌকা ভুল পথে নিয়ে ডুবিয়ে দেয়। তারপর ঘাড় ভেঙে রক্ত খায়।

বাণ চিন্তায় ডুবে ছিল। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে আসে। মাঝিরা আকাশে ঝুলে থাকা শিখা দেখিয়ে বলে মক্কলের চোখ। বাণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চন্দ্রষেণকে জিজ্ঞাসা করে নিশ্চয়ই জেঠু প্রীতিকূটে এসেছেন। চন্দ্রষেণ স্বীকার করে — জেঠামশাই হংসবেগ বাড়ীতে এসেছেন। বাণ বলে, প্রীতিকূট থেকে জেঠুর বাসস্থান নগরশ্রী নৌঘাট একদিনের পথ। জেঠু বাড়ীতে এসে গেছেন। কিন্তু তাকে খবর দেওয়া হল না। চন্দ্রষেণ বলে খবর দিতে বারণ করেছিলেন বাণের বাবা স্বয়ং।

বলেছিলেন শ্রীপঞ্চমীতে সমাবর্তন উৎসব। তাই উৎসব শেষে চন্দ্রষেণকে পাঠানো হয়েছে।

নৌকা বাতাসে দুলছে। দাঁড়িমাঝি হাল দাঁড় বন্ধ করে আছে। বাণ আলোর দিকে নৌকা চালাতে বলে। মাঝিরা ইতস্তত করে। বাণ বলে, তার জ্যেঠামশাই আলো জ্বালিয়ে রেখেছেন, যাতে নৌকা পথ ভুল না করে।

নৌকা চলতে শুরু করে। বাণ বলে — অনেক দিন আগে বাবার সাথে নগরশ্রীতে গিয়েছিল। হেমন্তকাল ধান কাটা শুরু হয়েছে। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। আকাশ প্রদীপ তখনো জ্বালানো হয়নি। জেঠু তড়িঘড়ি প্রদীপ জ্বালিয়ে গুন টেনে টেনে প্রদীপ উঠিয়ে ছিলেন মস্ত বাঁশের ডগায়। বাণের বাবা রসিকতা করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁদের বাৎস্য - গোত্রীয় আত্মাগুলির দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে। প্রদীপ না দেখালে চলবে না। উত্তরে জেঠু স্নেহের হাসিতে চিত্রভানুকে 'ভানু' সম্বোধন করে বলেছিলেন, কাজের লোকেরা ফসল কাটতে দূরে গেছে। আলো দেখে সহজে এসে যাবে। আত্মা প্রসঙ্গে বলেছিলেন আত্মা স্বয়ং জ্যোতির শিখা। দুভাই খুব হেসেছিলেন।

নৌকা জ্যোতির শিখা ধরে এগিয়ে চলে। পঞ্চমীর ক্ষীণ চাঁদ অশরীরী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বাণের মনে হচ্ছে যুগ-যুগান্তর ধরে চলছে। চলার বিরাম নেই।

অন্ধকারে নৌকা ঘাটে লাগে। ময়ূর-শাল্মল অঞ্চলের পূর্ব দিকে শোন বিলের উত্তর-পশ্চিমের এই ঘাট 'বপ্পঘোষ ঘাট' নামে পরিচিত।

বন্ধুবান্ধব বাণের অপেক্ষায়। ঘাটে নৌকা লাগার সাথে অনেকগুলি মশাল জ্বলে উঠে। বাণ এগিয়ে চলে। পঞ্চমীর চাঁদ ডুবে গেছে। পথের দুধারের বাড়ি থেকে কুকুর ডাকছে। প্রীতিকূট বাড়ির সামনে পৌঁছে। বাণের শরীর কাঁপছে। গলা শুকিয়ে গেছে।

বাবার ঘর থেকে হংসজেঠু বের হয়ে বাণের কাঁধে তাঁর হাত রেখে বিছানার সামনে এলেন। কুলুঙ্গিতে প্রদীপ জ্বলছে। সাদা চাদরে শরীর ঢাকা। পাংশু মুখমণ্ডল। হংস মৃদুকণ্ঠে বলেন 'ভানু! বাণ এসে গেছে।' বাবার মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা। শিথিল হাতে পাশের কমণ্ডলু দেখিয়ে দেন। হংস বলেন — 'বাণ! বাবাকে গঙ্গাজল দাও।' বাণের হাত থরথর করে কাঁপে। কমণ্ডলুর ব্রহ্মনল দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা গঙ্গাজল পিতা চন্দ্রভানুর মুখে নামে। বাণের মুখ বাবার মুখমণ্ডলের কাছে নেমে আসে। বাবা, ডান হাত বাণের মাথায় রাখেন। পিতা চিত্রভানুর মৃত্যু হয়।

মৃত্যু ঘোষিত হবার সাথে সাথে জমাট স্তব্ধতা খান খান হয়ে যায়। অজস্র মানুষ। কোলাহল। বাণ স্তব্ধ। চৌদ্দ বছর পূর্ণ হবার এই ক্ষণ থেকে বাণ সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। ভাই নেই, বোন নেই, বাবা নেই। শিশুকালে মা রাজদেবীর মৃত্যু হয়েছে। মার মুখ মনে নেই।

মৃতদেহের আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হয়। হংসবেগ যেন সেনাপতি। তার নির্দেশে কাজ হচ্ছে। কলস কলস গঙ্গাজলে মৃতদেহকে স্নান করানো হচ্ছে। আত্মীয় স্বজন শবদেহে হলদু লেপন করছে। জেঠুর নির্দেশে বাণ বাবার দেহে হলদু মাখায়। বাণ স্মৃতির জোয়ারে ভেসে যায়। মনে পড়ে, এমনি এক মাঘের রাত। ভীষণ শীত। গঙ্গিনিকার তীব্র হাওয়া ঘরের ভিতর ঢুকছে। বিছানায় বাবাকে আঁকড়ে কাঁপছে। শিমুল তুলার লেপ ভেদ করে শীত ঢুকছে। কুলুঙ্গির প্রদীপ কাঁপছে। সে রাত ছিল

মাঘের শুক্লা চতুর্থী। পরদিন শ্রীপঞ্চমী। বাণের সাত বৎসর পূর্ণ হবার দিনে উপনয়ন হবে। এর মাঝে বাবা তাকে সাহিত্য ব্যাকরণ কাব্য নানা কাহিনি শিখিয়েছেন। বাবা তার সবকিছু। মার স্নেহ বাবার দায়িত্ব বন্ধুর আনন্দ সবকিছু ঢেলে দিয়েছেন। তিনি এক দেহে তার মা-বাবা হয়ে গেছেন। সেই শীতের রাতে বাবা বলেছিলেন — 'বপ্প! আমার পিঠে কিছু লিখো তো। দেখি পড়তে পারি কিনা?' বাণ হলুদ দিয়ে বাবার পিঠে লিখতে শুরু করে — শাম্মলী কাদম্বরী চন্দ্রপুর বরাক মেঘনা।

হংসবেগ সস্নেহে বাণের হাতে হাত রাখেন। বাণ জেগে ওঠে।

কৌশিকা নদী তীরে চন্দনকাঠের আগুনে চিত্রভানুর দেহ যখন ছাই হল তখন চন্দ্রপুর পাহাড়ের পূর্ব দিকে ইন্দ্রঘরের উদয়াচলে, সূর্য উঁকি ঝুঁকি দিতে শুরু করেছে।

* * *

বাণের বুকে হাহাকার। একমাত্র বন্ধন মালতী পিসি। মালতী পিসি তাকে চোখে চোখে রাখেন। বলেছেন এক বছরের মধ্যে বাণ বাড়ি ছেড়ে বের হতে পারবে না। প্রতি মাসে শ্রাদ্ধ করে বাবাকে জল দিতে হবে।

* * *

বাড়িতে বসে প্রায় আটমাস কেটে গেছে। দল বেঁধে বন্ধুরা বাড়িতে হানা দেয়। বন্ধুদের সাথে কাছাকাছি গিয়ে আড্ডা দেয়।

শরতের সাদা লাল নীলপদ্মে সব পুকুর বিল ছেয়ে গেছে। এক বিকালে বন্ধুদের সাথে বপ্প ঘোষ ঘাটের অর্জুন গাছের তলায় আড্ডা জমে। বাণের সাথে রুদ্র এবং ঈশান। ঈশান কবি প্রাকৃত ভাষায় কবিতা লিখে। রুদ্র বয়সে অল্প বড়ো। তিন বছর আগে চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমে পাঠ শেষ করে স্নাতক হয়েছে। ঈশান ব্রাহ্মণ্যাধিবাসের প্রীতিকূট বিদাশ্রমে কয়েক বছর পড়াশোনা করেছে। সংস্কৃত ভাষা বা সাহিত্য আয়ত্ত করতে পারেনি।

ঈশানকে কবিতা শোনাতে বলা হলে সে গুরুগম্ভীরভাবে বলে কবিতা উপলব্ধি করতে হয়। শরতের এই প্রকৃতি হচ্ছে শুদ্ধকবিতা। সামনের শোনবিল ছেয়ে আছে পদ্মফুলে। কবিরা তাই এর নাম দিয়েছেন পদ্ম-সরোবর। যারা ব্যবসায়ী জাহাজ নিয়ে দোকান করে এরা বলে পূর্বসাগর। পূর্ব-সাগর আর পশ্চিম সাগরের মাঝখানে ক্ষীণ তনুর এক লীলায়িত ভূমিখণ্ড। দক্ষিণের বিন্ধ্যাটবী থেকে নেমে এসেছে — নৃত্যের ছন্দে। আমাদের এ ভূমিখণ্ড, পূর্ব আর পশ্চিম সাগরের কটিবন্ধনী। আমাদের এই ভূমি, তার পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ নিয়ে বিশুদ্ধ এক কবিতা।

কবি ঈশানের কথা বাণের ভাল লাগে। নূতন করে আজন্ম পরিচিত ভূমিকে উপলব্ধি করে।

রুদ্র ঈশানের কথা শুনে বলে, প্রকৃতি সুন্দর হোক ভীষণ হোক প্রকৃতি হল শুধুমাত্র প্রকৃতি। মানুষ যদি ভাষায় চিত্রে গানে এই প্রকৃতিকে প্রকাশ করতে পারে, তখনই প্রকৃতি শিল্প হয়ে ওঠে।

বাণ ভাবে, যদি সম্ভব হয় তাহলে এই পরিচিত প্রকৃতিকে জীবন্ত করে সাহিত্যের বুকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

ঈশান কবি। পরিচিত অপরিচিত সবাইকে কবিতা শোনায়। কবিতা বলতে আলস্য নেই। সে লক্ষ করেছে অধিকাংশ মানুষ কবিতা বোঝে না এবং কবিতা পাঠ করে না। এই সুযোগ নিয়ে অন্যের কবিতা নিজের বলে চালিয়ে দেয়। অন্যদিকে রুদ্র কবিতার পাঠক। কবিতা ভালবাসে। বাণের অনুরোধে ঈশান কবিতা আবৃত্তি করে। 'ভমই মহুঅর ফুল্ল অরবিন্দ, নব কেসুকানন জুলিঅ। অন্য লাইনে যাবে। সব্বদেশ পিকরাব বুল্লিঅ, সিঅল পবন লহু বহই।"

বাণ, ঈশানকে জড়িয়ে বলতে লাগল — "ঈশান! কী সুন্দর! ভ্রমর উড়ছে পদ্ম ফুটে আছে। নবীন কিংশুক কানন ফুলে ভরে গেছে। আ-হা! কী সুন্দর! কোকিলের কুহু রব। মধুর বাতাস! আ-হা!"

রুদ্র চুপ করে মিটি মিটি হাসে। মাত্র সে দিন প্রাকৃত পৈঙ্গল কাব্যগ্রন্থে এ কবিতা পাঠ করেছে। ঈশানকে বলে, সুন্দর কবিতা।

হঠাৎ রুদ্র, শোনবিলের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে উঁচু গলায় বলে — 'দেখো — দেখো।' দেখা যায় ভীষণ বেগে নৌকা আসছে। লম্বা নৌকা। অনেক মাল্লা। বলতে গেলে চোখের পলকে ঘাটের কাছে পৌঁছায়। পঁচিশ-ত্রিশ জন মাল্লা। নৌকার মাঝখানে ছই। নৌকা ঘাটে লাগতে না লাগতে কয়েক জন মাঝিমাল্লা লাফিয়ে নেমে নৌকা বাঁধে। তিন জন, কাঁধে ঢাক ঝুলিয়ে নেমে, ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করে --

"শোনো — শোনো — শোনো! সর্বজন শ্রদ্ধেয় মহামান্য শ্রীগোপালের আগমন হইয়াছে। এতদ্বারা সকল গ্রামের সকল গোপকে অনতি বিলম্বে শাল্মলী অগ্রহারের ব্রাহ্মণ্যাধিবাসের কুতকুট্ট দেব মন্দিরের প্রাঙ্গণে মুহূর্তমধ্যে হাজির হইতে আদেশ দেওয়া হইতেছে। ... যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে ... শোনো! শোনো! শোনো!

তিনজন ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করে করে তিনদিকে এগিয়ে যায়। নৌকা থেকে শ্রীগোপাল নামেন। বাণ, শ্রীগোপালের সাথে পরিচিত। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, যেন অন্য ব্যক্তি। সাদা পোশাক। মাথায় সাদা পাগড়ি। গলায় মুক্তার মালা। কানে কুণ্ডল। ব্যায়াম কঠিন দীর্ঘ দেহ। সোনার মত গায়ের রং।

মুহূর্ত মধ্যে গ্রামের গোপ দুটি ঘোড়া নিয়ে হাজির হয়। একটিতে শ্রীগোপাল অন্যটিতে একজন সৈনিক খোলা তলোয়ার নিয়ে উঠে ব্রাহ্মণ্যাধিবাসের পথ ধরে এগিয়ে যায়।

মাল্লারা দল বেঁধে ঘোড়ার পিছনে এগিয়ে চলে। কয়েকজন মাল্লা ছোটো বড়ো কাঠের তোরঙ্গ কাঁধে করে নিয়ে যায়। বাণ লক্ষ করে মাল্লারা পরিচিত সাধারণ মাল্লার মতো নয়। রুচিসম্মত পোশাক। মাথায় পাগড়ি। কোমরে তলোয়ার।

অতর্কিত ঈশান বলে — 'যুদ্ধ! যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে?' বাণ প্রশ্ন করে — "কার সাথে যুদ্ধ বেঁধেছে?" রুদ্র বলে 'এখনই বাবাকে খবর দিতে হবে।'

রুদ্রের বাড়ি, ঘাটের কাছাকাছি। বাবা উন্মিলন স্বামী শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। শাল্মলী গ্রামের পূর্ব-সীমান্তে কৌশিকা নদীর তীরে বাড়ি।

রুদ্রের বাড়ি লক্ষ করে তিন বন্ধু ছুটে চলে। বাড়ির পূর্বদিকে শোনবিল মস্ত চর সৃষ্টি করেছে। পথ সংক্ষিপ্ত করার জন্য চরের ঝোপঝাড় ভেদ করে বাড়িতে পৌঁছায়। রুদ্রের বাবা উন্মীলন স্বামী ঘোষণা শুনেছেন কিন্তু কার সাথে যুদ্ধ বুঝতে পারেননি।

বাণ, মালতী পিসির কথা ভাবে। নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে গেছেন। সে বাড়ির পথ ধরে।

চারদিকে সরগোল। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। কেউ জানে না কার সাথে যুদ্ধ হচ্ছে। বাণ ভাবে বহুকাল ধরে তাদের অঞ্চলের অধিপতি নরকাসুর বংশের বর্মন রাজবংশ। এই বংশের বর্তমান রাজা সুপ্রতিষ্ঠিত বর্মন। এই আদ্য রাজার সাথে কার যুদ্ধ বাঁধল?

কিছুক্ষণের মাঝে বাতাসে ভেসে এল, গৌড়ের রাজা জয়নাগ আক্রমণ করেছেন। পশ্চিম সাগর অর্থাৎ গঙ্গিনিকার পশ্চিম থেকে গৌড়ের নৌবহর আসছে।

বছর কয়েক আগে মালব রাজ মহাসেনগুপ্ত, আক্রমণ করেছিলেন। তখন এখানে রাজা ছিলেন, বর্তমান রাজার পিতা সুস্থিত বর্মন। ভীষণ যুদ্ধ। দারুণ সৈন্য ক্ষয়। মালবরাজ জয়ী হয়েও সুস্থিত বর্মনকে কাবু করতে পারেননি। মহারাজ সুস্থিত বর্মন আশ্রয় নিয়েছিলেন প্রাগজ্যোতিষপুরের পার্বত্য দুর্গে। যুদ্ধের পর, সুস্থিত বর্মনের অকালমৃত্যু হয়। দুই পুত্র, সুপ্রতিষ্ঠিত বর্মন এবং ভাস্কর বর্মন নিতান্ত কিশোর। বড় ভাই সুপ্রতিষ্ঠিত বর্মন রাজপদে অধিষ্ঠিত হলেন। ভাস্কর বর্মন, দাদার সাথে রাজ্য পুনর্গঠনে সিংহ বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

সুপ্রতিষ্ঠিত বর্মন কামরূপের সমতল অঞ্চল আবার নিজের অধিকারে নিয়ে এলেন। শাল্মলী পালিতক জয় করে দক্ষিণের বিন্ধ্যাটবী পৌঁছলেন। বিন্ধ্যাটবীর উত্তর সীমান্তের পশ্চিম সাগর তীরে কুলাচলে ছিল আদ্য রাজবংশের দ্বিতীয় রাজধানী। এই রাজধানী এখন আবার হাতে এসেছে।

* * *

কুক্কুট্ট মন্দির প্রাঙ্গণে বহু গোপ উপস্থিত। শ্রীগোপাল সকলের সামনে দাঁড়িয়ে গোপদের কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছেন।

সভাব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বহু মানুষ। এর মাঝে বাণের বন্ধুরা ফিসফিস করে কথা বলছে। ঈশান বলে— 'লেগেছে যুদ্ধ; আর কথা হচ্ছে গোপদের সাথে। ওরা যুদ্ধের কী জানে? জানে তো হালচাষ দুধ বেচা আর চাটি - পাটি বানানো।'

বাণদের দলে আর একজন ভিড়েছে। লম্বাচুল। খোঁচা-গোঁফ - দাঁড়ি। ভীষণ লম্বা। লম্বা হয়ে হয়ে পিঠ বাঁকা হয়ে গেছে। মাংসহীন মোটা হাড়। নাম বায়ুবিকার। অস্বাভাবিক নাম। চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমে পাঠকালে তার এই নাম অর্জন। বছর তিনেক চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমে ছিল। এর মাঝেই উপলব্ধি করেছে এই শিক্ষা অপজ্ঞান মাত্র। শিক্ষকদেরে ধোলাই দিয়ে বিদ্যাশ্রম ছেড়ে এসেছে। বাস করে শাল্মলীর পশ্চিম দিকের নৌঘাট পালিতক গঞ্জে। ঢোল শুনে এসেছে।

বায়ুবিকার গোপ সম্পর্কে ঈশানের বক্তব্য শুনে, তার দিকে তাকিয়ে বলে — "যা বেটা, যা! পদা লিখ গিয়ে। ঐ দ্যাখ! ডান দিকে চেয়ে দেখ্! দেখছিস? মাদারের ডাল ধরে শবর ছুঁড়ি?

ওর নাভি থেকে পদ্ম টেনে টেনে নিচে নামিয়ে আন্।'

ঈশান কথা বলে না। ভয় পায়।

বায়ুবিকার এবং রুদ্র প্রায় সমবয়সী। রুদ্র বায়ুবিকারকে বলে— 'গোপ সম্পর্কে মনে হয় আপনি বেশ কিছু জানেন।' বায়ুবিকার, কথা লুফে নিয়ে বলে — ''নিশ্চয়ই জানি। জানব না কেন? আমাদের পাশেই তো ভীমক কাকার বাড়ি। কাকা একজন গোপ। কাকার সাথেই তো এলাম।'' ভীড়ের মাঝে, ভীমক কাকাকে দেখানোর প্রাণপণ চেষ্টা করে করে কিছু সময় নষ্ট করে। আবার কথা আরম্ভ করে — ''গোপদের মস্ত কাজ। মস্ত দায়িত্ব। এক একজন গোপকে চল্লিশটি বাড়ীর সব খবর রাখতে হয়। প্রতিটি বাড়ীতে কজন লোক। কজন পুরুষ -- মেয়ে বাচ্চা। বিয়ে হল কোথায়। কার বাচ্চা হল। কে মারা গেল। কত আয় খরচ কত। কুটুম্ব কে এল। সব খবর রাখতে হয়। এরপর সবকিছু লিখে খবর পাঠাতে হয় বড়ো গোপের কাছে। বড় গোপ আরো বড়ো গোপের কাছে পাঠায়। তারপর যায় শ্রীগোপালের কাছে। এই যে কথা বলছেন তিনি গোপদের কর্তা শ্রীগোপাল। সব গোপদের সর্দার।'

ঈশান নিরীহভাবে বলে, ভীমক কাকা তাহলে মস্ত লোক। বায়ুবিকার কটমট করে ঈশানের দিকে চেয়ে বলে — 'ভীমক কাকা বুদ্ধিমান। দুষ্ট-পজিরা বলে — ভীমক ধূর্ত। অবশ্য মাঝে মধ্যে তিনি জুয়া খেলেন।'

বাণ বলে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পড়েছে গোপদের কথা। কৌটিল্য লিখেছেন, রাজ্যে যদি অরাজকতা দেখা দেয় তখন গোপালকে শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়োগ করা হবে। বাণের ধারণা ছিল গোপাল বুঝি কোনও ব্যক্তির নাম। এখন বুঝতে পেরেছে গোপাল মস্ত বড়ো জনপ্রতিনিধি।

বায়ুবিকারের মুখে সামান্য প্রশান্তির ছায়া দেখা যায়। বাণকে জিজ্ঞাসা করে — তার কী নাম? বাণ নাম বলে। বায়ুবিকার উপদেশ দিয়ে বলে, কোনও বিষয়ে যদি বাণের খটকা লাগে তখন নির্ভয়ে যেন তার কাছে চলে আসে। বাণকে বলে, পুঁথির জ্ঞান শুকনো পাতার মতো মৃত। পুঁথির উপর ভরসা করতে নেই।

বায়ুবিকার সবাইকে চুপ করতে বলে। শ্রীগোপাল তখন বলেছিলেন — 'আপনারা জানেন, মানুষের মঙ্গলের জন্য আমরা রাজা-মহারাজাগণকে সাহায্য করি। আমরা প্রজাপুঞ্জের ভালমন্দ সুখ-দুঃখ সবকিছু রাজা মহারাজগণকে জানাই। এক রাজার পর আর এক রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেন। এক রাজা, অন্য রাজা দখল করেন কিন্তু আমরা সব রাজাদের মিত্র। যুদ্ধকালে প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলের জন্য আপনারা কাজ করবেন। মনে রাখবেন! কর্তব্যকর্মে অবহেলা গুরুতর অপরাধ।''

শ্রীগোপাল, তাঁর কর্মচারীদের সাথে দুএকটি কথা বলেন। কর্মচারীগণ কাঠের তোরঙ্গ থেকে চীনাংশুক বস্ত্রে অঙ্কিত অভিজ্ঞান চিহ্ন প্রতিজন গোপের হাতে অর্পণ করে। শ্রীগোপাল বলেন, প্রত্যেক গোপ যুদ্ধকালে, অভিজ্ঞান চিহ্ন আপনার দেহের প্রকাশ্য স্থানে ধারণ করবেন।

শ্রীগোপালের আদেশ প্রত্যেক অঞ্চলের দোকান বাজার, স্থাবর অস্থাবর সবকিছুর রক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সেই অঞ্চলের গোপগণের।

শ্রীগোপাল, তার কর্মচারীদের নিয়ে বপ্প ঘোষ ঘাটে নৌকায় ওঠেন। নৌকা বেগে, দক্ষিণে কাদম্বরী দেবকুলিকার দিকে এগিয়ে যায়।

* * *

শ্রীগোপালের গোপ-সভার দুদিন পর বাণ রুদ্র এবং ঈশান বপ্প ঘোষ ঘাট থেকে সোজা পশ্চিমমুখী পথ ধরে পালিতক গঞ্জে পৌঁছায়। পৌঁছে নির্বাক। মানুষ এই সংথে জিনিষপত্রে, গঞ্জের চর ঠাসা। গঙ্গিনিকার জলে অজস্র নৌকা।

গরুর গাড়িতে মাল বোঝাই হচ্ছে। অজস্র গাড়ি। গাড়ির পাশে গরু বাঁধা। কিছু লোক গরুগুলির সামনে ঘাস পাতা রাখছে। বাণ লক্ষ করে যুদ্ধের কাজে নানা ব্যস্ত মানুষের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি হাড় লিকলিকে স্ত্রীলোক টুকরি মাথায় করে গোবর নিয়ে পালাচ্ছে। স্ত্রীলোকেরা উলঙ্গপ্রায়। শতচ্ছিন্ন পোষাক।

বায়ুবিকার যোগ দেয়। গঙ্গিনিকার উত্তর দিক থেকে ছিপ তীব্র বেগে জল কেটে দক্ষিণে যাচ্ছে। বায়ুবিকার ঈশানকে বলে — "বলতে পারিস! এসব কিসের নৌকা?" ঈশানের চটপট জবাব "এগুলি যুদ্ধের ছিপ।" আবার প্রশ্ন — "এসব ছিপ, কোন্ জায়গা থেকে আসছে?" ঈশানের উত্তর নেই। এবার বাণের দিকে তাকিয়ে বলে — 'তোমার নাম যেন কী বলছিলে?' ঈশান বাণের নাম বলে। বায়ুবিকাব, বাণকে বলে এসব ছিপ যুদ্ধের জন্য কোন্ জায়গা থেকে আসছে এবং যাচ্ছে কোথায় এসব খবর বাণেব জানা উচিত ছিল। বায়ুবিকার বিকারহীনভাবে নাম বলে — কাটিগড়' বন্দরপুর হরিনগব। এসব স্থানেব গুরুত্বের বর্ণনা দেয়। বলে, ববাক এই সাথে গঙ্গিনিকার উত্তব তীরে হরিনগর। হবিনগরেব উত্তরে মস্ত মস্ত পাহাড়। পাহাড়েব মাঝখানে আদা রাজাদের মূল রাজধানী প্রাগজ্যোতিষপুব।

চারজনের দলে আব একজন যোগ দেয়। আড্ডার আর এক মক্কেল। নাম শশ। চমৎকার পোষাক পরে এসেছে। শশ বলে — 'যুদ্ধ ভীষণ ব্যাপার। যুদ্ধে ভালোমানুষের সর্বনাশ।' একটু থেমে লক্ষ করল তার গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের প্রতিক্রিয়া। আবার শুরু করে — 'শ্রীগোপাল, তার বক্তৃতায় বলেছেন, প্রত্যেকের উচিত গোপগণকে সাহায্য করা। বেচারা গোপেরা কী করবে? চারদিকে চোর-জোচ্চোর দোকানপাট লুটে পুটে নিবে।'

গঞ্জের দোকানপাট বন্ধ। দোকানিরা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। বাণদের আড্ডার পাশে এমনি বন্ধ দোকানের দরজায় এক মিশরীয় তরুণ। পালিতক গঞ্জে মিশরীয় চীনা যবন গন্ধর্ব এই সংথে স্থানীয় নানা ধরনের লোক ব্যবসাবাণিজ্য করে।

শশ, বিনীতভাবে মিশরীয় তরুণকে বলে — 'এই ভীষণ দুর্দিনে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যাকে সাহায্য করা উচিত।' বাণ দেখে, শশ হাত পা ছুঁড়ে কী সব বলছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যায় মিশরীয় তরুণ দোকানের সামনে শশকে রেখে চলে গেছে। বাণ জিজ্ঞাসা করলে শশ বলে বেচারা ক্লান্ত হয়ে গেছে। একটু বিশ্রামের দরকার। দোকানের দায়িত্ব তাকে দিয়ে বেচারা বিশ্রাম করতে গেছে।

ভিড়ের মাঝ দিয়ে চারজন, একটু একটু করে এগিয়ে চলে। ওরা যখন গঙ্গিনিকার কাছে

গেছে তখন যুদ্ধ ছিপ কটা তীরের পাশ দিয়ে তীব্র বেগে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যায়। নৌকাব জলকাটা ঢেউ পারে এসে লাগে। ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে বায়ুবিকার বাণকে প্রশ্ন করে যুদ্ধের ছিপে কজন থাকে? উত্তর নেই দেখে বায়ুবিকার শুষ্ক পুঁথির শ্রাদ্ধ করে বলে, এসব যুদ্ধনৌকা এখনো যুদ্ধের সাজ নেয়নি। এখন দক্ষিণে পিণ্ডার বন্দরে যাচ্ছে। সেখানে সাজ নেবে। প্রতিটি নৌকায় থাকবে এগারো জন। একজন হালী, দুজন মাল্লা, তিনজন তীরন্দাজ পাঁচজন বর্শাধারী। সব মিলে এগারো জন।

বাণ বিস্মিত হয় বায়ুবিকারের পরবর্তী কথায়। বায়ুবিকার বলে, পাঁচজন বর্শাধারীব মধ্যে তিনজনের ছোটো বর্শা। বর্শার ফলা বৈঠার ডগায় লাগানো। দুটি বর্শা মস্ত লম্বা। হালী এবং দুজন মাল্লার সাথে কোন অস্ত্র থাকে না। এই তিনজন, নৌকার সাথে শিকলে বাঁধা থাকে।

বাণের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলে, শিকলে বেঁধে রাখা হয়, যাতে নৌকা ছেড়ে পালাতে না পারে। নৌকা ডুবে গেলে মৃত্যু।

চারজন গঙ্গিনিকার চর ছেড়ে দক্ষিণে এগিয়ে চলে। কয়েকজন লোক বায়ুবিকাবেব সাথে কথা বলে। এবা বায়ুবিকারের মত পালিতকের অধিবাসী। ওরা বলে, যুদ্ধেব সাজ-সরঞ্জাম গাড়ি, হাতি - ঘোড়া সৈন্য সামন্ত, দক্ষিণ দিকে যাবে। সেদিকে তাদেব খেত। খেতে ধান পেকে গেছে। পাকা ধান নষ্ট হবে।

বায়ুবিকাব অভয় দেয়। বায়ু বিকারের উঁচু মাথাব দুটি চোখ খুঁজে খুঁজে বেব কবে একজনকে। তিনি ভীমক কাকা। এই অঞ্চলেব গোপ। বায়ুবিকাব পাকা ধানেব সমস্যাব কথা বলে। ভীমক অভয় দিয়ে বলেন ব্যবস্থা হবে। পালিতক থেকে সৈন্য-সামন্ত সবঞ্জাম দক্ষিণ দিকে পিণ্ডাব বন্দরে অবশ্য যাবে তবে বাজপথ ধবে যেতে হবে। সর্ষপ বাজপথ ছাড়া অন্য দিকে যেতে পাববে না।

অনেক লোক, গোপ ভীমককে ঘিরে থাকে। ভীমক গর্বিত। মস্ত কেউকেটাব মত ভীমক বললেন, যদি পাকা ধান নষ্ট হয় তা হলে দ্বিগুণ দাম আদায় কবে নেবেন। ভীমকেব জয়জয়কাব।

বাণ রুদ্র ঈশান শাল্মলীতে ফেবাব কথা যখন ভাবছে তখন শশ উপস্থিত হাতে একটা খেজুরপাতাব ঝুড়ি। ঝুড়ি থেকে পিণ্ড খেজুব বের করে সকলকে খেতে দেয়। সবাই খুশি। বাণ খেতে অস্বীকাব করে

বাণেব মনে পড়ে বাবাব শ্রাদ্ধেব সময় বহুলোক নানা ধবনেব জিনিসপত্র নিয়েছিল। একদিন শশ চুপিচুপি বাণকে বেশ কটি কাপড় দিয়ে বলেছিল সে কিছু দিতে পাবেনি, তাই সাধাবণ কটি কাপড় দিচ্ছে। বাণ দেখে, দারুণ সব চীনাংশুক বস্ত্র। বাণ জানত, এগুলি দামি কাপড়। বিদেশে রপ্তানী হয। বাণ, চুপিচুপি চীনা দোকানে ফেবং দিয়েছিল।

পিণ্ড খেজুর তেমনি কিছু হবে। রুদ্র, বাণকে খেতে বলে। বাণ, শশকে একটু দূরে নিয়ে সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করে পিণ্ডখেজুর কীভাবে পেল? শশ বলে, মিশবীয ছেলে অনেকক্ষণ ফিবে নি। তারপর সে দরজা খুলে এক ঝুড়ি পিণ্ডখেজুর নিয়ে এসেছে। শশ বলে, এ চুবি নয়। পারিশ্রমিক।

বেলা পড়ে আসছে। বাণের দল পূর্বমুখী শাল্মলীর পথ ধরে। বায়ুবিকাব, তাদেবে কিছু এগিয়ে দিতে আসে। পথে গরুর গাড়িব ভিড়। পশ্চিম দিকে চলছে। গাড়িগুলির উপর গরুব

গাড়ির চাকার স্তূপ। চাকাগুলি শোনবিলের পূর্বদিকের নানা স্থান থেকে নৌকায় বপপ ঘোষ ঘাটে এসেছে। ঘাট থেকে গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে চলেছে পালিতকের দিকে। একটি গাড়ির চাকার স্তূপের উপর এক তরুণ বসে আছে। মাথায় মস্ত পাগড়ি। চুরুট টানছে। নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। বাণদের পঞ্চজনের গোষ্ঠী দেখে তরুণ লাফিয়ে নামে। পরিচয় দেয় সে একজন মস্করী। মস্করী অর্থ পরিব্রাজক। নাম তাম্রচূড়।।

তাম্রচূড়ের কথাবার্তা, চুরুট টানা, বায়ুবিকারের পছন্দ হয়।

তাম্রচূড় বলে, দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো তার স্বভাব। প্রাগজ্যোতিষপুর থেকে কাটিগড়া বন্দরে এসে যুদ্ধের খবর পায়। বন্দরে দেখে নৌকা বোঝাই গরুর গাড়ির চাকা। চাকা হচ্ছে যুদ্ধের সরঞ্জাম। চাকা বোঝাই নৌকায় চড়ে বসল। নৌকার পর চাকা যখন গরুর গাড়িতে বোঝাই হয়েছে তখন গরুর গাড়িতে চড়ে বসল। এমনি করে সে যুদ্ধের স্থানে গিয়ে যুদ্ধ দেখবে।

বায়ুবিকার মহাখুশি। মনের মানুষ পেয়েছে। তাম্রচূড়ের কথায় জানা গেল সে কোথায় থাকবে কোথায় শোবে কিছু ঠিক নেই। বায়ুবিকার তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে। বায়ুবিকার, অনেক কথা খরচ করে, তাম্রচূড়কে বুঝিয়ে দিল সে পালিতক গঞ্জে থাকে। সেখান থেকে অকুস্থলে সহজে পৌঁছা যাবে। তাম্রচূড়, বায়ুবিকারকে কৃপা করে।

আড্ডাগোষ্ঠী ভাগ হয়। বাণের দল পূর্বদিকে বায়ুবিকার তাম্রচূড় পশ্চিমে এগিয়ে চলে। গোষ্ঠী ভাগ হবার ঠিক আগে — বায়ুবিকার তাম্রচূড়ের কাছ থেকে একটি চুরুট আদায় করে। চুরুটে আগুন ধরানোর জন্য তাম্রচূড়ের চকমকি নিয়ে কসরৎ করে কিন্তু পারে না। তাম্রচূড় তার চুরুট এগিয়ে দিয়ে চুরুট থেকে কীভাবে ধরাতে হয় সেই বিজ্ঞান শিখিয়ে দেয়। বায়ুবিকার চুরুটে দম দিয়ে ধোঁয়া উদ্গীরণ করে।

* * *

বাণ প্রীতিকূটে যখন পৌঁছাল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মালতী পিসি বান্ধবীর সাথে গল্প করছেন। বান্ধবীর সন্ন্যাসীবেশ। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গৈরিক বসন। নাম চক্রবাকিকা। প্রীতিকূটের দক্ষিণে গায়ে গায়ে লাগানো কুতকুট্ট মন্দিরে তার বসবাস।

বান্ধবী দুজন যুদ্ধ নিয়ে কথা বলছেন। বান্ধবী বলছেন, তিনি নিজের কানে শুনেছেন, কুতকুট্ট মন্দিরের প্রধান পুরোহিত করালীর কথা। করালী জয়নাগের লোককে বলেছেন, তিনি চতুর্দশী অমাবস্যার সঙ্গমমুহূর্তে, মন্দিরে তান্ত্রিক আচার শুরু করবেন। সেই সঙ্গমমুহূর্তে, জয়নাগের আক্রমণ অবশ্যই শুভফল প্রদান করবে।

দুই বান্ধবী হিসাব নিকাশ করে বের করেছেন আগামী পরশু সেই সঙ্গম তিথি। মালতী পিসি মন্তব্য করেন অমাবস্যায় যাত্রা নাস্তি। তাহলে, জয়নাগ কীভাবে যুদ্ধ যাত্রা করবে?

বাণ আপন মনে চিন্তা করে এই সঙ্গমমুহূর্তে ভীষণ জোয়ারের কাল। জয়নাগের পক্ষে পশ্চিম সাগর পার হয়ে আসা অসম্ভব। এই সাথে বাণের ধারণা হয় কুতকুট্ট মন্দিরের পুরোহিত করালী আদ্য রাজার বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে।

করালী বাণের বাবার শ্রাদ্ধের সময় কালে গণ্ডগোল পাকিয়ে ছিল। বলেছিল, শ্রাদ্ধের প্রকৃত অধিকারী কুতকুট্টু মন্দিরের ব্রাহ্মণগণ। তারা হচ্ছে কট্টু ব্রাহ্মণ অগ্রদানী। কট্টু অর্থ দেশ। দেশের ব্রাহ্মণগণকে ঠকিয়ে নিচ্ছে নূতন যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণগণ।

গণ্ডগোল মিটিয়ে ছিলেন বাণের কাকা মহীদত্ত। করালীকে গোপনে বহু দানসামগ্রী দক্ষিণা দিতে হয়েছিল।

* * *

বাণের খেয়াল ছিল না গত রাতে অমাবস্যা গেছে। সকাল বেলা শশ এসে বলে — 'চল্ কালিকাশ্বভ্র দেখে আসি ' কালিকাশ্বভ্র, প্রীতিকূটের দক্ষিণ দিকে, চার দণ্ডের পথ। বপপ ঘোষ বাটি পার হয়ে দক্ষিণ দিকে যেতে হয়। পিসীমা বলেন, গতকাল পূজা গেছে বাণ যেন প্রসাদ নিয়ে আসে।

শশের হাতে চটের থলে। শোন বিলের পশ্চিম তীরে মস্ত বাঁধ। বপপঘোষ বাটি থেকে বাঁধের উপর দিয়ে পথ দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেছে। বাণ এবং শশ বাঁধপথ ধরে এগিয়ে যায়।

দণ্ড চারেকের মধ্যে, কালিকাশ্বভ্র মন্দির অঞ্চলে পৌঁছায়। শশ বলে - 'শ্বভ্র কী রে?' বাণ বলে 'তীর্থস্থানকে শ্বভ্র বলে।' বাঁধ পথের ডান দিকে কালিকা শ্বভ্র শশ বলে, এখন কালীমাকে দেখা হবে না। আরো কিছু এগিয়ে যেতে হবে। কালিকাশ্বভ্রের দক্ষিণে কাদম্বরী দেব কুলিকা। দুটিই চণ্ডিকা দেবী মন্দির। মন্দির দুটি সম্পূর্ণ আলাদা। কালিকাশ্বভ্রের দক্ষিণ সীমায় বাঁধ পথের বাঁদিকে কয়েকটি খেজুর গাছ গায়ে গায়ে লেগে আছে। খেজুর গাছের পিছনে, শোনবিলের ধূ ধূ বালির চর।

বাণ বলে, খেজুর বন মরুদ্যানের মতো। শশের প্রশ্ন 'মরুদ্যানের অর্থ কী?' বাণ ব্যাখ্যা করে পাথক একজন এগিয়ে এসে এদের পাশে দাড়ায়। আর একজন পাথক আসে। কথায় কথায় খেজুর গাছগুলি কালিকা শ্বভ্র অথবা কাদম্বরী দেবকুলিকার ভূমিতে পড়েছে এই নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। প্রশ্ন নিয়ে পথিক দুজনের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয় বাণ এবং শশ দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যায়। মন্দির দুটির সীমান্তের খেজুর বনের অধিকার নিয়ে গণ্ডগোল আছে বোঝা যায়।

খেজুরবন পার হয়ে বাঁ দিকে শোন বিলের উপর দেখা যায় সবুজ একখণ্ড খেত দুজন খেতে কাজ করছে। বাণ, জলে ভাসা খেত ভাল করে দেখেনি। চরের উপর দিয়ে খেতের কাছে পৌঁছয়। বিলের তীর থেকে খানিক দূরে জলের উপর খেত ভেসে আছে।

লোক দুজন বলে, বিলের শেওলা এই সঙ্গে নানা খোলকাণ্ড দিয়ে প্রথমে জলে ভাসা খেত তৈরী হয় খেত তৈরি হলে গোবর-মাটি দিয়ে চাষাবাদ করা হয়।

বাণ এবং শশ দেখে ঝলমলে সবুজে নানা শাকসব্জিতে জলে ভাসা খেত ঝলমল করছে।

খেতের লোকেরা বলে জলে ভাসা বাগানের নানা সুবিধা। জলসেচ নামমাত্র। বিলের জল পার হয়ে হরিণ শুয়র বাঁদর ছাগল গরু খেত নষ্ট করতে পারে না।

ছাগল গরু খেত নষ্ট করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে শশ খেতের দুজনের দিকে তাকিয়ে বলে

'বাদর শুয়র খেতের ক্ষতি করতে পারল না। কিন্তু ধরা যাক! ভীষণ খারাপ! ভীষণ পাজি! কোনও লোক যদি জলে ভাসা খেত রশি বেঁধে টেনে টেনে নিয়ে যায় তা হলে কী হবে?'

শশের কথায়, লোক দুজন হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে।

বাণ, শশকে নিয়ে বাঁধপথে উঠে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলে।

কাদম্বরী মন্দিরে পৌঁছানোর আগেই দেখা যায় রাস্তার ডানদিকে ছোটো ছোটো দোকান। বেশির ভাগ বন্ধ। গত রাতে অমাবস্যার পূজা হয়েছে। সারারাত খোলা ছিল।

শশ একটি বন্ধ দোকানের দরজায় শব্দ করে করে দোকানিকে ডাকে। কিশোর একটি দরজা ফাঁক করে জিজ্ঞাসা করে। শশ বলে; একটি রুপার টাকা ভাঙাবে। দুজন দোকানের ভিতর ঢোকে। দরজা বন্ধ হয়। ভিতরে হালকা অন্ধকার। চোখে অন্ধকার সহে গেলে দেখা যায় দোকানে সারি সারি তাক। তাকগুলি তক্তার পাল্লা দিয়ে ঢাকা। পাল্লা গুলিতে ছোটো বড়ো তালা।

আবছা আলোকে শশের রুপার টাকা চকচক্কক করে। শশ, তরুণকে জিজ্ঞাসা করে রুপার টাকা ভাঙিয়ে কতকড়ি পাবে? উত্তর পাবার আগেই আবার তরুণকে জিজ্ঞাসা করে তাদের দোকানে এক টাকার কড়ি আছে কিনা? প্রশ্ন শুনে তরুণ উত্তেজিত হয়ে বলে মাত্র গতকাল মস্ত এক বণিক তাদের দোকানের সামনে শোন বিলের তীরে পানসি লাগিয়ে দুই দিনারের কড়ি নিয়ে গেছে।

কথা উঠে এক দিনারে কত কড়ি। তরুণ পাতায় লিখতে শুরু করে। হিসাব মেলে না। শশের তাড়া খেয়ে বলে লেখার পাতাগুলি বেশি শুকিয়ে খরখরে হয়ে গেছে। লেখা বিগড়ে যাচ্ছে।

শশ একান্ত নিরীহ ভাবে বলে --- 'গতকালের অমাবস্যার জোয়ারে নিশ্চয়ই পত্রগুলিকে আরো বিগড়ে দিয়েছে।

বাণ কলম ধরে। তরুণ বলে — বিশ কড়িতে এক পয়সা চার পয়সায় — এক পণ। ষোল পনে - এক টাকা। বানের হিসারে বের হয় এক টাকা সমান এক হাজার, দুশ আশি কড়ি

শশের প্রশ্ন — এক দিনারে কত কড়ি? বাণ, হিসাব করে বের করে এক দিনার সমান — ছিয়াত্তর হাজার আটশত কড়ি। তরুণ জিজ্ঞাসা করে কত টাকাতে দিনার ধরা হয়েছে? বাণ বলে, ষাট টাকা। তরুণ ঘাড় নেড়ে বলে, দিনার এখন এই দামেই চলছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ দিনারের দাম চড়ে যায়।

বন্ধ দরজায় শব্দ। গঙ্গাস্তোত্র ভেসে আসে। তরুণ বলে, বাবা স্নান করে এসে গেছেন। হিসাবপত্র বাবা করবেন। ইতিমধ্যে কথাবার্তায় তরুণ তার নাম বলেছে ধনকুবের। বাণ-শশ তাদের নাম বলেছে।

বাবার গৃহপ্রবেশ। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। মাথায় টাক এই সাথে উপযুক্ত ভুঁড়ি। কাঁধে ভিজা গামছা। প্রবেশ করতে না করতে কড়ির তাকের পিছন থেকে আর্তনাদ ওঠে। পিতাপুত্র একসাথে ভিতর কোঠায় প্রবেশ করেন। বাণ শশ আতঙ্কিত হয়ে সেদিকে চেয়ে থাকে। দোকান আর বাসগৃহের মাঝে আধ-খোলা দরজা।

আর্তনাদের উৎস ধনকুবেরের মাতার কণ্ঠ। মাতা দরজার ফাঁক দিয়েছে রুপার টাকা লক্ষ করে বুঝেছিলেন এ টাকা বিশেষ মূল্যবান। গৌড়ের রাজা জয়নাগের মুদ্রা। মহিলা স্বামীপুত্রকে বুঝিয়ে বলেন, যুদ্ধে জয়নাগ জয়ী হলে এ টাকার দাম হঠাৎ দারুণ বেড়ে যাবে।

ঝানু কারবারি, তার ভূমিকা স্থির করে অকুস্থলে এলেন। মুদ্রা দেখলেন। দেখেই চিৎকার— 'ওরে কুবের! রশি নিয়ে আয়! রশি নিয়ে আয়! গুপ্তচর ধরেছি। আমাদের আদ্যরাজার সর্বনাশ করতে গুপ্তচর এসেছে।'

ধনকুবের গরু - বাঁধার রশি নিয়ে হাজির হয়। শশকে বাঁধা হল। বিস্মিত শশ এবং বাণ জানতে পারল না — এই রুপার টাকা জয়নাগের মুদ্রা।

শশ, কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল গুপ্তচর নয়। সে টাকাকড়ি চায় না। মুক্তি চায়।

ছাড়া পেয়ে শশ দিক-বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুট দেয়। দোকানের সামনের পাট বন্ধ। শশ, খোলা দরজা দিয়ে বাসগৃহের ভিতর ঢুকে পিছনের খিড়কি দিয়ে বের হয়ে গেল। খিড়কির খিলভাঙা। সহজেই লম্বা দৌড়।

কিছুপর বাণ বের হয়ে খেজুর গাছের পাশে শশকে পেল। শশ হাঁপাচ্ছে।

বাণ, রেগে শশকে জিজ্ঞাসা করে এই টাকা কোথায় পেয়েছে? শশ বলে, গতকাল বিকালে বপপ ঘোষ ঘাটে গিয়ে দেখে, মস্ত নৌকা। নৌকা থেকে নামছিলেন এক শেঠ। মাঝিরা বলে, বন্দরপুর থেকে এসেছেন নাম গুহন দীন। গৌড়ের মস্ত শেঠ।

বাণ ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করে টাকা কীভাবে পেয়েছে? শশ কাঁচুমাচু হয়ে বলে, শেঠ যখন নৌকা থেকে কাঠের পাটাতন দিয়ে নামছেন তখন পা পিছলে পড়ে গেলেন। সেই সঙ্গে উত্তরীয়ের ভিতর থেকে ছোটো বটুয়া কাদায় পড়ে গেল। কেউ লক্ষ করেনি। শশ, চুপি চুপি তুলে নিয়েছে। বটুয়ার মধ্যে ছিল এই টাকা এই সাথে পাঁচ গন্ডা কড়ি।

বাণের প্রশ্ন— শেঠ যাচ্ছিল কোথায়? শশ বলে, কুতকুট্ট মন্দিরে অমাবস্যার পূজা দিতে। শেঠের সাথে ফল ফুলের ঝুড়ি পাঁচটি কালোপাঁঠা, কয়েকটি কাঠের তোরঙ্গ। শশ বলে, সে মাঝিদের কাছ থেকে জেনেছে তোরঙ্গে ছিল শিশির দেশের আঙুর রসের মদ।

বাণ চিন্তিত হয়। জিজ্ঞাসা করে শেঠের সাথে লোকজন কেমন ছিল? শশ বলে, মাঝি-মাল্লা এই সাথে দুটি উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে শশের ধারণা একটি মেয়ে যবন অন্যটি শবর একটির সোনালি চুল নীল চোখ। অন্যটি কালো, থেবড়ানো নাক।

বাণ বুঝে নেয় মালতী পিসি আর বান্ধবীর গল্পের বিষয়। বন্দরপুরের শেঠ গুহনদীন জয়নাগের গুপ্তচর।

শশ, বাণকে জিজ্ঞাসা করে, কুতকুট্ট মন্দিরে অমাবস্যা পূজার এত নাম ডাক কেন? বাণ বলে, কিছু কাল থেকে সবকটা চণ্ডিকা গুলে কাপালিকদের প্রতাপ বেড়ে গেছে। ওরা, মদ্য মাংস নারী সহযোগে নানা আচার করে। ভক্ত সংখ্যা বেড়ে উঠছে। শশ, উৎসাহিত হয়ে বলে, শেঠ তাই মদের তোরঙ্গ কালোপাঁঠা এই সাথে মেয়েমানুষ নিয়ে এসেছে। শশ আরো কিছু বলতে চলছিল।

বাণ বাঁধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে বটুয়ার কড়ি কোথায়? শশ কোমর থেকে বের করে দেখায়। বাণ, কড়ি ফেলে দিতে বলে। শশ বলে, পাঁচ গণ্ডা কড়ি খরচ করে চার-পাঁচ দিন মজা করা যাবে। এই সাথে কড়ি হচ্ছে লক্ষ্মী। কড়ি ফেলে দিলে লক্ষ্মী রাগ করতে পারেন। বাণের ধমক খেয়ে বলে, তাদের বাড়ীর সামনে কৌশিকা নদীর খাতে একটি গর্ত আছে। সেখানের গভীর জলে কড়ি ফেলে দিবে। মা লক্ষ্মীকে তো যেখানে সেখানে ফেলে দেওয়া যায় না।

বাণ বলে, লক্ষ্মীকে এত সমাদর করে লাভ নেই। লক্ষ্মী চপলা যখন তখন যে কোনও পুরুষের গায়ে লেগে যান। আবার মুহূর্তের মধ্যে অন্যের বুকে ঢলে পড়েন।

শশ বলে, তারও মনে হচ্ছে ঐ ব্যাটাদের লক্ষ্মী পালিয়ে যাবে। লক্ষ্মী পালিয়ে যাবার পথ সে দেখেছে। খিড়কির দরজা দিয়ে পালিয়ে আসার সময় লক্ষ করেছে ভাঙা দরজা খিল নেই। বুড়ো শিয়াল চোখ বন্ধ করে ঢুকে যেতে পারে। শশ উত্তেজিত হয়ে বলে কোন দুষ্ট পাজি চোর যদি, খিড়কি দিয়ে ঢুকে সব কড়ি নিয়ে পালায় তা হলে পেট মোটা শুয়র করবেটা কী?

বাণ বলে, এত কড়ি নিয়ে ভেগে যাওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়। শশশান্তভাবে বলে, চোর নৌকা নিয়ে যেতে পারে।

* * *

বাণ, দুপুরের শেষ মাথায় প্রীতিকূটে পৌঁছায়। ঘরে ঢোকার দরজার সামনে আমলকি গাছ। গাছ থেকে বাণী লাফিয়ে নামে। আমলকি খেতে উঠে ছিল। বাণী, বাণের বন্ধু ময়ূরকের বোন। বাণী মালতী পিসির বান্ধবীর গায়ে সারাক্ষণ আঠার মত লেপটে থাকে।

বাণী হুকুম দেয় আমলকি উঁচু ডালে আছে। বাণ গাছে চড়ে পেড়ে দিক। বাণ, ওকে লক্ষ করেছিল বাবার শ্রাদ্ধের দুদিন আগে। বাণ কাকবলি দিচ্ছিল। গঙ্গাজলে পরিষ্কার করা আমগাছের তলায় বলি রেখে ইদম-ক্ষীরম গ্রহণ করার জন্য কাককে অনুনয় বিনয় করা হচ্ছিল।

শেষপর্যন্ত কাক যখন দয়া করে গ্রহণ করেছিলেন সেই মোক্ষম কালে কাকের পাশে পড়ে মস্ত ঢিল। কাকের পলায়ন। হৈ হৈ রৈ রৈ। ঢিল ছুঁড়েছিল বাণী। বাণীর বক্তব্য সহজ। কাক গল্প টান টান করে খেয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে দাদার বুদ্ধু বন্ধু বাণ। তাই কাক তাড়ানোর দায়িত্ব তাকেই নিতে হয়েছে।

ময়ূরক বোনের গালে থাপ্পড় কশালে বাণীবনবিড়ালির মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পলায়ন ছাড়া ময়ূরকের অন্য উপায় ছিল না।

প্রায় সাত বছরের ডানপিটে দামাল মেয়ে বাণী। রুক্ষ-পিঙ্গল চুল। নীল চোখে হুকুমের ছায়া। বাণ, বনবিড়ালির হুকুম তামিল করতে বাধ্য হয়।

শীতলপাটিতে বসে মালতী পিসি বান্ধবীর সাথে গল্প করছিলেন। মাঝখানে পানের বাটা। গল্প হচ্ছিল রামকাহিনি নিয়ে।

বাণ, খেয়ে দেয়ে এসে শুনে একই কাহিনি চলছে। পিসি বাণকে বলেন, প্রীতিকূট বিদ্যাশ্রমে রাবণবধ পুঁথি আছে। পুঁথির অন্য নাম সেতু বন্ধাখ্য। রাবণবধের জন্য সেতু বানিয়ে ছিল কামরূপের

সৈনিকগণ। সেনাপতি ছিলেন নল। নল বিশ্বকর্মার ছেলে।

বাণ বলে, সে শুনেছে বানরসেনা সেতু বানিয়েছে। পিসি বলেন, একথা, তিনিও দাদাকে বলেছিলেন। দাদা প্রশ্ন শুনে হেসে বলেছিলেন, জিহ্বার গলদ। ভুল উচ্চারণে 'বানরসেনা' হয়েছে। পুঁথিতে লেখা 'নলসেনা'। শবরদের ভাষায় সম্মানীয় বা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি নামের পূর্বে 'বা' উপসর্গ যুক্ত হয়। এমনিভাবে শ্রদ্ধেয় 'নল' হলেন 'বানল'। বানল থেকে 'বানর'।

বাণের মনে হল, তার বাবা যেন পিসির মুখ দিয়ে কথা বলছেন। বাবার কথা মনে হতেই ভীষণ এক শূন্যতা হাহাকার করে ওঠে।

পিসি বলেন, তাঁর দাদা বলেছেন প্রবরসেন কামরূপের লেখক। রাম সীতার লোক কাহিনি তিনিই প্রথম প্রাকৃত ভাষায় লিখেছেন। রাম সীতা বনবাস কালে ময়ূর শাল্মল বিন্ধ্যাটবী অচ্ছোদ সরোবর এসব অঞ্চলেই বসবাস করেছিলেন। প্রীতিকূটের উত্তরপূর্বে মাথাকাটা যে ক'টা তালগাছ আছে এগুলি রামচন্দ্রের বাণে কাটা পড়েছে।

বান্ধবী কথায় যোগ দেন। বলেন, দিন কতক আগে কজন কাঠুরিয়া, মন্দিরে জ্বালানি কাঠ বিক্রি করতে এসেছিল। ওরা বলেছে, জঙ্গলের ভিতর, ভাঙা কুটিরে সীতার ছবি দেখেছে। রাবণ, সীতাকে হরণ করার পর রামচন্দ্র নিজের হাতে সীতার ছবি এঁকেছেন।

বাণ হনুমানের নাম উল্লেখ করে বলে, তাহলে হনুমান নিশ্চয়ই মানুষ ছিলেন। পিসিমা বলেন, তার দাদা বলেছেন বিন্ধ্যাটবীর উত্তর-পশ্চিমে যে সানুমান পর্বত আছে, হনুমান সেখানকার অধিবাসী। 'সানুমান' কামরূপের উচ্চারণে, 'হনুমান' হয়ে গেছে। হনুমান মস্তবীর। সুবিপুল তার দেহ। হনুমানের অন্যতম নাম — বজ্রংবলী। শবর ভাষায় ব্রজং অর্থ সুবিশাল।

*　　　　*　　　　*

মালতী পিসির গল্পে গল্পে বিকাল হয়ে গেছে। রুদ্র এসে ডাকে। বপ্প ঘোষ বাটের অর্জুন গাছতলার আড্ডার সময় বয়ে যাচ্ছে। দুজন, অর্জুন তলায় বসতে না বসতে ঘোড়ার গাড়ি ঘাটের সামনে দাঁড়ায়। গাড়ির সঙ্গে দুজন ছুটে ছুটে এসেছে। একজন পরিচিত। পালিতকগঞ্জের গোপ ভীমক। অন্যজন অপরিচিত।

শ্রীক্ষিকুণ্ড গাড়ি থেকে নামেন। মাথায় সাদা পাগড়ি। মধ্যম আকৃতি। ক্ষীণদেহী প্রৌঢ়। তিনি আদ্য রাজার ভূমি জরিপ বিষয়ের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। পোশাক পরিচ্ছদ জীর্ণ। মনে হয় পরিচ্ছদ সম্পর্কে নির্বিকার অথবা পালটানোর সময় সুযোগ মিলেনি।

রুদ্র তাঁকে নিয়ে বাড়ী যায়। উন্মীলন স্বামী আলিঙ্গন করে অভ্যর্থনা করেন। উন্মীলন স্বামী শ্রীক্ষি কুণ্ডের মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে, কোনও কিছু অনুভব করে, রুদ্রকে খাবার নিয়ে আসতে বলেন। শ্রীক্ষি কুণ্ড নীরবে থালার চিড়া দৈ কলা গুড় শেষ করে মুখে তাম্বুল পুরে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। তার ব্যস্ততার কথা বলেন। তাকে এখনই চন্দ্রপুর বিষয়ের রাজদপ্তরে যেতে হবে। গঙ্গিনিকা থেকে পালিতক ঘাটে নেমে সড়ক পথে বপপ ঘোষ ঘাটে এসেছেন। এখান থেকে শোন বিলের মাঝ দিয়ে চন্দ্রপুর যাবেন। দ্রুত পৌছানোর জন্য এ পথ ধরেছেন। সঙ্গে, দুজন গোপ এনেছেন — নৌকা এই সাথে মাল্লার ব্যবস্থা করার জন্য।

উম্মিলন স্বামী যুদ্ধের প্রসঙ্গ উল্লেখ করলে শ্রীক্ষি কুণ্ড বাণের দিকে তাকিয়ে বলেন, বাণের বাবা চিত্রভানু তাঁর মিত্র ছিলেন। ভূমিজরিপ বিষয়ে চিত্রভানুর বিশেষ আগ্রহ ছিল। বাবার কথা শুনে বাণের ভালো লাগে। বাণ হঠাৎ করে ভূমি জরিপ কী করে করতে হয় জিজ্ঞাসা করে। বাণের এমনি প্রশ্নে উম্মিলন স্বামী এবং শ্রীক্ষিকুণ্ডের মুখে স্মিতহাসির রেখা ফুটে ওঠে।

শ্রীক্ষিকুণ্ড বলেন, এক কথায় উত্তর দেওয়া কঠিন। চন্দ্রপুর অঞ্চলে প্রায় হাজার বছর ধরে এর চর্চা চলেছে রুদ্র শ্রীক্ষিকুণ্ডের "হাজার বছর ধরে" এই উক্তির বিষয় জানতে আগ্রহ প্রকাশ করে।

শ্রীক্ষিকুণ্ড বলেন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়কাল থেকে এই অঞ্চলে নানা ধরনের গ্রীক জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্পের চর্চা প্রচলিত হয়েছে। এরমধ্যে মিশর দেশের মত ভূমিজরিপ ব্যবস্থা অন্যতম।

বাণ, 'মিশর দেশের মতো' জরিপের বিষয় জানতে চাইলে, শ্রীক্ষিকুণ্ড বলেন, মিশরের ভূমি প্রতিবছর, নীলনদের বন্যায় ডুবে গিয়ে পুরানো মাপজোক বদলে দিত। চন্দ্রপুর অঞ্চলে তেমনি প্রতিবছর গঙ্গিনিকা বরাক প্রভৃতি নদীর জলে ভূমির পুরোনো মাপজোক বদলে দেয়। সেজন্য গ্রীকদের মাধ্যমে মিশরদেশের ভূমি-জরিপ ব্যবস্থা এ অঞ্চলে প্রচলিত হয়।

কথা ওঠে চন্দ্রপুর অঞ্চলের ভূমি-গঠন সম্পর্কে। কুণ্ড বলেন, এই অঞ্চলের বিস্তারিত ক্ষেত্র সমুদ্রগর্ভে ছিল। দ্বীপের মতো ভেসে ছিল কিছু পাহাড়ি অঞ্চল। পাহাড়ি অঞ্চলে প্রথম বসতি গড়ে ওঠে। চন্দ্রপুর তথা শাল্মলী পালিতক প্রভৃতি অঞ্চলের দক্ষিণে-উত্তরে এবং পূর্বদিকে একাধিক প্রাচীন পার্বত্যভূমি অবস্থিত। এ সকল পাহাড়ি ক্ষেত্রের ভূমি বৃষ্টিধারায় ক্ষয়ে অনবরত সমুদ্রে এসে জমা হতে থাকে। ক্রমশ সমুদ্রের নানা অংশ ভরে ওঠে নব নব বসতি এবং কৃষিক্ষেত্রের সৃষ্টি। ভূমি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেত বলে, জরিপের ভাষায় এ অঞ্চল "বর্দ্ধমান ভূমি" নামে পরিচিত হয়।

বাণ, এই অঞ্চলের বিস্তারিত দেবোত্তর ভূমির কথা জিজ্ঞাসা করে। শ্রীক্ষিকুণ্ড বলেন, আর্যদের আগমণের পূর্বে এই অঞ্চলে বৌদ্ধ শৈব শাক্ত প্রভৃতি ধর্ম প্রচলিত ছিল। আর্যদের মধ্যে সুর অর্থাৎ সূর্য উপাসক গোষ্ঠীর আগমন প্রথম হয়েছিল। এই গোষ্ঠী অসুর আর্য নামে পরিচিত। পরবর্তী গোষ্ঠী যজ্ঞকারী আর্যগোষ্ঠী। অগ্নি বা আলোক অর্থ বাচক 'ডি' ধ্বনি অনুসারে এই গোষ্ঠী 'দেব' আর্য গোষ্ঠী নামে পরিচিত। দুগোষ্ঠীর যুদ্ধবিগ্রহ পুরাণাদি ধর্মশাস্ত্র দেবাসুরের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

বাণ, চণ্ডিকা বা কুক্কুট মন্দিরের সাথে অন্যান্য ব্রাহ্মণদের বিরোধের কথা উত্থাপন করে।

শ্রীক্ষিকুণ্ড হেসে বলেন, দেবতা নামের অর্থের পার্থক্য বিবাদের অন্যতম কারণ। শ-দেড়েক বছর আগে গুপ্ত রাজাদের শাসনকালে শাল্মলী অঞ্চলের দক্ষিণে চণ্ডিকা অরণ্যে কোকামুখ দেবতা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। রিভু পাল বহু জমি খরিদ করে এই ভূমিদেবতার উদ্দেশে দান করেছিলেন। রিভুপাল ছিলেন বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী।

শবর ভাষায় কোকামুখ অর্থ বহু সন্তানবতী জননী বা মহামাতৃকা। অন্যদিকে আর্যদের ভাষায় নানা কারণে 'কোকা' শব্দ মোরগ অর্থাৎ কুক্কুট হয়ে গেল।

রুদ্রের জিজ্ঞাসায় শ্রীক্ষিকুণ্ড বলেন, প্রথমে কারা কোকামুখ দেবতার প্রচলন করেছিলেন, এ

সম্পর্কে তার সঠিক ধারণা নেই তবে বহুকাল পূর্বে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মহা-মাতৃকার পূজা প্রচলিত ছিল। সুতরাং আরব বণিকদের মাধ্যমে এদেশে কোকামুখ দেবীর আবির্ভাব অসম্ভব নয়।

বাণ, দেবোত্তর ভূমি সম্পর্কে আবার জিজ্ঞাসা করে শ্রীক্ষিকুণ্ড বলেন — দেবোত্তর ভূমির বিশেষ প্রচলন হয় — গুপ্ত রাজাদের সময়কালে। গুপ্ত রাজাগণ মূলত দেবপন্থী আর্য। এই অঞ্চলে দেবপন্থী আর্যধর্ম প্রসারের জন্য পশ্চিম ভারত থেকে বহু ব্রাহ্মণকে ভূমিদান সহ অন্যান্য নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ক্রমে এসব ব্রাহ্মণদের বংশবৃদ্ধি হতে থাকে এবং সেই সাথে দেবোত্তর ভূমির বৃদ্ধি হতে থাকে।

দুজন গোপ এসে খবর দেয় — নৌকা প্রস্তুত। শ্রীক্ষিকুণ্ডের সাথে উন্মীলন স্বামী রুদ্র এবং বাণ ঘাটে উপস্থিত হয়। প্রায় ত্রিশজন মাল্লার দীর্ঘ নৌকা। তীব্র বেগে জল কেটে নৌকা অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

বাণ, তাকিয়ে দেখে, শোনবিলের পূর্ব তীরে চন্দ্রপুর পাহাড় অঞ্চলের অসংখ্য গৃহে আলোক জ্বলে উঠেছে। মনে হয় অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্র ঝকমক করছে।

* * *

পরের দিন সকালবেলা তাম্রচূড়কে সঙ্গে করে বায়ুবিকার হাজির হয়ে বলে 'সবশেষ'। বাণের জিজ্ঞাসা — 'কি শেষ?' বায়ুবিকার বলে — ''আমাদের আদ্য রাজা সুপ্রতিষ্ঠিত বর্মন এই সাথে তাঁর ভাই ভাস্কর বর্মনকে গৌড়ের রাজা জয়নাগ বন্দী করে কর্ণসুবর্ণে নিয়ে গেছে। বাণ হতবাক।

তাম্রচূড় তার অভিজ্ঞতার কাহিনি বলে। সে মালপত্রের নৌকা চড়ে গঙ্গিনিকা দিয়ে সোজা রাজধানী কুলাচলে পৌঁছায়। চারদিকে মালপত্র। নৌকা হাতি ঘোড়া মানুষ। রাজা সুপ্রতিষ্ঠিত বর্মন বিন্ধ্যাটবীর গন্ধর্ব সর্দারদের প্রিয় বন্ধু। বর্মন রাজার জন্য, গন্ধর্বগণ তাদের হাতি এনেছে। অনেক হাতি। পাহাড় কালো করে হাতি। সবাই বলাবলি করছে, দুতিন দিন পর গৌড়ের রাজা গঙ্গিনিকার পশ্চিম থেকে নৌবহর নিয়ে হাজির হবে।

বাণ জিজ্ঞাসা করে দু'তিন দিন পর আক্রমণ হবে একথা কি গৌড়ের রাজা জানিয়েছিল? বাণের প্রশ্নে বায়ুবিকারের বিকার হয়। ভীষণ চটে বলে বাণ শিশু। দুগ্ধপোষ্য শিশু। এমনি খবর কি শত্রুপক্ষ অন্যকে দিতে পারে? যুদ্ধ কি কন্দুক খেলা?

তাম্রচূড় বায়ুবিকারের কথার মাঝখানে বলে এ হচ্ছে অনুমান। যখন সে কুলাচলে হাজির হয়েছিল তখন চতুর্দশীর আরম্ভ। চতুর্দশী থেকে জোয়ার শুরু হয় এবং প্রতিপদে গিয়ে শেষ হয়। জোয়ারের সময়কালে গঙ্গিনিকা পার হয়ে আক্রমণ প্রায় অসম্ভব। তাই অনুমান দুতিন দিন পর আক্রমণ হবে।

তাম্রচূড় সে রাতে আশ্রয় নিয়ে ছিল কুলাচল প্রাসাদের কাছাকাছি চন্দ্রমৌলির শিববাড়ীর হট্টমন্দিরে। থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, এক তরুণ। নাম হর দত্ত। সে চন্দ্রমৌলির ক্রোশ খানেক পশ্চিমের গোপপল্লীতে বাস করে। শ্রীগোপালের কায়স্থ। গোপদের সদর দপ্তরে লেখালেখি করে।

তাম্রচূড় শুরু করে আশ্চর্য সুন্দর শিব-মন্দির কথা। মন্দিরের পাশে রিভুপাল নামের দীঘির কথা। মন্দিরের ভূমি লিঙ্গ এসব দান করে ছিলেন রিভু পাল। তাম্রচূড়ের বর্ণনার মাঝে বায়ুবিকারের গর্জন ওঠে। তাম্রচূড়কে মূল কথা বলতে আদেশ দেয়।

তাম্রচূড় ধমক খেয়ে হাসে। বলে হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে যায়। শেষ রাত। ভীষণ শব্দ। মানুষ হাতি এই সাথে জোয়ারের শব্দ। কাণ্ড হয়ে গেল জোয়ারের মাঝে। জোয়ারের প্রবাহ ধরে গৌড়ের নৌবাহিনী সরাসরি কূলাচল আক্রমণ করল। হাতির দল জঙ্গলে বাঁধা। মানুষ বিছানায়। নৌকা ঘাটে বাঁধা। সৈনিকরা তাঁবুতে। ভাবছিল সবাই জোয়ারের পর যুদ্ধ হবে। গৌড়ের সৈনিকরা গন্ধর্ব সর্দারদের হাতি দখল করে পিঠে চড়ে বসল। ঘোড়া দখল করে নিল। কূলাচলের প্রাসাদ ঘিরে আদ্য রাজাগণকে আক্রমণ করল। দুইভাই ঘুম ভেঙে উঠে যুদ্ধ করলেন। গৌড়ের সৈনিকগণ হাতির বাহিনী নিয়ে কুমার রাজাগণকে ভীষণভাবে চেপে ধরল। যুদ্ধ করে করে দুভাই অজ্ঞান হয়ে গেল ওদেরে বন্দী করা হল।

তাম্রচূড়, একটু বিশ্রাম নিলে, উদ্‌গ্রীব বাণ প্রশ্ন করে "তারপর? তারপর কী হল? জোয়ারের মাঝদিয়ে, নৌবহর কীভাবে এল?"

তাম্রচূড় বলে, সে প্রশ্ন তার মনে উঠেছিল। জিজ্ঞাসা করে জেনেছে গৌড়ের রাজা যবন নাবিক দিয়ে তার নৌবাহিনীকে শিখিয়েছে কীভাবে জোয়ারের মাঝে নৌকা চালাতে হয়। এই কৌশল দেড়-দুবছর ধরে অভ্যাস করেছে। শেষ পর্যন্ত এই কাণ্ড।

ভোর হলে তাম্রচূড় দেখে আদ্য রাজার হাতি ঘোড়া নৌকা এই সাথে সৈনিকদের দুরবস্থা। হাতির সাথে মাহুতের সম্পর্ক নেই। ঘোড়ার সাথে নেই সওয়ার। সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেছে।

বাণ ভাবছিল, পিসিমা আর বান্ধবীর গল্প। বান্ধবী বলেছিলেন, করালী, জয়নাগের লোককে বলেছিল চতুর্দশী-অমাবস্যার সঙ্গমকালে আক্রমণ করলে, জয়নাগের জয় সুনিশ্চিত। তার অর্থ-গুহনদীন এবং করালী-আক্রমণের পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু আঁচ করেছিল।

তাম্রচূড় বলে সকালবেলা জোয়ারের মাঝে মস্ত ছিপে দু'ভাইকে বন্দী করে গঙ্গিনিকার পশ্চিম দিকে কর্ণসুবর্ণে নিয়ে গেল।

সকালবেলা চন্দ্রমৌলী শিবমন্দিরে হন্তদন্ত হয়ে হরদত্ত এসে তাকে গোপল্লীতে নিয়ে গেল।

এবার বায়ুবিকারের হুঙ্কার। বাণের ভদ্রতাবোধ নেই। বাণ, এতক্ষণ ধরে তাম্বুলের ব্যবস্থা করেনি। বাণ তাম্বুল এনে দেয়। তাম্বুল মুখে পুড়ে বায়ুবিকার বলে এখন শ্রীমান বাণ সম্পর্কে তাম্রচূড় কিছু বলবে।

তাম্রচূড় বাণের দিকে তাকিয়ে বলে বাণের নামে সে অনেক সম্মান এবং সুবিধা পেয়েছে।

বাণ বলে, গোপপল্লীতে তার বন্ধু আছে। তাম্রচূড় বলে বন্ধুর বাবা বাণকে ভালোবাসেন। বাণের খবরা খবর পই-পই করে জিজ্ঞাসা করেছেন।

বায়ুবিকার বলে, সেও জানত শ্রীগোপালের পুত্র লোহিতাক্ষ বাণের বন্ধু।

তাম্রচূড় বলে, হরদত্তের সাথে গোপ্পল্লীর গোপদের প্রধান দপ্তরে গিয়ে শ্রীগোপালের সাথে পরিচয় হয়। প্রসঙ্গক্রমে পালিতকগপ্তের কথা বায়ুবিকারের কথা বাণের কথা ওঠে। তাম্রচূড় বলে, মাত্র সেদিন বাণের সাথে পরিচয় হয়েছে। বাণের কথা শুনে শ্রীগোপাল তার পুত্র লোহিতাক্ষের সাথে তাম্রচূড়ের পরিচয় করিয়ে দেন। লোহিতাক্ষ বাণের বন্ধু তাম্রচূড় বাণের বন্ধু সুতরাং নিয়ম অনুসারে তাম্রচূড় লোহিতাক্ষের বন্ধু হয়ে গেল।

তাম্রচূড় বলে, শ্রীগোপাল নিজে বলেছেন বাণ তাঁকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে ছিল বাণ হাসে। বলে তখন ছোটো ছিল বাঁচানো টাচানো বুঝেনি।

বাণ বাঁচানোর কাহিনি বলে। তখন চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমে পড়াশোনা করে। মাঝে মাঝে বিকালবেলা বিদ্যাশ্রম থেকে বের হয়ে কাছাকাছি নানা স্থানে বেড়াতে যায়। এমনি করে চণ্ডক নামের একটি বিলাল শ্রেণীর ছেলের সাথে পরিচয় হয়। বাণের মতো তারও বয়স দশ এগারো।

চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমের উত্তরে চন্দ্রপুর প্রশাসনিক নগরীর কাছাকাছি মস্ত এক বিদ্যালয়। সেখানে রাজা মহারাজামন্ত্রী সেনাপতি এই সাথে মস্ত সব ধনী বণিকদের ছেলেরা পড়াশোনা করে। বিরাট দেয়ালে ঘেরা বিদ্যালয়। এক বিকালে বাণ এবং চণ্ডক বেড়াতে বেড়াতে হাজির হয় প্রধান ফটকের সামনে। বাণ লক্ষ করে ফটকের সামনে একটি গাছের তলায় একজন দাঁড়িয়ে আছেন। গাছের একটি ডাল মাথার কাছাকাছি। ডালে জড়িয়ে ফণা তোলে আছে মস্ত সাপ। বাণ গাছের ভাঙা ডাল দিয়ে ফণায় আঘাত করে। সাপ পড়ে যায়।

এমনিভাবে শ্রীগোপালের সাথে বাণের পরিচয়। শ্রীগোপাল লোহিতাক্ষের সাথে বাণের পরিচয় করিয়ে দেন। লোহিতাক্ষ চন্দ্রপুরের এই রাজকীয় বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত। বাণের চেয়ে বছর খানেকের বড়ো। নিবিড় হয়ে উঠেছিল বাণ এবং লোহিতাক্ষের বন্ধুত্ব।

শ্রীগোপাল, যেদিন লোহিতাক্ষকে দেখতে আসতেন সেদিন চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমে গিয়ে বাণকে দেখে আসতেন। বাণ, শ্রীগোপালের অপত্য স্নেহের পাত্র হয়ে ওঠে। বাণের পিতার মৃত্যুর পর তিনি নিজে প্রীতিকূটে এসে শ্রাদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ এক দিনার হংস বাণের হাতে দিয়েছিলেন।

বাণ, এক ফাঁকে পিসিমাকে বলে আসে, দুজন এখানে খাবে

তাম্রচূড় গোপ্পল্লীর গোপদের সদর দপ্তর প্রসঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করে। দপ্তরে দারুণ ব্যস্ততা। একদল কর্মী সাদা কাপড়ের পতাকা তৈরি করছে। জনকয়েক প্রৌঢ়, সিন্দুক খোলে মানচিত্র সাজিয়ে রাখছেন। অধিকাংশ কর্মী মস্ত সব তালপাতার পুঁথি সামনে রেখে কাঁচা কলাপাতায় হিসাব নিকাশ করে তালপাতার গ্রন্থে টুকে রাখছেন। শ্রীগোপাল, কাজকর্ম দেখছেন, কথা বলছেন।

তাম্রচূড় হরদত্তের সাথে দপ্তরে গিয়েছিল কিন্তু হরদত্ত নিদারুণ ব্যস্ত। কথা বলার ফুরসৎ নেই। লোহিতাক্ষ এসে তাম্রচূড়ের সঙ্গ দেয়। এটা ওটা কথা বলে। লোহিতাক্ষ বলে, যেকোন মুহূর্তে গৌড়বাহিনী গোপ্পল্লীতে উপস্থিত হতে পারে। খবর এসেছে ঘোড়সওয়ার সৈন্যদল রাজধানী কুলাচল থেকে উত্তর মুখে এগিয়ে আসছে।

লোহিতাক্ষ তাম্রচূড়কে বলে, গোপ দপ্তরের কাজ হচ্ছে বিজয়ী রাজাকে এই অঞ্চলের বিস্তারিত সংবাদে সরবরাহ করা। এই সাথে বিজয়ী সৈনিকগণ যাতে কোন অনাচার অত্যাচার

করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা।

তাম্রচূড় বলে, হঠাৎ অনেক কণ্ঠের চিৎকার ওঠে। গৌড় সেনা দেখা যাচ্ছে। তাম্রচূড় দক্ষিণে তাকিয়ে দেখে দূরে গাছের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া উড়ছে। লোহিতাক্ষ বলে, ধোঁয়া নয়। অশ্ববাহিনী আসছে ধুলা উড়ছে। আঁকাবাঁকা পথ। বেশি দূর দেখা যায় না। অস্পষ্ট গুরু-গুরু শব্দ ওঠে। অশ্ববাহিনীর ক্ষুরের শব্দ।

শ্রীগোপালের কণ্ঠে আদেশের সুর। তাঁর আদেশে গোপগণ সাদা পতাকা নিয়ে আসে। শ্রীগোপালের নির্দেশমতো গোপগণ সাদা পতাকা নিয়ে রাস্তার উপর দাঁড়ায়। অশ্ব বাহিনীকে দপ্তরের সামনে থামাতে হবে। হর দত্ত তিনটি সাদা পতাকা নিয়ে আসে। একটি পতাকা নিজের হাতে রেখে বাকি দুটি লোহিতাক্ষ এবং তাম্রচূড়ের হাতে দেয়। তিনজন গোপদের সাথে রাস্তার উপর দাঁড়ায়।

শ্রীগোপাল বলেন, অশ্ববাহিনী ভীষণ বেগে আসতে পারে কিন্তু ভয় পেয়ে রাস্তা ছেড়ে দেওয়া চলবে না।

গৌড়বাহিনী স্পষ্ট হয়। তীব্রবেগে আসছে। হাতে খোলা তলোয়ার। পিঠে বর্শা। মাথায় লাল পাগড়ি, পরনে লাল ধরা। খোলা গা। কালো শরীরে সাদা চন্দন মাখানো।

শ্রীগোপাল পতাকা নিয়ে যে দিক দিয়ে গৌড়বাহিনী এগিয়ে আসছে সেদিকে ছুটে যান। তাঁর পিছনে, লোহিতাক্ষ হরদত্ত এবং তাম্রচূড় এগিয়ে যায়।

যুদ্ধের এই অংশের বর্ণনা দিতে গিয়ে চন্দ্রচূড় উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলে তারা চারজন রাস্তার মাঝ দিয়ে গৌড়বাহিনীর মুখোমুখি এগিয়ে যাচ্ছে। গৌড়বাহিনী চিৎকার করে বলছে "পথ ছাড়ো! পথ ছাড়ো! কেটে ফেলব। পথ ছাড়ো।"

শ্রীগোপাল ভীষণ চিৎকার করে বলেন, তিনি গোপদের প্রধান তিনি শ্রীগোপাল। পতাকা হাতে গোপগণ। এ স্থান গোপ্পপল্লী, গোপ বিভাগের প্রধানদপ্তর।

অশ্ববাহিনীর গতি কমে আসে। অবশেষে থামে। বাহিনীর প্রধান অবতরণ করেন। শ্রীগোপাল এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় প্রদান করেন। অশ্ববাহিনীপ্রধান তাঁর পরিচয় প্রকাশ করেন।

শ্রীগোপাল বলেন, গোপ দপ্তরের প্রধান হিসাবে তিনি বক্তব্য নিবেদন করতে চান। বাহিনী প্রধান সম্মত হয়ে শ্রীগোপালকে অনুসরণ করে সদর দপ্তরে প্রবেশ করেন। বাহিনীপ্রধানকে অনুসরণ করে এগারো জন অস্ত্রধারী গৌড়সৈনিক দপ্তরে ঢুকে বাহিনীপ্রধানের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকে।

তাম্রচূড় বলে, দপ্তরের ভিতর শ্রীগোপালের সাথে লোহিতাক্ষ হরদত্ত এবং সে প্রবেশ করেছিল। তাম্রচূড়ের কথায় প্রকাশ পায়, বাহিনীপ্রধান সজ্জন ব্যক্তি। ভদ্র মার্জিত এবং শিক্ষিত। তিনি গৌড়রাজার নির্দেশ মতো ছোটো নৌবাহিনী নিয়ে উথাল পাথাল জোয়ারের মাঝ দিয়ে গঙ্গিনিকা পার হয়ে কুলাচল প্রাসাদ দখল করে রাজকুমারদেরে বন্দী করেছেন। তাঁর নাম নারায়ণদেব।

শ্রীগোপাল তাঁর দপ্তরের দায়দায়িত্ব এবং কর্তব্য কর্মের কথা বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেন।

নারায়ণদেব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

তাম্রচূড় বলে, শ্রীগোপালের সহজ কথায় পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। শ্রীগোপাল নারায়ণদেবকে বলেন "বেলা তো অনেক হল, তাছাড়া দুদিন ধরে, আপনার ছেলেদের বিশ্রাম নেই। আপনার ছেলেদের সাথে যদি সামান্য জলযোগ করেন তাহলে আনন্দিত হব।"

নারায়ণদেব বলেন — "আমার ছেলে?" তারপর আবার বলেন— "নিশ্চয়ই আমার ছেলে।"

শ্রীগোপালের আন্তরিক কথায় নারায়ণদেব মুগ্ধ হন। তিনি করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে সম্মতি প্রকাশ করেন।

তাম্রচূড় বিস্তারিতভাবে গৌড়-সৈনিকদের ভোজন-কাহিনির বর্ণনা দেয়। দপ্তরের কয়েকটি কামরা দই চিড়া, পিণ্ডখেজুর, পাতা, ঘড়া ঘড়া জল, মাটির ভাঁড়ে ভর্তি ছিল।

শ্রীগোপাল স্বয়ং নারায়ণদেবকে পরিবেশন করেন। সৈনিকগণকে পরিবেশন করে দপ্তরের কর্মচারী এই সাথে লোহিতাক্ষ হর দত্ত এবং তাম্রচূড়। তাম্রচূড়ের বর্ণনায় মনে হয় সৈন্যবাহিনীর সাথে পরিবেশনকারীদের সম্পর্ক হয়ে উঠেছিল কোন বিয়েবাড়ীর ভোজসভার মত।

এরপর শ্রীগোপাল এবং নারায়ণ দেবের জরুরি কথাবার্তা। নারায়ণদেব রাজি হলেন বিস্তারিত অঞ্চলে গৌড়বাহিনীর সাথে গোপগণ অবশ্যই থাকবেন এবং প্রজাপুঞ্জের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। কোন সৈনিক যদি প্রজাপুঞ্জের ধনজন সম্পত্তি বিনষ্ট করে তাহলে নারায়ণদেবকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানাবে এবং উপযুক্ত বিচার হবে। অন্যদিকে, গোপগণ সৈনিকদের খাবার দাবারের ব্যবস্থা করবেন।

বায়ুবিকার প্রশ্ন করে গৌড় বাহিনী দৈ চিড়া খেল কিন্তু আমাদের কামরূপের ঘোড়াদেরে কী দিল?" বাণ, বায়ুবিকারের দিকে তাকিয়ে বলে — "আমাদের কামরূপের ঘোড়া কেন?" বায়ুবিকার তার লম্বা বাঁশের মতো দেহ এই সাথে বাড়ি কাঁপিয়ে হেসে বলে — "আমাদের আদ্যরাজার ঘোড়া-ঘোড়ীকে এই বেটারা বলাৎকার করে পিঠে চড়ে বসেছে?" বায়ুবিকারের হাসিতে সবাই যোগ দেয়।

তাম্রচূড়, বায়ুবিকারের জিজ্ঞাসার জবাবে বলে — 'সদর দপ্তরের সামনের মস্ত মাঠে ওরা ঘাস খেল। মাঠের পিছনের ঝরনার জলে খেল। তবে সাধারণ জল নয়। কামরূপের প্রতিটি ঘোড়ী এই সাথে ঘোড়া ঝরণায় নেমে জল লাথি মেরে ঘোলা করে পান করেছে। ঘোলা জল হচ্ছে ঘোড়াদের মিছরি মেশানো সরবৎ।"

* * *

খাবারের ডাক আসে। বাণের আসন খানিক দূরে। পিসিমার নির্দেশ বাণকে আলাদা বসতে হবে। বাবার মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ণ হয়নি। বাৎসরিক শ্রাদ্ধের পর অশৌচ শেষ হবে।

তিনজন খেয়ে দেয়ে ব্রাহ্মণ্যাধিবাসের পাশে গাছের তলায় বসে। তাম্রচূড় পুটুলি থেকে চুরুট বের করে চকমকি ঠুকে ধরায় একটি বায়ুবিকারকে দেয়। বায়ুবিকার পাকা ধূম্রপায়ীর মতো,

নাক এবং মুখ দিয়ে ধূম্র উদ্‌গীরণ করে।

শুরু হয় যুদ্ধের কথা। বায়ুবিকার বর্মন এবং গৌড় রাজার রাজত্বের ভৌগোলিক অবস্থা নিয়ে কথা বলে।

বর্মন রাজার কামরূপের পশ্চিমে পশ্চিম সাগর। পশ্চিম সাগরের পশ্চিম তীরের গৌড় রাজ্য। অন্যদিকে কামরূপের উত্তরে বরাক-গঙ্গিনিকা-লোহিত্যের ধারায় সম্মিলিত বৃহৎ জল ধারা। সম্মিলিত জলধারার উত্তরে প্রাগজ্যোতিষপুরের পার্বত্য অঞ্চল।

বায়ুবিকার বলে সে লক্ষ করছে বর্মন রাজার নৌবাহিনী দুদিন ধরে, বিরামহীনভাবে, উত্তর দিকে যাচ্ছে। তার অর্থ হচ্ছে প্রাগজ্যোতিষ পুরের দক্ষিণ সীমার বরাক গঙ্গিনিকা লোহিত্যের সম্মিলিত ধারায় নৌবাহিনী সংগঠিত হচ্ছে। বর্তমানে প্রাগজ্যোতিষপুর দখল করা গৌড়রাজার পক্ষে অসাধ্য। হঠাৎ এক কৌশলে কামরূপে ঢুকে কুমার রাজাদেরে বন্দী করে নিয়ে গেছে। প্রকৃত যুদ্ধ হলে কামরূপ জয় সহজ ছিল না।

তাম্রচূড় প্রশ্ন করে এত্‌সব বিশ্লেষণ করে বায়ু বিকার কী বলতে চাইছে?

উত্তরে বলে, তার বক্তব্য হচ্ছে — প্রাগজ্যোতিষপুরে সৈন্যাদি সমাবেশে করে কুমার রাজার সেনাপতিগণ কামরূপ আক্রমণ করবে এবং দখল করবে।

বায়ুবিকার চুরুটে দম দিয়ে বলে, সে যদি গৌড়ের রাজা হত তাহলে এমনি অবস্থায় একটি সন্ধি করে ফেলত। সন্ধি হচ্ছে কুমার রাজাদের মুক্তি কিন্তু কুমার রাজাদেরে কামরূপের অধিকার ছেড়ে দিয়ে প্রাগজ্যোতিষপুরে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

*   *   *

যুদ্ধের পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। বাণ, রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের আবর্ত দেখে আশ্চর্য হল। বায়ুবিকার বলেছিল সে যদি গৌড়ের রাজা হত তাহলে কীভাবে সন্ধি করত। ঘটনা তেমনি হয়ে উঠল। কুমার রাজাদ্বয় মুক্তি পেলেন। কামরূপের অধিকার ছেড়ে প্রাগজ্যোতিষপুরের মধ্যে তাদের রাজ্য সীমিত রাখতে হল। গৌড়ের রাজা জয়নাগের অধীনে কামরূপের সমতল অঞ্চল এসে গেল। কামরূপের রাজপ্রতিনিধি হলেন নারায়ণদেব।

*   *   *

এক সন্ধ্যায় পিসি আর বান্ধবী করালী এবং গুহনদীনের কথাবার্তা নিয়ে গল্প করছিলেন। করালী ব্রাহ্মন্যাধিবাসের ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছিল। মূল অভিযোগ এসব ব্রাহ্মণ কুতকুট্ট মন্দিরের নানা অধিকার ক্রিয়াকর্ম জোর করে বেদখল করে ফেলছে। শ্রাদ্ধশান্তির প্রেতক্রিয়ার একমাত্র অধিকারী ছিল কুতকুট্ট মন্দিরের কুট্ট ব্রাহ্মণগণ। বর্তমানে প্রেতের উদ্দেশে যেসব দানসামগ্রী প্রদান করা হয় তাও নিয়ে যাচ্ছে ব্রাহ্মণ্যাধিবাসের অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণগণ।

গুহনদীন, করালীকে শলা দেয়। ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান এবং অধিকার দিয়েছেন বর্মন রাজা ভূতিবর্মন। প্রায় একশ বছর আগের এই দানপত্র কুতকুট্ট মন্দিরে আছে। দানপত্র নষ্ট করে দিলে ব্রাহ্মণগণ কাবু হয়ে যাবে। ভূমিকর দিতে হবে। মন্দিরের উপর অধিকার ফলাতে পারবে না।

চক্রবাকিকা বলেন, গুহনদীনের কথা শুনে করালী ভীষণ খুশি। বলে, দানপত্র নষ্ট করতেই হবে।

বাণ, আসরে বসে তাম্বুল খেয়ে গল্প শুনছিল। চক্রবাকিকার কথায় চিন্তিত হয়। বর্তমানে এই অঞ্চলে আদ্য রাজার আধিপত্য নেই। গুহনদীন করালী ব্রাহ্মণ্যাধিবাসের শত্রু। অন্যদিকে এই দুজন গৌড়রাজের আপনজন। যুদ্ধের চক্রান্তে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। বাণের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পায়।

* * *

তিনদিনের মাথায় বাণের দুশ্চিন্তা কাটে। সকালবেলা করালী প্রীতিকূটে জোড় হাতে প্রবেশ করে। করালী বিনীতভাবে নিবেদন করে কুতকুট্ট মন্দিরে দুপুরবেলা সকলকে পদার্পণ করতে হবে। মন্দিরে শাস্ত্রপাঠ হবে। বিশেষ করে বাণকে আমন্ত্রণ করে। বলে, মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমের স্নাতক হয়ে বাণ সকলের বিস্ময়ের এবং গর্বের বিষয়।

বাণ, সকলের সাথে মন্দিরে গেল। অনেকে উপস্থিত হয়েছেন। খানিক বাদে গুহনদীন এলেন সাথে বলিষ্ঠ আকৃতির গোটা দশ বারো লোক। সম্ভবত বন্দরপুরের লোক। গুহনদীন কাটিগড়া বন্দরের বিপরীত তীরে বন্দরপুরে ব্যবসা আরম্ভ করেছেন।

কুশাসনের সামনে লালশালুতে ঢাকা পাঠ বেদী। বেদীর উপর লাল কাপড়ে জড়ানো শাস্ত্রগ্রন্থ। গুহনদীন পাঠ বেদীর বা পাশের কামা থেকে করালীকে ধরে ধরে এনে আসনে বসালেন। দুজনের পা টলছিল।

করালীর মাথায় লাল কাপড় বাঁধা। কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ। কানে সোনার কুণ্ডল। গলা এবং বাহুতে রুদ্রাক্ষের মালা। লোমশ বুকে রুদ্রাক্ষের মালার সাথে পৈতা।

করালী, কাঁপা হাতে গ্রন্থ খুলে পাঠ আরম্ভ করে। জড়িত কণ্ঠ। পাঠ অস্পষ্ট। বাণ, কান পেতে শেষপর্যন্ত বুঝতে পারে সামবেদ থেকে কিছু পাঠ হচ্ছে। করালী এক একটি মন্ত্র পাঠ করে ডান হাত মুখে লাগিয়ে আবার দূরে ঠেলে দিচ্ছে। বাণের মনে হচ্ছিল করালী যেন এক একটি মন্ত্র শেষ করে মুখ থেকে থুথু নিয়ে সকলের দিকে উড়িয়ে দিচ্ছে। বাণের হাসি পায়।

বাণ, বাল্যকাল থেকে বেদ পাঠ অভ্যাস করেছে। চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমের আনুষ্ঠানিক বেদপাঠে তাকে নির্বাচন করা হত।

করালীর দেহ ভারসাম্য হারিয়ে দুলতে থাকে।

বাণ, কান পেতে করালীর পাঠ লক্ষ্য করে শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করে সামবেদের অগ্নি দেবতা বিষয়ক মন্ত্র পড়া হচ্ছে, মন্ত্র হচ্ছে —

"প্রকেতুনা বৃহতা যাতাগ্নিরা রোদসী বৃষভোরোর বীতি।

দিবশ্চি দন্তাদুপ মামু দান ঙপা মুপস্থে মহিষো ববর্ধ।"

অর্থ হচ্ছে — বিশাল পতাকা উড়িয়ে অগ্নিদেব স্বর্গ মর্ত পৃথিবী জুড়ে বৃষের মতো শব্দ করে করে চলছেন। কাছের এই সাথে দূরের সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলছেন।

বাণ লক্ষ করে করালী ''প্রকেতুনা'' শব্দ ফ্রখেতুনা; ''রোদশী'' শব্দ রোদহী, 'বৃষ ভো' শব্দ বৃখবো: এমনিভাবে উচ্চারণ করছে। করালীর উচ্চারণ এই সাথে অঙ্গভঙ্গি সবকিছু মিলিয়ে বাণের হাসি পায়। হাসি চেপে রাখতে পারে না। ফেটে বের হয়।

করালী পাঠ বন্ধ করে বাণকে বলে — ''এত স্পর্দ্ধা! ব্যঙ্গ করছিস?'' করালী উঠে দাঁড়াল। মাথায় বাঁধা লাল কাপড় খুলে গেল। জটা কিলবিল করে নাচতে লাগল।

শ্রোতাগণ স্তম্ভিত। সুযোগ নিলেন গুহনদীন। দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে করালীকে বলেন — 'গুরুদেব আদেশ করুন!' গুরুদেব আদেশ দিচ্ছেন না দেখে গুহনদীন গুরুদেবের কানে কানে মন্ত্র পাঠ করলেন। করালীর মুখে অভিশাপ বাণী উচ্চারিত হল — ''আমি অগ্নিদেবকে আহ্বান করছিলাম! এখন প্রার্থনা করি অগ্নিদেব যেন সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেন।

গুহনদীনের ইঙ্গিতে তার সাথে যারা এসেছিল প্রেতবাহিনীর মত গুরুবাক্য পালন করতে শুরু করল। মন্দির থেকে বের হয়ে ব্রাহ্মণ্যাধিবাসে প্রতিটি গৃহে আগুন লাগাল। প্রীতিকূটে আগুন ধরল। বিদ্যাশ্রম দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। আগুনের শিখা এই সাথে কালো ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে গেল। বিদ্যাশ্রমের ছাত্ররা লেলিহান আগুনে তাদের কমণ্ডলুর জল ঢালতে লাগল। হাতের পলাশ দণ্ড দিয়ে আগুনে আঘাত করতে থাকে। বাঁধ ভাঙা। বন্যা স্রোতের মত বাড়ী ঘর পুড়িয়ে আগুন এগিয়ে চলে।

গুহনদীন, চণ্ডিকা আসন থেকে ভূতিবর্মনের তাম্র দানপত্র করালীর হাতে দেয়। করালী বিদ্যাশ্রমের জ্বলন্ত শিখার মধ্যে তাম্রপত্র বিসর্জন দিতে এগিয়ে গেল। ব্রাহ্মণগণ জোড়হাতে করালীর কাছে তাম্রপত্র বিনষ্ট না করার জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন। তাম্রপত্রের ঘর্ষণে রুদ্রাক্ষের মালা ছিঁড়ে গেল। লটপট করছে মাথার জটা। কপালে জেগে উঠেছে ভীষণ ভ্রূকুটি। করালী হুঙ্কার দিয়ে জ্বলন্ত শিখায় দানপত্র বিসর্জন দিল।

*　　　　*　　　　*

সংবাদ দ্রুত গোপ্পলী পৌঁছাল। শ্রীগোপাল এবং নারায়ণদেবের নির্দেশে দুদিনের মধ্যে গৌড়বাহিনী কাজ শুরু করল। খাদ্য পানীয়ের ব্যবস্থা হল। সৈন্যবাহিনী অস্থায়ী বাড়ী এবং তাঁবুতে দুর্গতদের আশ্রয় দেবার কাজে লেগে গেল।

দিন তিনেক কেটে গেছে। প্রীতিকূট বিদ্যাশ্রমের ভস্মীভূত গ্রন্থাগারের ছাই থেকে তখনো ধোঁয়া উড়ছে। বাণ, ধোঁয়ার পাশে দাঁড়িয়ে চোখ মুছছে। শ্রীগোপাল কখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন বুঝতে পারেনি। বাণের মাথায় হাত বুলিয়ে শ্রীগোপাল বলেন চন্দ্রপুর থেকে সব গ্রন্থ নকল করে আবার গ্রন্থাগার ভরে দেবেন।

শ্রীগোপালের কথাবার্তার সময়কালে ব্রাহ্মণ কজন এলেন। দারুণ উত্তেজিত। জ্ঞাপন করলেন গৌড়-সৈনিকগণের রান্না করা অন্নগ্রহণে তাঁরা অসমর্থ। শ্রীগোপাল, বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করেন ব্রাহ্মণ্যাধিবাসে কি সৎ উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন যাঁরা রন্ধন করার যোগ্য?

উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন তাদের নিজস্ব উচ্চতম বর্ণের কথা। শ্রীগোপাল বলেন, তাহলে ব্রাহ্মণগণ স্বয়ং অন্নাদি প্রস্তুত করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। খাদ্যবস্তু গৌড়সেনা

প্রদান করবে।

ব্রাহ্মণদের পরস্পরের মধ্যে ফিসফিস করে কথা ওঠে। কথা ক্রমে হট্টগোলে পরিণত হয়। দেখা যায় উপস্থিত পনেরো জন ব্রাহ্মণের মধ্যে চারটি গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেক গোষ্ঠীর দাবী তারাই একমাত্র উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

শ্রীগোপাল, সহজভাবে সমস্যার সমাধান করেন। তিনি বলেন, চারটি গোষ্ঠী আলাদাভাবে রন্ধনাদি করবেন।

শ্রীগোপাল, তার সঙ্গের নিজস্ব কায়স্থকে চারটি গোষ্ঠীর দলপতিদের নাম লিখে রাখতে আদেশ দিলেন।

দলপতির নাম নিয়ে আবার হট্টগোল। কোন গোষ্ঠীই তাদের দলপতি নির্বাচন করতে পারল না। শ্রীগোপালের নির্দেশে কায়স্থ চারটি আলাদা গোষ্ঠীতে পনেরো জনের নাম লিখে রাখলেন। ব্রাহ্মণগণ নমস্কার জানিয়ে যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন শ্রীগোপাল বিনীতভাবে নিবেদন করলেন — "ব্রাহ্মণগণের এই চারটি গোষ্ঠী ভিন্ন অন্য কোনও গোষ্ঠী সৃষ্ট হবে না। অন্য সব ব্রাহ্মণ যে কোনও গোষ্ঠীতে যোগ দিতে পারেন। অথবা সৈনিকগণের ব্যবস্থায় থাকতে পারেন। তবে, প্রত্যেকের উপবাস থাকার অধিকার এই সাথে কারাগারে বাস করে অন্নগ্রহণের অধিকার আছে।"

ইতিপূর্বে, এমনি একদল ব্রাহ্মণ শ্রীগোপালের কাছে গিয়ে অভিযোগ করে দিলেন তাঁদের প্রতিবেশীগণ পুড়ে যাওয়া ঘরবাড়ীর সুযোগ নিয়ে অন্যের ভূমি দখল করছেন। ব্রাহ্মণগণের এই অভিযোগ সম্পর্কে শ্রীগোপাল নারায়ণদেবের সাথে পরামর্শ করে একটি সাময়িক বিধান নির্মাণ করেছেন।

শ্রীগোপাল যখন, সৎ ব্রাহ্মণগণের ধর্মরক্ষার বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তখন দূর থেকে রাজকীয় ঘোষণার ঢোলের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ক্রমে ঘোষণা স্পষ্ট হয়। 'শোনো! শোনো! শোনো! মহামান্য শ্রী শ্রী গোপালের আদেশ। ... তাম্রপত্র শাসনে যে সকল ব্রাহ্মণগণের ভূমি ছিল এবং এই সকল ভূমির উপর অবস্থিত গৃহাদি আগুনে মুড়িয়া গিয়াছে তাহারা তাহাদের, আপন -আপন প্রতিবেশীর সহিত পূর্বতন সীমা মীমাংসা করিয়া নব গৃহনির্মাণ করিবেন। ... যদি কোনও ব্যক্তি প্রতিবেশীর সহিত মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারেন তাহা হইলে কোন পক্ষই গৃহ নির্মাণ করিতে পারিবেন না।

... ভূমি বিষয়ক কোনও বিচার-আচার বর্তমানে করা সম্ভব নহে। ভূমি লইয়া প্রতিবেশীগণের মধ্যে কোনও বিবাদ আরম্ভ হইলে বিবদমান সকলকে কারাগারে লইয়া যাওয়া হইবে। ... শোনো! শোনো! শোনো!"

*　　　　*　　　　*

দেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে গৃহাদি নির্মাণের জন্য প্রতিবেশী অঞ্চলের বহু মানুষ গাড়ি নৌকা বোঝাই করে কাঠ বাঁশ ছন বেত নিয়ে হাজির হতে থাকে। ব্রাহ্মণ্যাধিবাসের সম্মুখে ঘরবাড়ি নির্মাণের অজস্র সামগ্রী স্তূপীকৃত হয়।

শ্রীগোপালের সাথে নারায়ণদেব ব্রাহ্মণ্যাধিবাসে এসেছেন। শ্রীগোপাল, নারায়ণদেবের তাঁবুতে গিয়ে নূতন দানপত্র নির্মাণ বিষয়ে আলোচনা করেন। শ্রীগোপাল, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের রাজকীয় বিধানের একটি ধারা উল্লেখ করে বলেন, কোনও রাজা যদি, ব্রাহ্মণ দেবতা অথবা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য ভূমিদান করেন তাহলে পরবর্তী কোনও বিজয়ী রাজা পূর্বতন রাজার ভূমি নিজের দখলে, নিতে পারবেন না। বরং প্রদত্ত ভূমির সাথে নবভূমি সংযুক্ত করে পুনরায় দানপত্র রচনা করবেন।

নারায়ণদেব বলেন দান করা ভূমি সম্পর্কে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের এই ধারা তাঁর জ্ঞাত। নূতন দানপত্র অবশ্যই নির্মাণ করা হবে। কারণ বিজয়ী রাজা যখন পূর্বতন রাজার ভূমি দখল করেন, তখন বিজয়ী রাজাই জয় করা ভূমির অধিকারী। বিজয়ী রাজা নূতনভাবে ভূমিদান করে ভূমিদানের পূণ্যফলের সম্পূর্ণ অধিকারী হন।

নারায়ণদেব শ্রী গোপালকে বলেন নূতন দানপত্র নির্মাণে ভূমিজরিপ একান্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমানে জরিপের সুযোগ নেই। পরবর্তীকালে দানপত্র রচনা করা যাবে।

শ্রীগোপাল জরিপ বিষয়ে, শ্রীক্ষি কুণ্ডের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। উত্তরে নারায়ণদেব বলেন, রাজনৈতিক কারণে শ্রীক্ষিকুণ্ডের সাহায্য গ্রহণ সম্ভব নয়।

* * *

পরদিন সকালবেলা বাণ, এক সৌম্যদর্শন যুবককে নিয়ে শ্রীগোপালের সাথে দেখা করতে গেল। তিনি তখন নারায়ণদেবের সাথে কথা বলছিলেন। বাণ বলে, তার জেঠু হংসবেগ এই ব্রাহ্মণকে প্রীতিকূট বিদ্যাশ্রমে অধ্যাপনার জন্য মল্লকূট থেকে পাঠিয়েছেন। তাঁর নাম ব্রহ্মবীর স্বামী। কোটিবর্ষের অধিবাসী।

ব্রহ্মবীর স্বামীর সাথে দুজনের আলাপ জমে। আলাপক্রমে আড্ডায় পরিণত হয়। নারায়ণ দেব বলেন, ব্রহ্মবীর স্বামীকে তাম্রপত্রের মাধ্যমে ভূমি দান করা যেতে পারে।

শ্রীগোপাল, দান করার মতো উপযুক্ত ভূমি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে একখণ্ড অহল্যা ভূমি আবিষ্কার করলেন। বপ্প ঘোষ বাট ঘাটের কাছে শোন বিলের চরভূমিতে সৃষ্ট হয়েছে। এই নূতন ভূমিখণ্ড উন্মিলন স্বামীর বসতবাড়ীর পূর্বদিকে অবস্থিত।

মাস কয়েকের মধ্যে কর্ণ সুবর্ণ থেকে গৌড়ের রাজা জয়নাগের প্রদত্ত তাম্রপত্র নিয়ে রাজ কর্মচারী এলেন। দানপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রহ্মবীর স্বামীর হাতে প্রদান করা হল। এই অনুষ্ঠানে স্বয়ং নারায়ণ দেব শ্রীগোপাল উন্মীলন স্বামী ভরণী স্বামী উপস্থিত ছিলেন।

অক্ষ্যনীবি ধর্ম্ম অনুসারে, এই দানপত্র রচিত হয়েছে। অক্ষ্যনীবি ধর্ম হচ্ছে কোনও কুমারী ভূমিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বপ্রথম দান করা।

নারায়ণদেব তাম্রপত্রে পাঠ করেন। ভূমির সীমারেখা "..... পশ্চিমস্যান্ দিশি কুতকুট্ট গ্রামীণ।

ব্রাহ্মণ্যাম সত্ত তাম্রপট্ট সীমা।।

উত্তর সাং গঙ্গিনিকা, পূর্ব স্যামিয়ম গঙ্গিনিকা

তত মিসসৃতো অমল পৌতিক গ্রাম

পশ্চিম সীমন অনুগতস সর্ষপ যানক।"

*　　　*　　　*

শ্রীপঞ্চমীতে বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপ্ত করে বাণ পিসিমাকে বলে — "আমার আর কোনও বন্ধন নেই। আমি মুক্ত। সম্পূর্ণ মুক্ত।

সাতদিন পরে ব্রাহ্ম্যমুহূর্তে বাণ দক্ষিণের পথ ধরে যাত্রা করে। অজান উদ্দেশে যাত্রা।

পিছন থেকে পিসিমা চেয়ে থাকেন। বাণ মাঘের নিবিড় কুয়াশায় ডুবে যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাণ, বপ্প ঘোষ বাট ঘাটে পৌঁছায়। নিত্য আড্ডার ঘাট। ঘাট থেকে একটি সড়ক পথ সোজা পশ্চিমে এগিয়ে পাল্লিতকগঞ্জে পৌঁছেছে। পাল্লিতক থেকে বাঁক নিয়ে দক্ষিণে এগিয়ে গেছে। দক্ষিণমুখী পথ চণ্ডিকা অরণ্যের পূর্ব সীমান্তের পশ্চিম সাগরের পূর্বকূল ঘেঁষে, নলচর্মট, প্রডামার নৌ-বন্দরের মাঝ দিয়ে গোপ্পপলী পৌঁছেছে। গোপ্পপলীর পর আরো দক্ষিণে এগিয়ে সরষপ অঞ্চলের অন্নপোতায় গেছে। রাজকীয় দলিল দস্তাবেজে এই সড়কপথের নাম 'সরষপ যান'। যান অর্থ সড়ক পথ। লোক মুখে এই পথ 'অন্নযান' নামেও পরিচিত।

বপ্প ঘোষ বাট ঘাট থেকে অন্য একটি পথ বাঁধের উপর দিয়ে দক্ষিণদিকে এগিয়ে গেছে। এই বাঁধ পূর্ব সাগরের পশ্চিমকূল ঘেঁষে নির্মিত। দিন কতক আগে বাণ এবং শশ এই বাঁধ পথ ধরে কালিকা শ্বভ্র পার হয়ে কাদম্বরী দেব কুলিকায় গিয়েছিল।

বাণ স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করে কোন্ পথ ধরে নিরুদ্দেশ যাত্রায় ঝাঁপিয়ে পড়বে?

দক্ষিণমুখী বাঁধ পথ, কাদম্বরী দেবকুলিকা পার হয়ে ভীষণ চণ্ডিকা অরণ্যের মাঝ দিয়ে বহু দূরের চণ্ডিকা মন্দিরে পৌঁছেছে। চণ্ডিকা মন্দিরের সামান্য দক্ষিণে মল্লকূট গ্রাম। মল্লকূটে বাণের পারাশব দাদা চন্দ্রষেণ এবং মাতৃষেণের মায়ের বাড়ি।

শীতের বাতাস, পূর্ব-সাগর অর্থাৎ শোনবিল থেকে এসে ঝাপটা দেয়। মালতী পিসির হাতে বোনা কার্পাস চাদর গায়ে শক্ত করে জড়িয়ে রাখে। পূর্বদিকে শোনবিলের অন্যতীরে চন্দ্রপুর পাহাড়। কুয়াশার মাঝে অস্পষ্ট চন্দ্রপুর।

বাণ, চন্দ্রপুরের দিকে তাকিয়ে ভাবে কোন্ পথ ধরবে? সর্ষপ যান অথবা ভয়াল চণ্ডিকা অরণ্যপথ?

কুয়াশা কাটতে থাকে। চন্দ্রপুর পাহাড়ের উপর যজ্ঞের ধোঁয়া স্পষ্ট হয়। যজ্ঞের ধোঁয়া সরল রেখায় আকাশে উঠছে। বাণ ভাবে মাত্র একবছর আগে প্রতিটি প্রভাতে আশ্রমের অধ্যাপক ঋষিদের সাথে সে যজ্ঞে যোগ দিত। ব্রহ্মচারীদের সাথে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে সামমন্ত্র উচ্চারণ করত। পৃথিবীর সব কাল, সব ঋতু সুন্দর। পরম রমণীয়। "বসন্ত ইন্নুরন্ত্যো গ্রীষ্ম ইন্নুরন্ত্যঃ। বর্ষান্যানু শরদো হেমন্তঃ শিশির ইন্নুরন্ত্যঃ।।"

বাণের মনে প্রশান্তি জেগে উঠে। পুব আকাশের অরুণউদয় ভাল লাগে। অনুভব করে উদিত ভানু নবজীবন পথের নির্দেশ দিচ্ছে। জোড় হাতে সামমন্ত্র উচ্চারণ করে। "এতা উত্যা

উষসঃ কেতুমক্রত পূর্বে অর্ধে রজসো ভানুমঞ্জতে।" অরুণ বর্ণ উষা জ্ঞানকে প্রকাশ করছেন। পূর্ব দিগন্ত অরুণবর্ণে রঞ্জিত হয়েছে।

বাণ, দক্ষিণমুখী চণ্ডিকা অরণ্যের ভয়াল পথ ধরে দ্রুত এগিয়ে চলে। সূর্য আকাশের এক-চতুর্থাংশ বেয়ে কাদম্বরী মন্দিরের কাছে পৌঁছায়। ধনকুবের তার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে। বাণ, তার সাথে কোনও কথা না বলে এগিয়ে গেলে পিছন থেকে ধনকুবের বাণকে ডাকে। বাণ দাঁড়ায়।

ধনকুবের এগিয়ে গিয়ে বাণের সাথে কথা বলতে শুরু করে। ধনকুবেরের ভীষণ দুর্যোগ। যুদ্ধ শেষ হতে না হতে ধনকুবেরের বাবা বন্দরপুরে কড়ি কিনতে গিয়েছিলেন। সাথে ছিল সেই গৌড়ের মুদ্রা। সন্ধ্যায় যখন বাবা ফিরে এলেন তখন তার শরীর অচল, কথা বন্ধ। শোনবিলের ঘাট থেকে মাঝিরা চ্যাংদোলা করে বয়ে নিয়ে এসেছে।

মাঝিরা বলেছে, তার বাবাকে কড়ির ব্যবসায়ী গুহনদীন ভীষণ অত্যাচার করে সব টাকা-দিনার কেড়ে নিয়েছে। গুহনদীন তার বাবাকে চোর বলে গালি দিয়েছে। তখনই তার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন।

বাণ জিজ্ঞাসা করে কড়ির ব্যবসা কি এখন ধনকুবের চালাবে? ধনকুবেরের চোখে জল দেখা দেয়। বলে, বাবা সন্ধ্যায় এলেন। বৈদ্য বলেন, পক্ষাঘাত। সারারাত ঘুম নেই। পরদিন অন্য বৈদ্য এসে একই কথা বলেন — পক্ষাঘাত। পরের রাতে ভীষণ ঘুম লাগে। সকালবেলা দেখা যায় দোকান ফাঁকা। সব কড়ি চুরি হয়ে গেছে। বাণ জিজ্ঞাসা করে চোর এত কড়ি কীভাবে নিয়ে গেল? ধনকুবের বলে, নৌকায় নিয়ে গেছে। ঘাটের কাছে কড়ির একটি পেটেরা পড়েছিল।

বিদায় নিয়ে বাণ চলতে শুরু করে। শশের কথা মনে পড়ে, "কোন দুষ্ট পাজি চোর যদি খিড়কি দিয়ে ঢুকে সব কড়ি নিয়ে পালায়? ..... ভাঙা দরজা। .... নৌকা।"

শুরু হয় চণ্ডিকা অরণ্য পথ। শীতের শুকনো বালিতে ভরা আঁকাবাঁকা পথ। দুদিকে মস্ত সব গাছ। গাছে বেয়ে উঠা মালিনী লতা মাথার উপর দিয়ে এক ধার থেকে অন্য ধারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বাণের মনে হয় যেন সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে চলেছে। পথ কখনো শুষ্ক নদীখাতের পাশ দিয়ে চলেছে। নদীতীরে কুঞ্জড়লতার ঝোপ।

মাথার উপর, জমাট কালো পাতার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে দেখা দেয় শীতের সূর্য। পথের পাশে, দুএকটি পাতকুয়া। সে পাতকুয়োর পাশে এসে দাঁড়ায়। কুয়ার চারিপাশে হরিতকীর বিচি। বাণ উপলব্ধি করে পথিকেরা হরিতকী খেয়ে পিপাসা নিবারণের চেষ্টা করেছে। বিচির স্তূপের উপর, পাতা গেঁথে বানানো জলপাত্র। পাতা শুকিয়ে গেছে। পাতার জলপাত্রের সাথে লম্বা জংলী লতা বাঁধা। বাণ, জলপাত্র কুয়ার ভিতর নামিয়ে লতা দিয়ে টেনে জল তোলে। কালচে-সবুজ জল। দুর্গন্ধ। পোকা কিলবিল করছে। জলপান সম্ভব নয়।

পিপাসা। ভীষণ পিপাসা। জনমানবশূন্য। বাঁক একটি পার হয়ে দেখে পথের উপর মস্ত সব গাছ পড়ে আছে। বাণ শুনেছে, চণ্ডিকা অরণ্যে হাতির দল মস্ত মস্ত গাছ ভেঙে পাতা খায়। এগিয়ে চলে।

পথ এখন শুষ্ক নদীখাতের পাশ দিয়ে চলেছে। হঠাৎ দূরে কুকুরের ডাক শোনা যায়। বাণের ভালো লাগে। কিছু এগিয়ে গেলে কুকুর দেখা যায়। কুকুরের পাশে কিরাত মেয়ে। কিরাত মেয়ে, শুষ্ক নদীর বালি খুঁড়ে নারিকেলের মালা দিয়ে জল তুলে কলসিতে ঢালছে।

এবার বাণের পিপাসার বাঁধ ভাঙে। কিরাত মেয়ের দিকে বাণ ছুটে যায়। নেড়ি কুকুর যথাসাধ্য হুঙ্কার তুলে বাণের দিকে এগিয়ে আসে। লেজটিকে দু পায়ের ফাঁকে নিরাপদ স্থানে রেখেছে। বাণের ভ্রূক্ষেপ নেই দেখে নেড়ি স্তব্ধ হয়। তারপর পায়ে পায়ে পিছনে হটে যায়।

বাণ, অঞ্জলিবদ্ধ হাত পাতে। কিরাতকন্যা নারিকেলের মালা দিয়ে জল ঢেলে দেয়। বাণ তৃপ্ত হয়।

বাণ, জলপান করে উপলব্ধি করে সে ভীষণ ক্লান্ত। চলতে পারছে না। বালির উপর বসে। নেড়ী, কীর্তন চালিয়ে যায়।

মনে পড়ে, পিসিমা একটি পুঁটলি দিয়েছিলেন। নারিকেল চিড়া ক্ষীরের নাড়ু বের করে। ছোটো একটি পাতায় তিনটি নাড়ু কিরাতকন্যার সামনে বালির উপর রাখে। মেয়েটির মুখ-সুন্দর হাসিতে ভরে ওঠে।

বাণ খেতে সুরু করে। লোভে নেড়ির সাহস বাড়ে। পায়ে পায়ে বাণের কাছাকাছি আসে। বাণ, নাড়ু ভেঙে, ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয়। খুশিতে লেজ বন্ধনমুক্ত হয়ে ডানে-বামে দোলে।

বাণ, আবার জল খায়। এবার নিজে জল তোলে। দুশ্চিন্তা হয় কিরাত মেয়ের হাতে জল খেয়েছে। জাত গেল নাকি?

আবার যাত্রা। নেড়ি বাণকে অনুসরণ করে। ছু-ছু-ছু, করে কিরাতকন্যা ডাকে। বাণ জানে, কিরাতরা কুকুরকে - ''কিক্‌ছু'' বলে। নেড়ির চৈতন্য হয়। মেয়েটির কাছে ফিরে যায়।

বাণ, শুষ্ক নদীখাত থেকে অরণ্যপথে ওঠে। বাঁদিকে চেয়ে দেখে মেয়েটি জল তুলছে। কিরাত মেয়ের পিছন দিকে পাতা ঢাকা দুটি কুঁড়ে ঘর। সেখান থেকে মোরগের ডাক ভেসে আসছে।

আবার ঘন অরণ্যপথ। সূর্য পশ্চিমে। পথের পাশে গাছের মস্ত কাণ্ডে দুর্গার মূর্তি খোদাই করা। মেরুদণ্ডে শীতল স্রোত। শুনেছে, চণ্ডিকা অরণ্য 'টুগা' ডাকাতদের আস্তানা। পথিকদের সবকিছু কেড়ে নিয়ে দুর্গার সামনে বলি দেয়। দুর্গামূর্তি খোদাই করা গাছের চারদিকে শুকনো পাতা। বাণের চোখে পড়ে শুকনো পাতার মাঝে নরমুণ্ড। পোকা কিলবিল করছে। পচা মুণ্ড থেকে রস পাতার উপর পড়েছে। পাতার উপর নীল রঙের মস্ত মস্ত মাছি।

আতঙ্কিত বাণ, সামনের দিকে ছুটে এগিয়ে যায়। শুনেছে, বপ্প ঘোষ বাট থেকে চণ্ডিকা মন্দির একদিনের পথ। সন্ধ্যার আগে পৌঁছাতে হবে।

সূর্য পশ্চিম আকাশের শেষ মাথায়। ক্রমে জঙ্গল হাল্কা হয়ে আসে। কদম্ব পলাশ শাল্মলী গাছের উপরের ডালগুলির অধিকাংশ ছাঁটা। গাছের শেষ মাথায় ছাতার মত দুএকটি ডাল। তলায় খেত। খেতের চারদিকে শক্ত কঞ্চির বেড়া। ফসল পেকে হলুদ হয়ে উঠেছে। খেতগুলির মাঝখানে বাঁশ-খড়ের কাকতাড়ুয়া মূর্তি।

কিছু এগিয়ে বাণ পথের মাঝখানে দাঁড়ায়। দেখে একটি পথ সোজা দক্ষিণমুখী, অন্যটি পশ্চিমে গেছে। পশ্চিমের পথ ধরে মধ্যবয়সী একটি কিরাত নারী আসে। মাথায় টুকরি। বাণ চণ্ডিকা মন্দির পথের কথা জিজ্ঞাসা করে। মেয়েটি দক্ষিণের সোজা পথ দেখিয়ে দেয়। বলে,পশ্চিমের পথ প্রডামার-নগরশ্রী বন্দরে গেছে। নগরশ্রী বন্দর অঞ্চলে বাণের জেঠামশাই হংসবেগ থাকেন।

বাণ দক্ষিণপথে এগিয়ে দেখে সামনে মস্ত বড়ো রক্তচন্দন গাছ। গাছের ডগায় লম্বা বাঁশ বাঁধা। বাঁশের মাথায় রক্তপতাকা বাতাসে পত্‌ পত্‌ করে উড়ছে। সূর্য ডুবি ডুবি করছে। বাণ এগিয়ে চলে। পথ আর নির্জন নয়। লোক চলাফেরা করছে। ক্রমে রাস্তার পাশে বাড়ীঘর দেখা যায়। বাড়ীঘরের পর জমজমাট দোকান-পাট। অনেক মানুষজন।

দোকান-পাটে একটি দুটি করে মশাল জ্বলে ওঠে। দুটি কুঁড়েঘরের মাঝে কাঁঠালগাছের তলায়, একজোড়া তরুণ-তরুণী সবেমাত্র মশাল জ্বালিয়েছে, তখন হঠাৎ বিকট শব্দ। শব্দ মাথার উপর থেকে আসছে। তরুণ-তরুণী, মশালদণ্ড মাটিতে পুঁতে, হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করে। বিকট কর্কশ শব্দ বন্ধ হলে বাণ শব্দের কথা জিজ্ঞাসা করে। ওরা বলে, কাঁসার ঘন্টার শব্দ। গাছের উপর বাঁধা। সকাল-সন্ধ্যায় বাজানো হয়। চণ্ডিকা মন্দিরের ঘন্টা।

দুজন বাণের আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়ে ইঙ্গিতে কিছু শলা-পরামর্শ করে। তরুণ বাণের কাছে এসে বিনীতভাবে বলে, ওরা দুজন দেবী চণ্ডিকার ভীষণ ভক্ত। তারা দেবীর আশীর্বাদে, তীর্থযাত্রীদের সৌভাগ্যের পথ দেখায়। বাণের জিজ্ঞাসায় তরুণ কাঠের গোল কৌটায় মস্ত বড়ো অস্বাভাবিক একটি কড়ি দেখায়। তরুণী বাণকে বুঝিয়ে দেয় এই কড়ি উল্টে-পাল্টে পড়ার মধ্যে সৌভাগ্যের ইঙ্গিত ধরা দেয়। সৌভাগ্যবানের এক কড়ি হয়ে যায় দুকড়ি। দুকড়ি হয় চারকড়ি। চার হয় আট; একশ কড়ি হয় দুশ।

তরুণ হাতে কলমে প্রমাণের কাজে লাগে। কৌটায়, মস্ত কড়ি ঢুকিয়ে, দুহাতে কৌটার মুখ ঢেকে 'গিল গিল গিল' করে চীৎকার করতে থাকে। কাঠের কৌটার ভিতর মস্তকড়ি, 'ঠগাঠগি-ঠগাঠগি' করে তাল দেয়। খানিক বাদে ঘাসের উপর পেতে রাখা বং চটে যাওয়া কাপড়ের উপর কৌটা উপুড় করে রাখে। বলে, ভিতরের কড়ি চিৎ অথবা উপুড় হয়ে আছে এই কথা বলার মাঝেই সৌভাগ্য ধরা দেয়।

ইতিপূর্বে, শশ এবং অন্যান্য বন্ধুদের কৃপায় বাণ জুয়া সম্পর্কে প্রাথমিক পাঠ শেষ করেছে। অজানা স্থান এবং পরিস্থিতি। বাণের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়। বাণ বলে, সে তার সৌভাগ্য জানতে চায়; কিন্তু স্নান-আহ্নিক হয়নি। অপবিত্র দেহ নিয়ে বাণ কা-সিন-থিড দেবকর্ম সম্পাদন উচিত নয়। আগামীকাল সৌভাগ্য বিচার করবে।

বাণের সাথে ওরা পরিচয় প্রসঙ্গের জন্য আলাপ আলোচনা আরম্ভ করে। তরুণের বয়স উনিশ-কুড়ি। তরুণী সতেরো-আঠারো। দুজনের গায়ের রং উজ্জ্বল,কিরাতীয় পোশাক। তরুণের চুল লালচে, চোখের মণি নীল। পরিচয় প্রসঙ্গ হয়। তরুণের নাম আখণ্ডল। বাণ বুঝে নেয়, আখণ্ডল দ্যূতকার। তরুণীর নাম-কা-সিন্‌ থিউ। নাম উচ্চারণ করে বারে বারে। আখণ্ডল বলে তাদের কিরাতীয় ভাষায় অর্থ হচ্ছে ফুল। আখণ্ডল, মৃদু হেসে বাণকে জিজ্ঞাসা করে, কাসিনথিউ

নামটি কি মানিয়েছে? তরুণী হাসে। বাণ উপলব্ধি করে ওরা দুজন প্রেমের কোনও বিশেষ অধ্যায়ে সাঁতার কাটছে।

বাণ বলে, ময়ূর-শাল্মলীর প্রীতিকূট থেকে আসছে। যাবে মল্লকূটে। বাণ বিস্মিত হয়, তরুণী সরাসরি জিজ্ঞাসা করে তার নাম কি বাণ? বিস্মিত বাণ নানা কথা জিজ্ঞাসা করে। তরুণীর মুখে কুলুপ। আর কিছু বলে না।

বাণ, তার গন্তব্যস্থানে যাবার কথা বলে তরুণী বলে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, মল্লকূটের পথ ভালো নয়। চোর ডাকাত আছে।

তরুণী, বাণকে নিয়ে চণ্ডিকা মন্দিরে যায়। মন্দিরের হট্টশালায় থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে বলে, আগামীকাল সকালবেলা আবার দেখা হবে।

ক্লান্ত বাণ স্নান আহ্নিক করে অনেকের সাথে রাতের খাবার খায়। নিদারুণ ক্লান্ত। একজন তাকে হট্টশালার একটি কামরায় নিয়ে যায়। বাণের মনে হয় যেন স্বপ্ন দেখছে। টান-টান করে মশারি টাঙানো। ভেড়ার লোমের কম্বল। কুলুঙ্গিতে জ্বলন্ত প্রদীপ। বিছানায় মিষ্টি গন্ধ।

শেষ রাতে কাছ থেকে বাঘ ডাকে। ঘুম ভেঙে যায়। খানিক বাদে শেষ রাতের পাখি ডাকে। বাণ বিছানায় ওঠে বসে। প্রদীপ স্তিমিত। কক্ষের দুদিকে গবাক্ষ। গবাক্ষ দিয়ে মৃদু আলো চুঁইয়ে আসে। ভোর হয়ে আসছে। পূর্বদিকে গবাক্ষের বাইরে ডালপালা, ফুল স্পষ্ট হয়। মৃদু আলোতে শীতের কুঁকড়ে যাওয়া জবাফুল দেখা যায়।

বাণ দেখে, একটি বাঁকা লাঠি জবার ডাল টেনে নামানোর চেষ্টা করছে। ডাল বারবার ফঁিচকে যাচ্ছে। বাণ, খাটের উপর দাঁড়িয়ে, গবাক্ষ দিয়ে হাত গলিয়ে, জবা ফুলসহ ডাল নামিয়ে দেয়। খানিকবাদে, ছেড়ে দিলে ডাল আবার লাফিয়ে ওঠে।

গবাক্ষ দিয়ে দুর্বোধ্য নাকি সুরের কীসব কথা ভেসে আসে। নাকি সুরের কথা, কান্না-চিৎকার হয়ে উঠে। বাণ দরজা খুলে বের হয়। সে এই ঘরে রাতে ঢুকেছিল। তাই হঠাৎ করে পথ খুঁজে পায় না। শেষ পর্যন্ত নাকি কান্নার সুর লক্ষ করে জবাগাছের তলায় হাজির হয়। দেখে, জবাগাছের গোড়ায় কে একজন তার গাল এই সাথে কান কুটছে। গাল-কান কুটে কুটে, নাকি সুরে আম্মা! আম্মা! করে চিৎকার করছে।

একজন দু'জন করে ভিড় জমে উঠে। ভিড় দেখে সে উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে 'আম্মা! আম্মা! চিৎকার করে নাচতে থাকে। লোকটি লম্বা এই সাথে সরু। সরু দেহে হঠাৎ করে মস্ত ভুঁড়ি ভেসে উঠেছে। ঘাড়ের উপর গলা বাঁকা হয়ে জোড়া ফলে মাথা একদিকে বেঁকে আছে। একদিকে বাঁকা মাথা দেখে গাছের গোড়ায় গাল-কান কুট'র কারণ বাণ উপলব্ধি করে।

সে ব্যক্তি সমবেত জনমণ্ডলীকে তার দেবীদর্শনের কথা বলে। কথায় দ্রাবিড় ভাষায় উচ্চারণ। সে বলে এইমাত্র দেবী 'কু-কামাই খা' তাকে পুজার ফুল গাছের ডাল নিজের হাতে নামিয়ে দিয়েছেন। সে কুঁকড়ে থাকা জবাফুল দেখায়।

হাতের ফুল, উপরে তুলে কথা বলে। কথার মাঝে থেকে থেকে "আম্মা! কু-কামাইখা"

ধ্বনি দিয়ে নাচতে থাকে।

বাণ তার ঘরে ফিরে যায়। নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে বলে — "জয়। আম্মা- কু-কামাইখা।"

বাণ স্নান করে পুকুর পাড়ে প্রভাতী আহ্নিক করে। আহ্নিক শেষ হতে না হতেই সেই ভীষণ কর্কশ ঘন্টাধ্বনি। সামনে মস্ত রক্তচন্দন গাছের উপর বাঁশের ডগায় টাঙানো লাল পতাকা। গত সন্ধ্যায় অস্পষ্ট আলোকে পতাকা দেখেছিল; ভোরের সূর্যালোকে স্পষ্ট। পতাকার মাঝে, সাদা-কড়ি দিয়ে সাজানো — অর্দ্ধচন্দ্র। অর্দ্ধচন্দ্রের উপর মস্ত বিন্দু। বিন্দু, শিশু সূর্যের মত সাজানো।

পতাকা দণ্ডের বাঁশ, কাঁচা চামড়ায় পেঁচানো। চামড়া থেকে, বাঁশের দণ্ড বেয়ে টাটকা লাল রক্ত নামছে। লাল পতাকার ঠিক নিচে, পতাকা দণ্ডের সাথে চমরি গরুর ঘন কালো চামর বাঁধা। বাতাসে চামরের চুল উড়ছে। বাণের মনেহয় কোনএক ভীষণার আলুলায়িত চুল।

পতাকা দণ্ডের পাশে মস্ত এক কাঠের স্তম্ভ। স্তম্ভের মাথায় সোনার ত্রিশূল। সোনালি আলোকে ত্রিশূল ঝকমক করছে। ঘন্টায় লম্বা রশি বাঁধা। রশি টেনে টেনে ঘন্টা বাজিয়ে চলছে — ঢং ঢং ঢং।

* * *

প্রভাতী জলযোগের পর চন্দ্রগোমী স্বামীর সাথে বাণের পরিচয় হয়। তিনি, পম্পা -সরোবর তীরের চন্দ্রমৌলীর শিবমন্দিরের পুরোহিত। বাণ এই বয়সেই চন্দ্রপুর বিদ্যশ্রমের স্নাতক হয়ে গেছে জেনে চন্দ্রগোমী স্বামী বিস্মিত। তিনি সুদীর্ঘকাল আগে চন্দ্রপুরের স্নাতক হয়ে শিবমন্দিরে যোগদান করেছেন।

চন্দ্রগোমী স্বামীর সাথে আলাপ-আলোচনা এগিয়ে যাবার আগেই তিনজন দরজায় শব্দ করে ঘরে প্রবেশ করেন। এদের দেখে চন্দ্রগোমী স্বামী পরে আলাপ হবে বলে বাণের ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। তিনি দুদিন হল এসেছেন। বাণের পাশের ঘরে আছেন।

বাণ তিনজনের মধ্যে দুজনকে চিনতে পারে। গত সন্ধ্যার দ্যূতকার আখণ্ডল এবং কা-সিনথিউ। তৃতীয় জন, কিরাতীয় পোশাক পরা জনৈকা প্রৌঢ়া মহিলা। কা-সিনথিউ খুব করে সেজেছে। শক্ত খোঁপা। সোনার কুণ্ডল। সোনার বালা। সেই সাথে লালগুঞ্জা ফলে গাঁথা মালা। চওড়া কাঁধ। লাল কালো সুতায় বোনা মোটা চাদর। কোমরে জড়ানো মুগার বস্ত্র, পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বিত। সঙ্গের মহিলার সাজগোজ একই ধরনের। তিনজনের মুখভর্তি তাম্বুল। মহিলার দাঁত কালো।

বাণের মনে হয় মহিলা পরিচিত। কোথায় যেন দেখেছে। মহিলা হঠাৎ করে বাণকে বলেন, তিনি চন্দ্রযেণ মাতৃযেণের মা। বাণের কানে বেজে উঠে স্তম্ভে বাঁধা কাঁসার ঘন্টা; হাজার হাজার ভীষণ ঘন্টা যেন বাজছে।

মহিলা বলেন, কা-সিনথিউ গতরাতে বাণের কথা বলেছে। তাই এসেছেন। কা-সিনথিউ তার বেতের পেটেরা থেকে পান-সুপারি বের করে বাণকে দেয়। বাণের মনে হয় যুগ-যুগান্তর

পার হয়ে গেছে সে পান খায়নি। তাম্বুল খেয়ে ধাতস্থ হয়।

মহিলার কথাবার্তা বাণের ভালো লাগে। তিনি অন্যান্য কথাবার্তার সাথে, চন্দ্রষেণ-মাতৃষেণের বাবা, বাণের অন্যতম জেঠু জাতবেদার গল্প বলেন। বাণের মতো এমনি বয়সে তিনি হঠাৎ করে চণ্ডিকা মন্দিরে এসেছিলেন। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। ঝড়-বৃষ্টির প্রচণ্ড দাপট। মহিলার সঙ্গে মন্দিরে দেখা। তিনি তখন নিতান্ত বালিকা। অন্ধকার ঝড়-বৃষ্টি বজ্রপাতের মধ্যে জাতবেদাকে তাদের বাড়ী মল্লকূটে নিয়ে গিয়েছিলেন।

জাতবেদা ছিলেন কবি। সংস্কৃত সাহিত্য এবং দর্শনে পারদর্শী। কবিতা লিখতেন প্রাকৃত ভাষায়। তিনি তার প্রাকৃত ভাষার কবিতায় মাঝে মাঝে কিরাতীয় শব্দ ব্যবহার করতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি চণ্ডিকামন্দিরে যোগ দেন। জাতবেদা দেবী চণ্ডিকার নানা সংস্কৃত স্তবস্তুতি এবং ধ্যানমন্ত্র রচনা করেন।

মহিলা, কা-সিনথিউ এর পেটেরা থেকে তাম্বুল নিয়ে মুখে পুরে কিছুক্ষণ অতীত স্মৃতি রোমন্থন করেন। এরপর জাতবেদার সাথে তার বিয়ের কথা বলেন। তাদের বিয়ে যজ্ঞ-বেদপাঠ করে হয়নি। বিয়ে হয়েছে শুদ্ধ কিরাতীয় প্রথায়। চন্দ্রষেণ এরপর মাতৃষেণের জন্ম হয়। ওদের বয়স যখন আট এবং নয় বৎসর, তখন স্থির হয়, ওদেরে প্রীতিকূট বিদ্যাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। প্রীতিকূটের সবাই খুশি। স্থির হল, চন্দ্রষেণ এবং মাতৃষেণকে তাদের বাবা জাতবেদা নিজে প্রীতিকূটে নিয়ে যাবেন। একদিন ভোরে দুই ছেলেকে নিয়ে যাত্রা করলেন।

মহিলার গলা ধরে এল। মাথা নুয়ে বসে রইলেন। বাণ দেখে, তিনি মুখ নামিয়ে চোখের জল লুকানোর চেষ্টা করছেন। স্তব্ধতা নামে।

কা-সিনথিউ হাল ধরে। বলে, তারা যখন প্রীতিকূটে পৌঁছালেন তখন সন্ধ্যা হয় হয়। উঠানে মাত্র পা দিয়েছেন এমন সময় ভূমিকম্প। ভীষণ ভূমিকম্প। উঠান ফেটে গেল। সকলের সামনে তার বাবা মাটির ভিতর ঢুকে গেলেন। প্রীতিকূটের সবাই হতভম্ব। ভূমিকম্পের পর উঠানে পুকুরের মতো গর্ত খোঁড়া হয়েছিল, কিন্তু দেহ পাওয়া গেল না। চন্দ্রষেণ মাতৃষেণ প্রীতিকূটে রয়ে গেল।

কা-সিনথিউ, মহিলাকে 'কম্মাই' বলে ডাকে। বাণ, জানে, কিরাতীয় ভাষায় "মা" শব্দ খানিকটা 'কম্মাই' ধ্বনিতে উচ্চারিত হয়। বাণ জিজ্ঞাসা করলে, মহিলা বলেন, কা-সিনথিউ তার কন্যা। তিনি পরিচ্ছন্নভাবে বলেন, এই কন্যার পিতা জাতবেদা নন।

বাণের চিন্তা হোঁচট খায়। বাণ কা-সিনথিউকে তার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করে। কা-সিনথিউয়ের নির্বিকার জবাব, সে তার বাবার নাম জানে না। বাণের হতভম্ব ভাব দেখে মহিলা বলেন, তাদের কিরাতীয় সমাজে সন্তানগণ মায়ের নাম এবং গোত্রে পরিচিত হয়। স্বগোত্রে, অর্থাৎ মায়ের গোত্রে বিবাহ হয় না।

মহিলা সংক্ষিপ্তভাবে, কা-সিনথিউয়ের বাবার কথা বলেন। জাতবেদার মৃত্যুর পর মহিলা তার ভাসুর অর্থাৎ বাণের জেঠু হংসবেগের বাড়ী, নগরশ্রী নৌবন্দরে মাঝে মাঝে যেতেন। পথে জনৈক গন্ধর্ব বণিকের সাথে প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হত। এই দেখাসাক্ষাৎ শেষপর্যন্ত বিয়েতে রূপান্তরিত

হয়। জাতবেদার মৃত্যুর প্রায় বছর তিন পরে এই কন্যার জন্ম। বাণের কোনও জিজ্ঞাসার আগেই মহিলা বলেন, গন্ধর্ব বণিকের সাথে তার এখন কোনও যোগ নেই। মৃদু কণ্ঠে কা-সিনথিউ বলে, বাবার কথা তার মনে নেই। বাবার চেহারা ভুলে গেছে।

বাণ, মহিলাকে 'জেঠাইমা' সম্বোধন করে তাদের গোত্রের নাম জিজ্ঞাসা করে। বাণের, 'জেঠাইমা' সম্বোধনে মহিলা ভাবাবেগে বিচলিত হন। খানিক পরে বলেন, তার উপাধি এবং গোত্র 'ব্লা'। তার স্বামী জাতবেদা বলেছিলেন, 'ব্লা' নাকি ব্রাহ্মণ বাচক শব্দ। অন্যদিকে, 'ব্লা' উপাধিধারীগণ কিরাতীয় সামাজিক এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। বাণ মৃদু হেসে কা-সিনথিউকে জিজ্ঞাসা করে তার গোত্রের নাম কী? কা-সিনথিউ বলে তার গোত্রের নাম 'ব্লা'।

আলোচনায়, আখণ্ডল প্রায় নির্বাক থাকে। আখণ্ডলের কথা ওঠে। সে নগরশ্রী বন্দরের কাছাকাছি প্রডামার বন্দরের অধিবাসী। তার মা গন্ধর্ব নারী এবং পিতা গ্রীসের যবন।

কা-সিনথিউ প্রসঙ্গত বলে গত সন্ধ্যায়, আখণ্ডলের দিদি এবং দিদির বর প্রডামার থেকে এসেছেন। তারা এখন, মল্লকূটে আছেন। আজ সন্ধ্যায় চণ্ডিকা মন্দিরে এসে পূজা দেবেন।

বাণের জেঠাইমা বলেন, আজ চতুর্দশীর বিশেষ পূজা। বাণ জিজ্ঞাসা করে, প্রত্যেক চতুর্দশী পূজায় কি ওরা প্রডামার থেকে পূজা দিতে আসেন? জেঠাইমা বলেন, এটি মানসপূজা। ওদের বিয়ের প্রায় তিন বছর হয়ে গেল। সন্তানাদি হয়নি। সন্তান কামনায় এই মানস পূজা।

সন্ধ্যায় মন্দিরে আবার দেখা হবে বলে ওরা মল্লকূটের দিকে যাত্রা করেন। মল্লকূট, চণ্ডিকা মন্দিরের দক্ষিণে পাশাপাশি গ্রাম।

দুপুরে খাবারের ঘন্টা বাজে। চন্দ্রগোমী স্বামী পাশের ঘর থেকে এসে, বাণকে নিয়ে খাবারের ঘরে প্রবেশ করেন। দুজন পাশাপাশি আসনে বসেন।

বাণ, ইতস্তত করে চন্দ্রগোমী স্বামীকে বলে, সে গতকাল কিরাত মেয়ের হাতে জল খেয়েছে। চন্দ্রগোমী স্বামী বলেন, প্রবাসে এসব ছোঁয়াছুঁয়ি, জাতপাতের বিচার অপ্রয়োজনীয়। তীর্থক্ষেত্রের পুণ্য এসব ছোটোখাটো অনিয়মকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়।

চন্দ্রগোমী স্বামী বাণকে, চন্দ্রমৌলী শিবমন্দিরে যেতে বলেন। চণ্ডিকা মন্দিরের দক্ষিণে একদিনের পথ এই শিবমন্দির। প্রসঙ্গত বলেন, শিব মন্দির প্রায় একশ পঁচিশ-ত্রিশ বছরের পুরানো। গুপ্ত সম্রাটের আমলে কোটি বর্ষের বিখ্যাত বণিক রিভু পাল এই মন্দির এবং লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বাণ বলে, মাস কয়েক আগে, যুদ্ধের সময়কালে তার এক বন্ধু মন্দিরের হট্টশালায় রাত্রি কাটিয়েছিল। সে বলেছে, শিবমন্দিরের পাশে হাজার হাজার দেবস্থান। বিভিন্ন ধর্মীয় রীতিনীতির পূজা আর্চা প্রচলিত। মন্দিরের কাছাকাছি আদ্য রাজাদের রাজধানী কুলাচল অবস্থিত। মন্দিরের ক্রোশ খানেক পশ্চিমে গোপদের সদর দপ্তর গোপ্পপলী। গোপ্পপলীতে তার একবন্ধু থাকে। বাণ উৎসাহের সাথে বলে সে অবশ্যই চন্দ্রমৌলীর শিবমন্দির দেখতে যাবে।

বাণ বিশ্রামাদির পর বিকাল বেলা হট্টশালা থেকে বের হয়ে মন্দিরের কাছে বেড়াতে গেল। লাল পতাকা বাঁধা রক্তচন্দন গাছের তলায় পেল দ্রাবিড় ব্যক্তিকে। সেই ব্যক্তি যাকে স্বয়ং দেবী কু-

কমাইখা জবা ফুল দিয়েছিলেন। দ্রাবিড় ব্যক্তির বেহাল অবস্থা। ছোটো বড়ো নগ্ন অর্দ্ধনগ্ন কাচ্চা বাচ্চারা তাকে তাক্ করে ঢিল ছুঁড়ছে। বাণ এগিয়ে গিয়ে সামাল দেয়।

দ্রাবিড় বিপদমুক্ত হয়ে বাণকে হাত তুলে আশীর্বাদ করে নাকি সুরে উচ্চারণ করে "কস্তি"। বাণ লক্ষ করে ওর পোড়া কাঠের মত শরীরের ধমনীগুলি ফুলে ফেঁপে আছে। মনে হচ্ছে অজস্র কালো কেঁচো তার শরীর বেয়ে এঁকে-বেঁকে উঠছে। নাকের শ্লেষা, ঠোটের উপর দিয়ে, মুখের ভিতর ঢুকছে। নাক আর ঠোটের মাঝখানে দগদগে লাল ঘা।

দ্রাবিড়, বাণকে তার সাধনাগৃহে নিয়ে যাবে। দ্রাবিড় নাছোড়। বাধ্য হয়ে বাণ গিয়ে দেখল, দ্রাবিড়ের গুপ্ত সাধনার ক্রিয়াকলাপ। বাণ, বলতে গেলে পালিয়ে ভেগে এল।

বাণ সেখান থেকে চন্দ্রগোমীর আস্তানায় এল। তিনি তখন পোশাক পাল্টিয়ে বের হচ্ছিলেন। দুজন চণ্ডিকা মন্দিরের বারান্দায় উঠলেন। বিকাল হয়ে গেছে। লোকজন প্রায় নেই। মন্দির প্রাঙ্গণে পাঁঠা মহিষ বাঁধা। পাঁঠা মহিষের সাথে বেতের খাঁচায় হাঁস-কবুতর। আজ চতুর্দশীর পূজায় বলি দেওয়া হবে।

মন্দিরের সম্মুখে লোহার শিকের দরজা। বন্ধ দরজার লোহার শিকের ফাঁক দিয়ে চণ্ডিকা মূর্তি দেখা যায়। লোহার শিকে ছোটো ছোটো রঙিন কাঁচ বসানো। দরজার দুদিকে, কারুকাজ করা পাথরের স্তম্ভ।

স্তম্ভের কারুকাজের বৈশিষ্ট্য চন্দ্রগোমী স্বামী বাণকে বুঝিয়ে দেন। পাথরের স্তম্ভে সহস্র দলপদ্ম। প্রতিটি পাপড়ির উপরে অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন খোদাই করা। চন্দ্রগোমী বলেন, এই অর্ধচন্দ্র চিহ্ন দেবী চণ্ডিকার দৈবী চিহ্ন। রক্তচন্দন গাছের শিখরের লাল পতাকার উপর যেভাবে অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন অঙ্কিত তেমনি অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন পাথরের পদ্ম পাপড়িতে খোদাই করা। শিবের মাথায় এমনি অর্দ্ধচন্দ্র। দেবতা এবং স্বর্গত মানুষের নামের পূর্বে এমনি অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন আঁকা হয়।

দরজার অন্য পাশের দুটি পাথরের স্তম্ভে অন্য কারুকাজ। খোদাই করা হয়েছে, সূক্ষ্ম শিল্পমণ্ডিত শিকল ঝোলানো ঘন্টা। চন্দ্রগোমী স্বামী বলেন, শিকলে ঝোলানো ঘন্টা চণ্ডিকা দেবীর দৈবী চিহ্ন। রক্ত চন্দন গাছে লোহার শিকলে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে মস্ত ঘন্টা। প্রতি ভোর এবং সন্ধ্যায় ঘন্টা ধ্বনিতে দেবীর মঙ্গলবার্তা প্রচারিত হয়।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে আসে। মন্দিরে ভিড় বাড়তে থাকে। ভিড়ের মধ্যে 'কো-সাধু' বলে একজন অন্যকে ডাকে। বাণ চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখে ধারে কাছে কোন সাধু-সন্ন্যাসী নেই। চন্দ্রগোমী স্বামী বলেন, কিরাতীয় ভাষায় 'সাধু' অর্থ বৃদ্ধ লোক, 'কো' হচ্ছে — সম্বোধন। বাণ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'সাধু' অর্থ শুধুমাত্র বৃদ্ধ? চন্দ্রগোমী স্বামী বলেন, কিরাতীয় সাধু শব্দ বর্তমানে খোল-নলচে পাল্টে সাধু অর্থাৎ সন্ত হয়ে উঠেছে।

চন্দ্রগোমীর স্বামীর সাথে যখন, 'সাধু' শব্দ নিয়ে কথা হচ্ছে তখন - কা-সিনথিউ বাণের কাঁধে হাত রাখে। বাণ চেয়ে দেখে মস্ত দল। আবার দেখা হবে বলে চন্দ্রগোমী স্বামী তার আস্তানায় চলে গেলেন।

কা-সিনথিউয়ের সাথে আশ্চর্য সুন্দর এক মেয়ে। বাণ মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে। কা-সিনথিউ বাণের গালে তার ডান হাত ছুঁইয়ে বলে মনে রেখো এই মেয়ের কিন্তু বিয়ে হয়ে গেছে।

রূপসী রমণী আখগুলের দিদি। আখগুলের মত উজ্জ্বল রং। নীল চোখ, সোনালি চুল। গ্রীক পিতার সকল আশীর্ব্বাদ। সন্তানকামনায় মানস পূজা দিতে এসেছে। পাশে প্রিয়দর্শন গন্ধর্ব ব্যবসায়ী বর।

মন্দির প্রাঙ্গণের সব দিকে অজস্র মশাল জ্বলে উঠেছে। হলুদ আলো'কে প্রাঙ্গণ কাঁপছে। ঢাব ঢোল কাঁসরের আকাশ ফাটানো শব্দ। হৈ-হট্টগোল চিৎকার। ক্রমাগত পশু বলি হয়ে চলছে। মাঝে মধ্যে উলুধ্বনি। রক্তের স্রোত। ধূপের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন।

সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরের বারান্দায় আখগুলের দিদি পূজা দিতে উঠে দেবী চণ্ডিকার মূর্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে। জোড় হাতের মধ্যে ফুল বেলপাতা। পুরোহিত কিরাতীয় ভাষায় তাকে মন্ত্র বলতে বলছেন - 'অং'। চন্দ্রগোমী স্বামী খানিক আগে কিরাতীয় 'সাধু' শব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে 'অং' শব্দের অর্থ বলেছিলেন। 'অং' একটি কিরাতীয় শব্দ, এর অর্থ 'বল'। যজমানকে, পুরোহিত তার সাথে মন্ত্র উচ্চারণ করার জন্য প্রথমে নির্দেশ দেন — 'বল', অর্থাৎ কিরাতীয় ভাষায় 'অং'।

চন্দ্রগোমী স্বামী মৃদু হেসে বাণকে বলেছিলেন বর্তমান কালের ব্রাহ্মণগণ কিরাতীয় 'অং' শব্দের মূল অর্থ না জেনে স্বকপোল কল্পনায়, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সমগ্র ক্রন্দসী পরিব্যাপ্ত করে ফেলছেন।

হঠাৎ করে ভীষণ গণ্ডগোল। চারিদিকে ছুটাছুটি। একজন বারান্দায় উঠে আখগুলের দিদির হাত ধরে টানছে। ধস্তাধস্তি। প্রাঙ্গণ থেকে গন্ধর্ব বর খাটো গন্ধর্ব কৃপাণ হাতে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরে উঠতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে একদল লাঠিয়াল কৃপাণধারী গন্ধর্বকে লাঠির আঘাতে সিঁড়ির উপর ফেলে দিয়ে অনেকগুলি লাঠি দিয়ে চেপে ধরে। কয়েকটি লাঠিয়াল তাদের পাগড়ির কাপড় দিয়ে ওকে শক্ত করে বেঁধে টেনে টেনে প্রাঙ্গণের দিকে নিয়ে আসে।

বারান্দায়, চণ্ডিকামূর্তির সামনে আখগুলের দিদি এবং লোকটিকে লাঠিয়ালগণ ঘিরে রাখে। লোকটি রোগা পাতলা। কালো রং। রক্তচন্দনে সাজানো কপালে। গায়ে চীনাংশুক চাদর। পরিধানে লালপেড়ে তসরের ধুতি। কানে সোনার কুণ্ডল। গলায় ছোটো বড়ো সোনার হার। মণিবন্ধ এবং বাহুতে সোনার বলয়।

ক্ষীণকায় লোকটি আখগুলের দিদিকে কাবু করতে পারে না। লাঠিয়াল কজন লাঠি দিয়ে মেয়েটিকে চেপে ধরে। লাঠিয়ালের বেষ্টনীর মাঝে লোকটি সুন্দরী নারীটিকে মন্দির থেকে টেনে টেনে নামায়। এরপর মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে, হিঁচড়ে পিছন দিকের অন্ধকার ফুলবাগানের দিকে নিয়ে যায়।

ঢাক ঢোল কাঁসর থেমে গেছে। নিস্তব্ধ। কেউ প্রতিবাদ করে না।

হতভম্ব বাণ ভাবে এই ক্ষীণকায় লোকটি কি রাজা? গৌড়ের রাজা জয়নাগ?

চণ্ডিকা মন্দিরের ডামাডোল অবস্থা দেখে বাণ হট্টশালায় চলে যায়। হট্টশালায় চন্দ্রগোমী স্বামীর সাথে কথা বলে। তিনি বলেন, ক্ষীণকায় লোকটি রাজামন্ত্রী অথবা রাজকর্মচারী নয়। লোকটি হচ্ছে একজন ভোগী।

চন্দ্রগোমী স্বামী বিস্তারিতভাবে ভোগী প্রথার বিশ্লেষণ করেন। ভোগী হচ্ছে এক শ্রেণীর মানুষ যারা স্বেচ্ছায় দেবীচণ্ডিকার উদ্দেশে আপনার দেহপ্রাণ সমর্পণ করে। ভোগীগণ সাধারণভাবে শারদীয় নবমী পূজার মহাবলির পর, দেশের রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেকে, দেবীর উদ্দেশে নিবেদন করে। নরবলি মহাপুণ্য কর্ম। নরবলিতে, দেশ এবং রাজার বহুবিধ মঙ্গল সাধিত হয়। সমর্পিত দেহের মানুষকে, রাজা আগামী শারদীয় মহানবমীর বলিরূপে গ্রহণ করেন। চন্দ্রগোমী স্বামী বলেন, সমর্পিত মানুষকে নানা বিচার বিশ্লেষণের পর বলি হিসাবে নির্বাচন করা হয়। নাবালক, অঙ্গহীন, নারী যবন ব্রাহ্মণ প্রভৃতি মানুষকে বলি হিসাবে নির্বাচন করা হয় না। বিচার বিশ্লেষণের পর যদি সমর্পিত প্রাণের কোনও মানুষকে চণ্ডিকার বলি হিসাবে গ্রহণ করা হয় তখন এই বলি পবিত্র 'ভোগী' রূপে চিহ্নিত হয়।

ভোগীগণ বলি হয়ে যাবার পূর্ব পর্যন্ত নানা রাজকীয় অধিকার লাভ করেন। ভোগীগণ তাদের ইচ্ছামতো যে কোন খাদ্য বস্ত্র অলঙ্কার প্রসাধন সামগ্রী তাদের আকাঙক্ষা মত লাভ করেন। দেশের রাজা ভোগীগণের যেকোনও কামনাবাসনা মেটাতে বাধ্য।

চন্দ্রগোমী স্বামী ভোগীগণের একটি বিশেষ অধিকারের কথা প্রকাশ করলে বাণ বিস্মিত হয়। তিনি বলেন, ভোগীগণ তাদের কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্য রাজ্যের যেকোন নারী এমনকী মহারাণীকে পর্যন্ত ভোগ করতে পারে।

চন্দ্রগোমী বলেন, ভোগীরূপে চিহ্নিত হবার পর সে ব্যক্তির পলায়নের অধিকার থাকে না। শেষপর্যন্ত ভোগীকে মহানবমীতে দেবী চণ্ডিকার সম্মুখে বলি দেওয়া হয়।

* * *

বাণ দুদিন পর মল্লকূটে, তার পারাশব ভাই চন্দ্রসেন মাতৃষেণের মায়ের বাড়ি যায়।

বাণ প্রসঙ্গত চন্দ্রগোমী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তার জ্যেষ্ঠ জাতবেদার সন্তান, চন্দ্রষেণ এবং মাতৃষেণকে, 'পারাশব' ভ্রাতা কেন বলা হয়। উত্তরে বলেছিলেন, 'পারাশব' লোকমুখে সৃষ্ট একটি আঞ্চলিক শব্দ। কিরাতীয় ভাষায় 'পারা' অর্থ ভাই। 'শবর' শব্দ থেকে, 'শব' অংশ যোগ করে 'পারা-শব' শব্দ তৈরি হয়েছে। জ্যেষ্ঠ জাতবেদার শবর স্ত্রীর গর্ভেজাত সন্তান, চন্দ্রষেণ এবং মাতৃষেণ তাই বাণের পারাশব ভ্রাতা।

মল্লকূটে বাণের, মাসখানেক আড্ডায় দ্যূতকার আখণ্ডলের সাথে বন্ধুত্ব গাঢ় হয়। চৈত্রের প্রথম দিকে, একভোরে আখণ্ডল জুয়ার আড্ডায় চলে গেছে। খানিক বাদে বাণকে নিয়ে কাসিনথিউ চণ্ডিকা মন্দিরের দিকে এগিয়ে যায়। কাসিনথিউ বলে, কিছু পয়সাকড়ি হলে, কাঁঠাল তলার আড্ডার কুঁড়েঘর তৈরি করবে। রোদ বৃষ্টিতে আখণ্ডলের দারুণ কষ্ট।

আড্ডার কাছাকাছি এসে কাসিনথিউ থমকে দাঁড়ায়। আখণ্ডল, তখন জনৈক ব্যক্তির সাথে কথা বলছে।

বাণ লক্ষ করে, আখগুলের চোখ কাসিনথিউ এবং তার উপর পড়েছে।

কাসিনথিউ, বাণকে দেখায়, আখগুল কীভাবে তার ডান হাত বা কানের উপর চেপে কথা বলছে। এর অর্থ আখগুল ইঙ্গিত করছে ব্যবসা হচ্ছে এবং কাসিনথিউকে অভিনয় করতে হবে।

বাণের দারুণ অভিজ্ঞতা। কাসিনথিউ বাণকে বারবার বলে সে এখন অভিনয় করবে। কোনও অবস্থায় বাণ যেন একটি কথাও না বলে।

কাসিনথিউ বাণের হাত ধরে, গোবেচারা মুখে জুয়ার আড্ডার সামনে এসে দাঁড়ায়। আখগুল, জনৈক মধ্যবয়স্কের সাথে সৌভাগ্য নিয়ে কথা বলছে। বাণ প্রথম সন্ধ্যায় এই বক্তৃতা খেয়েছিল।

বাণ এবং কাসিনথিউ, আড্ডার সামনে যেতে না যেতে আখগুল বাণের দিকে তাকিয়ে সৌভাগ্য বিষয়ে বক্তৃতা শুরু করে। ভাব দেখায় যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত। মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি বাণ এবং কাসিনথিউয়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

কাসিনথিউ তার সৌভাগ্য জানতে আগ্রহী। আখগুলের কথামতো, পাঁচটি কড়ি, রং চটা কাপড়ের উপর রাখে। আখগুল, গিল-গিল-গিল শব্দ করে কাঠের পেটেরা, কাপড়ের উপর উপুড় করে রাখে। পেটেরার ভিতরের মস্ত কড়ি উপুড় হয়ে থাকলে ভাগ্য সুপ্রসন্ন।

আখগুল পেটেরা দুই হাতে তুলে ধরে। দেখা যায়, মস্ত কড়ি উপুড় হয়ে আছে। প্রমাণিত হয় কাসিনথিউ সৌভাগ্যবতী। সে পাঁচটি কড়ির স্থানে দশটি কড়ি লাভ করে। পরবর্তী গিল গিল শব্দে দশটি হয় বিশটি কড়ি।

এবার সৌভাগ্যবতী কাসিনথিউ তার বটুয়া থেকে আরো দুপণ অর্থাৎ একশত ষাটটি কড়ি কাপড়ের উপর রাখে। আবার গিল গিল শব্দে পেটেরা উপুড় হয়। সৌভাগ্যবতী এবার লাভ করে সাড়ে চারপণ অর্থাৎ তিনশত ষাটটি কড়ি।

কাসিনথিউ বাণের হাত ধরে মন্দিরের দিকে এগিয়ে যায়। ওরা দূর থেকে দেখে মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি কড়ি দিয়ে সৌভাগ্য বিচার করছে। খানিক বাদে সৌভাগ্যবাণ জুয়ার আড্ডা ছেড়ে চলে গেলে ওরা সেখানে যায়। আখগুলের মুখে হাসি ধরে না। বলে, নগদ সাতপণ লাভ করেছে।

বোকা বাণকে আখগুল মস্ত কড়ির গুপ্ত কৌশল শিখায়। মস্ত কড়ির ভিতর ছোটো ছোটো চুম্বক আঁটা আছে। স্বাভাবিকভাবে কড়ি উপুড় হয়ে থাকে। কড়িকে চিৎ করাতে হলে ঘাসের উপর পেতে রাখা রংচটা কাপড়ের তলায় চুপি চুপি একটি লোহার পাত বসিয়ে দেয়। চুম্বক এবং লোহার টানাটানিতে কড়ি চিৎ হয়ে যায়। চিৎ হলে সৌভাগ্যের সব কড়ি জব্দ হয়ে যায়।

বাণ মল্লকূটে এসে, জেঠাইমার সাথে চুম্বক রহস্য নিয়ে কথা বলে। জেঠাইমা বলেন, চুম্বক-রহস্য যেমন তেমন নয়। সেতুবন্ধাখ্য কাহিনিতে আছে স্বয়ং লক্ষ্মণকে এই নাগবাটে বন্দী করা হয়েছিল। বাণ তখন জানতে পারে অয়স্কান্ত মণি অর্থাৎ চুম্বককে কিরাতীয় ভাষায় নাগবাট বলে। জেঠাইমা বলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে, লক্ষ্মণের দেহে ছিল লোহার বর্ম। দুর্ভেদ্য বর্মের উপর অজস্র নাগবাটের তীর ছুঁড়ে দিয়ে লক্ষ্মণকে কাবু করা হয়েছিল। নাগবাটের ভারে লক্ষ্মণ পড়ে গিয়েছিলেন।

বাণ বলে, পিসিমা বলেছেন নাগা অর্থাৎ অজস্র সাপ, লক্ষ্মণকে পেঁচিয়ে বন্দী করেছিল।

জেঠাইমা বলেন, তার স্বামী জাতবেদা বলেছেন কিরাতীয় শব্দ নাগ বাট সাধারণের মুখে নাগপাশ হয়ে গেছে।

মল্লকূটের পর বাণ চন্দ্রমৌলীর শিবমন্দিরে, চন্দ্রগোমী স্বামীর গৃহে দীর্ঘ দিন কাটায়। চন্দ্রমৌলীর পর গোপ্লপল্লী গ্রামে গিয়ে লোহিতাক্ষের সাথে আড্ডা। এরপর ক্রমে চন্দ্রপুর বন্দরপুর কাটিগড়া মহাকাল কন-কলস বাসুলী অলকাপুরীতে শুধু আড্ডা - আড্ডা। এমনি উদ্দেশ্যহীন আড্ডায় তিন বছর কাটে।

* * *

আঠারো বছর বয়সে বাণ আবার চন্দ্রমৌলী শিবমন্দিরে হাজির হয়। রাতে খাবার দাবারের পর গল্পসল্প। বিছানায় বসে, চন্দ্রগোমী স্বামী। তার পাশে বসে কন্যাশ্রী। কন্যার বয়স নয়-দশ। মেঝের উপর মোড়ায় বসে চন্দ্রগোমী স্বামীর স্ত্রী এবং বাণ। তাত বাণের উপর স্ত্রীর আদেশ গল্প বলতে হবে। চন্দ্রগোমী স্বামী চণ্ডিকা মন্দিরের দ্রাবিড়ের গল্প বলতে বলেন।

গল্পের মূল শ্রোতা চন্দ্রগোমী স্বামীর কন্যাশ্রী। বাণ, প্রথমে তার হাত পা ছুঁড়ে পাগলা দ্রাবিড়ের বিকট আকৃতির একটি খসড়া খাড়া করে। শ্রী জিজ্ঞাসা করে — "তাত! কানা কেমন করে হল?" বাণ বলে — "সে একমস্ত কাণ্ড। ভীষণ এক পাজি এসে বলে তার কাছে দারুণ কাজল আছে। কাজল চোখে লাগালে সব কিছু দেখা যায়। মাটির তলায় অসুর গর্তে যেসব সোনাদানা লুকিয়ে রাখা হয়েছে, সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। সোনা দানার কথা শুনে কাজল কিনে তার চোখে লাগাল। যেই না চোখে লাগিয়েছে তখনই উফ-আফ চিৎকার করে লাফাতে লাগল। বাণ, পাগলা দ্রাবিড়ের কীভাবে লাফিয়ে ছিল তা দেখাল। শ্রীর সাথে তার মা-বাবা হাসি যোগ দিলেন। তারপর বাণ বলে - "ব্যস! এমনিভাবে দ্রাবিড়ের এক চোখ কানা হয়ে গেল।"

শ্রীর মহা উৎসাহ। তার জিজ্ঞাসা — দ্রাবিড়ের কান কীভাবে চেপ্টা হয়ে গেল? বাণ বলে — "কান? ওরে বাব্বা ! সে এক ভীষণ কাণ্ড। পাজি ছেলেরা অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে। যেই না দ্রাবিড় আসে কানের উপর দেয় মস্ত সব থাপ্পড়। দ্রাবিড় চিৎকার করে ভূত-ভূত। চীৎকার করে করে তার ঝোলা থেকে সাদা সর্ষে ভূতের দিক লক্ষ করে অন্ধকারে ছুঁড়ে দেয়। এমনি থাপ্পড় খেয়ে খেয়ে তার কান দুটি চিড়াচেপ্টা হয়ে মাথায় লেপ্‌টে গেছে।

কন্যার সাথে স্বয়ং চন্দ্রগোমী স্বামী মজে গেছেন। জিজ্ঞাসা করেন দ্রাবিড় নাকি রসায়ন অর্থাৎ পারদ দিয়ে — তন্ত্রমন্ত্র করে? বাণ বলে, দ্রাবিড় তার সাধনাগৃহে বাণকে নিয়ে গিয়েছিল। বাণ দেখেছে বেলের খোলের মস্ত দোয়াতে কালো কালি, নিমের রস এই সাথে কাঠকয়লার গুঁড়া মিশিয়ে তৈরি করেছে। তালপাতার পুঁথিতে লাল আখরে, পারদ থেকে সোনা বানানোর গুপ্ত কৌশল লেখা।

কাঁচের এবং চীনামাটির বোতলে নানা রঙের তরল পদার্থ। একটি বোতলে পারদ দিয়ে বানানো অমর হবার ঔষধ। এই ঔষধ সে খেয়েছে। কিন্তু পারদের অনুপাত ঠিক হয়নি বলে ঔষধ খেয়ে তার জ্বর এসেছে। অনেকদিন হয়ে গেছে জ্বর সারছে না। বাণ বলে, সে দ্রাবিড়ের শরীরে হাত দিয়ে দেখেছে ভীষণ উত্তাপ।

সাধনাগৃহের দেয়ালের একদিকে তার দিয়ে নির্মিত নানা বাদ্যযন্ত্র। বাণ বলে, সেই এইসব তার যন্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করতেই পাগলা দ্রাবিড় তার যন্ত্র বাজাতে শুরু করে। বিকট বাদ্যের সাথে ভীষণ গান এই সাথে নৃত্য।

গল্পে গল্পে রাত হয়ে গেছে। বাণ ঘুমাতে অন্য ঘরে যায়।

*   *   *

পরদিন ভোরে মন্দিরের পাশে রিভু পুকুরে সাঁতার কেটে স্নান করে। স্নান শেষে সন্ধ্যাহ্নিক করতে শিবমন্দিরে প্রবেশ করে।

চন্দ্রগোমী স্বামী গঙ্গাজলে শিবলিঙ্গ স্নান করিয়ে পূজা আরম্ভ করেছেন। পিছনে অঞ্জলিবদ্ধ হাতে বাণ বসে। সদ্য স্নাত মস্ত শিবলিঙ্গ চন্দ্রগোমী স্বামীর প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট হয়।

পূজা শেষে, চন্দ্রগোমী স্বামী প্রণাম করেন। অঞ্জলিবদ্ধ ধ্যানরত বাণের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় — "প্রণম্য দেবং শশিশেখরং প্রিয়ং পিনাকিনং ভস্মক নৌর্বিভূষিতং।"

বাণের কণ্ঠে, স্বপ্নের ঘোরে যেন মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছিল। চন্দ্রগোমী স্বামীর সাথে, চোখাচোখি হতেই থেমে গেল।

চন্দ্রগোমী স্বামী বলেন — "বাণ! তোমার ভাষায় আমার শশিশেখরকে প্রত্যক্ষ করছি। আরো বলো ! বাণ! আবার বলো।"

বাণের অনুভূতিতে পিনাকপানি প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। অঞ্জলিবদ্ধ হাত। ধ্যানমগ্ন চোখ। বাণের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়।

"নম স্তুঙ্গ শিরশ্চুম্বি চন্দ্র চামর চারবে।

ত্রৈলোক্য নগরারম্ভ মূল স্তম্ভায় শম্ভবে।"

বিস্মিত চন্দ্রগোমী স্বামী বলেন — "বাণ! এত সুসংবদ্ধ শিবস্তুতি, আমি কোথাও পাইনি। তুমি কোথায় পেয়েছ? বাণ লজ্জা পায়। বলে — "এইমাত্র মনে হয়েছে। আপনা আপনি উচ্চারিত হয়েছে। চন্দ্রগোমী স্বামী বলেন "বাণ! আবার বল।, মেঝেতে এখনই বেলপাতার রস দিয়ে লিখে রাখব। তারপর তালপাতার পুঁথিতে টুকে নেব। বাণ! এই মুহূর্ত একটি সুফলা মুহূর্ত। চন্দ্রশেখর স্বয়ং তাঁর কথা তোমার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন।"

চন্দ্রগোমী স্বামী মন্দিরের মেঝের উপর বেলপাতা দিয়ে বাণের সৃষ্ট শিবস্তুতি লিখে রাখেন।

ভাবাবেগবিহ্বল চন্দ্রগোমী বলেন — "বাণ! তোমার মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনার বীজ আমি লক্ষ করছি। চন্দ্রমৌলির এই দেবতা তোমার মন্ত্রের মধ্যে তাঁর সম্পূর্ণ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ নিয়ে রূপ নিয়েছেন। তুমি উচ্চারণ করেছ — "শিরশ্চুম্বিচন্দ্রচামর" সাধারণ অর্থ, যার শিরে চন্দ্র। কিন্তু অন্যদিকে, আমরা যেখানে এখন আছি তার পূর্ব দিকে চন্দ্রপুর পাহাড় এবং আমাদের এই স্থানের নাম চন্দ্রমৌলী। দুটি চন্দ্রযুক্ত স্থান আশ্চর্য সুন্দর হয়ে মন্ত্রে রূপায়িত হয়েছে। এই মন্ত্রে তুমি উচ্চারণ করেছ — "ত্রৈলোক্য নগরারম্ভ মূল স্তম্ভায়।" মহাদেব স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল তিন লোকের আদি স্তম্ভ। অন্যদিকে, এই মন্দির ত্রৈলক্য দেশের উত্তর সীমান্তের প্রথম স্তম্ভ। লোকমুখে এই

দেশের নাম ত্রিপুর। ত্রিপুর দেশকে আশ্চর্য সুন্দরভাবে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের বিশাল চিত্রকল্পে মিলিয়ে দিয়েছ। বাণ! তোমার এই ভাষা, সংস্কৃত সাহিত্য নূতন উপলব্ধির জন্ম দেবে। তোমার ভাষার প্রতিটি শব্দ নিত্যনতুন ব্যাখ্যায় নব নব দিগন্তের উন্মোচন করবে।"

অভিভূত বাণ চন্দ্রমৌলীর শিবলিঙ্গ এরপর চন্দ্রগোমী স্বামীকে প্রণাম করে। চন্দ্রগোমী স্বামী মন্দির থেকে চলে যাবার পর বাণ শিবলিঙ্গের সম্মুখে উপবেশন করে। বাণ উপলব্ধি করে — এই স্থান এই মন্দির এই স্থাণুদেবতার সাথে তার যেন অনন্তকালের সম্পর্ক। স্তব্ধ বিস্ময়ের বাণ, তন্ময় হয়ে লিঙ্গ দেবতার কারুকার্য লক্ষ করে।

আশ্চর্য সুন্দর কৌশলে লিঙ্গদেবতা প্রতিষ্ঠিত। লিঙ্গের ভিত্তি, মন্দিরের মেঝের উপর স্থাপিত। মস্ত কলসের উপর দিকের অর্দ্ধাংশের মত ভিত্তির আকৃতি। ভিত্তি প্রস্তরের উর্দ্ধাংশের, কলসের গলার মত অংশের মুখে বৃহৎ প্রদীপের মত একটি গৌরীপাত। গৌরীপাতের মধ্যে স্থাপিত কৃষ্ণপ্রস্তরের শিবলিঙ্গ। পাণ্ডু-শ্বেত বর্ণের গৌরীপাত সূক্ষ্ম কারুকার্যে অলঙ্কৃত।

লিঙ্গের গঠনশৈলী বিস্ময়কর। ভিত্তি গৌরীপাত লিঙ্গ সবকিছু সামনা থেকে দেখে মনে হয় সম্পূর্ণ এবং স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গদেবতা সম্পূর্ণ বস্তুর অর্দ্ধাংশ মাত্র। শিল্পচাতুর্যের আশ্চর্য নিদর্শন। লিঙ্গদেবতার পিছন দিক মণি-মাণিক্য গাঁথা দেয়ালের সাথে সম্পূর্ণ সাঁটা। লিঙ্গের পিছন দিক দেখার উপায় নেই। মনে হয়, যেন সম্পূর্ণ লিঙ্গদেবতা নির্মাণ করে মস্ত এক পাথর কাটার করাত দিয়ে সম্পূর্ণ বস্তুটিকে উপর থেকে তলা পর্যন্ত চিড়ে ফেলে, একটি মাত্র অংশ দেয়ালে সেঁটে রাখা হয়েছে।

লিঙ্গদেবতার পিছনের অংশ দেয়ালে সাঁটা, তাই দেবতার পিছন দিক দেখার উপায় নেই। দেবতাকে সম্পূর্ণ পরিক্রমার পথ বন্ধ। এমনি পরিবেশে বাণের মনে হয় শিবের 'স্থাণু' নাম সার্থক।

* * *

চন্দ্রগোমী স্বামীর বাড়ীতে আবার বিগত রাতের মতো বাণের আড্ডা। চন্দ্রগোমী স্বামীর কন্যা শ্রীর আদেশ গল্প। বাণকে দ্রাবিড়ের গল্প বলতে হবে।

বাণ শুরু করে — 'এক সকালে ফুল তুলতে বের হয়েছে। তখনো অন্ধকার। মন্দিরের পিছন দিকে গিয়ে গিয়ে চণ্ডিকা অরণ্যের কাছাকাছি পৌঁছে দেখে গাছের তলায় কালো কী একটা পড়ে আছে। হাত দিয়ে বুঝে কম্বল। ভেড়ার লোমের কম্বল। খুব আনন্দ। ভাবে আম্মা কু-কামাইখা দয়া করেছেন। টেনে তুলতে গিয়ে দেখে মস্ত ভারী। হঠাৎ কম্বল তাকে জড়িয়ে ধরে। সে কম্বল ছাড়াতে চায় কিন্তু কম্বল তাকে ছাড়ে না। কম্বল যখন তাকে ছাড়ল তখন তারা সারা শরীরে রক্ত। এই কম্বল কিন্তু কম্বল নয়। মস্ত ভালুক। ভাল্লুকের নখের দাগে তার শরীরে মুখে নক্সা কাটা।'

শ্রী খুশি। চন্দ্রগোমী স্বামী এই সাথে তার স্ত্রীর মুখে হাসি। দ্রাবিড়কে, অন্য আর জানোয়ার কামড়িয়েছে কিনা শ্রীর জিজ্ঞাসা।

বাণ, চোখে মুখে দারুণ ভাবসাব প্রকাশ করে বলে — "কামড়ায়নি আবার? একবার ওষুধ

তৈরির জন্য মধুর দরকার। মৌচাক কোথা আছে তার ঠিকানা জানে না। সে দারুণ বুদ্ধি করে চুপ করে একটা লাল রঙের ফুলের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। ভোঁ করে মৌমাছি এল। চুক্ চুক্ করে মধু খেল। মধু খেয়ে উড়তে শুরু করল। মৌমাছির পিছনে পিছনে সে ছুটল। জঙ্গল টঙ্গল পার হয়ে হয়ে পেয়ে গেল মৌমাছির ঘরবাড়ী। মৌমাছির বাড়ীতে হাত ঢুকিয়ে দিল।

বাণের কথা শেষ হতে না হতেই শ্রী বলে উঠে "হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মৌমাছি তাকে খেয়ে ফেলে।" বাণ বলে, "না! তাকে একেবারে খায়নি' তবে এমন কামড় দিয়েছে সে মাটির উপর লম্বা হয়ে পড়ে গেছে আর হাজার হাজার মৌমাছি তার গায়ে কামড় দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

অনেক কৃষ্ণসর্প তাকে কতবার কামড়িয়েছে। যেখানে সেখানে নোংরা আবর্জনায় শুয়ে পড়ত; তখন কামড় খেত।

* * *

এমনিভাবে রসে বসে চন্দ্রগোমী স্বামীর বাড়ীতে অনেকদিন আড্ডা দিল। এরপর চৈত্রের প্রথম দিকে একদিন দুপুরে লোহিতাক্ষের গোপ্পপলী বাড়ীতে হাজির হল।

গোপ্পপলীতে তখন পূর্ণ বসন্ত। চ্যূতপুষ্পের সাথে কোকিলের কুহু, বাসন্তী বাতাস। এই সাথে বাণের উপস্থিতি। সব মিলে লোহিতাক্ষের বাড়ী পরমরমণীয় হয়ে উঠে। বাণ যেন বসন্তের আনন্দের দূত। লোহিতাক্ষ জড়িয়ে ধরে। শ্রীগোপাল তার সদর দপ্তর থেকে ফাঁকি দিয়ে বাড়িতে হাজির হন। বাণকে কেন্দ্র করে শ্রীগোপাল, লোহিতাক্ষ ও লোহিতাক্ষের মা-বোন দাঁড়িয়ে। সকলের অভিমান অভিযোগ, বাণ এতদিন কোথায় ছিল? কেন খবর দেয়নি। কেন আসেনি।

রাতে লোহিতাক্ষদের মস্ত উঠানে বেতের কেদারায় বসে আড্ডা জমে। আড্ডার আলোক সম্পাতে মস্ত বাসন্তী চাঁদ। পরিবেশ সঙ্গীতে ঝিল্লি এই সাথে রাতজাগা পাখির গান। রূপসজ্জায়-বাসন্তী প্রকৃতি। এই সাথে পরিপূর্ণতায় বাসন্তী বাতাসে মধুগন্ধী ফুলের সুবাস। আড্ডা আড্ডা আড্ডা। গভীর রাত পর্যন্ত আড্ডা।

পরদিন সকাল বেলা বাণ সদর দপ্তরে গিয়ে, তাম্রচূড়ের বন্ধু হরদত্তের সাথে দেখা করে। প্রিয়দর্শন সহজ সরল হর দত্তকে বাণের ভালো লাগে। হরদত্ত সদর গোপদপ্তরের একজন কায়স্থ। এই অঞ্চলের নানা দান করা ভূমির সাধারণ খবরাখবর মাপজোক ইত্যাদি বিষয়াদির দেখাশোনা করে।

কথাপ্রসঙ্গে বাণ চন্দ্রমৌলী শিবমন্দির এই সাথে 'অগ্রহার' প্রথা সম্পর্কে কিছু জানতে আগ্রহ প্রকাশ করে। হরদত্ত বিনীতভাবে বলে, সে, এ বিষয় সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না। দানভূমির বিস্তারিত তথ্যাদি সম্পর্কে শ্রীক্ষিকুণ্ড এবং শ্রীগোপাল বিশেষ অভিজ্ঞ।

বাণ সন্ধ্যায় শ্রীগোপালের কাছে চন্দ্রমৌলী শিবস্থান এবং অগ্রহার প্রথা সম্পর্কে কিছু জানতে আগ্রহ প্রকাশ করে।

শ্রীগোপাল বলেন, প্রায় সোয়াশ বছর আগে গুপ্ত বংশের বিখ্যাত মহারাজা বুধগুপ্তের

কালে চন্দ্রমৌলী শিবমন্দির পশ্চিম দিকে অবস্থিত দেবী কোকা মুখের মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রিভুপাল।

বাণ, প্রসঙ্গত কোকামুখ মন্দির এবং রিভুপাল বিষয়ে শ্রীক্ষিকুণ্ডের সাথে তার আলাপ আলোচনা এবং শ্রীক্ষিকুণ্ডের বক্তব্য শ্রীগোপালকে বলে।

শ্রীগোপাল বলেন, রিভুপাল ছিলেন অগ্রহারের একজন বিশিষ্ট সদস্য। তিনি, গুপ্ত বংশের দুজন রাজার প্রায় পঞ্চাশ বছর দীর্ঘ সময়কালে এক নাগাড়ে অগ্রহার সদস্য ছিলেন।

বাণ, রাজাদের নাম জিজ্ঞাসা করলে শ্রীগোপাল বলেন, প্রথম রাজার নাম বুধগুপ্ত। দ্বিতীয় রাজার নাম বলতে গিয়ে বলেন, এই মুহূর্ত্তে তার ঠিক মনে পড়ছে না।

শ্রীগোপাল এই প্রসঙ্গে বলেন, রিভুপালের দীর্ঘ সময়কালে অগ্রহারের পঞ্চপ্রধান অর্থাৎ বিষয়পতি প্রথম জনের নাম ছিল শন্দক। দ্বিতীয় জনের নাস্বয়ম্ভুদেব।

শ্রীগোপাল বলেন, অগ্রহার প্রথা মূলত গ্রীক আদর্শে গঠিত। গ্রীসে অনেককাল থেকে, এমনি পঞ্চপ্রধানের তত্ত্বাবধানে শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। গ্রীস দেশে এর নাম ছিল 'অগ্রনোমী'। গুপ্ত রাজাদের শাসনকালের বহু পূর্বে এদেশে পঞ্চপ্রধানের শাসন প্রণালী প্রচলিত হয়েছিল। গ্রীক নাম "অগ্রনোমী" অনুসরণে এদেশে নাম হয়েছে 'অগ্রহার'।

বাণ বলে, চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমে গ্রীক অধ্যাপক অগস্তি বলেছেন, খ্রিষ্ট-পূর্ব কাল থেকে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে পূর্বভারতীয় অঞ্চলে গ্রীক সভ্যতা সংস্কৃতি প্রচলিত হয়েছে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়কালে মেগাস্থিনিস এবং অন্যান্য গ্রীক নাবিক বণিকগণও পূর্ব ভারতের বহু স্থানের নামকরণ এবং রীতিনীতির প্রচলন করেছেন। লোহিতাক্ষ আলোচনায় যোগ দিয়ে বলে, বুধগুপ্তের দানপত্রে, পঞ্চপ্রধানের নাম আছে। প্রধান ব্যবসায়ী স্বয়ং রিভু পাল। ঘোড়া-গাড়ী-নৌকা এসব যানবাহনের অধিকর্তা বসুমিত্র। ঘরবাড়ী মন্দির নানা দেবস্থান এসবের কর্তা হরদত্ত। রাজকীয় কাজকর্মের লেখালেখির কর্তা বিপ্রপাল। পঞ্চম জনের নাম শন্দক। শন্দক, পঞ্চজন প্রধান বিষয়পতি।

শ্রীগোপাল বলেন, বিষয়ের নাম হচ্ছে কোটিবর্ষ। কোটিবর্ষ বিষয় ছিল, পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত।

বাণ, পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির রাজার নাম জিজ্ঞাসা করে। শ্রীগোপাল বলেন, পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি ছিল মহারাজা বুধগুপ্তের রাজ্যের অন্তর্গত। বুধগুপ্তের অধীনে পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির শাসনকার্য পরিচালনা করতেন রাজা জয় দত্ত।

বাণ রাজকীয় দানপত্র কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করলে লোহিতাক্ষ বলে এসব রাজকীয় তাম্রপত্র, চন্দ্রমৌলী শিবমন্দিরের পাশে মন্দিরের ভাড়ার দালানের একটি কুলুপ আঁটা প্রকোষ্ঠে রক্ষিত আছে।

দানপত্রের তামার পাত প্রসঙ্গে লোহিতাক্ষ বলে তারা যে করণ্ডীপোত তৈরি করছে, সেখানে এমনি ধরনের বিশুদ্ধ তামা ব্যবহার করছে। সমুদ্রগামী সুবৃহৎ জাহাজকে করণ্ডীপোত বলা হয়।

লোহিতাক্ষের করণ্ডীপোত এবং বিদেশ বাণিজ্য প্রসঙ্গে বাণ লোহিতাক্ষকে জিজ্ঞাসা করে

সত্যিই কি সে গ্রীসদেশে বাণিজ্য করতে যাচ্ছে? লোহিতাক্ষ বলে, বিদেশ বাণিজ্য মূলত দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করছে। প্রথমত করগুীপোত নির্মাণ যদি সময়মতো শেষ হয়। দ্বিতীয়ত কাটিগড়া মেলায় যদি রপ্তানি করার মত উপযুক্ত জিনিসপত্র পাওয়া যায়।

শ্রীগোপাল বাণকে বলেন, যদি সম্ভব হয় তাহলে বাণ যেন কাটিগড়ার গঙ্গাসাগর মেলায় লোহিতাক্ষের সাথে থাকে।

বাণ এক কথায় রাজি।

অশোকাষ্টমী থেকে মেশা শুরু হবে। সাতদিন পর অশোকাষ্টমী।

* * *

বাণ এবং লোহিতাক্ষের আগে লোহিতাক্ষের সুবিশাল নৌবহর কাটিগড়ায় পৌছায়। মেলা বরাক নদীর উত্তর তীরে। বরাকে মস্ত চর জেগে উঠেছে।

বাণ এবং লোহিতাক্ষ অশোকাষ্টমীর ভোরে কাটিগড়া অঞ্চলে পৌছায়। হাজার হাজার ভক্ত সিদ্ধেশ্বর তীর্থে স্নান করছে। লোহিতাক্ষ বলে, এই সিদ্ধেশ্বর তীর্থে দুদিন আগে অশোকাষষ্ঠী তিথি থেকে স্নান আরম্ভ হয়ে গেছে। তবে পুণ্যস্নানের মোক্ষম লগ্ন এই অশোকাষ্টমী।

কাটিগড়া বন্দর তথা মেলার দক্ষিণে বরাকের অন্য তীরে সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির। বরাকের দক্ষিণ তীর সিদ্ধেশ্বর মন্দিরাদি অঞ্চল রাজা জয়নাগের রাজ্যের উত্তরে সীমা। অন্যদিকে, বরাক উত্তর তীরের কাটিগড়া বন্দরাদি অঞ্চল আদ্য রাজা ভাস্কর বর্মনের রাজ্যের দক্ষিণসীমা।

কাটিগড়া বন্দরের উত্তর দিকের একটি ছোটো টিলার উপর বাণ এবং লোহিতাক্ষের দুটি আলাদা তাঁবু। বাণ দুপুরে খাবার দাবারের মেলা দেখতে বের হয়। সূর্য মাথার উপর। ভক্তরা পুণ্য স্নান করছে। বরাকের পূর্ব-পশ্চিম থেকে মালপত্র নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে নৌকা আসছে। কালিন্দি নদী বেয়ে দক্ষিণ থেকে মালপত্র বোঝাই নৌকা সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের সামান্য পূর্ব দিকে বরাকে এসে নামছে।

বাণ এই মেলার কথা অনেক শুনেছে কিন্তু মেলা দেখেনি। চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমের গ্রীক অধ্যাপক বলেছেন, এই মেলা একটি প্রাচীনতম মেলা। অন্তত পাঁচশত বছর আগে গ্রীক নাবিকগণ এই মেলায় এসেছিলেন। জনৈক গ্রীক বণিক তার ভ্রমণ কাহিনিতে ভারতবর্ষের অন্যান্য নানা তথ্যের সাথে কাটিগড়ার মেলার কথা উল্লেখ করেছেন। ভ্রমণ কাহিনিতে লিখিত হয়েছে, 'কাটিগড়া' পৃথিবীর পূর্ব দিকের সর্বশেষ বন্দর। কাটিগড়ার পর সমুদ্র সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে।

অধ্যাপক অগস্তি বলেছেন, তিনি অজ্ঞাতনামা এই গ্রীক বণিকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করেছেন। পূর্ব ভারতীয় এই চন্দ্রপুরে অঞ্চলে, তার আগমনের মূল কারণ এই ভ্রমণকাহিনি গ্রন্থ।

বাণ অদম্য কৌতূহল নিয়ে মেলার ভিড়ে প্রবেশ করে। নানা ধরনের দোকান হাট। বিচিত্র সব মানুষ। বাণ অদ্ভুত দর্শনের কিছু নরনারীকে দেখে। ইতিপূর্বে, এমনি ধরনের আকার আকৃতির নরনারী চোখে পড়েনি। সুবিশাল দেহ। লম্বা চুল, চাপা নাক, কুত কুতে চোখ। হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত কম্বল কেটে পট্টি বাঁধা। মস্ত মস্ত মোটা চামড়ার জুতা। বাঁশের খুঁটির উপর ছনের ছাপটা

বসিয়ে দোকান বানিয়েছে। বসেছে এবং এই সাথে মালপত্র রেখেছে মুথা ঘাসের চাটির উপর।

দোকানে মালপত্রের সাথে নারী, পুরুষ এবং শিশুরা বসে আছে। নারী পুরুষের সাজগোজ একই ধরনের। বাণ, তীক্ষ্ণভাবে চেয়ে লক্ষ্য করে — পুরুষদের তুলনায় নারীদের দেহের আকৃতি সামান্য ছোটো। অন্যদিকে, পুরুষদের লম্বাটে মুখমণ্ডলের চিবুকে দুএকগাছি গোঁফ। বাণের সাথে যখনই এদের চোখাচোখি হয় ওরা চোখে মুখে ঠোঁটে মিষ্টি হাসিসহ নমস্কার করে।

বাণ জিজ্ঞাসা করে জেনেছে মেলার লোকেরা এদের 'শেঠাই' বলে। কাটিগড়ার এই মেলার শেঠাইগণ উত্তর এবং পূর্বদিকের বহু দূরের পাহাড় থেকে প্রতিবছর আসে। ধূপ চন্দনকাঠ হরিণ বাঘের চামড়া ধনেশ পাখির পাখা-ঠোঁট হাতির দাঁত নানা ধরনের পশুর চর্বি ঔষধি লতাপাতা মূল এবং নানা ধরনের জীবন্ত পাখি নিয়ে আসে। সপরিবারে মুথা ঘাসের চাটি পেঁচিয়ে মালপত্র পিঠে বয়ে আনে। সপরিবারে — মাসখানেক থাকে। মেলা শেষে, ফিরে যাবার কালে লবণ এই সাথে বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং শৌখিন জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যায়।

চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমের অন্ধমুণি অগস্তি বলেছেন, তিনি অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিকের ভ্রমণ কাহিনিতে পড়েছেন মেলার কাছাকাছি বরাক নদীর দক্ষিণের সিনাই অঞ্চলে এবং বরাকের উত্তরের সেরিস অঞ্চলে মুথাঘাস ছিল না। শেঠাইগণ বহুদূর থেকে মুথাঘাস চিড়ে পাটি বানিয়ে মালপত্র পেঁচিয়ে নিয়ে আসত। মেলায় এসে এসব পাটির উপর সপরিবারে বসত ঘুমাতে এবং মালপত্র সাজিয়ে ব্যবসা করত। মেলা শেষ হলে পাটিগুলি ফেলে দিত। অন্যদিকে, মেলা অঞ্চলের স্থানীয় লোকেরা চুপি চুপি অপেক্ষা করত শেঠাইগণ কখন এগুলি ফেলে দেবে। যেই না ফেলে দিত তখনই স্থানীয় লোকেরা এগুলি দখল করে নিত।

বাণ অগস্তিকে তখন জিজ্ঞাসা করেছিল এসব পাটি দিয়ে স্থানীয় লোকেরা কী করত?

উত্তরে, অগস্তি বলেছিলেন, স্থানীয় লোকেরা মুথাঘাসের বেত দিয়ে ছোটো বড়ো মাঝারি গোল এবং লম্বাটে নানা ধরনের ঝুড়ি তৈরি করত। ঝুড়িতে তাম্বুলপত্র ঢুকিয়ে দূর-দূরান্তে রপ্তানি করত।

পরবর্তীকালে দুর্গম স্থান থেকে মুথাঘাসের চারা পাচার হয়ে এদেশে আসে। এদেশের ভূমি এবং জলবায়ুর পরিবেশে, ফলন দারুণ হয়। মুথাঘাস দিয়ে নানা ধরনের জিনিসপত্র তৈরি হতে থাকে। শত সহস্র সূক্ষ্ম চাটি পাটি নানা ধরনের শৌখিন ঝুড়ি বটুয়া আসন দেশ বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। বর্তমানকালে চন্দ্রপুরের শীতলপাটি জগৎ-বিখ্যাত হয়ে উঠেছে।

* * *

বাণ দুদিন পর বরাক পার হয়ে দক্ষিণ তীরের সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দিরে যায়। মন্দিরের পিছনে উত্তর দিকে বরাকের জলরাশি। দক্ষিণে অনুচ্চ ঘন সবুজ পাহাড়। বাণ, ঝোলানো ঘন্টা বাজিয়ে প্রবেশ করে মৃদু কণ্ঠে শিবস্তুতি আবৃত্তি করে। পূজা বন্ধ করে পুরোহিত বাণের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

ধ্যানমন্ত্র শেষ হলে পুরোহিত বাণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বাণ সংক্ষেপে জবাব দেয় সে একজন তীর্থযাত্রী।

বাণ মন্দির থেকে বের হয়। সবদিকে মানুষের ভিড়। দলে দলে, নদীপার হয়ে মেলায় যাচ্ছে। বাণ নদীর তীর ধরে পশ্চিমে কিছু এগিয়ে দেখে বরাকের জল ছুঁয়ে আছে মস্ত দুর্গ। পাথরের উঁচু দেয়ালে ঘেরা। পাথরের দেয়ালে গোল গোল গর্ত। গর্ত দেখে সহজেই বুঝা যায় এসব গর্ত দিয়ে সৈনিকরা, দুর্গের ভিতর থেকে তীর বর্ষা ছুঁড়ে মারে।

বাণ, দুর্গের দক্ষিণ দিকের লোহার ফটকের সামনে গিয়ে দেখে দুর্গের ভিতরে এবং বাইরে রাজা জয়নাগের সৈনিকরা অস্ত্র-সস্ত্রসহ প্রস্তুত হয়ে আছে। রাজা জয়নাগের ভয় মেলার হৈ হট্টগোলের সুযোগ নিয়ে ভাস্কর বর্মন যদি আক্রমণ করেন ?

বছর দুই আগে সুপ্রতিষ্ঠিত বর্মনের মৃত্যুর পর ছোটো ভাই ভাস্কর বর্মন প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা হয়েছেন। রাজা হয়ে কাছাকাছি ছোটো বড়ো রাজ্য দখল করে শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন। রাজা জয়নাগের আতঙ্ক ভাস্কর বর্মন যদি জয়নাগের বেদখল করা কামরূপ অঞ্চল আক্রমণ করে বসেন।

বাণ দুর্গের দক্ষিণ দিকে অনুচ্চ পাহাড়ি পথ ধরে কিছু এগিয়ে মস্ত বিলের তীরে পৌছায়। তীরে কিছু কুঁড়েঘর। কুঁড়েঘরের আশেপাশে মাছ ধরার জাল শুকাচ্ছে।

কুঁড়েঘরের আশেপাশে কিছু লোক কূপ থেকে রশি দিয়ে টেনে স্বচ্ছ স্ফটিকের মত কীসব জিনিস তুলছে। বাণ কাছে গিয়ে জানতে পারে এগুলি সৈন্ধব লবণ। এই পটি লবণের সপ। লোকেরা বলে, কাছাকাছি এমনি ধরনের আরো কূপ আছে।

বাণের মনে হয়, মেলায় শেঠাইগণ বাণকে বলেছে, ওরা যাবাব সময় অন্যান্য জিনিসেব সাথে লবণ নিয়ে যায়।

বাণ ভাবে এমনি স্ফটিকের মত লবণ সুন্দর ছোটো বড়ো আধাবে পুরে শেঠাইদের জিনিসপত্রের সাথে অদলবদল-করে ব্যবসা করা যেতে পারে। লোহিতাক্ষ এমনি সহজভাবে শেঠাইদের নানা জিনিসপত্র ক্রয় করে বিদেশে রপ্তানি করতে পারে।

সন্ধ্যায় বাণ তার পরিকল্পনার কথা বলে। পরদিন সকালে লোহিতাক্ষ বাণ এবং একজন কায়স্থকে নিয়ে কূপে হাজির হয়।

লোহিতাক্ষ এবং কায়স্থ, কূপের মালিকের সাথে, দরদাম হিসাব নিকাশ করে। হিসাব নিকাশের পর লোহিতাক্ষ কূপের মালিককে নগদ অর্থ দিয়ে ব্যবসায়ের শর্তাদি স্থির করে। স্থির হয় প্রতিদিন লোহিতাক্ষের লোক এসে লবণ নিয়ে যাবে।

লোহিতাক্ষ কাটিগড়ায় ফেরার পথে নৌকায় বাণকে বলে, এই লবণের ব্যবসায়ের লাভের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বাণকে দেওয়া হবে। বাণ বলে, সে ব্যবসা করছে না। কথার কথা মাত্র লোহিতাক্ষকে বলেছে। লোহিতাক্ষ বলে, এমনি ধরনের "কথার কথাই" হচ্ছে ব্যবসা। বাণ কোনও গুরুত্ব দেয় না।

*   *   *

বাণ সময়ে অসময়ে নদী পার হয়ে বন্দরপুরে হাজির হয়। বন্দরপুরে বরাকের তীর ধরে পূর্ব

পশ্চিমের পথ ধরে বেড়াতে যায়। একদিন সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের পূর্বদিকের পথ ধরে এগিয়ে যায়। পথ জঙ্গলের মাঝ দিয়ে পঞ্চগ্রামে গেছে। পথের বাঁদিকে, জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে বরাকের জলধারা দেখা যায়। পথে মেলার যাত্রীদের আনাগোনা।

পূর্ব দিকে এগিয়ে কালিন্দি নদীর তীরে পৌছায়। কালিন্দির বিপুল জলধারা দক্ষিণ থেকে এসে বরাকে নামছে বাণ কালিন্দি নদীর তীর থেকে আবার ফেরার পথ ধরে। খানিক পথ পার হবার পর সূর্য অস্ত যায়। ক্রমে অন্ধকার নামে।

বাণ লক্ষ করে দক্ষিণ-পূর্ব দিকের আকাশ মাঝে মাঝে হঠাৎ করে লাল হয়ে উঠছে। বাণ জনৈক পথিককে জিজ্ঞাসা করে। পথিক বলে পঞ্চগ্রামের পাহাড়ে মাঝে মাঝে ভীষণ আগুনের শিখা লাফিয়ে ওঠে। ইন্ধনহীন আগুন। এই পাহাড় মস্ত এক তীর্থ স্থান। এই পাহাড়ে গিয়ে এক রাত্রি উপবাস করে বাস করলে একটি নরবলি প্রদানের মত মহাপুণ্য লাভ হয়

জংলি পথের বাঁকে বাণ একজনের মুখোমুখি হয়। ইতিমধ্যে কৃষ্ণ-দ্বিতীয়ার ঝকঝকে চাঁদ পুব আকাশে উদিত হয়েছে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে আসা আলো-ছায়ায় লোকটিকে অস্পষ্ট দেখা যায়। মুখে গোঁফ-দাড়ি। লম্বা চুল কাঁধের উপর পড়ছে।

প্রথম দর্শনে বাণ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। লোকটি জোড় হাতে নমস্কার জানিয়ে শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় বলে, সে বাণের সাথে একটু কথা বলতে চায়। শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা এবং অমায়িক কণ্ঠ শুনে বাণের ভয় কাটে।

বাণ প্রতিনমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞাসা করে কী কথা তিনি বলতে চান? লোকটি বিনীতভাবে বলে বাণ যদি তার সাথে একটু এগিয়ে আসেন তাহলে তিনি কৃতজ্ঞ থাকবেন।

বাণ সন্ন্যাসীবেশধারী লোকটিকে অনুসরণ করে পথের দক্ষিণ দিকে জঙ্গলের ভিতর ঢোকে। জঙ্গলের মাঝ দিয়ে খানিক এগিয়ে প্রদীপের আলো দেখা যায়। প্রদীপের সামনে পৌঁছে, বাণের শরীর আতঙ্কে কাঁপতে থাকে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। বাণ ডান হাতে পৈতা জড়িয়ে গায়ত্রী মন্ত্র জপতে থাকে। গায়ত্রী মন্ত্র জপে জপে, উপলব্ধি করে এই ভীষণ ক্ষণে সাহসের একান্ত প্রয়োজন। ভয় পেলে মৃত্যু অনিবার্য।

বাণের সম্মুখে ঘাসের উপর রাখা মস্ত কলাপাতার একধারে জ্বলন্ত প্রদীপ। বাতাসে প্রদীপ শিখা কাঁপছে। কম্পিত প্রদীপের আলোকে দেখা যায় সবুজ কলাপাতার উপর মানুষের কাটা হাত পা মাথা। কলাপাতায় চাপ চাপ রক্ত।

প্রদীপের আলোকে লোকটির অবয়ব স্পষ্ট হয়। খাটো শরীর। লম্বা ঘনকৃষ্ণ চুল দাড়ি গোঁফ। গায়ের রং কালো। কপালে গোলাকৃতি মস্ত সিঁদুরের ফোটা। গলা এবং বাহুতে রুদ্রাক্ষ মালা। লাল রঙের ধুতি চাদর।

লোকটি জোড়হাতে বলে দিন কতক ধরে সে বাণকে লক্ষ করছে। তার ধারণা বাণ উচ্চশিক্ষিত এবং ধনী। সে করুণভাবে বাণের দয়া ভিক্ষা করে।

লোকটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা এবং বিনয়ের সাথে বাণের কাছে নিবেদন করে তার গুরুদেব ভৈরবাচার্যের আকাঙ্ক্ষা, মহাশক্তির পূর্ণপূজা সাঙ্গ করে দেবীর অখণ্ড আশীর্বাদ লাভ করা। পূর্ণ পূজার পুণ্যলগ্নে একটি মনঃশিলার একান্ত প্রয়োজন। পূর্ণ পূজায় মহাদেবীর উদ্দেশে একটি মনঃশিলা উৎসর্গ করতে হয়। মনঃশিলা উৎসর্গ না করে পূর্ণ পূজার মহাআশীর্বাদ লাভ হয় না।

লোকটি কিছুক্ষণ নীরবে বাণের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর ভাষা বিনয় এবং ব্যবহারে বাণের ভয় কেটে গেছে।

লোকটি বলে মনঃশিলা ভীষণ দামী মণি। এত দাম দিয়ে মণি ক্রয় করা গুরুদেব ভৈরবাচার্যের পক্ষে সম্ভব নয়।

বাণ লক্ষ করে লোকটির চোখ বেয়ে অশ্রু নামছে। বাণ মণি কোথায় পাওয়া যায় জিজ্ঞাসা করে। উত্তরে লোকটি বলে, শৈঠাইগণ বহুদূরের পাহাড় পর্বত থেকে মাঝে মাঝে নিয়ে আসে। কাটিগড়া মেলায় এবারো মনঃশিলা মণি এনেছে। কিন্তু ভীষণ দাম। অনেক অনেক অর্থের প্রয়োজন।

বাণ মনঃশিলা — পূর্ণ পূজা এ নিয়ে দুচারটি কথা বলে। লোকটি বলে, সে দীন শিষ্য রূপে গুরুদেবের সেবা করার প্রয়াস করছে। মনঃশিলা ক্রয় করার জন্য, মহামাংস বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করছে।

লোকটি কলাপাতার উপর মানুষের রক্তাক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিয়ে বলে সে এই মহামাংস আঠারো বছরের এক তরুণকে শাস্ত্রসম্মতভাবে বলি দিয়ে সংগ্রহ করেছে। সর্ব সুলক্ষণ যুক্ত তরুণের কাটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এই মহামাংস।

এই মহামাংস কিনে কী করবে — বাণ জিজ্ঞাসা করে। বাণের প্রশ্নে লোকটি বিস্মিত হয়ে বলে, মহামাংস কিনে মহাশক্তি ভক্তবৃন্দ যা করে বাণ তাই করবে। অর্থাৎ আহার করবে। মহামাংসের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রসাদ নরদেহের হৃদয় অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডটি। যকৃত ভক্ষণ করলে অনন্ত পুণ্য হৃপিণ্ডটি এখনো আছে। বিক্রি হয়নি, দিতে পারে। তবে অন্যান্য অঙ্গের মহাপ্রসাদ অপেক্ষা এর মূল্য কিঞ্চিত বেশি।

বাণের মনে পড়ে, লোক মুখে শুনেছে কুতকুট্ট মন্দিরে করালী কাপালিক আচার শুরু করেছে। মদ্য মাংস নারী সহযোগে তন্ত্রাচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তবে কি সেখানেও মহামাংস ভক্ষণের প্রথা প্রচলিত হয়ে গেছে?

বাণ বলে, তার মহামাংসের প্রয়োজন নেই। তবে সে কিছু অর্থ দিতে পারে। বাণ কাটিগড়া বন্দরে তার আস্তানার বর্ণনা করে ঠিকানা দেয়। লোকটিকে বলে, আগামী ভোরে সে যেন বাণের আস্তানায় গিয়ে কিছু অর্থ নিয়ে আসে।

বাণ রওয়ানা হলে লোকটি বলে, সে বাণকে বৃহৎকুট্ট ঘাট পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে। বাণ 'বৃহৎকুট্টের' অর্থ জানতে চাইলে সে বলে, বরাকের তীরের বড়ো দুর্গটিকে বৃহৎ কুট্ট বলা হয়।

লোকটি বাণের সাথে কয়েক পা এগিয়ে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। বলে, সে বৃহৎকুট্ট পর্যন্ত যেতে পারবে না। শিয়াল, কুকুর মহাপ্রসাদ অপবিত্র করে ফেলতে পারে।

বাণ একা ঘাটের দিকে এগিয়ে যায়।

লোকটি পরদিন ভোরে বাণের আস্তানায় হাজির হয়। বাণ মনঃশিলার মূল্য জিজ্ঞাসা করে এবং একটি মনঃশিলার সম্পূর্ণ মূল্য প্রদান করে।

*   *   *

মেলার বেশ কতদিন হয়ে গেছে। লোহিতাক্ষ এক বিকালে সেজেগুজে বাণের তাঁবুতে হাজির হয়ে বাণকে তাড়া দেয়। এখনই বন্দরপুরে যেতে হবে। বাণ প্রস্তুত হয়। দুজন ছিপনৌকায় বন্দরপুরের দিকে যাত্রা করে। লোহিতাক্ষ বলে, তারা এখন নাটক দেখতে যাচ্ছে। বন্দরপুরে অলকাপুরী নাট্যগোষ্ঠী নাটক মঞ্চস্থ করবে। নাটকের নাম শকুন্তলা। লেখক কালিদাস।

বাণ অলকাপুরী নাট্যগোষ্ঠীর নাম শুনেছে। বরাক নদীর দক্ষিণ তীরে পঞ্চ গ্রামের দুচার ক্রোশ দক্ষিণে অলকাপুরী। অলকাপুরী গন্ধর্ব বণিকদের বিখ্যাত নগরী।

লোহিতাক্ষের কথায় প্রকাশ পায় বিখ্যাত অলকাপুরী নাট্যগোষ্ঠীকে খরচপত্র দিয়ে বন্দরপুরে নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা করেছেন বণিক গুহনদীন। গুহনদীন তার ব্যবসা বাণিজ্যের নানা সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য স্থানীয় জনসাধারণের উপর ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

নাটক বিষয়ক কথা বার্তায় গুহনদীনের আচার-আচরণ সম্পর্কে লোহিতাক্ষের ক্ষোভ, বাণের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

বাণ কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ গ্রন্থের বিষয়াদি সম্পর্কে সাধারণ আলোচনার পর বলে লোহিতাক্ষ ইচ্ছা করলে অতি সহজেই এমনি ধরনের নাটকাদি মঞ্চস্থ করতে পারে।

লোহিতাক্ষ সংক্ষেপে "তা অবশ্য করা যেতে পারে।" এই বলে গভীর চিন্তায় ডুবে যায়।

*   *   *

সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দিরের মুখোমুখী সামান্য পশ্চিমে নাট্যমঞ্চ স্থাপিত হয়েছে। সমতলভূমিতে দর্শকদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাহাড়ি টিলার শেষ উত্তর অংশের উপর উত্তরমুখী মঞ্চ। মঞ্চের মুখোমুখি কয়েক সারি বেতের কেদারা। কেদারার পিছনে খড় বিছানো সাধারণ দর্শক আসন। গুহনদীনের লোকেরা লোহিতাক্ষকে বিশিষ্ট দর্শক আসনে বসায়। বাণ লক্ষ করে লোহিতাক্ষ করালীর বেতের আসনের পাশে বসেছে। করালীর পাশে গুহনদীন।

নৌকা করে উত্তর থেকে পায়ে হেঁটে পূর্ব পশ্চিম এবং দক্ষিণ থেকে দর্শক আসছে। ভিড় বেড়ে উঠছে। বাণ খড়ের উপর বসে। মঞ্চের সম্মুখে লাল যবনিকা। বাতাসে যবনিকা কাঁপছে।

লাল যবনিকার দিকে চেয়ে বাণের মনে হয় চন্দ্রগোমী স্বামীর কথা। তিনি নানা কিরাতীয় শব্দ নিয়ে অনেক কিছু বলেছেন। 'যবনিকা' শব্দ সম্পর্কে বলেছিলেন — যবনিকা, যবন অর্থাৎ বিদেশী শব্দের সাথে যুক্ত নয়। কিরাতীয় ভাষায় 'জেইন' হচ্ছে বস্ত্র। প্রসঙ্গত বলেছিলেন,

সংস্কৃত ভাষায় হরিণের শুকনো চামড়াকে অজিন বলা হয়।

খানিক আগে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাণ পিছন ফিরে দেখে খড়ের দর্শক আসন ভরে গেছে। কিছু দর্শক দাঁড়িয়ে আছে। পিছন দিকে দেখা যায় নদীর অন্য তীরে মেলার অজস্র প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। অজস্র প্রদীপ শিখা বরাকের স্রোতে ছায়া ফেলে চলন্ত আলোর প্রবাহ সৃষ্টি করেছে। মেলার উত্তর দিকে আকাশ ছুঁয়ে আছে অস্পষ্ট প্রাগজ্যোতিষপুর পর্বত। বাণ লক্ষ করে পর্বত শিখরের উপরে ক্ষীণ বিদ্যুৎ রেখা চমকে উঠছে। দুশ্চিন্তা হয় নাটক চলার সময়কালে যদি বৃষ্টি নামে?

বাণের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে। সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দিরে হঠাৎ করে সন্ধ্যারতির মৃদঙ্গধ্বনি উঠে। মৃদঙ্গের সাথে শঙ্খ ঘন্টা কাঁসর।

সিদ্ধেশ্বর শিবের সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হলে শঙ্খ ঘন্টা মৃদঙ্গ স্তব্ধ হয়। যবনিকার সামনে মঞ্চের উপর ধীরে ধীরে উপস্থিত হন শকুন্তলা নাটকের সূত্রধর। সূত্রধর দর্শকগণের দিকে করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে নাটকের নাম, নাটকের লেখক পরিচয় প্রদান করে নাটকের প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করেন।

যবনিকা সরে গেলে দেখা যায় সাদা পর্দায় হরিণের ছায়া। ভীত হরিণ ভীষণ বেগে ছুটছে। পর্দায় হরিণের ছায়ার পর দেখা দেয় ঘোড়ার ছায়া। ঘোড়া ছুটে আসছে। মঞ্চ থেকে ভেসে আসে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ এই সাথে রথ চক্রের ঘর্ঘর ধ্বনি। ঘোড়ার ছায়ার পর পর্দায় জেগে ওঠে রথের চাকার ছায়া। চাকা ঘুরছে। নানা শব্দ ওঠে। রথের ঘর্ঘর শব্দ, ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি বাতাস কাটা চাবুকের হিস্ হিস্ শব্দ। সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে ওঠে ধনুকের টঙ্কার ধ্বনি। পর্দায় ধনুকের ছায়া দেখা দেয়। ধনুকের তীক্ষ্ণ তীর হিল হিল করছে।

হঠাৎ করে সব শব্দের উপর মেঘ গর্জনের মত কণ্ঠে উচ্চারিত হল "ভো ভো রাজন্! আশ্রম মৃগোহয়ং; ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ" — হে রাজন্! এ আশ্রমের হরিণ; ওকে হত্যা করো না, হত্যা করো না।

বাণ নাটকের কাহিনি ভালো করে জানে। নাটক এগিয়ে চলে। কালিদাস, শকুন্তলাকে নানারূপে, নানা রসে সাজিয়েছেন। বাণ জানে, নাটকের প্রথম অংশে শকুন্তলা-অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা এক বৃন্তের তিনটি ফুল। লীলায়িত তিনটি তনু এক অবিচ্ছেদ্য সুরের বসন্ত বাহার।

মঞ্চে নাটকের কাহিনি এগিয়ে চলে। কালিদাস তাঁর সোহাগি কাব্যকন্যা শকুন্তলাকে কোলে নিয়ে চিত্রের পর চিত্র এঁকেছেন। রঙের পর রঙে সাজিয়েছেন। কিন্তু বাণের হৃদয়ে গেঁথে আছে, প্রথম দৃশ্যের কণ্বাশ্রমের তিন কন্যার ছবি। এক কন্যা প্রিয়ংবদা। লীলায়িত প্রিয়ংবদা, বাণের বুকে ঝড় তুলে। হৃদয়ে বারে বারে জেগে উঠে প্রিয়ংবদার ছন্দময় তনু প্রিয়ংবদার অস্ফুট কাকলি।

বাণ, শকুন্তলা গ্রন্থ তন্ন তন্ন করে পাঠ করেছে। সে জানে মঞ্চে প্রিয়ংবদাকে আর দেখা যাবে না। তবু মনে অসম্ভব কল্পনা পাখা মেলে যদি কোনও ভাবাবেগে নাটকের পরিচালক চুপি চুপি দর্শকের সামনে প্রিয়ংবদাকে হাজির করেন? যদি প্রিয়ংবদা দর্শকের সামনে এসে বলে, 'ওগো! আমি বাসন্তী রাগে সেজে বসে আছি। ওগো মৃগয়া বিলাসী! আমাকে বিদ্ধ করো। তোমার

পঞ্চবাণে আমাকে বিদ্ধ করো।'

বাণের মনে পড়ে চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমের কাব্যের অধ্যাপকের কথা। অধ্যাপক বলেছিলেন, মহৎকাব্য হীরকের মত জ্যোতির্ময়। হীরকের মত কঠিন কবচে আচ্ছাদিত। হৃদয়ের ভাবাবেগে মহৎকাব্য দ্রব হয় না।

বাণ মুগ্ধ! প্রিয়ংবদার সবকিছু নিয়ে বাণ মুগ্ধ।

অগ্নিশুদ্ধা ভরতজননী শকুন্তলার সাথে রাজা দুষ্মন্তের মঙ্গল মিলনের পূর্বেই লোহিতাক্ষ বাণকে সংবাদ দিয়ে কাটিগড়ায় চলে গেল।

বাণ তাকিয়ে দেখে বিদ্যুৎ চমকে আকাশ শিহরিত হচ্ছে। মেঘে মৃদু মৃদঙ্গ ধ্বনি।

দুষ্মন্ত আর শকুন্তলার মঙ্গল মিলনে নাটক শেষ হয়। যবনিকা নামে। বাণের কৌতূহল— প্রিয়ংবদা। বাণ, যবনিকা সরিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে। মঞ্চ অভিনেতা, অভিনেত্রীগণ প্রসাধন তুলছে পোশাক পাল্টাচ্ছে একে অন্যের সাথে কথা বলছে। অজস্র কথায় মঞ্চ মুখর।

প্রিয়ংবদার সাথে বাণের চোখাচোখি হয়। বাণের বুকে গুরু গুরু ডম্বরু বাজে। প্রিয়ংবদা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধন তুলছে। প্রতিচ্ছবির মাঝে আবার দৃষ্টিপাত।

বাণ, দুর্জয় সাহসে বুক বেঁধে প্রিয়ংবদার মুখোমুখি হয়। প্রিয়ংবদা বাণের দিকে তাকায়। বাণ হঠাৎ করে প্রিয়ংবদাকে বলে, প্রিয়ংবদার অভিনয় হয়নি।

প্রিয়ংবদা বাণের তীক্ষ্ণ মন্তব্য শুনে চমকে ওঠে। এরপর বাণকে বলেন "কেন? কেন অভিনয় হয়নি।"

ইতিমধ্যে, বাণের বুকের গুরু গুরু ডম্বরু রবে সহজ একটি তাল চরণ রাখে। বাণ বলে, প্রিয়ংবদা চরিত্রের অভিনয় হয়নি কিন্তু এই ব্যর্থতার জন্য অভিনেত্রী দায়ী নন। প্রিয়ংবদা চরিত্রের ব্যর্থতার জন্য দায়ী স্বয়ং কালিদাস।

প্রিয়ংবদা, বাণের কথা না বুঝে বাণের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাণ বলে, কালিদাস তার সৃষ্ট নায়িকা শকুন্তলাকে দর্শক হৃদয়ের পাদপ্রদীপের আলোকে উজ্জ্বলতম করে রাখার জন্য প্রিয়ংবদার মত শিশির স্নাত কুসুমকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছেন।

প্রিয়ংবদা এবার সহজ হয়ে ওঠে। বাণের দিকে তার কাজলে সাজানো ঘন চোখ মেলে বলে কালিদাস তাঁর মানসকন্যা শকুন্তলাকে রূপে রসে রঙে সাজিয়েছেন। মানসকন্যাকে প্রতিষ্ঠার জন্য, তিনি শকুন্তলার পাশে অন্য কোনও চরিত্র প্রতিষ্ঠা করেন নি। এতো খুবই স্বাভাবিক। দোষের কিছু নয়।

বাণ প্রতিবাদ করে। বাদ-প্রতিবাদের মাঝে কথা এগিয়ে যায়। কথায় সুর লাগে। সুরে সুরে সম্পর্ক অঙ্কুরিত হয়।

বাণ এবং প্রিয়ংবদার সুরের মল্লারে বৃষ্টি নামে। বরাক থেকে মধ্যরাতের শীতল বাতাস প্রিয়ংবদার আলুলায়িত কুন্তলে ঝাপটা দেয়। প্রিয়ংবদার চুল বাণের চোখ মুখ ছুঁয়ে যায়। বাণ কস্তুরী সুবাস অনুভব করে।

বৃষ্টি-বৃষ্টি-বৃষ্টি। বৃষ্টির বিরাম নেই। বাণ চাদর মুড়ি দিয়ে ঘাটে পৌঁছায়। ঘাটে, বাণের ছিপ অপেক্ষা করছে। দুজন মাঝি, বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডায় কাঁপছে। বাণকে নিয়ে মাঝিরা নৌকা ছাড়ে। বাণ মাঝি দুজনের দিকে তাকিয়ে ভাবে একি অদৃষ্ট? একি পূর্বজন্মের কর্মফল? অথবা দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার?

বাণ পরদিন ভোরে, নদী পার হয়ে বন্দরপুরে পৌঁছায়। নাটক দলের গরুর গাড়ি মালপত্রে বোঝাই হয়ে মস্ত সারি দিয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। বাণ প্রিয়ংবদার সাথে দেখা করে।

গতরাতের বৃষ্টি আশেপাশের গাছ পাতাকে ধুয়ে মুছে ঝকঝকে করে তুলেছে। সড়ক পথের লালবালির হিংস্র বিক্রম বিনীত হয়ে সকালের রোদে গৈরিক রাগিনী হয়ে উঠেছে।

প্রিয়ংবদা হলদু রঙের সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র পড়েছে। ভিজা চুল হলুদ উত্তরীয়ের উপর দিয়ে পিঠের উপর জমাট হয়ে আছে। কপালে চন্দন তিলক। কানে কুন্দকলি। গলায় চম্পক ফুলের মালা।

প্রিয়ংবদা, অফুরন্ত অবসর নিয়ে বাণের সাথে গল্প করে। বাণের কথা শুনছে। নিজের কথা বলছে।

প্রিয়ংবদা বলে, তার দুটি বাড়ি আছে। একটি শোনবিলের পূর্ব তীরে অন্যটি পশ্চিম তীরে। শোনবিলে পূর্ব তীরে বাসুলী গ্রামে তার ঠাকুমার বাড়ী। পশ্চিম তীরে কাদম্বরী দেবকুলিকায় তার দিদিমার বাড়ী।

প্রিয়ংবদার জন্ম হয়েছে কাদম্বরী অঞ্চলে। তার বাবা বিয়ের পর দিদিমার বাড়ীতে এসে গিয়েছিলেন।

বাণ জানে কিরাতীয় সামাজিক নিয়ম অনুসারে বিয়ের পর বর কন্যার বাড়ীতে চলে যায়। প্রিয়ংবদা কিরাতকন্যা।

প্রিয়ংবদা বলে, তার জন্ম হয়েছে দিদিমার বাড়িতে। তার জন্মের পূর্বেই বাসুলী গ্রামে ঠাকুরদা এবং ঠাকুমার মৃত্যু হয়। তার বাবার অন্য কোনও ভাই বোন ছিল না। ঠাকুরদা-ঠাকুরমার মৃত্যুর পর বাসুলী গ্রামের বাড়ী শূন্য হয়ে যায়।

অন্যদিকে, দিদিমার কাদম্বরী দেবকুলিকার বাড়িতে মস্ত দুর্ঘটনা ঘটে। প্রিয়ংবদার জন্মেরকিছু দিনের মধ্যে তার মায়ের মৃত্যু হয়।

প্রিয়ংবদা বলে, তার মায়ের মৃত্যুর পর বাবা যখন তখন তার জন্মভূমি বাসুলী গ্রামে চলে যান। প্রিয়ংবদাকে লালন পালন করেছেন তার দিদিমা। বছর কয়েক আগে বৃদ্ধা দিদিমার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর পর প্রিয়ংবদা বাবার কাছে বাসুলী গ্রামে চলে গেছে।

প্রিয়ংবদা বাণকে বলে, বাসুলী তার ভালো লাগে না। বাবা যেমন যখন-তখন তাঁর জন্মভূমি বাসুলীতে চলে যেতেন ঠিক তেমনি সেও তার জন্মভূমি কাদম্বরীতে চলে যায়।

প্রিয়ংবদা বলে, সে এখন বাসুলী গ্রামে যাবে। বাসুলী গ্রাম বাণের পরিচিত। চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রম এবং চন্দ্রপুর বিষয়ের রাজকীয় সদর কার্যালয়ের প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে বাসুলী গ্রাম। বাসুলীর

সংলগ্ন উত্তর পশ্চিমে পূর্ব সাগর অর্থাৎ শোনবিলের উপকূলে বিখ্যাত কামলকা নৌঘাট।

প্রিয়ংবদা, বাণকে বাসুলী গ্রামে নিমন্ত্রণ করে তার বাবার নাম ধাম এবং ঠিকানা বলে। বাণ মাথা নেড়ে প্রিয়ংবদার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে। প্রিয়ংবদা, হঠাৎ করে বলে — 'রাজা দুষ্মন্ত প্রিয়ংবদাকে ভুলে গেছেন। কিন্তু আমি আশা রাখি বাণভট্ট আমাকে ভুলে যাবে না।'

বাণ বিস্মিত হয়। জিজ্ঞাসা করে, কী করে সে তার নাম জানতে পেরেছে? প্রিয়ংবদা, বাণের দিকে তাকিয়ে হাসে। বাণ লক্ষ করে, প্রিয়ংবদার চোখে কৌতুকের ছায়া।

বাণ, প্রিয়ংবদার নাম জিজ্ঞাসা করে। মুহূর্ত মধ্যে তার চোখের কৌতুকের ছায়া মিলিয়ে বেদনার ছায়া পাখা মেলে।

প্রিয়ংবদার হঠাৎ এই পরিবর্তন লক্ষ করে বাণ সহজভাবে বলে, 'তাহলে আমি, আমার মনের মত নাম দিয়ে তোমাকে ডাকব-কাদম্বরী কান্তা।" বাণ জানে, কিরাতীয় ভাষায় কন্যাকে 'কান্তাই' বলে।

প্রিয়ংবদার চোখে তখনো বেদনার ছায়া উড়ে চলেছে। সে বলে, 'কাদম্বরী দেবকুলিকা শুধু আমার মাতৃভূমি নয়। কাদম্বরী আমার স্বপ্নভূমি। বাণ! তোমার কাছে আমি, কাদম্বরী কান্তা নামেই পরিচিত থাকতে চাই। আমার সঠিক নামে নয়।'

বাণ প্রশ্ন করে 'সঠিক নামে নয়— এর অর্থ?'

সে উত্তর বলে, দিদিমা তাকে একটি কিরাতীয় নাম দিয়েছেন। সে নাম তার অসহ্য। অসহ্য সেই কিরাতীয় নাম বহন করতে পারে না।

বাণ, কিরাতীয় নাম জানতে চায়। প্রিয়ংবদা বলে, এখন বলবে না। ইতিমধ্যে গরুর গাড়ির স্রোত চলতে আরম্ভ করে। প্রিয়ংবদা একটি গাড়িতে উঠে বসে। বাণ, গরুর গাড়ির কাছে যায়। প্রিয়ংবদা, বাণের চোখে, চোখ রেখে প্রায় অস্ফুট কাকলি কণ্ঠে বলে "বাণ! তোমার কাদম্বরী কান্তা, তোমার পথ চেয়ে থাকবে।"

অজস্র গরুর গাড়ি বরাকের দক্ষিণ তীর ধরে যাত্রা করে। অজস্র চাকায় চলার শব্দ ওঠে। বাণ, চলমান গাড়িগুলির দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মনে হয় আকাশ পথে অজস্র বলাকা উড়ে চলছে। বলাকার কণ্ঠে মহাযাত্রার সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে।

* * *

মেলা শেষের পথে। লোহিতাক্ষ দারুণ উৎফুল্ল। বিদেশে রপ্তানি করা মত নানা জিনিসপত্র সংগ্রহ করেছে। নৌবহর নানা সামগ্রীতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। চীনাংশুক কার্পাস ক্ষৌম পাটবস্ত্র, গাঁট গাঁট নানা ধরনের বস্ত্র বয়নের সূতা। সুগন্ধি চাল ডাল ঘি সাদা দানার শর্করা। মৃগনাভি পিশু ধূপ কৃষ্ণ অগুরু চন্দন কাঠ। নানা ধরনের পশু পাখি, পশুর চামড়া রঙিন পাখির পালক। কিছু কার্তি মুদ্রা। কার্তি মুদ্রা, এই পূর্ব এবং পশ্চিম সাগর উপকূলের বিখ্যাত স্বর্ণমুদ্রা। এই মুদ্রা কামরূপের বিখ্যাত বরুণ ছত্রের উজ্জ্বল সোনা দিয়ে তৈরি। রোমের মহিলাগণের প্রিয়। রোমের মহিলাগণ এই কার্তিমুদ্রা অলঙ্কার রূপে ব্যবহার করেন।

লোহিতাক্ষ বাণকে তার সংগ্রহের মধ্যে এক ধরনের কার্পাসবস্ত্র দেখায়। এত সূক্ষ্ম সুতায় তৈরী হয়েছে দেখে মনে হয় যেন কাচ দিয়ে তৈরি করা। এই বস্ত্র পশ্চিম সাগর অর্থাৎ গঙ্গিনিকার পশ্চিম তীরের 'ডওকায়' নির্মিত। লোহিতাক্ষ উৎফুল্ল হয়ে বলে, এমনি ধরনের সূক্ষ্ম বস্ত্র বিদেশে কাটবে ভালো। লোহিতাক্ষ বলে সে তার একজন কায়স্থকে টাকাকড়ি দিয়ে ডওকায় পাঠিয়ে দিয়েছে। কায়স্থ ডওকায় গিয়ে সেখানকার তাঁতিদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে কাপড় তৈরি করিয়ে নিয়ে আসবে।

লোহিতাক্ষের কথায় বাণ আশ্চর্য হয়। লোহিতাক্ষ বলে, প্রায় মাস খানেক সময়ের মধ্যেই খনি ব্যবসার বিরাট সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। লোহিতাক্ষের পরবর্তী কথা বার্তায় বাণ বুঝতে পারে লোহিতাক্ষ লবণের কূপকে খনি বলছে।

লোহিতাক্ষ বলে, পাহাড়ি শেঠাইগণ ছোটো বড়ো পুটলির বিভিন্ন পরিমাণের সৈন্ধব লবণ কিনছে। লোহিতাক্ষ বলে, বাণের কথা মত ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের লবণ ছোটো বড়ো চটের থলিতে ভর্তি করা হয়েছে। থলিগুলির আকার আকৃতি এই সাথে শেঠাইদের পছন্দ মতো সহজ রঙীন-চিত্রে থলিগুলি সাজানো হয়েছে।

বাণ, শেঠাইদের পছন্দের রঙিন চিত্রের কথা জানতে চাইলে লোহিতাক্ষ বলে, সে চিত্রকর গণকে থলির উপর বাঘ ভল্লুক বাদর পাখি মাছ এসব আঁকতে নির্দেশ দিয়েছে।

লোহিতাক্ষ বলে, লবণের সাথে বিনামূল্যে রঙিন চিত্রের থলি শেঠাইগণের বিশেষ আগ্রহের কারণ হয়ে উঠেছে।

বাণকে বলে, ইতিমধ্যে আরো তিনটি কূপের সাথে ব্যবসা শুরু হয়ে গেছে। ব্যবসা লাভজনক এবং বাণের নামে বেশ অর্থ জমা হয়ে গেছে। লোহিতাক্ষ বলে, লবণের ব্যবসায়ে বাণের লাভের অঙ্ক বিপুল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে।

বাণ, লোহিতাক্ষের উচ্চারিত 'সম্ভাবনার' অর্থ জিজ্ঞাসা করলে, লোহিতাক্ষ বলে সে খনিজ লবণ বিক্রয়ের নতুন বাজারের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করছে। নতুন বাজার হবে ভুবনপাহাড় অঞ্চলে। ভুবনপাহাড় অঞ্চল নির্দেশ করতে গিয়ে বলে চন্দ্রপুর পাহাড়ের পূর্বদিকের ইন্দ্রঘর সমুদ্রের পূর্ব উপকূলে ভুবনপাহাড়। নৌকাবোঝাই খনিজ লবণ ইন্দ্রঘর বন্দর পার হয়ে সমুদ্রের পূর্ব উপকূলের ভুবন পাহাড়ে যাবে। সেখানে কিছু পার্বত্য গুহা আছে। এ সকল গুহা শেঠাইগণ নানা প্রকার জিনিসপত্রের গুদাম হিসাবে ব্যবহার করে। গুহা অঞ্চলে, বছরের প্রায় বারো মাস নানা ধরনের লোকজন থাকে কাজকর্ম করে। ভুবন পাহাড়ের নানা দিক থেকে এই গুহা- গুদামে মালপত্র জমা হয়। গুহা-গুদাম থেকে ছোটো বড়ো নৌকা এবং বাসের ভেলায় মালপত্র নানাজলপথ ইন্দ্রঘর এবং কাটিগড়া বন্দরে পৌছায়।

লোহিতাক্ষ বলে, যদি ভুবনপাহাড়ের গুহা-গুদামে লবণ পৌছিয়ে দেওয়া হলে, বুঝলেন তো পণ্ডিত মশাই! 'লাভের অঙ্ক বিপুল হয়ে উঠার সম্ভাবনা' এর বাক্যের সারমর্ম?

প্রাণ খোলে দুজন হাসে।

সন্ধ্যার পর লোহিতাক্ষের তাঁবুতে বসে বাণ এবং লোহিতাক্ষ অলকাপুরীর নাট্যগোষ্ঠীর শকুন্তলা নাটক নিয়ে আলোচনা করে। লোহিতাক্ষ বলে, গুহনদীনের এই নাটক করার পিছনে আছে তার কূট ব্যবসায়ী কৌশল। বাণ নাটক নিয়ে বিভিন্ন কথা বলে। বাণের নানা কথা প্রসঙ্গে লোহিতাক্ষ বলে সুযোগ সুবিধা পেলে সেও এমনি নাটক মঞ্চস্থ করাতে পারে। লোহিতাক্ষ বলে গুহনদীন নাটক মঞ্চস্থ করিয়েছে — রাজা জয়নাগের রাজ্যের অন্তর্গত — বন্দরপুরে। সে যদি নাটক মঞ্চস্থ করে তা হলে করবে ভাস্কর বর্মনের রাজ্যের অন্তর্গত কাটিগড়া বন্দরে।

নাটক নিয়ে দু'জনের অনেক কথায় রাত গভীর হয়। লোহিতাক্ষ বলে নাটকের সর্ব প্রকার খরচপাতির দায়দায়িত্ব সে বহন করবে। মধ্যরাত্রিতে স্থির হয় আগামী মেলায় কাটিগড়াতে নাটক মঞ্চস্থ করা হবে। বাণ নাটক প্রস্তুতির দায়িত্ব গ্রহণ করে।

*　　　　*　　　　*

কাটিগড়ার গঙ্গাসাগর মেলা সমাপ্ত হল। লোহিতাক্ষ তবে নৌবহর নিয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

বাণ, লোহিতাক্ষকে বলে সে এখন জলপথে যাচ্ছে না। কাছাকাছি বন্ধুবান্ধবের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করবে। নাটক নিয়ে কথাবার্তা বলবে।

লোহিতাক্ষ বলে, সে গোপ্পপলীতে বাণের জন্য অপেক্ষা করবে। লোহিতাক্ষ পথের ডাকে পাগল বাণকে ভালো করে চিনে।

বাণ পিঠে পুটলী বেঁধে সিদ্ধেশ্বর মন্দিরে এসে শিবকে প্রণাম করে বৃহৎ কুট্ট আলি সড়ক ধরে পশ্চিম দিকে এগিয়ে যায়।

বৃহৎকুট্টের সামনে এসে দেখে দুর্গের দক্ষিণ মুখী প্রধান লোহার ফটক সম্পূর্ণ খোলা দুর্গের ভিতর থেকে মাহুতগণ বহু হাতি নিয়ে বের হচ্ছে। অনেক যুদ্ধের ঘোড়া দুর্গের প্রধান ফটকের বাহিরে বাঁধা।

বাণ পশ্চিম দিকে দ্রুত এগিয়ে চলে। মেলার মালপত্র বোঝাই অজস্র গরুর গাড়ি ভারবাহী ঘোড়া এগিয়ে চলছে। সড়কপথের উপরে ঘন মেঘের মতো ধূলি উড়ছে।

বাণ ধূলির আস্তরণের মাঝ দিয়ে দুপুরের মধ্যে মহাকাল শিবমন্দিরের হট্টশালায় আশ্রয় নেয়।

স্নান আহ্নিক এবং ভোজনের পর বাণ সামান্য বিশ্রাম নিতে গিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। হঠাৎ গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভেঙে দেখে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মহাকাল শিব মন্দিরে সন্ধ্যার আরতি আরম্ভ হয়ে গেছে। গুরু গুরু ধ্বনি মেঘ মন্দ্র নয়। আরতির মৃদঙ্গ-ধ্বনি তরঙ্গ।

বাণ, মহাকালের সন্ধ্যারতি দেখতে যায়। মৃদঙ্গ বাজিয়ে চলছে সুন্দর সুঠাম একতরুণ। মৃদঙ্গ যেন কথা বলছে। কখনো মেঘ গর্জন, কখনো বা সমুদ্রের উচ্ছ্বাস।

আরতি শেষে বাণের সাথে পরিচয় হল। নাম জীমূতবাহন। মহাকাল মন্দিরের 'মার্দঙ্গিক জীমূত'।

সাধারণত মন্দিরাদির হট্টশালায় অতিথিগণ এক নাগাড়ে তিনদিন বসবাস করতে পারেন। তিনদিনের মাথায় জীমূত বাণকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল। এই তিনদিনের মাঝেই বাণের নাটকের গোষ্ঠী দানা বেঁধে নিয়েছে। জীমূতের সাথে পরিচয়ের পরই দর্দুরকের সাথে পরিচয় হল। দর্দুরক গন্ধর্ব বিদ্যার উপাধ্যায়। অলকাপুরীতে তার মূল বাসস্থান। অলকাপুরীতে ঘরবাড়ী স্ত্রী পুত্র পরিবার। মহাকালে বাস করে ব্যবসা বাণিজ্য করেন। তিনি ছিলেন অলকাপুরী নাট্যগোষ্ঠীর মধ্য মণি। একাধিক নাটক পরিচালনা করেছেন। ইদানীং অলকাপুরী গোষ্ঠীর সাথে তার সম্পর্ক ভালো নয়। নানা কারণে এবারের শকুন্তলা নাটকের পরিচালনার দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়নি।

বাণ, নাটকের বিখ্যাত উপাধ্যায় দর্দুকের সাথে, বিস্তারিতভাবে তার পরিকল্পনার কথা বলে।

দর্দুরক, নূতন নাটক পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাণ দর্দুরকের চোখে মুখে কঠিন শপথের তীব্রচ্ছটা লক্ষ করে।

বাণ এবং দর্দুরকের আলোচনায় স্থির হয় নূতন নাট্যগোষ্ঠীর নাম হবে "মহাকাশ নাট্যগোষ্ঠী" বাণ নাটগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক এবং নাট্যগ্রন্থ রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। অন্যদিকে দর্দুরক গ্রহণ করেন নাটকের অন্যসব দায়-দায়িত্ব, কাজকর্মের ভার।

বাণ নাট্যগ্রন্থ রচনার দায়িত্ব নিয়েছে। কিন্তু কিবিষয় নিয়ে লিখবে ভেবে পাচ্ছে না। একটির পর একটি ভাবনা আসে। কোন ভাবনা কোন পরিকল্পনা দানা বাঁধে না। বাণের ভাবনা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে পরিক্রমা করে চলছে। বিচিত্র ভাবনায় বাণের মন অস্থির হয়ে ছটফট করে।

এক অপরাহ্নে বরাকের তীরে ভাবনার পাহাড় মাথায় নিয়ে বাণ নাটকের বিষয় সম্পর্কে ভাবতে বসে। বৈশাখের খরতাপে বরাকের বুকে চরভূমি চাড়া দিয়ে উঠেছে। বাণের সামনে নদীর অন্যতীরে হরিনগর পুরী। হরিনগরের নৌ-ঘাটে অজস্র নৌকা। হরিনগরের উত্তরে আকাশ জুড়ে প্রাগজ্যোতিষপুর পর্বতমালা।

বরাকের ধারা পশ্চিমে প্রবাহিত। পশ্চিমের বরাক সুবিপুল প্রায় সমুদ্রের মতো। জলধারার সুদূর পশ্চিমে বাঁকা ক্ষীণতীর রেখা। ক্রমে সূর্য সুবিপুল জলধারার পশ্চিমের ক্ষীণ কৃষ্ণরেখায় অস্ত যায়।

বাণের ভাবনায় মহাকাশের সন্ধ্যারতির মৃদঙ্গধ্বনি তরঙ্গায়িত হয়। বাণ মন্দিরে যায়। জীমূতের মৃদঙ্গে রুদ্রের প্রলয়নৃত্য ধ্বনিত হচ্ছে। আরতি ধূপের ধোঁয়া মন্দিরে স্বপ্নলোক সৃষ্টি করেছে। বাণ অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে সম্মুখে দেখতে পেল মহাকাল প্রলয়নৃত্যে মগ্ন। সতীহারা মহাকাল দিগ্বিদিক মহাকালের তীব্র হাহাকার। বাণ তার নাটকের কাহিনি পেল। মহাকালের, ভালোবাসার কান্না বাণকে কাহিনি লিখতে অনুপ্রেরণা দিল। মহাকালের অগ্নিদগ্ধ ভালবাসাকে আবার বাসন্তী রঙে রাঙাতে হবে।

বাণ পুরাণগ্রন্থে কাহিনি পেয়ে গেল। অসুরদের অত্যাচারে দেবতাগণ বিপন্ন। দেবতাদের

প্রার্থনায় পিতামহ ব্রহ্মা বললেন, একমাত্র দেবাদিদেব মহাকালের পবিত্র, অসুররাজ তারকাসুরকে নিধন করতে পারবে।

অন্যদিকে, সতীহারা মহাকাল হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গে তপস্যারত। হিমালয়ের গৃহে সতী পার্বতী হয়ে জন্ম নিলেন। বয়ঃসন্ধির পার্বতীকে ফুলে ফুলে সাজিয়ে এই সাথে বসন্ত আর মদনের পুষ্পবাণে অকাল কামবসন্ত সৃষ্টি করে মহাদেবের তপস্যাভঙ্গ হল।

মুহূর্তের মধ্যে মহাকাল মহাদেব উপলব্ধি করলেন তাঁর চতুর্দিকের পুষ্পিত মধু বসন্ত বসন্ত নয়। এ অকাল বসন্ত। প্রবঞ্চনা। মহাদেশের তৃতীয় নয়ন জ্বলে উঠল। তৃতীয় নয়নের বহ্নিদানে কামদেব ভস্মীভূত হল।

তারপর শুরু হল মহাদেবী মহাশক্তি পার্বতীর কঠোর তপস্যা। পার্বতীর কঠোর তপস্যায়, মহাদেব বন্দী হলেন পার্বতীর প্রেমডোরে। মহাদেব —পার্বতীর পরিণয় হল।

বাণ লিখতে শুরু করলে তার জীবনের প্রথম নাটক 'পার্বতী পরিণয়'। পরিচিত অভিনেতা অভিনেত্রীদের কল্পনায় রেখে চরিত্রগুলির সংলাপ সৃষ্টি হল। পার্বতী চরিত্রের অভিনয়ের জন্য বাণ সঙ্গোপণে কল্পনায় রূপ দিল তার ভালবাসা প্রিয়ংবদাকে। প্রাণ ঢেলে রূপে রসে গন্ধে তিল তিল করে বয়ঃসন্ধির পার্বতীকে সাজিয়ে দিল।

পার্বতী পরিণয় নাটক লিখার সময়কালে বাণ জানতেনা যে, ইতিমধ্যে এমনি কাহিনি নিয়ে কালিদাস তার কুমারসম্ভব লিখে ফেলছেন। কালিদাসের কুমারসম্ভব গ্রন্থ তখন মুষ্টিমেয় মানুষের কাছে মাত্র পরিচিত হয়েছে।

নাট্য পরিচালক দর্দুরককে কেন্দ্র করে মহাকাল নাট্যগোষ্ঠী বলিষ্ঠ আকারে রূপ নিল। মহাকাল অঞ্চলের দুই ক্রোশের আশেপাশের বন্দরপুর কাটিগড়া শ্রীগৌরী দর্শনে কনকলস প্রভৃতি স্থানের, নানা বিভাগের শিল্পীগণ এসে নাট্যগোষ্ঠীতে যোগ দিল।

মহাকাল অঞ্চলের চার-পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্বে অলকাপুরী অলকাপুরী নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পী গণ, নানাস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। দর্দুরকের পরিচিত নানা শিল্পী অলকাপুরী নাট্যগাষ্ঠী ছেড়ে মহাকাল নাট্যগোষ্ঠীতে যোগ দিল।

বাণ স্বয়ং জনাকয়েক শিল্পীকে আবিষ্কার করল। শিল্পীদের মধ্যে মধুকর এবং পারাবত নামে দু'ভাই। ওরা বাঁশি বাজায়। মহাকাল মন্দিরের সন্ধ্যারতির সময়কালে, বাণের সাথে পরিচয় হয়েছে।

বাণ, কেরলিকা এবং কুরঙ্গিকা নামের দুজন নারীকে নাটকের প্রসাধনের জন্য দলে এনেছে। কাটিগড়া বন্দর ঘাটে কেরলিকা এবং কুরঙ্গিকার সাজগোজের দোকান। বাণ লোহিতাক্ষের সাথে চুল কাটতে গিয়ে ওদের সাথে আলাপ পরিচয় হয়েছে। কুরঙ্গিকা প্রসাধন শিল্পে এবং কেরলিকা চুল -ঘড়িসহ মুখমণ্ডলের সাজসজ্জায় পারদর্শী। কথা প্রসঙ্গে কেরলিকা এব কুরঙ্গিকা বাণকে বলেছিল — বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী ওদেরে নাটকের সাজগোজ প্রসাধনের জন্য নিয়ে যায়।

*   *   *

বাণের সাথে দর্দুরকের দীর্ঘ আলাপ আলোচনা হল। আলোচনার বিষয় পার্বতী পরিণয়

নাটকের নায়ক এবং নায়িকা নির্বাচন। দর্দুরক, অলকা নাট্যগোষ্ঠীর অভিনেত্রী প্রিয়ংবদাকে ভালো করে জানেন। দর্দুরকের পরিচালিত একাধিক নাটক প্রিয়ংবদা অভিনয় করেছে কিন্তু কোন নাটকেই তাকে নায়িকা অথবা উপনায়িকার চরিত্র দেওয়া হয়নি। বাণের কথায় দর্দুরক প্রথমে ইতস্তত করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত বাণের বিশেষ আগ্রহ দেখে প্রিয়ংবদাকে নায়িকা চরিত্রে নির্বাচন করা যেতে পারে কিনা এ বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

দর্দুরকের কথায় বাণ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। দর্দুরক, বাণের উৎফুল্ল ভাব দেখে চিন্তিত হন। চিন্তিত হবার কারণ প্রকৃতপক্ষে বাণই মহাকাল নাট্যগোষ্ঠীর সর্বময় কর্তা।

দর্দুরক আরো লক্ষ করেছেন বাণের ইচ্ছা মহাদেব চরিত্রে অভিনয় করা। বাণের মহাদেব চরিত্রে অভিনয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে দর্দুরক ইতিমধ্যে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। বাণের কণ্ঠস্বর এবং উচ্চারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। অন্যদিকে, তার দৈহিক গঠন মহাদেব চরিত্রের অভিনয় সম্পর্কে অনুপযুক্ত নয়। বাণের দৈহিক আকৃতি দীর্ঘ। মাথায় স্বাভাবিক ঝাঁকড়া চুল। উন্নত নাসা, চাপা ঠোঁট। মহাদেবের চরিত্র অভিনয়ে সাধারণত অভিনেতার দেহ উন্মুক্ত রাখা হয়। সুতরাং বাণের উজ্জ্বল দেহবর্ণ সুবিধাজনক।

দর্দুরকের মনে হয়েছে বাণের দেহ যদি আর একটু স্থূল হত তাহলে মহাদেব চরিত্রের পক্ষে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠত। অবশ্য বাণের এমনি হালকা পাতলা ঋজুদেহ দারুণ কোনও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে না।

*　　　　*　　　　*

মহাকাল থেকে দক্ষিণদিকে বাণের যাত্রা শুরু হল। বাসুলী গ্রামের পরিচিত সড়ক পথ। বাণের প্রাণে গানের কলি "কাদম্বরী কান্তা — কাদম্বরী কান্তা।" গানে গানে বাণ ভর দুপুরে গানের কল্পলোক বাসুলী গ্রামে পৌঁছাল।

ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে এল বাণের গান কাদম্বরী কান্তা। বের হয়ে এলেন তার বাবা এই সাথে দূর-সম্পর্কীয় মামা। সবাই মিলে স্বাগত করে ঘরের ভিতর নিয়ে গেলেন বাণকে। মামা, শীতলপাটি পেতে দিলেন। সবাই বসলেন।

কাদম্বরী কান্তা প্রিয়ংবদা, কাঠের পানের বাটায় পান নিয়ে এল। একটি ঘন সবুজ পান পাতার উপর, এক খণ্ড কাঁচা সুপারি বসিয়ে বাবার হাতে দিতে গেল। বাবা রেগে উঠে বলেন — "উম- ইয়াম! তুমি ভদ্রতা ভুলে গেছ? তুমি ভালো করে জান প্রথমে অতিথিকে তাম্বুল দিতে হয়।"

বাবার কথায় লজ্জায় লাল হয়ে তাম্বুলটি বাণের হাতে দেয়। দুজনের হাতে স্পর্শ। বাণের বুকে গুরু গুরু বৈশাখী।

তাম্বুল মুখে পুরে বাণ কম্পিত বুকের গুরু গুরু শব্দ চেপে স্বাভাবিক ভাবে জিজ্ঞাসা করে — "ওর নাম উম-ইয়াম?" প্রিয়ংবদা তথা বাণের কাদম্বরী কান্তার বাবা বলেন - - "এই নামটি ওর দিদিমা অর্থাৎ আমার শশ্রুমাতা দিয়েছিলেন। ওর জন্মের ছয়দিন পর আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। মা মরা কন্যাকে তাই এই নাম দেওয়া হয়েছে।

বাণের মনে হয় সে যখন প্রিয়ংবদাকে নাম জিজ্ঞাসা করেছিল তখন সে বলেছিল তার দিদিমার দেওয়া কিরাতীয় নাম তো বহন করতে পারে না। বাণ নামের অর্থ জিজ্ঞাসা করে। বাবা বলেন — 'উম' অর্থ জল। 'ইয়াম' অর্থ চোখ। বাণ বলে, "তাহলে "উম ইয়াম" অর্থ চোখের জল।

বাণ তাকিয়ে দেখে — উম-ইয়ামের চোখ বেয়ে টপ্-টপ্-করে চোখের জল ঝরছে।

উম-ইয়ামের চোখের জলে পরিবেশমেদুর হয়ে উঠে। স্বাভাবিক কথাবার্তা থম্‌কে যায়।

বাণ তার অভিজ্ঞতায় দেখেছে প্রত্যেক মানুষ তার জীবিকাবৃত্তির কথা বলতে পারে এবং বলতে ভালোবাসে। বাণ এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। বাবা বলেন, তিনি এবং তার দূর সম্পর্কীয় শ্যালক "বর্দ্ধকী" কর্মী। বাণ জানে, ছুতার অর্থাৎ কাঠের জিনিসপত্র নির্মাণকারীকে বর্দ্ধকী বলা হয়। ওরা মূলত নৌকা নির্মাণ করেন। কথায় কথায় — হঠাৎ করে বলেন, মাঝেমাঝে নৌকা নির্মাণের সাথে অন্য একটি কাজ করেন। সে কাজে অর্থ কড়ি ভালো পাওয়া যায়।

বাণ, সেই কাজের কথা জিজ্ঞাসা করলে, উম-ইয়ামের বাবা হঠাৎ থমকে গিয়ে তার শ্যালকের দিকে তাকান। দুজন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে — কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন।

বাবা বলেন, বর্ষাকালের শেষ দিকে মাঝে মাঝে কিছু অপরিচিত লোক এসে তাদেরে গভীর জঙ্গলের ভিতর নিয়ে যায়। জঙ্গলের ভিতর মস্ত গাছের কাণ্ডের মাঝে হাতুড়ি বাটালি দিয়ে দুর্গা মূর্তি খোদাই করতে হয়। গোপনে এ কাজ করতে হয়। এ কাজে রোজগারপাতি মন্দ হয় না।

বাণের চোখে ভেসে ওঠে চণ্ডিকা অরণ্যের দুর্গা মূর্তি। গাছের কাণ্ডের তলায় গলিত নরমুন্ড।

বাণ তার মূল প্রসঙ্গে কথা শুরু করে। উম-ইয়াম, অলকা নাট্যগোষ্ঠীতে কয়েক বছর ধরে অভিনয় শিল্পে সংযুক্ত। ওর বাবা, বাণের প্রস্তাবে সহজেই রাজি হন। বাণ, অভিনয় শিল্পীদের-উপযুক্ত দক্ষিণা দেওয়া হবে এবং শিল্পীদেরে উপযুক্ত বাসস্থান সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে এসব বিষয় বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করে।

বাণ, নাটকের প্রস্তুতি সম্পর্কে বলে মহাকাল গ্রামে প্রতিপক্ষে দিন পাঁচ সাতেক নাটকের মহড়া দেওয়া হবে। উম -ইয়ামকে বাসুলীর কামলঙ্কা নৌঘাট থেকে উপযুক্ত নির্দ্ধারিত তিথিতে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেই নৌকায় পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। নৌকার যাতায়াতের খরচপত্র, নাট্য গোষ্ঠী বহন করবে।

কথায় কথায় বিকাল হয়ে গেছে। বাণের সামনে তার কাদম্বরী কান্তা উম ইয়াম থালা ভর্তি করে নানা ফল রাখে। বাণ হঠাৎ উপলব্ধি করে তার ভীষণ খিদে পেয়েছে।

খাবার শেষ করে জল খেয়ে — চুপি চুপি উমইয়ামের কাছে গিয়ে বলে — "কাদম্বরী কান্তা! আজ রাত্রিবাস তো এখানেই করতে হবে। তখন কথা হবে। এখন একটু বাইরে ঘুরে আসি।"

বাণ সড়ক পথে উঠে ভাবে কোন্ দিকে এগিয়ে যাবে? এই পথ উত্তরের বন্দরপুর মহাকাল হয়ে বাসুলী এসেছে। বাসুলী থেকে অন্যান্য স্থান পার হয়ে চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রম হয়ে আরো দক্ষিণে

বহুদূর চলে গেছে।

বাণের পা আপনা আপনি উত্তর দিকে এগিয়ে যায়। কিছুক্ষণ আগে এই পথ দিয়ে সে বাসুলীতে এসেছে।

আপন মনে — নানা সুখ-স্বপ্নের জাল বুনে উত্তর দিকে এগিয়ে চলে। সূর্য প্রায় পশ্চিম দিগন্তেরশেষ মাথায়। পশ্চিমের গাছ-পাতার পিছনে সূর্য। পথে সন্ধ্যার ছায়া নেমে এসেছে।

কিছু এগিয়ে বাণ দেখে সড়কপথ থেকে ছোটো একটি পায়ে চলা পথ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পূর্ব দিকে চলে গেছে। হঠাৎ করে বাণ এই পায়ে চলা ক্ষীণ জঙ্গলীপথে প্রবেশ করে — সম্মুখ দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

পথের দুধারে, ছোটো বড়ো টিলা ঘন কালো গাছপালা। শখানেক পা এগিয়ে দেখা যায় পথ ডান দিকে সম্পূর্ণ মোড় নিয়েছে। বাণ থমকে দাঁড়ায়। অন্ধকার হয়ে আসছে। অজানা পথ। ফিরে যাবে কি যাবে না ভাবতে না ভাবতে মোড়ের অন্যদিক থেকে একজন এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়। দু'জনের মুখে চাপা বিস্ময়ধ্বনি। বাণ চিনতে পারে বন্দর পুরের মহামাংস বিক্রেতা সন্ন্যাসী। সন্ধ্যার ছায়ায় অস্পষ্ট মুখায়ব। অস্পষ্ট পোশাকের গৈরিক রং।

সন্ন্যাসী কাটিগড়া গিয়ে বাণের হাত থেকে মনঃশিলা ক্রয় করার জন্য অর্থ নিয়েছিল। তার নাম বলেছিল চন্দ্রস্বামী। গুরুদেব তাকে চন্দ্রস্বামী নাম দিয়েছিলেন।

উচ্ছল বাণ গভীর আবেগে চন্দ্রস্বামীকে তার নাম ধরে ডাকে। চন্দ্রস্বামী বাণকে জড়িয়ে ধরে।

চন্দ্রস্বামী বাণকে জড়িয়ে বলে "আজ সেই মহাতিথি। এই মহাতিথির মহাক্ষণে গুরুদেব ভৈরবাচার্য সর্বসিদ্ধি - মহা পূজা সাঙ্গ করবেন।" চন্দ্রস্বামী বলে, গুরুদেবের আশ্রম সামান্য পূর্ব দিকে। সামনের মোড়ের পর আর মাত্র সামান্য পথ। চন্দ্রস্বামী বলে পূজার উপচার কিনতে দোকানে যাচ্ছে। দোকান থেকে আবার আশ্রমে ফিরে যাবে।

বাণ চন্দ্রস্বামীর সাথে আবার সড়ক পথে উঠে। কিছু পথ এগিয়ে দোকানে ঢুকে চন্দ্রস্বামী লালরঙের কার্পাস বস্ত্র ক্রয় করে।

বাণ চন্দ্রস্বামীর সাথে আশ্রমে যেতে রাজী হয় না। চন্দ্রস্বামী বাণকে নানাভাবে অনুনয় বিনয় করে শেষ পর্যন্ত কাঁদতে থাকে।

জঙ্গলীপথের গভীর অন্ধকারের মাঝ দিয়ে চন্দ্রস্বামীর সাথে বাণ আশ্রমে পৌঁছায়।

ভৈরবাচার্যের তন্ত্রাচার গৃহের দরজা বন্ধ। দরজার ফাঁক দিয়ে, তীব্র গন্ধী ধোঁয়া বের হচ্ছে। ধোঁয়ার সাথে বের হচ্ছে তন্ত্রপাঠের গুন গুন শব্দ।

ইতিমধ্যে চন্দ্রস্বামী স্নান করে এইমাত্র ক্রয় করা লাল বস্ত্র পরিধান করেছে। গলায় রক্ত জবার মালা।

চন্দ্রস্বামী বাণকে বলে গুরুদেব ভৈরবাচার্যের সুদীর্ঘ তন্ত্রাচার শেষ হয়েছে। এই কৃষ্ণা চতুর্দশীতে পূর্ণ বিদ্যাধরত্ব লাভের পুণ্যলগ্ন উপস্থিত।

ভৈরবাচার্যের তন্ত্রাচার গৃহের বন্ধ দরজা হঠাৎ খুলে যায় ; গৃহের ভিতর থেকে দু'টি কিরাত নারী বের হয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ টলতে থাকে। এরপর টলতে টলতে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

চন্দ্রস্বামী বাণকে নিয়ে তন্ত্রাচার গৃহে প্রবেশ করে।

বাণ তন্ত্রগৃহে প্রবেশ করে ভীষণ দৃশ্য দেখে। আতঙ্কে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। দেখে সাদা ভস্মে আঁকা গোল মণ্ডলের মধ্যখানে ভৈরবাচার্য, একটি শায়িত শবের বুকের উপর পদ্মাসন করে বসে আছেন। শবের মুখগহ্বরে আগুন জ্বলছে। ভৈরবাচার্য সেই আগুনে কৃষ্ণ তিল আহুতি দিচ্ছেন। ভৈরবাচার্যের ডান দিকে মেঝেতে হরিণের চামড়ার উপর একটি উলঙ্গ যুবতী নেশাগ্রস্ত হয়ে শুয়ে আছে।

ঈগল ডেকে ওঠে — অঃ অঃ আঃ আঃ। কৃষ্ণা চতুর্দশীর প্রথম প্রহরের সমাপ্তি ঘোষিত হয়। চন্দ্রস্বামী বাণকে বলে "বাণ! আমাকে বেঁধে ফেল। বেঁধে ফেল।" কুশের বেণী পাকানো রশি বাণের হাতে দেয়।

ভৈরবাচার্য দাড়িয়ে হুঙ্কার দিয়ে চন্দ্রস্বামীকে বেঁধে ফেলতে আদেশ দেন। বাণ প্রায় চৈতন্য শূন্য হয়ে — চন্দ্রস্বামীকে কুশের রশি দিয়ে বাঁধে।

ভৈরবাচার্যের আদেশে চন্দ্রস্বামী, মহাদেবী এবং ভৈববাচার্যকে প্রণাম করে। চন্দ্রস্বামী ভষ্ম কুণ্ডলীর ভিতর প্রবেশ করে, শবদেহের পাশে উপুড় হয়ে পড়ে। ভৈরবাচার্যের হাতে খড়্গ। বাণ, চীৎকার করে উঠে — চন্দ্রস্বামী! চন্দ্রস্বামী!

চন্দ্রস্বামী, বাণের দিকে তাকিয়ে বলে — "চন্দ্রস্বামী নয়। বলো বন্ধু, বিধু। আমার নাম বিধু। বাণ! ইন্দ্রঘরের কুকুর গ্রামে গিয়ে আমার অন্ধ বাবা সোমনাথ কুণ্ডকে বলো তার পুত্র বিধুর জীবন সার্থক হয়েছে।" কথা শেষ হতে না হতেই ভৈরবাচার্যের খড়্গ চন্দ্রস্বামীর গলা ছিন্ন করে।

চন্দ্রস্বামীর গলা ছিন্ন হল। ছিন্ন স্কন্ধের রক্ত জবার মালা বিগলিত হয়ে এঁকে বেঁকে চলছে। বাণের মনে হচ্ছে এ যেন তার পিতা চিত্রভানুর কবন্ধ। চিত্রভানুর পাশে খড়্গ হাতে ভ্রূকুটি কুটিল এক ভীষণ শবর। ভীষণ মাতঙ্গক শবরের কুটিল দৃষ্টি যেন বাণের উপর। চেতনাহীন বাণ, প্রাণের ভয়ে ছুটে চলে। ছুটি চলে মরুভূমির মত উত্তপ্ত সূর্যের তীব্র আলোর বিচ্ছুরণ। বাণ, প্রাণপণে ছুটে চলে। ছুটে ছুটে দেখতে পায় দূরে নীল জলের রেখা। পদ্মসরোবরের নীলজলের উপর কলকণ্ঠী রাজহংস। ভীষণ শ্রান্তি, ভীষণ তৃষ্ণা। বাণ, পদ্মসরোবরের নীল জলের পাশে পৌঁছায়। নীল জলে দুহাত ডুবিয়ে দেয়। বাণের ভীষণ ঘুম পায়।

*   *   *

বাণ ঘুম ভেঙে দেখে অশ্রুসিক্ত উমইয়াম তার দিকে চেয়ে আছে। উম-ইয়ামের পাশে গৈরিক বসনা বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী।

বাণ শুয়ে আছে বাসুলী গ্রামের পূর্ব সীমার এক বৌদ্ধ মঠে। তন্ত্রাচারী এই বৌদ্ধ মঠ কাপালিক ভৈরবাচার্যের আশ্রমের খানিক পূর্ব দিকে।

সন্ন্যাসিনী বলেন, রাত্রির মধ্য প্রহরে সন্ন্যাসিনী মঠের প্রাঙ্গণে অশ্বত্থ তলায় বসে ধ্যান

করছিলেন। তখন ছুটে এসে অশ্বত্থ তলার প্রজ্বলিত দীপের সামনে বাণ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল।

এক নাগাড়ে, তিনদিন তিনরাত সে অজ্ঞান হয়েছিল সন্ন্যাসিনীর এমনি কথায় বাণ বিস্মিত হয়।

উম ইয়ামের বাবা বলেন, সবার মনে দুশ্চিন্তা ভোর হয়ে গেল তবু বাণ ঘরে এল না। খুব ভোরে উম-ইয়াম বৌদ্ধ মঠে ছুটে গেল। উম ইয়াম, তার সমস্যা দেখা দিলেই সন্ন্যাসিনীর কাছে গিয়ে উপদেশ গ্রহণ করে। বাণের সমস্যা নিয়ে তাই সন্ন্যাসিনীর মঠে গিয়েছিল। আশ্চর্য! বাণকে সেখানেই পেয়ে গেল।

বাবা, উম-ইয়াম এবং সন্ন্যাসিনীর মধুর সম্পর্ক নিয়ে নানা কথা নানা কাহিনি বলেন। প্রকৃতপক্ষে, এই বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর উপদেশ উম-ইয়ামের জীবনমন্ত্র।

বাণের অসুস্থতার সংবাদ মহাকালে পৌঁছে গেছে। পালকি নিয়ে দর্দুর হাজির হলেন। বাণকে পালকিতে উঠানো হল। যাত্রার মুহূর্তে উম-ইয়াম বাণের ডান হাত, তার দুহাতের মাঝে রেখে কাঁদতে থাকে।

দর্দুরক, অশ্রুসিক্তা উম ইয়ামের দিকে তাকিয়ে বলেন — 'ইয়াম! প্রস্তুত থেকো। তোমাকে কিন্তু পার্বতী চরিত্রের অভিনয় করতে হবে। বাণ হবে মহাদেব।"

কঠিন সংযমী গন্ধর্ব বিদ্যার উপাধ্যায় দর্দুরকের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে তার কণ্ঠে গভীর এক ভালোবাসার সুর ঝঙ্কার সৃষ্টি করল।

* * *

মহাকালে পৌঁছে দিন কতকের মাঝে নাটক প্রস্তুতির কাজ দ্রুত গতিতে শুরু হয়। সূত্রধার চরিত্র নাটকের প্রধান স্তম্ভ। দর্দুরক সূত্রধার চরিত্রে কাউকে মনোনীত করতে পারছে না। বাণ, এই প্রসঙ্গে চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমের জয়সেনের নাম বলে। জয়সেন বাণের প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয়। দর্দুরক জয়সেনকে খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করে। জয়সেন সূত্রধার চরিত্রে যোগ দেয়।

মহাকালে বসবাস করে দর্দুরক, ব্যবসা বাণিজ্য করে। নাটকের ঠেলায় তার ব্যবসা বাণিজ্য লাটে উঠে গেছে। তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জমিতে একাধিক ছোটো বড়ো কাঠ বাশ ছনের কুঁড়ে ঘর নির্মিত হয়েছে। কুঁড়েঘরগুলি নাটকের বিভিন্ন ধরনের শিল্পী এবং কর্মীদের অস্থায়ী বাসস্থান।

বাণ, ইতিমধ্যে গোপ্নপলী গিয়ে নাটকের প্রয়োজনীয় অর্থাদির ব্যবস্থা করেছে।

গোপ্নপলীতে নাটকের আর্থিক ব্যবস্থা করতে গিয়ে সে বোকা হয়ে গেছে। লোহিতাক্ষ, তার কায়স্থকে ডেকে বাণের হিসাব-পত্রের সাথে বিরাট এক লাভের অঙ্ক বাণকে দেখিয়েছে। লোহিতাক্ষ বলে, সৈন্ধব লবণ ব্যবসায়ে বাণের নামে এই লাভের অংশ জমা হয়েছে।

বাণ বোকা হয়ে গেছে তার কারণ কোনও কাজ কর্ম না করে কিভাবে তার নামে এত অর্থ জমা হয়ে আছে।

স্থির হল প্রতিপক্ষে নাটক মহড়া পাঁচদিন করে হবে। ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত। কিন্তু প্রত্যেক শিল্পী এবং কর্মীকে পঞ্চমী তিথিতে মহাকালে পৌঁছাতে হবে এবং একাদশীতে ছুটি হবে। বাণের

ব্যবস্থায় উম-ইয়ামের জন্য আলাদা পানসি নৌকার ব্যবস্থা হয়েছে। মস্ত রাজকীয় পানসি।

পরিচালক দর্দুরকের কঠিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাঝ দিয়ে নাটকের মহড়া এগিয়ে চলে। পার্বতী পরিণয় নাটকে মহাদেব পার্বতীর প্রণয়। এই দৈবী প্রেমের সাথে এগিয়ে চলে মানবিক ভালোবাসা। উম-ইয়াম-বাণের প্রেমকাহিনি সকলের মুখে মুখে। প্রেমকাহিনি দাবানলের মত মহাকাল পার হয়ে দশার্ন - কনকল্লস বাসুলী কাদম্বরী পালিতক এই সাথে ময়ূর-শাম্মলের ব্রাহ্মণ্য্যা ধিবাস এবং কুতকুটু মন্দিরের করালীর কানে পৌঁছায়।

করালী সুযোগ নেয়। প্রচার করে প্রীতিকূটের ব্রাহ্মণ, চন্দ্রপুরের স্নাতক বাণভট্ট এক কিরাত নারীর সাথে বেলেল্লাপনা করছে।

চারিদিকের এই ভীষণ বিষবাষ্পের খবর বাণের কানে তখনো পৌছায়নি।

* * *

মহড়ায় মহড়ায় শ্রাবণ আসে। অঝোর বৃষ্টি। বাণ মাঝে মাঝে পদ্মগন্ধ অনুভব করে। পদ্ম তখনো ফোটেনি। বাণ ভাবে একি ভালোবাসার গন্ধ।

দর্দুরক বাণের উপর নিদারুণ খেপে আছে। মহড়াকালে বাণ শিবের সংলাপ বারেবারে বদলে দেয়। পার্বতীর সাথে তার সংলাপে নিত্য নতুন অনুপ্রাস এসে যুক্ত হয়। সহশিল্পীগণ, সংলাপ চালাতে পারে না। অন্যদিকে উম-ইয়ামের উচ্চারণে, দর্দুরক সন্তুষ্ট হয় না। দর্দুরক, বাণকে উম-ইয়ামের সঠিক উচ্চারণ শিক্ষার দায়িত্ব দেয়। দর্দুরকে বলে, যেসব উচ্চারণ উম ইয়ামের জিহ্বার আসে না বাণ সেখানে নূতন শব্দ নূতন অলঙ্কারাদি যেন বসিয়ে দেয়।

নাটকের মহড়া সাধারণত সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় শেষ হয়। অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের বসবাসের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা।

এক সন্ধ্যায় অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে। মহড়া শেষ হলে বাণ উম ইয়ামের গৃহে যায়। নায়িকা উম ইয়ামের জন্য সবিশেষ ব্যবস্থা যুক্ত আলাদা গৃহ। বাণ উইমযামের সাথে সংলাপ-মহড়া আরম্ভ করে। পার্বতী মহাদেবের সংলাপের সাথে শ্রাবণের ডম্বরু ধ্বনি যুথী পরিমল আর কদম্ব কেশরের মতো বিচ্ছুরিত বিদ্যুৎশিখা মিশে যায়। ঘন-বর্ষার নূপুরধ্বনির মাঝে উম-ইয়াম কথা খোঁজে পায় না। বাণ উম ইয়ামের কানে কানে বলে "কাদম্বরী! কথা কও। কথা কও কাদম্বরী!"

শ্রাবণধারার সাথে মেঘের গুরু গর্জন। তীব্র পবন। বিহ্বল বাণ। উইময়ামের ছন্দোময় অঙ্গে দেখে তরল বিদ্যুৎ শিখার বিচ্ছুরণ।

বিদ্যুৎ শিখা চুম্বনে চুম্বনে তার কাদম্বরীর অঙ্গে অঙ্গে আলিঙ্গন করছে। দমকা হাওয়ায় হঠাৎ বন্ধ দরজা খুলে যায়। কুলুঙ্গির ক্ষীণ দীপ নিভে যায়। সূচীভেদ্য অন্ধকারে দিগ্বিদিক ডুবে যায়। বাণ অন্ধকারে সাঁতার কেটে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। খোলা দরজা দিয়ে তীব্র হাওয়া এই সাথে বৃষ্টির ছাঁট হু হু করে ঢুকছে।

দরজার মুখে জমাট অন্ধকারে উম ইয়ামের দেহে বাণের ছোঁয়া লাগে। আকাশের ভীষণ বিদ্যুৎতরঙ্গের ছোয়ায় বাণের দেহ অসাড় হয়ে যায়। বিদ্যুৎ বল্লরী শতপাকে বাণকে আবদ্ধ করে। বাণ তার কাদম্বরীর কদম্ব কেশরে ধরা দেয়।

বাণ যখন উম ইয়ামের কুঞ্জ থেকে বের হল তখন শ্রাবণের কমণ্ডলু ধারা শ্রান্ত হয়ে গেছে। পূর্ব দিগন্তের ইন্দ্রঘরের আকাশে তখন সূর্য উদয়ের রঙিন অধিবাস উৎসব শুরু হয়েছে।

* * *

বর্ষার পর শরৎ। নাটকের মহড়া পূর্ণ বেগে এগিয়ে চলছে। বাণ অনুভব করে তার অস্থির জীবনে দেখা দিয়েছে স্নিগ্ধতার প্রলেপ। মহাকাল মন্দির প্রাঙ্গণে শুভ্র শেফালী, দীঘিতে শ্বেত রক্ত নীল পদ্ম, নীল আকাশে অভ্র খণ্ড মেঘ নিয়ে শরৎ এসেছে

উম ইয়ামকে নিয়ে বাণের বিশেষ মহড়া এখন আর উম ইয়ামের গৃহে নয়। উম-ইয়ামের পানসি নৌকার ছই এর ভিতরে মহড়া চলে। পানসির মাঝিরা মহাকাল গ্রামের ঘাটে নৌকা রেখে চলে যায়। সাতদিনের মাথায় আবার এসে উম-ইয়ামকে বাসুলী গ্রামে নিয়ে যায়।

এক রাত মহড়ার সাথে জীবন নাটকের অভিনয় চলে। বাণ তার কাদম্বরীকে অনেক কথা বলেছে। দুজনের মাঝে অনেক অনেক কথা হয়ে গেছে। কৃষ্ণা একাদশীর ক্ষীণ চাঁদ ইন্দ্রঘরের আকাশে ঝুলছে। রাত শেষ হতে দেরি নেই। প্রদীপের আলো ক্ষীণ হয়ে কাঁপছে।

উম ইয়াম বাণের কানে ঠোঁট রেখে বলে — "বাণ। তুমি আমার কে হও! আমাদের দুজনের মধ্যে কী সম্পর্ক?" বাণ, উমিয়ামের মুখমণ্ডল দুহাতে তুলে ধরে উম-ইয়ামের অধরে চুম্বনের পর চুম্বন দিয়ে দিয়ে বলে "কাদম্বরী! তোমার আমার মাঝখানে কোনও সম্পর্ক নেই। কাদম্বরী! তোমার আমার মাঝখানে কোনও বস্ত্র নেই, অলঙ্কার নেই। চন্দনরাগ নেই। নেই ত্বক-মেদ-মজ্জা। আমাদের দুজনের মাঝখানে আলো নেই অন্ধকার নেই। শীত গ্রীষ্ম প্রকৃতি পুরুষ কিচ্ছু নেই। কোনও কিছু নেই কাদম্বরী। শুধু আছে — অনন্তশূন্য।

বাণ তার কাদম্বরীকে জড়িয়ে ডুবতে থাকে। চেতনার পর চেতনার স্তর অতিক্রম করে ভেসে যায় — আদি অন্তহীন পরম শূন্যে।

বাণ চৈতন্যের জগতে ফিরে এসে দেখে ইন্দ্রঘরের আকাশে বাণের কঠিন চুম্বনে কাদম্বরীর কপোলের রক্তরাগ।

* * *

বৈশাখে কাটিগড়ার সাগরমেলা শেষ হতে চলেছে। লোহিতাক্ষ, মহাকাল নাট্যগোষ্ঠীর জন্য অকৃপণভাবে অজস্র টাকা ঢেলেছে। মহাকাল গোষ্ঠীর নাটক মঞ্চস্থ করার সবকিছু সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

বণিক গুহনদীন এবং লোহিতাক্ষ এই সাথে অলকাপুরী এবং মহাকাল নাট্যগোষ্ঠীর নাটক পরিচালকগণের আলোচনায় স্থির হয় মেলা শেষ হবার দুদিন আগে বন্দরপুরে অলকাগোষ্ঠী নাটক মঞ্চস্থ করবে। মেলা সমাপ্ত হবার একদিন আগে কাটিগড়া বন্দরে মহাকাল গোষ্ঠীর নাটক মঞ্চস্থ হবে।

লোহিতাক্ষ এবং বাণ অলকাপুরীর নাটক দেখতে বন্দরপুরে যায়। মঞ্চের সামনে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য নির্দ্ধারিত স্থানে বেতের কেদারায় লোহিতাক্ষের পাশে বাণ উপবেশন করে।

অলকাগোষ্ঠীর এবারের নাটক প্রবরসেনের সেতু বন্ধাখ্য। সেতু বন্ধাখ্য মূলত প্রাকৃত

ভাষায় লিখিত একটি কাহিনি। কাহিনির মূল বিষয়, বিশ্বকর্ম্মার পুত্র স্থপতি নলের তত্ত্বাবধানে সেতু বন্ধন করা। নল, সেতু নির্মাণের জন্য কামরূপের নিপুণ কর্মীদের নিয়োগ করেছিলেন। এই কর্মীগণ নলসেনা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। চন্দ্রগোমী স্বামী বাণকে বলেছিলেন কিরাতীয় ভাষায় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের নামের পূর্বে 'বা' উপসর্গ ব্যবহার করা হয়। স্বাভাবিকভাবে 'নল সেনা' শব্দ হয়ে উঠল 'বা নল সেনা'। অকিরাতীয় মুখে 'বানল' হয়ে গেল বানর।

সেতু বন্ধাখ্য অথবা রাবণবধ কাহিনীটি সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃত ভাষায় রচিত। বাণ লক্ষ করে অলকাপুরী নাট্যগোষ্ঠী কাহিনিটির বলিষ্ঠ নাটকীয় রূপ দিয়েছে। অনেক স্থানে প্রাকৃত ভাষার বদলে, শ্রুতি মধুর এবং ধ্বনিযুক্ত সংস্কৃত শব্দাদির প্রয়োগ করেছে।

নাটকের একটি দৃশ্য দেখে বাণের বিশেষ ভালো লাগে। বীর লক্ষ্মণ — তীর ধনু নিয়ে ভীষণ যুদ্ধ করছেন। তার দেহ কঠিন লোহার বর্মে আচ্ছাদিত। বিপক্ষের কোন অস্ত্র লোহার বর্ম ভেদ করতে পারে না। এমনি ক্ষণে দূর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর লক্ষ্মণের উপর বর্ষিত হতে থাকে। বাণ দেখে তীরগুলি লক্ষ্মণের লোহার বর্মের উপর আটকে যাচ্ছে। লক্ষ্মণ প্রথম দিকে বিষয়টি লক্ষ করেনি। যখন লক্ষ করল তখন তীরের ঝাঁক লক্ষ্মণের দেহ চেপে ধরেছে। তীরের ভারে লক্ষ্মণ পড়ে যায়।

বাণের মনে পড়ে তার জেঠাইমা, চন্দ্রষেণ মাতৃসেনের মা বলেছিলেন — কিরাতীয় ভাষায় চুম্বক হচ্ছে 'নাগবাট'। লক্ষ্মণ বন্দী হয়েছিলেন — নাগবাট অর্থাৎ চুম্বকের ভারে। কিরাতীয় শব্দ নাগবাট অকিরাতীয় মুখে হয়ে গেলে — 'নাগপাশ'।

নাগ অর্থাৎ সর্প রাত্রির প্রথম প্রহরের শেষ দিকে নাটক সমাপ্ত হয়।

* * *

পরদিন রাতে কাটিগড়া বন্দরে পার্বতীপরিণয় নাটক মঞ্চস্থ হল। দর্দুরকের পরিচালনা বাণের লেখা অভিনেতা অভিনেত্রীদের অভিনয় এই সাথে সকলের নির্দ্ধারিত কর্ম এবং শ্রম পরিপূর্ণভাবে সার্থক হল।

অজস্র দর্শকের অফুরন্ত প্রশংসা। সবার মুখে একই কথা বাণভট্ট এক মহৎ নাট্যকার। বাণভট্টের "পার্বতীপরিণয়" এক অসাধারণ নাটক।

যবনিকার আড়ালে মঞ্চের উপর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ভিড়। নানা কথা পোশাক পরিবর্তন। মঞ্চের উপর উঠে এসেছে অলকাগোষ্ঠীর শিল্পীগণ।

মঞ্চের উপর উম-ইয়াম। তাকে বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে আছে অলকাপুরী নাট্যগোষ্ঠীর কিছু অভিনেত্রী। অলকাপুরী গোষ্ঠীর অধিকাংশ অভিনেত্রী ভীষণ ক্ষুব্ধ। তাদের গোষ্ঠীর অখ্যাতা বালিকা মহাকাল গোষ্ঠীর নায়িকা হয়ে গেছে। শুধুমাত্র নাটকের নায়িকা নয়, মস্ত পণ্ডিত কন্দর্পের মত রূপবান বাণভট্টকে বগলদাবা করে ফেলেছে।

ক্ষুব্ধ নারী বাহিনী প্রকাশ্যে উম-ইয়ামের উপর তীক্ষ্ণ বাঁকা কথার ছুরি হানতে থাকে। অসহায় উম-ইয়াম চারিদিকে তাকিয়ে আশ্রয় খোঁজে। বাণ মঞ্চে নেই। মঞ্চের বাইরে লোহিতাক্ষের

সাথে কথা বলছে।

হঠাৎ ক্ষুব্ধ নারীবাহিনীর বেষ্টনী ভেদ করে প্রবেশ করে বায়ুবিকার। বিশালদেহ আলুথালু লম্বা চুল। মুখে খোঁচা দাড়ি। বায়ুবিকার উম ইয়ামের মুখের সামনে তার মুখ নামিয়ে চড়াগলায় বলে — "তোমার লজ্জা নেই? মহাদেবের মত মস্ত একটা মানুষকে জালে ফেলে চুষে নিচ্ছ! তুমি তো অসভ্য কিরাত। তুমি কী করে বুঝবে মানুষের মূল্য?"

উম-ইয়া মঞ্চ ছেড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। উম ইয়াম হঠাৎ করে চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ জানে না।

বাণ এক এক করে সব জায়গা দেখে কাদম্বরী দেবকুলিকায় গেল। কাদম্বরী দেব কুলিকার পর বাসুলী গ্রামে এল। উম ইয়াম বাসুলীতে আসেনি। হতাশ বাণ উম ইয়ামের গৃহের দাওয়ার মেঝেতে বসে পড়ল।

* * *

নাটক মঞ্চস্থ হবার দিন সাতেক পর দর্দুরক অনুমান করে বাণের খোঁজে বাসুলী গ্রামে এসে বাণের হাতে একটি লিপি দিল। লিপিতে নাটকের অভিনেতা অভিনেত্রী এবং অন্যান্য শিল্পী এবং কর্মীদের দক্ষিণার হিসাব লিখিত। হিসাব শিল্পী-কর্মীদের নামের সাথে অর্থের পরিমাণ লিখিত।

ইতিপূর্বে, নাটকের সাথে যুক্ত সকলকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নগদ অর্থাদি প্রদান করা হয়েছে এবং নগদ অর্থ ব্যয় করে বহু দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে। দর্দুরকের এই তালিকায় সেই অর্থাদি যুক্ত করা হয়নি। দর্দুরকের নূতন তালিকা এমনি ধরনের —

১)	নায়িকা ঃ	উমইয়াম	ঃ	অষ্টপণ।
২)	প্রতিলিপি লেখক ঃ	কুমার দত্ত	ঃ	পঞ্চপণ।
৩)	চিত্রকর ঃ	বীরবর্মা	ঃ	পঞ্চপণ।
৪)	কথক ঃ	জয়সেন	ঃ	পঞ্চপণ।
৫)	নর্তকী ঃ	হরিণিকা	ঃ	চতুর্পণ।
৬)	সংবাহিকা (কেশ বেশ শিল্পী)	কেরলিকা	ঃ	চতুর্পণ।
৭)	প্রসাধনিকা	কুরঙ্গিকা	ঃ	চতুর্পণ।
৮)	নৃত্যযুবা	তাণ্ডবিক	ঃ	ত্রিপণ।
৯)	নাট্যযুবা	শিখণ্ডিক	ঃ	ত্রিপণ।
১০)	মৃদঙ্গ বাদক	জীমূত বাহন	ঃ	দ্বিপণ।
১১)	বংশী বাদক	মধুকর	ঃ	দ্বিপণ।
১২)	ঐ	পারাবত	ঃ	দ্বিপণ।

১৩) গায়ক	সোমিল	ঃ	দ্বিপণ।
১৪) ঐ	গ্রহাদিত্য	ঃ	দ্বিপণ।

বাণ লক্ষ করে এই তালিকায় পরিচালক দর্দুরকের প্রাপ্য কোনও অর্থাদির পরিমাণ লেখা হয়নি। বাণ দর্দুর প্রাপ্য অর্থের অঙ্ক জিজ্ঞাসা করে। দর্দুরক বিনীতভাবে বলেন, এই নাটক পরিচালনা করার সুযোগ পেয়ে তার জীবন ধন্য। তিনি আগামী দিনের কোনও এক সুমহান সাহিত্যিকের প্রথম রচনা মঞ্চস্থ করার সুযোগ পেয়েছেন। এমনি সুবর্ণ সুযোগ পাওয়াই মস্ত পাওয়া। নাটক পরিচালনার জন্য তার আর কোনও আলাদা অর্থের প্রয়োজন নেই।

নাটকের অন্যান্য খরচের পরিমাণ দশ টাকা দ্বাদশপণ। এই অর্থ বাণ নিজের হাতে ব্যয় করেছে। দর্দুরক তার তালিকার মোট ব্যয় তিন টাকা ত্রিপণের সাথে বাণের হাতে ব্যয় করা দশ টাকা দ্বাদশপণ যোগ করে বলেন সর্বমোট ব্যয়ের পরিমাণ তেরো টাকা পঞ্চদশপণ।

বাণ সর্বমোট ব্যয়ের পরিমাণ তেরো টাকা পঞ্চদশ পণ শুনে দর্দুরকের দিকে তাকিয়ে বলে, নাটকের লেখক তথা নায়কের কিছু অর্থের প্রয়োজন। বাণ, দর্দুরকের নিকট থেকে হিসাবের তালিকা নিয়ে লিখে— 'পার্বতী পরিণয় নাটক লেখক তথা নাটকের নায়ক ঃ — বাণভট্ট ঃ একপণ। সর্বমোট ব্যয় — চৌদ্দ টাকা।

বাণ হিসাবপত্রের তালিকার গায়ে লোহিতাক্ষকে লিখে জানায়, দর্দুরকের হাতে অর্থাদি অর্পণ করতে। দর্দুরক গোপ্পপলীর পথে যাত্রা করেন।

*　　　　*　　　　*

উম ইয়ামের খবর নেই। উম ইয়াম হারিয়ে গেছে। বাসুলী গ্রামে বিষাদের ছায়া। কাদম্বরী কুলে বিষাদের ছায়া। যেদিন নিখোঁজ হবার খবর এসেছিল সেদিন বিকালে উম-ইয়ামের বাবা তাদের গ্রামের বৌদ্ধমঠে সন্ন্যাসিনীর উপদেশ নিতে গিয়েছিলেন। গিয়ে শোনেন সন্যাসিনী মাত্র একদিন আগে শেষ রাতে জনৈকা শিষ্যাকে নিয়ে তীর্থ দর্শনে চলে গেছেন। উম ইয়ামের বাবা নিস্তব্ধ। নিস্তব্ধ বাবার সম্মুখে বাণ নিজেকে অপরাধী বোধ করে।

দর্দুরকের চলে যাবার একদিন পর, সন্ধ্যাকালে একটি কিশোর শ্রমণ উম ইয়ামের সংবাদ নিয়ে এল। বৌদ্ধবিহারের মহাভিক্ষু তাকে পাঠিয়েছেন।

পরদিন ভোরে বাণ এবং উম ইয়ামের বাবা, কিশোর শ্রমণের সাথে যাত্রা করলেন। যাত্রা কামলঙ্কা নৌ-ঘাট থেকে নৌকায় শুরু হল। সারাদিন শোনবিলের উপর দিয়ে নৌকা চালিয়ে, সন্ধ্যায় উপস্থিত হলেন কান্তে উদক গ্রামের অবলোকিতেশ্বর মহাযান বৌদ্ধবিহারে।

কিশোর শ্রমণের নাম সুমতি। সারাদিন নানা বিষয়ে ওদের আলাপ আলোচনা হয়েছে। সুদীর্ঘ আলাপ আলোচনায় বাণ এবং উম ইয়ামের পিতা ভালো করে বুঝে নিয়েছেন সুমতি উম ইয়ামের কোনও খবরাদি জানে না। মহাভিক্ষুর নির্দেশমতো খবর নিয়ে এসেছে মাত্র।

অবলোকিতেশ্বর বিহার প্রসঙ্গে সুমতি বলে, প্রায় সোয়াশ বছর আগে বৈন্যেয় গুপ্ত নামে একজন রাজা, এই বিহারের খরচ পত্রাদি পরিচালনার জন্য, 'পঞ্চখণ্ড' ভূমি, এই অবলোকিতেশ্বর

বিহারের নামে তাম্রপত্র করে দান করেছেন।

বাণ সুমতিকে জিজ্ঞাসা করেছিলে এই অবলোকিতেশ্বর বিহারের প্রায় সংলগ্ন উত্তর দিকে যে সুবৃহৎ রাজবিহার মঠ আছে সে কেন সেই মঠে যোগ দেয়নি? উত্তরে সুমতি অবলোকিতেশ্বর মঠের প্রশংসা করে বলেছিল, এই মঠের পরিবেশ শান্ত নিয়মনিষ্ঠ এবং সুশৃঙ্খলাপূর্ণ। এই বিখ্যাত অবলোকিতেশ্বর বিহারের মূল প্রতিষ্ঠাতা মহাপুণ্যবান মহাযানপন্থী ভিক্ষাচার্য শান্তিদেব।

সুমতি বিহারে পৌঁছে মহাভিক্ষুর কাছে ওদের পৌঁছানোর সংবাদ দেয়। মহাভিক্ষু নির্দেশ প্রদান করেন আগামী প্রভাতে ওদেরে উম-ইয়ামের সাথে দেখা করতে দেওয়া হবে।

বাণ এবং উম-ইয়ামের পিতা বৌদ্ধ বিহারের অতিথিশালায় রাত্রিযাপন করেন।

পরদিন ভোরে বিহারের প্রচলিত নিয়মানুসারে বাণ এবং উমইয়ামের পিতা স্নান করে গৈরিক চীরবস্ত্র পরিধান করে প্রস্তুত হলেন। প্রস্তুত হলেন বিহারের পরম সাধনাকক্ষে প্রবেশের জন্য।

মহাভিক্ষুকে অনুসরণ করে মঠের নানা প্রকোষ্ঠ পার হয়ে একটি বন্ধ দরজার সম্মুখে দাঁড়ালেন। মহাভিক্ষু বন্ধ দরজায় মৃদুশব্দ করলে দরজা খুলে যায়। কক্ষের ভিতর অন্ধকার। ক্ষীণকম্পিত প্রদীপালোকে দেখা যায় একজন ভিক্ষুণী পদ্মাসন করে স্থির হয়ে বসে আছে। মুণ্ডিত কেশ। বন্ধ চোখ।

বাণ চিৎকার করে উঠে "কাদম্বরী! কাদম্বরী"।

বাবা চিৎকার করে ডাকেন — "উম-ইয়াম! উম-ইয়াম।"

ক্ষীণ প্রদীপালোকে দেখা যায় উম ইয়ামের বন্ধ চোখ বেয়ে অশ্রুবিন্দু ঝরছে!

মহাভিক্ষু বাণ এবং উম ইয়ামের বাবার বিচলিত অবস্থা দেখে উম ইয়ামকে বলেন "কল্যাণী! তাকিয়ে দেখো। তোমার প্রিয়জন এসেছেন। কল্যাণী! তুমি যে সত্যকে আশ্রয় করেছ সেই সত্য তোমার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হোক। তুমি সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করো।

"ন পরোপরং নিকুব্বেথ
নাতিম এও,এওথ কথচি ন কঞ্চি
ব্যারোসনা পটিঘ সএওএত্তা ?
ন এও এও মএও এও স্ স দুকখামিচ্ছেয্য।"

"হে কল্যাণী। পরস্পরকে বঞ্চনা করো না কোথাও কাউকে অবজ্ঞা করো না। কায়ে বাক্যে অথবা মনে, ক্রোধ করে অন্যের দুঃখ সৃষ্টি করো না।"

মহাভিক্ষুর উপদেশে উম-ইয়াম শান্ত চোখে তাকায়। তাকিয়ে বলে "তোমরা চলে যাও। আশীর্বাদ করো ভগবান অবলোকিতশ্বরের চরণে যেন ঠাঁই পাই। বাণ! কাদম্বরী কন্যাকে ভুলে যাও। বাণ! আমি প্রার্থনা করি আমার এই ভঙ্গুর দেহ নিয়ে তোমার কামনা বাসনা তোমার সাধনার পথে যেন বাধার সৃষ্টি না করে। অবলোকিতেশ্বরের করুণা তোমার উপর বর্ষিত হোক।

উম ইয়াম চোখ বন্ধ করে উচ্চারণ করে "বুদ্ধং শরনং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি; সংঘং শরণং গচ্ছামি।"

মহাভিক্ষুর নির্দেশে উম-ইয়ামের কক্ষের দরজা আবার বন্ধ হয়।

উম ইয়ামের বাবা বাসলীর উদ্দেশে এবং বাণ ময়ূর শাল্মলীর পথে যাত্রা করে।

বাণ, দুদিনের মাথায় ব্রাহ্মণ্যাধিবাসের কাছে পৌছায়। কুতকুট্ট মন্দিরের সামনে বাণের সাথে করালীর দেখা হয়। করালী বাণকে বলে — বাণ! শুভসংবাদ পেলাম। তোমার ঔরসে করাত নারী গর্ভবতী হয়েছে। বাচ্চা প্রসবের পর কিন্তু মস্ত ভোজের ব্যবস্থা করতে হবে।"

*　　　　*　　　　*

বাণ অস্থির। বন্ধুরা বাণের কাছাকাছি ভিড়তে পারে না। তার জীবন নৌকা হাল ভেঙে ঘূর্ণি ঝড়ের মধ্যে পড়েছে। বাণ কখনো পালিতক কখনো কাদম্বরী চন্দ্রপুর চণ্ডিকা অরণ্য কখনো বা কান্তেউক গ্রামের অবলোকিতেশ্বর বিহারে। বিহারে গিয়ে উম ইয়ামের সাথে দেখা করার সুযোগ পায় না। মাঝে মাঝে কিশোর শ্রমণ সুমতির সাথে দেখা করে। সুমতি উম ইয়ামের বিশেষ কোনও সংবাদ দিতে পারে না। বিহারের কঠোর নিয়ম অনুসারে উম ইয়ামে-দরজা বন্ধ করে তপস্যা করছে।

এমনি করে বাণ হাজির হল চন্দ্রমৌলি শিবমন্দিরে। উদ্‌ভ্রান্ত বাণকে দেখে, চন্দ্রমৌলি মন্দিরের অধিকারী চন্দ্রগোমী স্বামী অনুভব করেন বাণের জীবনে ভীষণ কিছু ঘটে গেছে। গভীর মমতায় তিনি বাণকে আগলিয়ে রাখেন।

খবর পেয়ে লোহিতাক্ষ চন্দ্রমৌলি শিবমন্দিরে আসে। লোহিতাক্ষ বাণের অস্থিরতা দেখে ভয় পায়। লোহিতাক্ষ বাণকে গোপ্পপলীতে নিয়ে আসে। গোপ্পপলীর শান্ত পরিবেশ এবং শ্রীগোপালের গভীর মমতা বাণের হৃদয়ের ক্ষতে স্নিগ্ধ প্রলেপ লেপন করে। বাণের অস্থিরতা ক্রমে শান্ত হতে আরম্ভ হয়। ক্লান্তি! অসহ্য ক্লান্তি বাণকে জড়িয়ে ধরে। বাণের ভীষণ ঘুম পায়। দিনরাত ঘুমায়। শ্রীগোপাল বাণের চতুর্দিকে, স্তব্ধতার দেয়াল নির্মাণ করেছেন। গোপ দপ্তরের কর্মীরা বাণের বিশ্রামকক্ষের চারদিকে পাহারা দেয়।

ঘুম আর বিশ্রামে বিশ্রামে মাসখানেক কাটে। মাস খানেক পর বাণ কিছু পরিমাণে স্বাভাবিক হয়ে উঠে। লোহিতাক্ষ বলে তার সমুদ্রের করণ্ডীপোত নির্মাণের কাজ প্রায় সমাপ্ত হতে চলছে।

লোহিতাক্ষ লক্ষ করে করণ্ডীপোত প্রসঙ্গ কথায় বাণের চোখে মুখে উৎসাহের ছটা। অনেকদিন পর লোহিতাক্ষ স্বস্তিবোধ করে। বাণ করণ্ডীপোত নির্মাণ দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করে।

লোহিতাক্ষ স্থির করে করণ্ডীপোত দেখানোর সুযোগে বাণকে নিয়ে কাছাকাছি কিছু স্থানে বেড়াতে যাবে। অবশ্য নিছক শখের বেড়ানো নয়। পিণ্ডার বন্দরে কিছু আর্থিক লেনা দেনা আছে।

এক প্রভাতে লোহিতাক্ষ বাণকে নিয়ে যাত্রা করে। দুই ঘোড়ার গাড়ী সর্ষপ সড়ক ধরে উত্তর দিকে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয় প্রহরে গাড়ি চূড়ামণি নৌবন্দরে পৌছায়। নৌবন্দরের বাজারের এক পান্থশালায় লোহিতাক্ষ এবং বাণ দ্বিপ্রহরের ভোজন সমাপ্ত করে। ভোজন সমাপ্তের পর গাড়ি

আবার সর্ষপ সড়ক ধরে উত্তর দিকে এগিয়ে যায়। গাড়ি যখন পিণ্ডার নৌবন্দরের পৌছাল তখন বেলা তিনপ্রহর।

পিণ্ডার নৌবন্দরে লোহিতাক্ষের ব্যবসায়াদির একাধিক গৃহ আছে। লোহিতাক্ষ বাণকে নিয়ে তার নিজস্ব অতিথিশালায় প্রবেশ করে। সন্ধ্যার পর লোহিতাক্ষ ব্যবসা সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেনের জন্য বের হয়ে যায়। অতিথিশালায় বাণ একা ঘুমায়।

পরদিন ভোরে যাত্রা উল্টোপথে শুরু হয়। গতকালের পথে গাড়ি সর্ষপ সড়ক ধরে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যায়। যাত্রার লক্ষ্য করণ্ডীপোত নির্মাণের স্থান। গাড়ি এবার দ্রুতগতিতে চলছে।

প্রথম প্রহরের মধ্যেই গাড়ি চূড়ামণি নৌবন্দর পার হয়ে যায়। চূড়ামণি বন্দর পার হয়ে, গাড়ি খানিক পথ এগিয়ে সর্ষপ সড়ক পথের উপর দাঁড়ায়। বাণ লক্ষ করে সড়কপথ থেকে একটি ছোটো পথ হাতের বাম দিকে — পূর্বদিকে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে এগিয়ে গেছে।

লোহিতাক্ষ গাড়ি চালকের সাথে সঠিক পথ কিনা পরামর্শ করে জঙ্গলীপথে প্রবেশ করে। পথ আঁকাবাঁকা অসমান। গাড়ি ধীরগতিতে এগিয়ে চলে। পথে বাণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

কিছু পথ এগিয়ে গাড়ি একটা বাঁক ঘুরে হঠাৎ থেমে পড়ে। রাস্তার উপর পড়ে আছে মস্ত এক কাটা গাছ। উলঙ্গ প্রায় কিছু মেয়ে পুরুষ কাটাগাছের ছোটো ছোটো ডাল-পালা কেটে আঁটি বাঁধছে। দুটি বেশ শক্ত সমর্থ লোক, রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ঝগড়া করছে। লোহিতাক্ষের গাড়ি দেখে এরা দুজন এগিয়ে আসে। দুজন, পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। পরস্পরের ঝগড়ার কারণ বনরক্ষকের ঘুষ। জঙ্গলে গাছ কাটলে বনরক্ষককে ঘুষ দিতে হয়। এদের সাথে ঘুষের টাকা ছিল না। কাটা গাছের পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে বনরক্ষক হাজির হয়েছিল। ঘুষ পায়নি তাই ওদের কুড়াল দুটি নিয়ে গেছে। এখন দুজনে ঝগড়া করছে একজন অন্যজনকে বলছে ঘুষের টাকা অন্য জনের আনার কথা ছিল।

উলঙ্গ প্রায় মেয়ে পুরুষ এদের সাথে কাঠুরিয়া দুজন মিলে গাছের ডালপালা সরিয়ে দিয়ে গাড়ি চলার পথ করে দেয়। গাড়ি এগিয়ে চলে।

কিছু এগিয়ে দেখা যায় — দুটি গরুর গাড়ি। গাড়ি দুটি যেমন নড়বড়ে তেমনি বলদগুলি। হতচ্ছাড়া গাড়োয়ান। ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে চলছে। গাড়ি দুটি ছোটো বড়ো নানা ধরনের মাটির জালায় ঠাসা। গরুর গাড়ির পাশ কাটিয়ে লোহিতাক্ষের ঘোড়ার গাড়ি এগিয়ে যায়।

গরুর গাড়ি পার হলে লোহিতাক্ষ বাণকে বলত গেলে কানের মধ্যে মুখ রেখে বলে, গত সন্ধ্যায় পিণ্ডার বন্দরে বেশ কিছু টাকা আদায় করেছিল। সংক্ষিপ্ত পথে সেই টাকা গোপ্পপলীতে পাঠাচ্ছে। লোহিতাক্ষ বলে, এই দুটি গাড়ির মধ্যে একটি গাড়ির জালার ভিতর টাকা আছে। বাণ বিস্মিত। লোহিতাক্ষ বলে, সে এবং অন্যান্য বহু ব্যবসায়ী এমনি করে একস্থান থেকে অন্যস্থানে টাকা পাচার করে। এমনিভাবে — গোপনে পাঠানোর কারণ, পথের চোর ডাকাত। গরুর গাড়ি চালক তার উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

কিছুপথ পার হয়ে শোনা যায় অজানা বাদ্যযন্ত্রের সুরঝঙ্কার। ক্রমে সুরঝঙ্কার তীক্ষ্ণ শব্দে পরিণত হয়। লোহিতাক্ষ বলে গাড়ি লোহারপোতা গ্রামের কাছে এসেছে। আরো কিছু পথ এগিয়ে

দেখা যায় গ্রামের আকাশ ধূলা এবং ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। রাস্তার দুধারে অজস্র জ্বলন্ত হাপর। লোহারিগণ মস্ত মস্ত হাতুড়ি দিয়ে লোহা পিটিয়ে চলছে। লোহিতাক্ষ বলে, এই লোহারপোতা গ্রামে দারুণ ইস্পাত তৈরি হয়। লোহা ইস্পাতের সাথে তামার পাত এবং তামার নানা প্রকার জিনিসপত্র তৈরি হয়। দেশ বিদেশের রাজা মহারাজাগণ, তাদের দানপত্রে যে তাম্রপত্র ব্যবহার করেন সেইসব তাম্রপত্র এখানেই নির্মাণ করা হয়।

লোহিতাক্ষের গাড়ি রাস্তার পাশে থামে। রাস্তার পাশের হাপরে লোহা নিয়ে কাজে ব্যস্ত লোকটি লোহিতাক্ষকে দেখে উঠে দাঁড়ায়। বাণ দেখে, দলে দলে লোহারিগণ গাড়ির চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। লোহারিগণ লোহিতাক্ষ এই সাথে বাণকে মাথা নুইয়ে প্রণাম করছে। লোহিতাক্ষ বলে সে এই ব্যবসায়ের মালিক।

গাড়ি এগিয়ে সামান্য পথ গেলে দেখা যায় পথের দুদিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। লোহিতাক্ষ বলে এখানে ছোটো বড়ো গাছ পুড়িয়ে হাপরের জন্য কাঠকয়লা প্রস্তুত করা হচ্ছে।

জ্বলন্ত আগুনের অঞ্চলের পর দেখা যায় অনেক করাতি বড়ো বড়ো করাতে দিয়ে গাছ চিড়ে তক্তা তৈরি করছে। লোহিতাক্ষ বাণকে কিছু বলে কিন্তু অজস্র করাতের শব্দে বাণ কিছু বুঝতে পারে না।

করাতের ভীষণ শব্দ; খানিক পার হয়ে এলে লোহিতাক্ষ বলে এখানে থেকেই সে তার করণ্ডীপোতের কাঠ এবং ইস্পাতের পেরেক ইত্যাদি নির্মাণ করিয়েছে।

বিশাল চূড়ামণি অঞ্চলের শেষ দক্ষিণ মাথায় গাড়ি পৌঁছায়। পথের পাশে ছোটো-বড়ো টিলা। পাহাড়ি টিলাগুলির ভিতর, গঙ্গিনিকা অর্থাৎ পশ্চিমসাগরের জলরাশি ঢুকে গেছে। দুই টিলার মাঝখানের সমুদ্র জলে, ছোটো বড়ো নৌকা নোঙর করে আছে। টিলাগুলির ভিতরে প্রবেশ করা জলরাশি নৌকাদির নিরাপদ আশ্রয়ঘাট। নৌকার মাঝিগণ এই স্থানকে বলে চুড়ানীবাড়ি।

লোহিতাক্ষ গাড়ী থেকে নেমে বাণকে নিয়ে দুটি মাঝারি আকারের টিলার মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলে। এগিয়ে গিয়ে পৌঁছায় করণ্ডীপোতের নির্মাণস্থানে। খানিক দূর থেকে দেখা যায় অনেক মানুষ কাজ করছে। একে অন্যকে নির্দেশ দিচ্ছে। দারুণ এক কর্মযজ্ঞ।

লোহিতাক্ষকে দেখে এক সাথে সবাই স্থির হয়ে দাঁড়ায়। হঠাৎ কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। বাণ দেখে করণ্ডীপোত প্রস্তুত হয়ে গেছে। পোতে রং দেওয়া হচ্ছে। লোহিতাক্ষ বলে, জাহাজের মাঝখানে যে মস্ত স্তম্ভটিতে রং দেওয়া হচ্ছে, এর নাম মাস্তুল · মাস্তুলে বহু পাল বাঁধা হয়। এই মাস্তুতল হচ্ছে সম্পূর্ণ আস্ত একটি পুরোনো পাকা শালবৃক্ষ। এমনি ধরনের আস্ত গাছের মাস্তুলের জন্য পূর্ব সাগর-পশ্চিম সাগরের করণ্ডীপোত জগৎবিখ্যাত।

বাণ ভালো করে লক্ষ করে করণ্ডীপোত তৈরি হচ্ছে দুটি টিলার মাঝখানে। বাণের মনে প্রশ্ন, মাটির উপর থেকে কীভাবে জলে নিয়ে যাবে? শেষপর্যন্ত লোহিতাক্ষকে জিজ্ঞাসা করে?

প্রশ্ন শুনে লোহিতাক্ষ, বাণকে নিয়ে দুটি টিলার সম্মুখভাগে উপস্থিত হয়। সম্মুখ অংশে দুটি টিলা নিয়ে মস্ত এক মাটির বাঁধ। বাঁধের অন্য দিকে সমুদ্রের জল। লোহিতাক্ষ বলে করণ্ডীপোত সম্পূর্ণ হয়ে গেলে এই বাঁধ কেটে দেওয়া হবে। সমুদ্রের জল এসে করণ্ডীপোতকে জলে ভাসিয়ে

দিবে। তারপর বাঁধপথে বের হয়ে সমুদ্র-মহাসমুদ্র।

লোহিতাক্ষ গোপ্পপল্লীতে ফিরে এসে তাদের পূর্ব পুরুষগণ কীভাবে বিদেশ বাণিজ্য করতেন সে বিষয়ে বাণের সাথে গল্প করে। লোহিতাক্ষ বলে তার বাবা-ঠাকুরদা বিদেশ বাণিজ্য করতেন দুই ধরণের। একটি হচ্ছে বিদেশী বণিকদের চাহিদা অনুসারে মালপত্র ক্রয় করে জমা করে রাখতেন। ক্যাটিগড়া বন্দরে । বিদেশী বণিকগণ কাটিগড়া বন্দরে এসে মালপত্র নিয়ে যেত।

অন্য ধরনের বাণিজ্য হচ্ছে গুদাম থেকে কিছু মালপত্রের নমুনা নিয়ে সিংহল বন্দরে চলে যেতেন। সেখানে বিদেশী বণিকগণ পছন্দ করা জিনিসপত্র তাদের জাহাজ নিয়ে এসে কাটিগড়া বন্দর থেকে নিয়ে যেতেন।

লোহিতাক্ষ বলে গঙ্গিনিকা থেকে করণ্ডীপোত সাধারণত সিংহল পর্যন্ত যাতায়াত করে। সিংহল থেকে আরবীয় জাহাজ মালপত্র নিয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূল ধরে আরব সাগরের উপর দিকে ইউরোপের দিকে যায়।

লোহিতাক্ষ তার বিদেশ বাণিজ্য প্রসঙ্গে বলে, এবার মালপত্র সিংহলে বিক্রি না করে, আরব সাগর হয়ে, লোহিত সাগর দিয়ে মিশর দেশে পৌছাবে। মিশরের পর করণ্ডী জাহাজ আর যেতে পারবে না। এরপর কিছু পরিমাণ স্থলপথ অতিক্রম করে রোম দেশে যেতে হয়। যদি সুযোগ সুবিধা পায়, তাহলে মিশর থেকে মালপত্র নিয়ে, রোমদেশে চলে যাবে। সুযোগ সুবিধা না হলে, মিশর দেশে মাল বিক্রি করবে।

লোহিতাক্ষ তার বিদেশ বাণিজ্য পরিকল্পনায় বিশেষ সুযোগ পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলে, তার ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন। আরব এবং লোহিতসাগর বাণিজ্যপথ অভিজ্ঞ এক বিস্ময়কর গ্রীক নাবিককে পেয়েছে। সিংহলের পর ভারতের পশ্চিম উপকূল থেকে সে করণ্ডীপোতের হাল ধরবে।

বাণ দিন চারেকের মাথায় করণ্ডীপোত নির্মাণ স্থান চুড়ানি বাড়িতে লোহিতাক্ষের সেই বিস্ময়কর গ্রীক নাবিকের সাথে পরিচিত হয়। করণ্ডীপোতে লাগানো রং শুকিয়ে গেছে। বাণ করণ্ডীপোতের পাশে গিয়ে দেখে কারখানার সব লোক উপর দিকে চেয়ে আছে। দেখা যায় উঁচু মাস্তুলের ডগায় একজন লোক হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে। এমন সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে বসে আছে দেখে মনে হয় যেন সে তার ঘরের দাওয়ায় বসে তাম্বুল খাচ্ছে। খানিক বাদে মাস্তুল বেয়ে কাঠবিড়ালির মত তরতর করে নেমে আসে।

বাণের সাথে গ্রীক নাবিকের আলাপ পরিচয় হয়। নাবিকের নাম এলিউস গেলুস। জাতিতে গ্রীক কিন্তু তিন পুরুষ ধরে ইজিপ্টে বসবাস। নাবিক গেলুস সত্যিই বিস্ময়কর। সে তার কাকার খোঁজে চন্দ্রপুর এসেছে। তার কাকা বিদ্যাশ্রমের অন্ধমুনি অগস্তি। গেলুসের বাড়ি দক্ষিণ ইজিপ্টের বেরেনিস শহরে। তার বাড়ির পাশে কাকা অগস্তির বাড়ি।

নাবিক বেরেনিস বলে তার কাকা অগস্তি পাঁচশ বছরের পুরনো নামগোত্রহীন এক গ্রীক বণিকের ভ্রমণ কাহিনি পাঠ করে অস্থির হয়ে উঠে ছিলেন। অজ্ঞাতনামা লেখকের ভ্রমণ কাহিনিতে, পৃথিবীর পূর্বদিকের শেষ আন্তর্জাতিক বন্দর কাটিগড়ার কথা লিখিত হয়েছে। আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্ন পৃথিবীর পূর্বদিকের শেষ বন্দর কাটিগড়া দেখবেন।

অগস্তি খোঁজখবর নিয়ে শেষপর্যন্ত ঝাঁপিয়ে পড়লেন সূর্যোদয়ের পথে। তিনি লোহিত সাগরের মাইয়স-হরমস বন্দর থেকে আরব জাহাজ করে পৌছালেন সিংহল। সিংহল বন্দর থেকে করণ্ডীপোতে সোজা কাটিগড়া বন্দরে।

গেলুস বলে তার ঠাকুমা অর্থাৎ অগস্তির মা এখনো বেঁচে আছেন। রাতদিন অগস্তির কথা বলে বলে ঠাকুমা কাঁদতেন। ঠাকুমার রাতদিন কান্না শুনে শেষ পর্যন্ত কাকার খোঁজে এসেছে। কাকার সাথে চন্দ্রপুরে দেখা হয়েছে। অনেক কথার সাথে বলেছেন বহুবছর আগে গঙ্গিনিকা চরের ভীষণ বালুর ঝড়ে ধারালো পাথরকণা তার এক চোখে বিদ্ধ হয়েছিল। প্রথমে এক চোখ, এরপর দ্বিতীয় চোখ নষ্ট হয়ে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেলেন। বাণ এবং গেলুসের কথাবার্তা এক আশ্চর্য খিচুড়ি ভাষায় হয়েছে।

লোহিতাক্ষের বাণিজ্যযাত্রার সময় ঘনিয়ে আসে। বাণ আবার গম্ভীর হতে থাকে। বাণের পরিবর্তন এবং মুখে বিষাদের দ্বারা শ্রীগোপালের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।

শ্রীগোপাল একদিন হঠাৎ করে বাণকে বলেন, বাণের উচিত ভারতের তীর্থস্থানগুলি দেখা। নানা কথার সাথে তীর্থ পরিক্রমার খরচপাতির প্রসঙ্গ ওঠে। খরচপাতির টাকাকড়ি প্রসঙ্গে লোহিতাক্ষ বাণকে বলে বাণ এখন মস্ত ধনী। বাণের অনেক টাকা কড়ি জমা হয়ে আছে। সাগর মেলার সৈন্ধব লবণের ব্যবসা বর্তমানে বিশাল রূপ নিয়েছে। এই ব্যবসা দূর-দূরান্তের পাহাড় পর্বত ও গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে গেছে।

দীর্ঘ আলোচনায় স্থির হয় বিদেশ বাণিজ্যের করণ্ডীপোতে লোহিতাক্ষের সাথে বাণ যাত্রা করবে। করণ্ডীপোত সিংহল অতিক্রম করে যখন আরব সাগর দিয়ে ভারতের পশ্চিমকূল ঘেঁষে চলবে, তখন ভারতের পশ্চিম উপকূলের কোনও তীর্থক্ষেত্রে নেমে যাবে। তারপর শুরু হবে বাণের তীর্থপরিক্রমা। তীর্থপরিক্রমা শুরু হবে ভারতের শেষ পশ্চিম সীমান্ত থেকে। ভারতের পূর্ব সীমান্তে আবার ফিরে এসে সেই পরিক্রমা সমাপ্ত হবে।

শ্রীগোপাল বাণের নিজস্ব অর্থ থেকে বিভিন্ন পরিমাণের অর্থমূল্যের নানা হুন্ডি বানিয়ে দিলেন। হুন্ডিতে লিখিত হল হুন্ডিতে লিখিত অর্থের দ্বিগুণ অর্থ ফিরিয়ে দিবেন পূর্ব ভারতের বিখ্যাত বণিক শ্রীগোপাল। প্রতিটি হুন্ডিতে স্বাক্ষর করেছেন শ্রীগোপাল।

শ্রীগোপাল বাণকে হুন্ডি ভাঙিয়ে টাকা কড়ি সংগ্রহের নিয়মকানুন এবং সেই সাথে হুন্ডি সম্পর্কে সতর্কতার বিষয় ভাল করে বুঝিয়ে দেন।

শ্রীগোপাল বলেন, তার হুন্ডি ভারতের সর্বত্র বিশিষ্ট ব্যবসায়ীগণের কাছে বিশেষ পরিচিত এবং সর্বত্র বিশ্বাসযোগ্য।

বাণ, তীর্থ পরিক্রমাণ জন্য প্রস্তুত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চূড়ামণি বন্দর অঞ্চলের দক্ষিণ সীমান্ত শ্রীগোপালের নৌ-ঘাট। মাঝিমাল্লা এবং সাধারণ মানুষের মুখে শ্রীগোপালের নৌ-ঘাট অঞ্চল চূড়ানিবাড়ি নামে পরিচিত।

শুক্লাতৃতীয়ার শুভক্ষণে উৎসব, করণ্ডীপোত যাত্রা করবে। দূর-দূরান্তের মানুষ নীরাজনা উৎসব দেখতে চূড়ানিবাড়ি ঘাটে এসেছে। বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের সাথে মহারাজা জয়নাগের প্রতিনিধি এবং এই অঞ্চলের শাসনকর্তা নারায়ণ দেবও এসেছেন।

মস্ত টিলার পাশে নৌ-ঘাট। টিলাভূমির পাথরের গায়ে পশ্চিম সাগরের ঢেউ এসে করতালি দিচ্ছে। সুবিশাল করণ্ডীপোত প্রায় টিলাভূমির গা ছুঁয়ে মৃদু দুলছে। করণ্ডীপোতের সামনে টিলাভূমির প্রাঙ্গণে বিশাল চন্দ্রাতপের ছায়ায় নীরাজনা উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

পাঁচজন পণ্ডিত সমবেতভাবে বেদমন্ত্র পাঠ করে চলছেন। চণ্ডিকা দেবীর বিগ্রহ স্থাপন করে চণ্ডিকা স্তোত্র পাঠ করে চলছেন পুরোহিতগণ। গণেশ বিগ্রহের সম্মুখে গাণপত্য পুরোহিতগণ ধ্যানমগ্ন। লিঙ্গ স্থাপন করে শিবার্চনা মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে। মকরবাহনা গঙ্গামূর্তির সামনে ভিড় উপচে পড়ছে।

সমুদ্রযাত্রার পূর্বমুহূর্তে শ্রীগোপাল লোহিতাক্ষ এবং বাণ স্নান সেরে নববস্ত্র পরিধান করে করণ্ডীপোতের হালের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। পিতা-পুত্রের মাঝখানে বাণ। পিতা পুত্রের হাত অঞ্জলিবদ্ধ। বাণের অঞ্জলিবদ্ধ হাতে বিল্বপত্র! টিলাভূমির নীরাজনা উৎসব প্রাঙ্গণ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ গিয়ে শ্রীগোপালদের দক্ষিণ দিকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালেন। ব্রাহ্মণদের হাতে ঘৃতপ্রদীপ।

ব্রাহ্মণগণের পর মৃদু নৃত্যের ছন্দে পাঁচজন বারাঙ্গনা শ্রীগোপালদের বামপাশে দাঁড়াল। সালংকার, রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্রে ভূষিতা যুবতী বারাঙ্গনাদের দুহাতে সজল লালপদ্ম।

নীরাজনা উৎসবের উঁচু প্রাঙ্গণ থেকে, পুরোহিতের কম্বুকণ্ঠে উচ্চারিত হল গঙ্গাস্তোত্র। স্তোত্রের সাথে ব্রাহ্মণদের ঘৃতপ্রদীপ এবং বারাঙ্গনাদের সজল রক্তকমল পূর্ণ অঞ্জলিবদ্ধ হাতগুলি উর্দ্ধে আন্দোলিত হয়ে আকাশ - আরতি আরম্ভ করল।

বাণের বিল্বপত্রপূর্ণ অঞ্জলিবদ্ধ হাতদুটি স্থির। স্থির পিতা-পুত্রের হাত। তিনজন ধ্যান নিমগ্ন।

নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে করণ্ডীপোতের নীরাজনা উৎসব সমাপ্ত হল। নীরাজনা রাজকীয় উৎসব। যুদ্ধযাত্রায় রাজা মহারাজাগণ এই উৎসব করেন। লোহিতাক্ষের এই করণ্ডীপোতের যাত্রা মস্ত এক যুদ্ধযাত্রার মতো।

করণ্ডীপোত থেকে শ্রীগোপাল, ব্রাহ্মণ এবং বারাঙ্গনাগণ নেমে এলে করণ্ডীপোত যাত্রা করে। করণ্ডীপোত যাত্রা করে পশ্চিম সাগরের জল কেটে কেটে দক্ষিণ দিকে।

করণ্ডীপোত, বঙ্গোপসাগরের উপকূল ধরে এগিয়ে যায়। এমনি করে উপকূল ছুঁয়ে চব্বিশ দিনের মাথায় সিংহলের অনুরাধাপুর বন্দরে নোঙর করে। করণ্ডীপোতের কোনও নাবিক সিংহল দেশ অতিক্রম করে আরবসাগরে যায়নি। আরবসাগরে গ্রীক নাবিক এলিউস গেলুসের উপর ভরসা। গেলুস অভয় দেয়। বলে লোহিত সাগরের মাইয়স হরমস বন্দর থেকে সিংহল বন্দরে বহুবার পাড়ি দিয়েছে। আরবসাগরের কোথায় কোন্ বন্দর, উপকূলে শহর গ্রাম তীর্থক্ষেত্রে, জলের তলায় চোরাপাথর সবকিছু তার কণ্ঠস্থ।

সিংহলের পর আরবসাগরে করণ্ডীপোত চালানোর সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব গেলুসের হাতে চলে যায়।

চূড়ানিবাড়ী ঘাট থেকে সিংহলের অনুরাধাপুর বন্দর পর্যন্ত পৌছানোর দিন চব্বিশের মাঝে ছোটো খাটো ঘটনা ঘটে গেছে। একটি হচ্ছে সমুদ্রঝড়। ঝড় অবশ্য ভয়ঙ্কর ছিল না। ঝড়ের মধ্যে করণ্ডীপোতের সফল গতি লক্ষ করে গেলুস লোহিতাক্ষকে বলেছে এই করণ্ডীপোত পৃথিবীর সমুদ্রযাত্রার জাহাজগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাহাজ।

অন্য একটি ঘটনা ঘটেছিল বাণকে কেন্দ্র করে।

চূড়ানিবাড়িঘাট থেকে যাত্রা করার দেড়দিনের মাথায় তাম্রলিপ্ত বন্দরে পৌছে ঘটনা ঘটে ছিল।

তাম্রলিপ্ত বন্দর ঘাটে যখন করণ্ডীপোত নোঙর করে প্রায় একই সঙ্গে আর একটি জাহাজ সেখানে নোঙর করে। সেই জাহাজ থেকে বহু চৈনিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নেমে লটবহর ঘোড়ার পিঠে সাজিয়ে উত্তরমুখী সড়ক ধরে এগিয়ে চলেন। জনা পঁচিশেক সন্ন্যাসী দলের সাথে মালপত্র বোঝাই বহু ঘোড়া এবং প্রত্যেকটি ঘোড়ার সাথে এক একজন সহিস।

সূর্য পশ্চিম দিগন্তে। মানুষ এবং ঘোড়ার চলায় পথের ধূলি লাল মেঘস্তরের মতো মাথার উপর উড়ছে।

বাণ যাত্রীদলের মাঝে প্রবেশ করে জনৈক তরুণ চৈনিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সাথে তাদের গন্তব্যস্থান ইত্যাদ নিয়ে আলাপ শুরু করে। তরুণ সন্ন্যাসী সুললিত সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তা আরম্ভ করে। তারা চীন দেশ থেকে তীর্থ করতে এসেছেন । এখন যাচ্ছেন নালান্দা বৌদ্ধবিহারে।

সন্ন্যাসীর নাম নাগানন্দ। বাণ, 'নাগানন্দ' নাম শুনে অবাক হলে সন্ন্যাসী বলেন, চৈনিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণের নামকরণ বৌদ্ধ শাস্ত্রানুসারে হয়ে থাকে।

এই তীর্থযাত্রী দল প্রায় বছর তিনেক আগে, চীন দেশ থেকে 'ব্রাহ্মণ জাহাজ' করে যাত্রা করেছিল। বাণ, 'ব্রাহ্মণ জাহাজ' শব্দের অর্থ জানতে চাইলে সন্ন্যাসী বলেন, চীনদেশের মানুষ ভারতীয় জাহাজকে ব্রাহ্মণ জাহাজ বলে। চীন দেশে সাধারণত দুই ধরনের জাহাজ ব্যবসা বাণিজ্য করে। এক ব্রাহ্মণ জাহাজ এবং অন্য আরব জাহাজ। চীনের জাহাজ দূর-দূরান্তে যাতায়াত করে

না।

"চীনদেশে কি ইদানীং এই ব্রাহ্মণ জাহাজ যাতায়াত শুরু করেছে?" বাণের এই জিজ্ঞাসার জবাবে সন্ন্যাসী বলেন, বহুকাল থেকে চীনদেশে এই জাহাজের যাতায়াত। প্রসঙ্গত বলেন, প্রায় দুশ আড়াইশ বছর আগে ফা-হিয়ান নামে একজন চীনা বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী ভারতে এসেছিলেন। ভ্রমণ কাহিনিতে লিখেছেন, তিনি ব্রাহ্মণ জাহাজ করে তাম্রলিপ্ত থেকে সিংহল হয়ে চীনদেশে ফিরে গিয়েছিলেন।

তরুণ সন্ন্যাসী তাদের সমুদ্রযাত্রা প্রসঙ্গে বলেন, তীর্থ যাত্রীদল দক্ষিণ চীন থেকে ব্রাহ্মণ জাহাজে আরোহণ করে উপকূল ধরে, ইয়াংসিকিয়াং নদীর মোহনার কাছাকাছি নানকিং বন্দর হয়ে, আরো দক্ষিণে এগিয়ে কেনটন বন্দর পার হয়ে চম্পাদেশের পাণ্ডুরঙ্গ বন্দরে এসেছেন। চম্পাদেশের বিখ্যাত বৌদ্ধমঠে তারা সংস্কৃত এবং পালি ভাষা শিখেছেন।

বিস্মিত বাণ সন্ন্যাসীর গল্প শুনে শুনে সড়কপথে উত্তরদিকে এগিয়ে যায়। এ সকল নদী বন্দর দেশের নাম, সে কোনওদিন শুনেনি।

মুগ্ধ বাণের দিকে তাকিয়ে সন্ন্যাসী তার সমুদ্রপথের বর্ণনা দিয়ে চলেন। ব্রাহ্মণ জাহাজ চম্পাদেশের পর সুবর্ণ উপকূল ধরে শ্রীবিজয় দ্বীপে পৌঁছায়। শ্রীবিজয় থেকে মস্ত দক্ষিণ সমুদ্রই কি ইরোথ্রন সাগর ?

বাণের মনে পড়ে চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমে অগস্ত্য মুনি বলেছিলেন, ভারতবর্ষের দক্ষিণের মস্ত সুমদ্রের গ্রীক নাথ ইরোথ্রন সাগর। বাণ ভাবে তরুণ সন্ন্যাসী বর্ণিত মস্ত দক্ষিণসমুদ্র।

ভারততীর্থে পদার্পণ করেই বাণের মত মুগ্ধ শ্রোতা এই সাথে চম্পামঠে তার অধ্যয়ন করা সংস্কৃত ভাষার যথার্থ ব্যবহার করে সন্ন্যাসী উৎফুল্ল। সন্ন্যাসী বলেন, দক্ষিণ সাগরে অনেক দ্বীপের মালা আছে। ব্রাহ্মণ জাহাজ শ্রীবিজয় থেকে পৌঁছায় নিকোবর দ্বীপে। নিকোবর থেকে পশ্চিমদিকে মস্ত সমুদ্র পার হয়ে উপস্থিত হয় সিংহল বন্দরে। সিংহল থেকে ভারতীয় উপকূল ধরে ধরে শেষ পর্যন্ত এই তাম্রলিপ্ত বন্দরে পৌঁছান।

বাণ, গল্প শুনে শুনে প্রায় ক্রোশখানেক পথ পার হয়ে গেছে। সূর্য তখন ডুবু ডুবু। জনৈক সহিস বাণকে দ্রুত ফিরে যেতে বলে। বাণ, উল্টোদিকে বন্দরের পথ ধরে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যায়। আধ ক্রোশ পথ পার হতে না হতেই সূর্য ডুবে যায়। বাণ শুক্লাপঞ্চমীর মৃদু চাঁদের আলোকে এগিয়ে চলে। পথ সম্পূর্ণ জনশূন্য।

হঠাৎ উলঙ্গপ্রায় কিছু মানুষ বাণকে ঘিরে ফেলে। লোকগুলির হাতে ছোটো বড়ো লাঠি। বাণের সঙ্গে অর্থকড়ি ছিল না। লোকগুলি বাণের পোশাক পরিচ্ছদ খুলে নিয়ে গেল। সম্পূর্ণ নগ্ন বাণ, ডাকাতদের প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাল, কারণ ওরা তার পৈতা খুলে নিয়ে যায়নি।

পশ্চিমের স্বচ্ছ আকাশে শুক্লাপঞ্চমীর চাঁদ। স্তিমিত জ্যোৎস্নায় নির্জন পথে বাণ এগিয়ে চলে। কিছুক্ষণ এগিয়ে গিয়ে বাণের কানে আসে সমুদ্র গর্জন। আরো কিছু পথ এগিয়ে চোখে পড়ে তাম্রলিপ্ত বন্দরের আলো।

বন্দরের আলো দেখে বাণ থমকে দাঁড়ায়। ভাবে বন্দরের দোকানপাট মানুষজনের মাঝ দিয়ে

কীভাবে যাবে? রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে। ভাবে, তবে কি গভীর রাতে দোকানপাট বন্ধ হলে করণ্ডীপোতে গিয়ে উঠবে? বান, ভাবতে ভাবতে লক্ষ করে রাস্তার পাশে মাটি নরম এবং ভেজা। আর একটু এগিয়ে দেখে ডোবার মতো একটি গর্ত। ডোবায় জল নেই, শুধুমাত্র কাদা।

বাণের মাথায় ফন্দি এল। ডোবার কাদা সারা মুখে এবং শরীরে মাখতে লাগল। বাণের মনে হল মস্ত অভিনয়ের আগে সে রূপসজ্জা করছে। পার্বতীপরিণয় নাটকের লেখক তথা কেন্দ্রীয় চরিত্রের অভিনেতা বাণভট্টের জীবন নাটকের অভিনয় আরম্ভ হল।

বাণ এই অভিনয়ে ভূতনাথ শিব নয়। ভূতনাথের ভূত। সারা গায়ে কাদামাখা কৃষ্ণবর্ণের ভূত মাত্রাঅতিরিক্ত মাতাল ভূত বেসামাল পদ বিক্ষেপে ধীরে ধীরে জমাট দোকানপাট মানুষের মাঝ দিয়ে সমুদ্রজলে নেমে সাঁতার কেটে করণ্ডীপোতের কাছে গিয়ে পৌঁছাল।

বাণ, করণ্ডীপোত থেকে, দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নৌকায় নেমে তীরে এসেছিল। বাণ দেখে দড়ির সিঁড়ি নেই। পাতলা একগাছি রশি ঝুলছে। বাণ রশি ধরে চিৎকার করে ডাকতে থাকে। বাণের চিৎকার জনৈক নাবিকের কানে পৌঁছায়। নাবিক দড়ির সিঁড়ি নামিয়ে দেয়। নাবিকেরা জানে তাদের মধ্যে কেউ কেউ বন্দরে নেমে গিয়ে আমোদফূর্তি করে অসময়ে ফিরে আসে। এমনিভাবে, গোপনে সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া তাদের অলিখিত আদর্শ ধর্ম।

সিঁড়ি বেয়ে নাবিক উঠে বলে, লোহিতাক্ষকে ডেকে দিতে। উপর থেকে নাবিক ভালো করে অনুভব করে বেচারার নেশা এখনো চড়ে আছে। কিছুক্ষণ পর নাবিক ফিরে এসে শুনে —একই কথা "লোহিতাক্ষকে ডেকে দাও।" এবার বাণ একটু বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে নিজের নাম বলে। ইতিমধ্যে আরো দুচার জন নাবিক উপর জমা হয়ে গেছে।

শেষপর্যন্ত লোহিতাক্ষ হাজির হয়। বাণ, লোহিতাক্ষকে বলে নাবিকদের সরিয়ে দিতে। লোহিতাক্ষের নির্দেশে নাবিকগণ সরে যায়। বাণের কথায়, লোহিতাক্ষ কিছু কাপড় চোপড় নামিয়ে দেয়। সমুদ্রমন্থনের পর সমুদ্রগর্ভ থেকে যেভাবে চন্দ্রের আবির্ভাব হয়ে ছিল তেমনিভাবে বাণ করণ্ডীপোতে আরোহণ করে।

বাণের এই দিগম্বররূপ, লোহিতাক্ষের এক স্মরণীয় ঘটনা। লোহিতাক্ষ, সুযোগ দুর্যোগে, তার প্রিয় বান্ধব বাণের উপর এই রূপচর্চা প্রয়োগ করে।

* * *

করণ্ডীপোত সিংহল পরিক্রমা করে আরবসাগরে নেমে উপকূল ধরে উত্তর দিকে এগিয়ে চলে।

পশ্চিম ভারতের উপকূলের গ্রামগঞ্জ নদী পাহাড় তীর্থক্ষেত্র গেলুসের কণ্ঠস্থ। গেলুস, বাণ এবং লোহিতাক্ষের কাছে উপকূলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনার ধারাভাষ্য দিয়ে চলে।

করণ্ডীপোত ক্রমশ গুজরাটের উপকূল ধরে এগিয়ে চলে। গুজরাট উপকূলের বেরাবল নামক স্থানের পাশ দিয়ে যাবার সময় গেলুস বলে এরপর করণ্ডীপোত পাটল নামক স্থানের পাশ দিয়ে যাবে। পাটলে বিখ্যাত সোমনাথতীর্থ অবস্থিত।

বাণ, সোমনাথতীর্থের কথা শুনেছে। শুনেছে সোমনাথতীর্থ প্রভাসপত্তন নামক স্থানে

অবস্থিত। গেলুস, প্রভাসপত্তনকে পাটল বলেছে। বাণ অনুমান করে তাহলে স্থানীয় মানুষ নিশ্চয়ই প্রভাসপত্তনকে পাটল বলে।

বাণ, লোহিতাক্ষকে বলে প্রবাদে আছে এই প্রভাসপত্তনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেছিলেন। এই স্থানে দুটি বিখ্যাত তীর্থস্থান আছে। একটি শৈবতীর্থ এবং অন্যটি বৈষ্ণব তীর্থ। সোমনাথ মন্দির সোমনাথ শিবলিঙ্গের জন্য বিখ্যাত।

বাণ, লোহিতাক্ষের সাথে পরামর্শ করে স্থির করে, সে এই প্রভাসপত্তনে অবতরণ করে সোমনাথ মন্দির থেকে ভারততীর্থ পরিক্রমা শুরু করবে।

গেলুসের নির্দেশে করণ্ডীপোত প্রভাসপত্তনের উপকূলে নোঙর করে। সম্মুখে সোমনাথের আকাশছোঁয়া মন্দির। মন্দিরের চূড়ায় সোনার ত্রিশূল। ত্রিশূলের পাশে অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্নিত রক্তপতাকা। সমুদ্রের তীব্র বাতাসে রক্তপতাকা সটান হয়ে কাঁপছে।

লোহিতাক্ষ বাণ এবং গেলুস, দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নেমে ছোটো নৌকায় সোমনাথ মন্দিরের প্রাঙ্গণে পৌঁছায়। লোহিতাক্ষ মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছে প্রথমেই বাণকে হুন্ডি সমঝিয়ে দেয়।

লোহিতাক্ষ মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের হাতে কিছু অর্থ দিয়ে বাণের জন্য হট্টশালার ব্যবস্থা করে দেয়।

বাণ মন্দিরপ্রাঙ্গণ থেকে দেখে ছোটো নৌকা চড়ে গেলুস এবং লোহিতাক্ষ করণ্ডীপোতের দিকে এগিয়ে চলছে। ছোট্ট নৌকা আরব সাগরের ঢেউ এর মাঝ দিয়ে করণ্ডীপোতে পৌঁছায়। বাণ দাঁড়িয়ে দেখে করণ্ডীপোত অজস্র বৈঠার ছন্দোময় নৃত্যের মাঝ দিয়ে উত্তর দিকে এগিয়ে রেখার সূর্যাস্তের আবির উৎসব শুরু হয়ে গেছে। বাণ হট্টশালার গিয়ে তার কামরায় শুয়ে পড়ে।

তন্দ্রার মাঝে শুনে অজস্র ঢাকঢোল কাঁসর বেজে চলছে। কৃষ্ণাগরু এই সাথে ধূপের সুবাস। মনে হয় চন্দ্রগোমী স্বামী চন্দ্রমৌলী মন্দিরে আরতি করছেন। তন্দ্রার ঘোরা কাটালে দেখে অন্ধকার নেমে এসেছে। অনুভব করে সে চন্দ্রমৌলী থেকে দূরে বহুদূরে সোমনাথ মন্দিরের হট্টশালার শুয়ে আছে।

বাণ ঢাকঢোল কাঁসরের শব্দ লক্ষ করে এগিয়ে যায়। মন্দিরপ্রাঙ্গণে অজস্র মানুষ দাঁড়িয়ে, হাতজোড় করে আরতি দেখছে। অজস্র মানুষের সাথে বাণ হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। বাণ, সোমনাথলিঙ্গদেবতা দেখতে পায় না। ধূপের ধোঁয়ায় মন্দির অঙ্গন ধূম্র মেদুর।

নিস্তব্ধ বাণ জোড়হস্তে দাঁড়িয়ে থাকে। আরতি শেষ হলে ভক্তরা লিঙ্গদেবতাকে প্রণাম করে ধীরে ধীরে মন্দির প্রাঙ্গণ ছেড়ে চলে যায়। প্রাঙ্গণ ফাঁকা হলে বাণ সিঁড়ি বেয়ে লিঙ্গদেবতার সম্মুখে উপস্থিত হয়। লিঙ্গের সামনে পঞ্চপ্রদীপ জ্বলছে। বাণ বিস্মিত হয়ে দেখে মন্দির গর্ভগৃহে সোনার নির্মিত চাঁদোয়া স্তম্ভ আসবাবপত্র। সোনার নির্মিত সবকিছু থেকে প্রদীপালোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মনে হয়, গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে অযুত সহস্র প্রদীপ জ্বলছে। একই স্থানে তালতাল এত সোনা বাণ কোনও দিন দেখেনি।

হট্টশালার ফিরে এসে বাণের মনে পড়ে সে সোমনাথ লিঙ্গদেবকে প্রণাম করতে ভুলে

গেছে। বাণ, নিজের আচরণ বিশ্লেষণ করে দেখে অজস্র সম্পদ রাশি দেবতার প্রতি ভক্তি ভাবকে দূর করে বিস্ময়ভাবের সৃষ্টি করেছে। সম্ভবত একারণেই বাণ সোমনাথদেবকে প্রণাম করতে ভুলে গেছে।

বাণ, পরদিন উষালগ্নে সমুদ্রস্নান করে বেলাভূমিতে বসে আহ্নিক শেষ করে। মনে পড়ে গত সন্ধ্যায় সোমনাথ লিঙ্গদেবকে প্রণাম করা হয়নি। মন্দিরে গিয়ে লিঙ্গদেবতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে শিবস্তুতি করে প্রণাম করে। প্রণামশেষে বাণ উপলব্ধি করে তার মনে প্রশান্তির স্নিগ্ধতা এসে স্পর্শ করছে।

* * *

বাণের টাকার প্রয়োজন। সোমনাথ মন্দিরের বাইরে বড়ো রাস্তা। রাস্তার দুদিকে দোকানপাট হাটবাজার। বাণ মন্দির থেকে বের হয়ে রাস্তার ওঠে। হুন্ডি ভাঙাতে হলে বড়ো দোকানপাটের প্রয়োজন। সাধারণত বড়ো ব্যবসায়ীগণ ভিন্ন অন্যেরা হুন্ডির কাজকারবার করে না।

দুএকটি দোকানে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর হুন্ডিব্যবসায়ীর হদিস পেয়ে গেল। মন্দির থেকে প্রায় সিকি ক্রোশ দূরে হুন্ডিকারবারীর দোকানে বাণ প্রবেশ করে।

তক্তপোষের উপর সাদা কার্পাস চাদর সাদা কোলবালিশ এর মাঝখানে মধ্যবয়সী ব্যক্তি বসে আছে। তার ধুতি চাদর এবং পাগড়ি ধবধবে সাদা। কানে মস্ত সোনার কুণ্ডল।

বাণ লক্ষ করে লোকটি বাণের দিকে তাকিয়ে কী যেন হিসাব নিকাশ করে হঠাৎ জোড় হাতে বাণকে স্বাগত করে। বাণ চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমের পুস্তকে লিখিত মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষায় কথা শুরু করে। বাণেব মনে হল এই ভাষা শুনে লোকটি যেন আরো সাবধান হয়ে তক্তপোষ থেকে নেমে এসে নিজের হাতে একটি কাঠের টোল এনে বাণকে বসতে দেয়।

সাধারণ কথাবার্তার পর বাণ হুন্ডি দেখাল। বাণ লক্ষ করে, লোকটির কথ্যভাষা সম্পূর্ণ একটি মিশ্রভাষা। মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃতের গাম্ভীর্যের সাথে 'শ' ধ্বনির 'হ' করে উচ্চারণ প্রবণতা আছে। অন্যদিকে তার কথ্যভাষায় বহু আরবীয় এবং গ্রীক শব্দাবলী মিশ্রিত। এ কথায় লোকটির কথ্যভাষা বন্দর অঞ্চলের প্রচলিত মিশ্রভাষা।

বাণের হুন্ডির উপর শ্রীগোপালের নামধাম স্বাক্ষর দেখে নিদারুণ বিস্ময়ের ছাপ তার ব্যবসায়ীর মুখোস ভেদ করে মুখে প্রকাশ পেল।

বাণ সিকি দিনার মূল্যের একটি হুন্ডির বিনিময়ে পনেরো টাকা পেল। বাণ মুদ্রাগুলি তার উত্তরীয়ের কোণে বাঁধার উদযোগ করার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি চীনাংশুক বস্ত্রে নির্মিত ছোটো একটি থলি বাণের হাতে দেয়। বাণ থলির ভিতর মুদ্রাগুলি রাখে। থলির ভিতর মুদ্রাগুলি রাখার পর লোকটি বাণকে উঠে দাঁড়াতে বলে। বাণ উঠে দাঁড়ালে লোকটি থলির মুখে আঁটা শক্ত হালকা রঙিন রশি টেনে থলিটি বাণের কোমরে বেঁধে দেয়। থলির আকার আকৃতি রং রূপ এই সাথে পাকা ব্যবস্থা বাণের পছন্দ হয়।

লোকটি অমায়িকভাবে বাণের সাথে কথাবার্তা বলতে শুরু করে। তার নাম বলে বিষ্ণুধর। মূল কারবার শুকনো মাছের। কচ্ছের সমুদ্রতীরে তার গুদাম। বিষ্ণুধর বিনীতভাবে বলে তার

আকাঙ্ক্ষা শ্রীগোপালের সাথে সরাসরি ব্যবসা বাণিজ্য করা। তার বিশেষ প্রয়োজন পাটজাত বস্তুআদি। যেমন পাটের রশি, চটবস্ত্র ইত্যাদি। বাণ রশি এবং চটের ব্যবহারের বিষয় জানতে চাইলে বিষ্ণুধর বলে, মাছ শুকানোর জন্য রশি এবং শুকনো মাছ রপ্তানির জন্য চটের থলির বিশেষ প্রয়োজন।

বাণ, বিষ্ণুধরের কথাবার্তায় বুঝে নেয়, পাটের জিনিসপত্র, গঙ্গানদী ধরে উজিয়ে এসে তারপর নানা ব্যবস্থার মাঝ দিয়ে এসব অঞ্চলে উপস্থিত হয়। স্বাভাবিকভাবে জিনিসপত্রের মূল্য অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। বাণ, গঙ্গানিকা থেকে জাহাজে করে সরাসরি এখানে এসে গেছে শুনে বিষ্ণুধরের উৎসাহ বেড়ে গেছে।

বিষ্ণুধর আরো নানা কথাবার্তার পর বলে, বাণ ইচ্ছা করলে আরো কিছু হুন্ডি ভাঙাতে পারে। সে হুন্ডিতে লিখিত অর্থের দ্বিগুণ দিতে রাজি আছে। বিষ্ণুধর দ্বিগুণ অর্থের ব্যাখ্যায় বলে, পনেরো টাকায় হুন্ডি সে ত্রিশ টাকায় খরিদ করবে।

বাণ বলে, সিকি দিনার অর্থাৎ পনেরো টাকার হুণ্ডি শ্রীগোপালের কাছে পৌছালে তিনি ত্রিশ টাকা দেবেন — তা হলে সেই হুন্ডি বিষ্ণুধর কেন ত্রিশ টাকায় খরিদ করবে?

বিষ্ণুধর বলে, হুন্ডির মাধ্যমে শ্রীগোপালের সাথে যোগাযোগের এটি হচ্ছে মস্ত সুযোগ। এই হুন্ডি দিয়ে সরাসরি পাটজাত বস্তু খরিদ করা যাবে।

বাণের মনে পড়ে, শ্রীগোপল মৃদুকণ্ঠে তাকে বলেছিলেন, শ্রীগোপালের স্বাক্ষরিত হুন্ডির উপর ব্যবসায়ীদের বিশ্বাস আছে। চাক্ষুষ ঘটনা দেখে বাণ উপলব্ধি করে সুদূর পূর্বাঞ্চলের করন্ডী শ্রীগোপালের ব্যক্তিত্ব কত বিশাল।

বাণ, সবিনয়ে বিষ্ণু ধরকে বলে, আপাতত তার অর্থের আর প্রয়োজন নেই। বাণের দৃষ্টিতে বিষ্ণুধরের মুখে বিষাদের ছায়া ধরা দেয়।

বিষ্ণুধর, বাণের সাথে অন্য প্রসঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে। জিজ্ঞাসা করে, বাণ কোথায় উঠেছে? সোমনাথ মন্দিরের হট্টশালার কথা শুনে বিষ্ণুধরের চোখে মুখে আতঙ্কের ছায়া দেখা দেয়। বিষ্ণুধরের মুখে আতঙ্কের ছায়া দেখে বাণের মনে হয় কোথায় যেন এমনি ভয়াল ছায়া দেখেছিল। হঠাৎ চোখে ভেসে উঠে, পার্বতীপরিণয় নাটকের মহড়ার প্রথম দিকে এমনি আতঙ্কের ছায়া মদনের মুখে ফুটে উঠেছিল। বাণ তখন মদনের দিকে তাকিয়ে তৃতীয় নয়ন থেকে অগ্নি উদ্গীরণের অভিনয় করছিল।

বিষ্ণুধর বলে, সোমনাথ মন্দিরের হট্টশালা চোর ডাকাতের আড্ডাখানা। সেই হট্টশালায় থাকা আর সাপের ঝাঁপিতে বাস করা একই কথা। এরপর প্রস্তাব দেয়, বাণ যেন বিষ্ণুধরের নিজস্ব অতিথিশালায় এসে যায়। টাকাকড়ি লাগবে না।

বিষ্ণুধর ইতিমধ্যে নানা কথাবার্তায় বুঝে নিয়েছে বাণ ব্যবসায়ী নয়, সাহিত্য-শিল্প নাটকের লোক। এবার কথা শুরু করে গুর্জর দেশের নানা উৎসব মেলা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। বিষ্ণুধরের এমনি কথাবার্তায় বাণ উৎসাহ প্রকাশ করে। বিষ্ণুধর বলে, তাদের অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে

নানা ধরনের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যেমন ভিন্ন ভিন্ন পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় গুরুপূর্ণিমা উৎসব, সাবিত্রী, পূর্ণিমা, ত্রিপুরী, পূর্ণিমা ও তাছাড়া আছে গণেশচতুর্থী, নাগপঞ্চমী, জন্মাষ্টমী উৎসব রামনবমী, ও ভীম একাদশী শিবচতুর্দশী ইত্যাদি।

বিষ্ণুধরের কথা বাণের ভাল লাগে। বিষ্ণুধর আবার হুন্ডির কথায় ফিরে আসে। আবার বলে সে পনেরো টাকার হুন্ডি ত্রিশ টাকার খরিদ করবে।

বাণ অন্যমনস্কভাবে বলে, আপাতত তার অর্থের বিশেষ প্রয়োজন নেই।

বিষ্ণুধর আবার উৎসবের কথায় ফিরে আসে। বলে আজ পূর্ণিমা। পূর্ণিমায় গরবা নাচ অনুষ্ঠিত হয়। বাণ যদি ইচ্ছা করে তা হলে গুর্জর দেশের বিখ্যাত গরবা নাচ দেখতে পারে। গরবা নাচের কথায় বাণ উৎসাহ প্রকাশ করে। বিষ্ণুধর বলে, আজ রাতে গরবা নাচের আয়োজন করে বাণকে সন্ধ্যার পর হট্টশালা থেকে নিয়ে আসবে।

বাণের দারুণ উৎসাহ। বাণ সেজে গুজে হট্টশালায় বিষ্ণুধরের জন্য অপেক্ষা করে। অপেক্ষায় অপেক্ষায় সন্ধ্যা হয়ে যায়। বাণ স্থির করে সে সোজা বিষ্ণুধরের দোকান হাজির হবে। হট্টশালা থেকে বের হবার মুহূর্তে বাণের মনে হল বিষ্ণুধরের সাবধানবাণী। সোমনাথ মন্দিরের হট্টশালা চোর ডাকাতের আড্ডাখানা।

বাণ হট্টশালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে, বারান্দায় দেয়ালে, প্রদীপের একাধিক কুলুঙ্গি লক্ষ্য করে। কোন কুলুঙ্গীতেই প্রদীপ রাখার চিহ্ন নেই। দুটি কুলুঙ্গী আবর্জনায় ঠাসা। মনে হয় কোনোকালে চড়ুই পাখী বাসা বানিয়েছিল।

বাণের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বাণকে সাবধান করে দেয়। তার নগদ পনেরো টাকার থলি এই সাথে হুণ্ডির বাকী সব কাগজপত্র, আবর্জনা সরিয়ে একটি কুলুঙ্গীর ভিতর রেখে কুলুঙ্গীর গর্তমুখে আবার ঘাস খড়ের আবর্জনা ঠেসে রাখে।

ঝকঝকে চাঁদের আলোর মাঝ দিয়ে বাণ বিষ্ণুধরের দোকানে হাজির হয়। বিষ্ণুধর তখন ভালো কাপড় চোপড়ে সেজে বাণের হট্টশালায় যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল

বিষ্ণুধর বাণকে নিয়ে সমুদ্রের কূল ধরে একটি বড়ো-সড়ো খোলামেলা বাড়ীতে প্রবেশ করে। এটি বিষ্ণুধরের নিজস্ব অতিথিশালা। বাড়ীর চারদিকে উঁচু দেয়াল। মাদুর পাতা মস্ত প্রাঙ্গণ। একদিকে মাটির উঠান। উঠানের মাঝখানে মস্ত ঝকঝকে পিলসুজের উপর প্রদীপ। বিষ্ণুধর বলে, মস্ত পিলসুজটি সোনা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। বাণ লক্ষ করে বিষ্ণুধরের কণ্ঠে গর্বের সুর। গুর্জর দেশের বিখ্যাত গরবা নৃত্যের দর্শক শুধুমাত্র বাণ। কাছাকাছি আছে বিষ্ণুধরের কিছু কর্মচারী।

বাণকে একটি আসনে বসিয়ে বিষ্ণুধর নিজের হাতে একটি মদিরাপাত্র বাণের সামনে রেখে বলে মদিরা পাত্রটি খাঁটি রুপায় নির্মিত।

পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকে নৃত্যপ্রাঙ্গণ ঝকঝক করছে। জ্যোৎস্নার সাথে রেখে শ্বেতশুভ্র বসনে সেজে প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল নয়টি যুবতী। বাণের মনে হল যেন স্বর্গ থেকে একঝাঁক পরী জ্যোৎস্নায় সাঁতার কেটে এসে নেমেছে।

বিষ্ণুধর বাণকে সোনার পিলসুজে রাখা ঘৃতপ্রদীপটি প্রজ্জ্বলিত করতে অনুরোধ করে। বাণ

পরম শ্রদ্ধাভরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে আপন মনে বেদমন্ত্রে অগ্নিস্তব করে।

প্রদীপ প্রদক্ষিণ করে নয়টি যুবতী নৃত্য শুরু করে। নৃত্য দেখে প্রতিমুহূর্তে বাণের মনে হয় এ সব নৃত্যরতা দেহ মাটির পৃথিবীর কোনও মানুষ নয়। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না জমাট বেঁধে, ওরা রূপায়িত হয়েছে। মুগ্ধ বাণ নিস্তব্ধ বিস্ময়ে নৃত্য দেখে চলে। মনে হয় সে স্বপ্ন দেখছে।

বিষ্ণুধরের কথায় বাণ জেগে উঠে। বিষ্ণুধর বাণের কানে মুখ রেখে জিজ্ঞাসা করে কোন্ শিল্পীকন্যার নৃত্যভঙ্গি সুন্দর। কোন্ শিল্পীকে বাণের ভালো লাগছে।

সমগ্র পরিবেশ নিয়ে এই গরবা নাচে বাণ বিমুগ্ধ হয়েছিল। হঠাৎ বিষ্ণুধরের কথায় বাস্তব পৃথিবীতে ফিরে আসে। ভাবাবেগে ডুবে যাওয়া নয়। কঠিন বিচারকের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করতে হবে। বাণ এবার বিচার বিশ্লেষণের দৃষ্টি নিয়ে একজন শিল্পীকে দেখিয়ে বলে তার বিচারের এই শিল্পীই শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী।

বাণের কথা শেষ হতে না হতেই বিষ্ণুধর বলে, বাণ ইচ্ছা করলে এই যুবতীকে নিয়ে আজ রাতে ফুর্তি আমোদ করতে পারে। খাবার দাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

বিষ্ণুধরের কথায় বাণের মনে পড়ে কবে এবং কোথায় যেন এমনি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে ছিল। এমনি জটিল পরিস্থিতিতে পথ দেখিয়েছিল তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি। বাণ ঘটনাটিকে স্মরণ করার চেষ্টা করে।

বিষ্ণুধর বাণের মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করে সে মাঝে মধ্যে বিশেষ অতিথিদের গরবা নাচ দেখায়। যুবতীদের কচ্ছ সমুদ্রের হালকা স্বচ্ছ জলে রঙ্গিন মাছের মতো নাচ দেখে অতিথিদের জিভে-টিভে জল এসে যায়। তখন সে অতিথিদেরে রঙ্গিন তরতাজা ভাজা মাছ খেতে দেয়।

বাণের পুরানো পরিস্থিতির কথা মনে পড়ে। চণ্ডিকা অরণ্য পার হয়ে ভর সন্ধ্যায় আখণ্ডল তার জুয়ার আড্ডায় তীর্থযাত্রীদের ভাগ্যপরীক্ষার কথা বলেছিল। বাণ সেই অপরিচিত পরিবেশে প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি। তখন খুব সাবধানে বলে ছিল সে স্নান-টান করে ভাগ্যপরীক্ষা করবে।

গরবা নাচের পরিস্থিতিতে বাণ কী করবে যখন ভাব ছিল তখন স্বয়ং বিষ্ণুধর সুযোগ তৈরী করে দিল। বিষ্ণুধর ইতিমধ্যে বাণের সামনে যে রুপার সুরাপাত্রে মদিরা রেখে ছিল তা সম্পূর্ণভাবে নিজেই শেষ করে ফেলেছে। সে শূন্য সুরাপাত্র নিয়ে পাশের ঘরে যায়।

প্রাণীজগতের আদিম এবং অকৃত্রিম পলায়ন পন্থা গ্রহণ করে বাণ প্রাচীরঘেরা বাড়ীর তোরণের দিকে ছুট দেয়। বন্ধ তোরণের উপর কাঠ-বিড়ালির মতো বেয়ে উঠে লাফিয়ে নেমে লম্বা ছুট। লক্ষ সোমনাথ মন্দির চূড়া।

সোমনাথ মন্দিরের হট্টশালায় প্রবেশ করে বাণ হতভম্ব দরজাখোলা। জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড। তোষক বালিশ ছেঁড়া। মন্দিরে হৈ-চৈ শুরু হয়। পুরোহিত বলেন, সোমনাথ মন্দিরের অতিথি শালায় এমন ঘটনা কোনও দিন ঘটেনি।

পুরোহিতের কথার প্রতিবাদ করে বাণ বলে ব্যবসায়ী বিষ্ণুধর বলেছে সোমনাথ মন্দিরে

এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে। সোমনাথ মন্দির চোর ডাকাতের আড্ডাখানা।

পুরোহিত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, এই ভয়ঙ্কর ব্যক্তির সাথে বাণের পরিচয় কীভাবে হল? বাণ, হুন্ডির কথা বলে। এই সাথে বিষ্ণুধরের আরো কিছু হুন্ডি খরিদ করার আগ্রহের কথা প্রকাশ করে।

পুরোহিত বলেন, অতিথিশালায় এই কাণ্ডের পিছনে অবশ্যই বিষ্ণুধর আছে। উদ্দেশ্য, হুন্ডি চুরি করা। পুরোহিতের মুখে চিন্তার ছায়া ভেসে উঠে। বাণকে বলেন, যদি হুন্ডি বিষ্ণুধরের হাতে চলে যায় তা হলে বিষ্ণুধরের পরবর্তী কাজ হবে হুন্ডি যে ব্যক্তির নিকট থেকে চুরি করেছে তাকে গুম করে ফেলা। পুরোহিতের কথায় বিষ্ণুধরের বচ্ছ সমুদ্রের তাজা রঙিন ভাজামাছের কথা বাণের মনে পড়ে।

বাণ বারান্দায় এসে দেখে কুলুঙ্গির গর্তের মুখে পাখীর খড়কুটো একই রকম আছে। পুরোহিত, বাণকে অভয় দিয়ে বলেন, তিনি পাহারার জন্য মন্দিরের পাহারাদার কজনকে এখনই পাঠিয়ে দিবেন।

পুরোহিত চলে গেলে বাণ, কুলুঙ্গির ভিতর থেকে বের করে হুন্ডি এবং নগদ মুদ্রা কোমরে বেঁধে রাখে।

কিছুক্ষণের মধ্যে হাতে বাঁশের লম্বালাঠি মাথায় মস্ত মস্ত পাগড়ি বাঁধা পাঁচজন প্রহরী বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

বাণ খাবার দাবারের পর দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে। মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে যায়। সমুদ্র গর্জন করছে।

বাণের মনে হয় সমুদ্র গর্জন করে যেন কী বলছে। চিন্তার অতলতলে তলিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় সূর্যোদয়ের আগে সোমনাথ মন্দির তথা প্রভাসপত্তন ত্যাগ করতে হবে। দ্বিতীয় ভাবনা—প্রভাস পত্তন ছেড়ে কোথায় এবং কোন্‌দিকে যাবে?

সমুদ্র গর্জন করে কী যেন বলছে? কোনও এক তীর্থের নাম বলছে। কান পেতে নিস্তব্ধভাবে সমুদ্রের ভাষা উপলব্ধি করে। সমুদ্র দ্বারকাতীর্থের নাম বলছে। সোমনাথ তীর্থের কাছাকাছি দ্বারকাতীর্থ। স্থির করে সূর্যোদয়ের আগে দ্বারকাতীর্থে যাত্রা করবে।

বাণ যাত্রার প্রস্তুতি নিয়ে দরজা খুলে দেখে প্রহরী পাঁচজন-একজনের উপর আর একজন ঘুমে অচেতন। পা টিপে টিপে মন্দির প্রাঙ্গণ পার হয়ে বড়ো রাস্তার ওঠে। বড়ো রাস্তার পা দিয়ে ভাবে কোন্‌ দিকে যাবে? শেষপর্যন্ত বিষ্ণুধরের দোকানের বিপরীত পথে এগিয়ে চলে। কিছুক্ষণ চলার পর পূর্বাকাশে সূর্যের সম্ভাবনা প্রকাশ পায়।

বাণের ছেড়ে আসা পথের দিক থেকে একটি ঘোড়ার গাড়ি শব্দ করে করে আসতে থাকে। . বাণ, গাড়ি থামিয়ে গাড়োয়ানের সাথে কথা বলে।

গাড়োয়ান বলে বহুবার সে তীর্থযাত্রী নিয়ে দ্বারকাতীর্থে গেছে। বিশ ক্রোশ পথ। একদিনে পৌঁছানো যাবে না। তবে আজ দ্বারকায় যাবে না , অন্য কাজ আছে। অন্য কাজ প্রসঙ্গে গাড়োয়ান বলে, সে দ্বারকার পথ ছেড়ে ডান দিকের পথ ধরবে। গাড়োয়ান বলে-— বাণ ইচ্ছা করলে এই

গাড়িতে চড়ে চারক্রোশ পর্যন্ত যেতে পারে। চারক্রোশ পর রাস্তার চৌমাথায় নেমে অন্য গাড়ি ধরে দ্বারকায় যেতে পারে। চৌমাথায় অনেক গাড়িঘোড়া থাকে।

বাণ গাড়িতে উঠে দুপুর বেলায় চৌমাথায় নামে। চৌমাথায় দুচারটি দোকানপাট সরাইখানা। সূর্যের ভীষণ উত্তাপ। সবদিকে রুক্ষ বালিপাথর। গাছপালা নেই। রুক্ষ বালি এবং পাথর থেকে উত্তাপ ঠিক্‌রে বের হচ্ছে।

তীব্র তাপের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে বাণ ক্লান্ত হয়ে ওঠে। চৌমাথার তিনদিক থেকে গাড়ি আসছে যাচ্ছে, কিন্তু দ্বারকাপথে কোন গাড়ি যাচ্ছে না এবং যেতে রাজীও হচ্ছে না।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ক্লান্ত-শ্রান্ত বাণ দেখে একটি ঘোড়ার গাড়ি প্রভাসপত্তনের রাস্তা ধরে এসে চৌমাথা পার হয়ে সোজা দ্বারকার দিকে ছুটে চলছে। বাণ পিছনে ছুটে ছুটে চিৎকার করে গাড়ি থামাতে বলে। গাড়ি থামার পর বাণ গাড়োয়ানকে বলে সে দ্বারকায় যেতে চায়। গাড়োয়ানের কিছু বলার আগে গাড়ির মোটা পর্দা সরিয়ে একটি মুখ বের হয়। প্রথম দৃষ্টিতেই বাণের চোখে পড়ে লোকটির মুখে মস্ত একজোড়া কাঁচাপাকা গোঁফ। লোকটি বাণের দিকে তাকিয়ে, কর্কশ কণ্ঠে বলে দ্বারকায় যেতে হলে অষ্টপণ কড়ি লাগবে। বাণের মনে হয়, অষ্টপণ কড়ি অনেক বেশি কড়ি। খানিক আগে চার ক্রোশ পথের জন্য মাত্র একপণ কড়ি দিয়েছে। লোকটি কর্কশ কণ্ঠে তাড়া দিয়ে বলে, অষ্টপণের কম হবে না। বাণ, বাধ্য হয়ে গাড়িতে উঠে, লোকটির পাশে বসে। গাড়ি চলতে শুরু করে।

বাণ ক্লান্ত। ভীষণ উত্তাপ। বাণের সারাদেহে ভীষণ অস্থিরতা। হঠাৎ সে পাশের লোকটির উপর এলিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়।

জ্ঞান হলে দেখে সে সরাইখানার মেঝের উপর মাদুরে শুয়ে আছে। ভেজা শরীর। পোষাক পরিচ্ছদ ভেজা। গোঁফওয়ালা লোকটির ইঙ্গিতে, গাড়োয়ান জলের একটি পাত্র বাণের হাতে দেয়। জল হাতে নিয়ে বাণ ইতস্তত করে। বাণের ইতস্ততভাব দেখে লোকটি বাণকে কর্কশ কণ্ঠে হুকুম করে জল খেতে। বাণ জল খেয়ে বুঝে জলে মিছরি মিশানো। জলপানের পর আবার চড়াগলার কর্কশ হুকুম চুষে চুষে লেবু খেতে হবে।

বাণের মনে পড়ে তার কোমরে হুন্ডি নগদ কড়ি ছিল। কোমরে হাত দিয়ে দেখে কিছু নেই। লোকটি বাণের অস্থির ভঙ্গি দেখে পুঁটুলি বাণের হাতে দেয়। বাণ দেখে সব ঠিকঠাক আছে। পুঁটুলিতে জল লাগেনি।

বাণ, লোকটিকে খুঁটিয়ে খুটিয়ে লক্ষ করে। চুল ছোটো করে ছাঁটা। শিখা নেই। শক্ত বাঁধুনির শরীর। গায়ের রং কালো। মস্ত কাঁচাপাকা গোঁফ। গোঁফে যখন তখন দুহাতে তা দেয়। তা দেওয়া সম্ভবত মুদ্রাদোষ।

গাড়ি আবার ছুটে ছুটে, সন্ধ্যায় একটি সরাইখানায় পৌঁছায় সেখান থেকে দ্বারকা প্রায় দশ ক্রোশ দূরে। বাণ লোকটির সাথে কথাবার্তায় সুযোগ পাচ্ছে না। লোকটির কাঠখোট্টা গোঁয়ার গোবিন্দ ভাবসাব দেখে বাণ কুঁকড়ে থাকে।

সরাইখানায় পৌঁছে বাণ লোকটিকে মিনমিন করে বলে সন্ধ্যাহ্নিক করতে পারলে ভালো

হত। বাণের প্রার্থনা শেষ হতে না হতেই লোকটি গর্জন করে সরাইখানার লোকজন ডেকে, বাণের স্নানের ব্যবস্থা করতে বলে। বাণ স্নান আহ্নিক করে ধাতস্থ হয়। লোকটির সাথে খেতে বসলে সে বাণকে সূর্য প্রণাম মন্ত্র বলতে বলে। মন্ত্র শুনে জিজ্ঞাসা করে বাণ কি সংস্কৃত ভাষার কথা বলতে পারে? বাণের উত্তর শুনে সে সংস্কৃত ভাষার কথা বলতে আরম্ভ করে। বাণের মহাবিস্ময়। এত স্পষ্ট উচ্চারণ চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমের মাত্র গুটিকয়েক অধ্যাপকের মুখে শুনেছে। এমনি বলিষ্ঠ উচ্চারণ ছিল নাটকের কথক জয়সেনের কণ্ঠে।

বাণের বিস্মিত ভাব লক্ষ করে লোকটি বলে সরাইখানার সর্বমোট খরচ সিকি টাকা। বাণকে সরাইখানার জন্য দুই পণ দিতে হবে। এরপর বাণের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসু শিক্ষকের মত, সর্বমোট বাণকে কত দিতে হবে জিজ্ঞাসা করে। বাণ, মাথা চুলকিয়ে হিসাব নিকাশ করে বলে দশপণ। বাণের উত্তর শুনে লোকটি মহাখুশি। বলে হিসাব নিকাশে বাণের মগজ সাফ। মগজ সাফ বলেই জিজ্ঞাসা করে বাণের মাথার খালি খালি হালকা হালকা ভাব কমেছে কিনা। বাণ বলে সে এখন সুস্থ।

লোকটি বলে বাণের অসুখ এমন কিছু নয়। বাণ ব্রাহ্মণ, তিনবেলা স্নান করে থাকে। এই সঙ্গে বাণ সম্ভবত বৃষ্টিবহুল অঞ্চলের লোক। লোকটির কথায় বাণ বিস্মিত। সে তো সত্যিই বৃষ্টি বহুল অঞ্চলের লোক। লোকটির সাথে বাণের দেশ সম্পর্কে কোন কথাই হয়নি। লোকটি বলে, বাণের অসুস্থতার কারণ আধি-দৈবিক দোষ। এই দোষ প্রকৃতির ভীষণ প্রকোপ পুরুষ সহ্য করতে পারে না।

বাণ জিজ্ঞাসা করে প্রকৃতির ভীষণ প্রকোপ কি একমাত্র নারীগণই সহ্য করতে পারে?

এবার লোকটির মুখে হাসির ঝিলিক দেখা যায়। বলে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে পঞ্চভূতে তৈরি শরীরকে পুরুষ বলে। নারী অথবা নরের শরীরকে 'পুরুষ' বলা হয়। তারপর বলে প্রকৃতির রৌদ্রতাপ বাণের দেহের উপর আক্রমণ করে কফকে বিপন্ন করে তুলেছে। কফ দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চলাফেরা নির্দ্ধারণ করে। পুরুষের অর্থাৎ শরীরের মৌলিক উপাদানে, কফের মতো গুরুত্বপূর্ণ আরো দুটি উপাদান আছে। এগুলি হচ্ছে বাত এবং পিত্ত। বাত, পিত্ত ও কফ একযোগে পুরুষকে রক্ষা করে। ভীষণ রোদে প্রথমে কফ বিপন্ন হয় বিপন্ন কফ একযোগে পুরুষকে রক্ষার জন্য প্রয়াসী হয়। ক্রমাগত সংগ্রাম করে এক সাথে এই তিনটি উপাদান ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে যায়। তারপরই বাণের পুরুষ বিপন্ন হয়ে পড়েছিল।

বাণ লোকটির কথাবার্তা শুনে বলে, তার ভাগ্য ভালো সে একজন অভিজ্ঞ বৈদ্যের সাথে ছিল। লোকটি বাণের মুখে বৈদ্য শব্দ শুনে আবার হাসে এই সাথে দুই হাতে বেশ কিছুক্ষণ গোঁফে তা দেয়।

পরদিন সন্ধ্যায় গাড়ি দ্বারকায় মন্দিরের কাছাকাছি একটি সরাইখানায় থামে। বাণ, বিনয়াবতার সেজে লোকটিকে মন্দিরের হট্টশালায় না ওঠার কারণ জিজ্ঞাসা করে। প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সে বাণের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ গোঁফে তা দেয়।

পরদিন ভোরে লোকটি সমুদ্রে নেমে স্নান সেরে সরাইখানায় একা খেতে বসে। বাণের

তখনো স্নানাহ্নিক হয়নি। বাণ লোকটির গলায় দীর্ঘ যজ্ঞোপবীত দেখেছে—কিন্তু আহ্নিকের কবালাই নেই।

ইতিমধ্যে বাণ স্নানাহ্নিক শেষ করে এসেছে। লোকটি খেতে খেতে বাণকে কত টাকা দিতে হবে তার পুঙ্খাণুপুঙ্খ হিসাব নিকাশ করে।

বাণ লোকটির পাশে খেতে বসে দ্বারকার কথা ওঠে। লোকটি বলে— এই স্থান যেমন শৈব তীর্থ তেমনি বৈষ্ণবতীর্থ। এখানকার জ্যোতির্লিঙ্গের নাম নাগেশ শিব। দ্বারকার পুরোনো নাম দ্বারাবতী । বাণ বিশেষ আগ্রহ নিয়ে দ্বারকার কথা শোনে।

লোকটি বলে প্রাচীন দ্বারকা প্রকৃতপক্ষে কোথা ছিল এ নিয়ে, নানা মুনির নানামত।

বাণ দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী ছিল এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। লোকটি বলে, মহাভারতে আছে আর্নত দেশের রাজধানী কুশস্থলীতেই দ্বারকা স্থাপিত হয়। পুণ্যজন রাক্ষস কুশস্থলী অধিকার করায়, শর্যাতি বংশধরগণ এই নগর ত্যাগ করেন এবং জনশূন্য হয়। বহু বহু দিন পর কালযবন এই সাথে জরাসন্ধের আক্রমণে বিপন্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণ যাদবগোষ্ঠী সহ, এই স্থানে নূতন রাজ্যের পত্তন করেন। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর মূল দ্বারকাসমুদ্রে লীন হয়ে যায়।

বাণ দ্বারকার প্রাচীন কথা শুনে মুগ্ধ। পরম শ্রদ্ধায় বাণ বলে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন তাই একজন জ্ঞানী পুরাণবিদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। বাণের কথা শুনে লোকটি গাম্ভীর্যের ভান করে বলে এখন জ্ঞানী পুরাণবিদ হয়ে পুরানো বৈদ্য খেতাব হারালো।

দুজনের কথাবার্তায় স্থির হল আগামী ভোরে, দ্বারকা থেকে প্রভাসপত্তনে যাত্রা করা হবে। লোকটি বাণের যাত্রাপথের কথা জিজ্ঞাসা করলে বাণ বলে এ সম্পর্কে তার কোনও সঠিক পরিকল্পনা নেই। বাণের কথা শুনে লোকটি বিস্মিত হয়ে বলে ইতিপূর্বে সে বাণের মতো কোনও ব্যবসায়ী দেখেনি। বাণ বলে সে ব্যবসায়ী নয়।

পরদিন ভোরে প্রভাস পত্তনের দিকে যাত্রা আরম্ভ করে। পথে একরাত পান্থশালায় কাটিয়ে - দ্বিতীয় সন্ধ্যায় সোমনাথ মন্দির অঞ্চলে পান্থশালায় গাড়ি থামে। বাণ, বিষ্ণুধরের দোকান এবং বাড়ীর অবস্থানের দিক সম্পর্কে চিন্তা করে। চিন্তা করে হদিশ করতে পারে না। ভাবনায় তালগোল পাকিয়ে গেছে।

পান্থশালার ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ধ্রুবতারা অনুসন্ধান করে। ধ্রুবতারা পেলে দিকনির্ণয় সহজ হয়ে যাবে।

বাণের দৃষ্টি যখন ঊর্দ্ধমুখী তখন তার পাশে এসে দাঁড়ায় সেই ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি গোঁফে তা দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করে বাণ আকাশের দিতে তাকিয়ে কী দেখছে? বাণ বলে ধ্রুবনক্ষত্র দেখছে। লোকটি বাণের সাথে নক্ষত্রাদি সম্পর্কে কথাবার্তা বলে বলে জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে আলাপ শুরু করে। জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে বাণের জ্ঞান অতিসামান্য।

লোকটি বলে গেলবছর গঙ্গা যমুনা মেলায় স্নান করতে গিয়ে এক যুবকের সাথে দেখা হয়েছে। দারুণ সব নূতন কথা নিয়ে গ্রন্থ লিখছে। গ্রন্থ লেখা তখনো শেষ হয়নি। দারুণ পরিশ্রমী যুবক। বই লেখা শুরু করার বহু আগ থেকে জ্যোতির্বিদ্যার নানা গ্রন্থ নিয়ে খুব ঘাঁটাঘাঁটি করেছে।

পাঠ করে করে প্রায় গিলে ফেলেছে আর্যভট্টের গ্রন্থ 'আর্য ভট্টীয়' সেই সাথে বরাহমিহিরের গ্রন্থ পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা।

বাণ যুবকের নাম জিজ্ঞাসা করলে লোকটি বলে নব যুবক এই জ্যোতির্বিদের নাম ব্রহ্মগুপ্ত। যে গ্রন্থ লিখতে শুরু করেছে তার নাম দিয়েছে ব্রহ্মস্ফুট।

বাণ লক্ষ করে লোকটির দৃষ্টি আকাশের দিকে স্থির নিবদ্ধ। আকাশের বিভিন্ন দিকে তাকিয়ে জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে কথা বলে চলছে। লোকটি বলে ভারতবর্ষে, বৈদিক কাল থেকে জোতির্বিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। চন্দ্র-সূর্যের গতিপথ বিশ্লেষণ করে প্রায় উনিশ শতবছর আগে, বেদাঙ্গ জ্যোতিষশাস্ত্র সৃষ্টি হয়েছে। বেদাঙ্গ জ্যোতিষসহ আরো একটি জ্যোতিষশাস্ত্রগ্রন্থ আছে। এই শাস্ত্র গ্রন্থের নাম সূর্যসিদ্ধান্ত।

বাণ সূর্যসিদ্ধান্ত কোন্ মুণির রচনা জিজ্ঞাসা করে। লোকটি উত্তর দিতে গিয়ে ইতস্তত করে বলে মুনির নাম নেই। তবে লোকমুখে প্রচলিত সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থের লেখক ময়দানব।

বাণ বলে একজন মিশ্র ব্যবসায়ী তাকে বলেছে তাদের দেশে নাকি পাঁচ হাজার বছর আগে থেকে পঞ্জিকার প্রচলন ছিল। বাণের কথা শুনে লোকটি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলে সঠিক পাঁচ হাজার বছর আগে নয়। পাঁচ হাজার থেকে দেড়-দুই শত বছর কম হবে। এই কথার রেশ টেনে লোকটি বলে সেই প্রাচীনকালে মিশর দেশে ত্রিশ দিনে এক মাস এবং বারো মাসের সাথে আরো পাঁচ দিন যোগ করে তিনশত পঁয়ষট্টি দিনের বছর চালু হয়েছিল।

দীর্ঘ সময় নানা প্রসঙ্গে আলোচনার পর লোকটি বলে বর্তমানকালে পূর্ব ভারতের গঙ্গাসাগর অঞ্চলে জ্যোতিষচর্চা বিশেষ উন্নতমানসম্পন্ন। আরব অঞ্চলের মানুষ সেখানে সরাসরি বাণিজ্য করে। এই সাথে শ দেড়েক বছর আগে, গুপ্তবংশীয় রাজাগণ গঙ্গাসাগর অঞ্চল দখল করে পশ্চিম ভারতের যজ্ঞপন্থী লাট অঞ্চলের দ্বিজগণকে ভূমিদান করে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই লাট দ্বিজগণ, জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

লোকটি পূর্বভারতীয় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলে সেই অঞ্চলে ধর্মসম্পর্কে এক অভূতপূর্ব আন্দোলন হচ্ছে। সেখানকার জ্ঞানী পণ্ডিতবর্গ, বিভিন্ন ধর্মকে সম্মিলিত করে এক মিলিত ধর্মীয় ধারণা সর্বভারতে বিস্তার করেছেন। সেই ধর্মের নাম দিয়েছেন সিন্ধুদেশীয় অর্থাৎ ভারতীয় ধর্ম। পূর্ব ভারতের উচ্চারণে হিন্দুধর্ম।

লোকটির কথা শুনে বাণ আবেগপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে কী কখনো গঙ্গাসাগর অঞ্চল দেখেছেন?

তিনি ধ্রুব নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ রেখে বলেন বহু বৎসর সেখানে বাস করেছে। সে চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমের স্নাতক।

বাণ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত লোকটির পায়ে লুটিয়ে পড়ে। বাণ আত্মপরিচয় প্রদান করে। তার নাম বলে ভর্ৎসু। ভর্ৎসু বলেন, চন্দ্রমৌলী শিব মন্দিরের চন্দ্রগোমী স্বামী তার আবাল্য বন্ধু-সখা।

বাণ নিজকে ভর্ৎসুর চরণে সমর্পণ করে। বাণ ভাবে চন্দ্রমৌলী শিবের পরম আশীর্বাদে তার জীবনে পরম গুরুর আবির্ভাব হল। বাণ উত্তরাকাশের ধ্রুব নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে যুক্ত করে, শিবস্তুতি মন্ত্র আবৃত্তি করে। ভর্ৎসু তার দক্ষিণ কর, বাণের মাথার উপর রেখে, বাণের মন্ত্রপাঠের সাথে আপন কণ্ঠ যুক্ত করেন।

* * *

পরদিন থেকে গাড়ি ছুটে চলে। দিনের পর দিন চলতে থাকে। পাহাড় নদী মরুভূমি পার হয়ে গাড়ী ছুটে চলে। দিনে চলা । রাতে পান্থনিবাসে বিশ্রাম। পান্থশালায় কখনো বা একাধিক দিন বিশ্রাম। লক্ষ্য স্থান্বীশ্বর।

পথে পান্থশালায় ভর্ৎসু এবং বাণের নানা কথা নানা গল্প। ভর্ৎসু - বাণকে তার মা-বাবা আত্মীয়স্বজনের কথা, চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমের অধ্যাপকদের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন। বন্ধুবান্ধবের কথা, বন্ধুবান্ধবের পরিচয় দিতে বাণের দারুণ উৎসাহ।

বাণ বলে তার গ্রন্থ লিপিকর বন্ধুর নাম কুমারদত্ত। লেখক বন্ধু হচ্ছে গোবিন্দক। কবি বন্ধুদের মধ্যে আছে ভাষা কবি ঈশান অন্যতম বর্ণ কবি-বেনী ভারত। জ্ঞানী পণ্ডিত বন্ধুরা হচ্ছে রুদ্রনারায়ণ, বারবার্ন, বাসবার্ন।

ভর্ৎসু বাণের বন্ধুবান্ধবের নাম এবং পরিচয় জেনে মন্তব্য করেন বাণ প্রকৃতপক্ষে একজন সাহিত্যিক।

ভর্ৎসুর মন্তব্য শুনে বাণ বলে এ সব জ্ঞানীগুণী সাহিত্যিক বন্ধু বান্ধবের সাথে আরো কতিপয় বন্ধুবান্ধব আছে। তারা হচ্ছে অনঙ্গবাণ সূচিবাণ সোমিল গ্রহাদিত্য। এই চারজন তার প্রিয় গায়ক বন্ধু। গায়ক বন্ধুদের সাথে অন্য বন্ধুরা হচ্ছে মার্দঙ্গিক-জীমূত বংশীবাদক মধুকর এবং পারাবত।

ভর্ৎসু গায়ক এবং বাদকের নাম - পরিচয় শুনে বলেন বাণ অবশ্যই সঙ্গীতজ্ঞ।

বাণ হেসে হেসে বলে তার আরো কিছু বন্ধুবান্ধব আছে। যেমন নাটক পরিচালক দর্দুরক চিত্রশিল্পী বীরবর্মা। বাণ ভর্ৎসুর দিকে তাকিয়ে বলে বন্ধু বান্ধবের সাথে তার বান্ধবীও আছে। বাণের কথায় ভর্ৎসুর চোখে কৌতুকের ছায়া ভেসে উঠে বাণ বলে তার বান্ধবীরা হচ্ছে নর্তকী হরিণিকা প্রসাধিকা কুরঙ্গিকা সংবাহিকা কেরলিকা।

বাণের মুখে তার বন্ধুবান্ধবের বিস্তারিত তালিকা শুনে ভর্ৎসুর মুখে প্রসন্নতা দেখা দেয়। তিনি মৃদু হেসে বলেন, বাণ হচ্ছে প্রকৃত নন্দন-তাত্ত্বিক। বাণের সাহিত্য অনুভূতির সাথে হৃদয়ে যুক্ত হয়েছে সঙ্গীত নাটকের নন্দনরস।

ভর্ৎসুর মুখে প্রসন্নতার ছায়া দেখে বাণের কৌতুহল হয়। বাণ বলে তার এমন সব কিছু বন্ধু -বান্ধব আছে যারা নন্দনতত্ত্বের ধারেকাছে থাকে না। সেই বন্ধুরা হল কুম্ভকার দামোদর ভ্রমণকারী তাম্রচূড় বিষকপুত্র মন্দারক বিষবৈদ্য ময়ূরক খনিবিদ লোহিতাক্ষ এই সাথে আছে অর্দ্ধ উন্মাদ বন্ধু বায়ু বিকার।

বাণের মুখে এসব বন্ধুদের নাম পরিচয় শুনে ভর্ৎসুর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠে। ভর্ৎসুর গম্ভীর মুখ দেখে বাণের চোখে কৌতুকের ছায়া ঝিকমিক করে ওঠে। বাণ বলে তার বন্ধুবান্ধবের নামের তালিকার আরো কজন আছে। বাণ এদের নাম বলে ঐন্দ্রজালিক চকোরাক্ষ চোর শশ জুয়াড়ি আখণ্ডল এবং ভীমক।

বিস্মিত ভর্ৎসু বাণকে প্রশ্ন করেন—চোর জুয়াড়ী বাণের বন্ধু?

বাণ বলে, জুয়াড়ি বন্ধু আখণ্ডল তাকে শিখিয়েছে চুম্বক দিয়ে কীভাবে জুয়াচুরি করতে হয়।

বাণের কথা শুনে ভর্ৎসু অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে আপনমনে গভীর চিন্তার ডুবে থাকেন। বাণ ভর্ৎসুর গভীর চিন্তা মগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বেশ খানিকক্ষণ পর ভর্ৎসু বলেন, বাণ জীবনকে চিনে নিয়েছে। জানার মধ্যেই আছে পূর্ণ জীবন। জানার আর এক নাম জ্ঞান। জীবনের ভালো মন্দ সব কিছুকে জেনে সত্যকে অনুসন্ধান করতে হয়।

ভর্ৎসু বাণকে আশীর্বাদ করেন। বাণ লক্ষ করে ভর্ৎসু এই প্রথম প্রকাশ্যভাবে বাণকে আশীর্বাদ করলেন।

বাণ বন্ধুবান্ধবের কথা ভাবে। ভাবে একটি প্রিয় নাম। অজ্ঞাত কারণে উচ্চারণ করেনি হৃদয়ের নর্ম-সহচরী ব্যর্থ ভালোবাসার অশ্রুসিক্ত উম-ইয়ামের নাম।

*　　　　*　　　　*

অনেক অনেক দিন পর স্থাণ্বীশ্বর নগরে গাড়ি পৌছাল। রাজকীয় পান্থশালার সামনে গাড়ি দাঁড়াল। ভর্ৎসুক দেখে পান্থশালার কর্মচারীদের মধ্যে দারুণ ব্যস্ততা। পান্থশালার প্রধান কর্তা, বিনীতভাবে দুজনকে দুটি আলাদা প্রকোষ্ঠে নিয়ে গেলেন। প্রকোষ্ঠের সাথে সংলগ্ন স্নানাগার-বারান্দা। বারান্দার সামনে সাজানো ফুলের বাগান। স্নানাহার শেষে দু'জনের বিশ্রাম।

বাণ সন্ধ্যায় ভর্ৎসুর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে দেখে তিনি শুয়ে আছেন। বাণকে দেখে বলেন, দিনের পর দিন মাসের পর মাস পা কুঁকড়ে বসে বসে দুপায়ে খিল ধরে গেছে। বাণ সহজভাবে বিছানায় বসে ভর্ৎসুর পা টিপে দিতে থাকে। ভর্ৎসু সহজভাবে বাণের সেবা গ্রহণ করে জিজ্ঞাসা করেন স্থাণ্বীশ্বর সম্পর্কে বাণের কী ধারণা?

প্রশ্ন সঠিকভাবে বুঝতে না পেরে বাণ ভর্ৎসুর দিকে তাকিয়ে থাকে। ভর্ৎসু বলেন, তিনি স্থাণ্বীশ্বরের প্রাচীন কথা জিজ্ঞাসা করছেন।

বাণ বলে, মহাভারত আছে, দুর্যোধন তার উরুভঙ্গের পর স্থাণ্বীশ্বরের দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে এসেছিলেন। বাণ খানিক চিন্তা করে বলেন, স্থাণ্বীশ্বরের ক্রোশ তিন দক্ষিণে সপ্তরথীগণ অভিমন্যুকে হত্যা করেছিলেন এবং সেই স্থানে অর্জুন, অশ্বত্থামাকে পরাজিত করেছিলেন। অভিমন্যুকে হত্যা করার স্থানের ক্রোশ দুই দক্ষিণ পশ্চিমে পিতামহ ভীষ্মের মৃত্যু হয়ে ছিল।

ভর্ৎসু বাণের কথা শুনে শুনে গোঁফে তা দিচ্ছিলেন। ভর্ৎসু কুরুক্ষেত্রের মাঠে মহাভারতে মহাযুদ্ধ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব কি না এ নিয়ে বাণকে প্রশ্ন করেন। বাণ ভর্ৎসুর প্রশ্ন সঠিকভাবে

বুঝতে পারে না। ভর্ৎসু, ব্যাখ্যা করে বলেন, কুরুক্ষেত্রের মাঠে কৌরবের এগারো এবং পাণ্ডবের সাত, সর্বমোট আঠারো অক্ষৌহিনী সৈনিক একসাথে যুদ্ধ করেছিল। বাণ ভর্ৎসুর দিকে তাকিয়ে থাকে। ভর্ৎসু বলেন, আঠারো অক্ষৌহিনী এক বিরাট সংখ্যা।

বাণকে লিখতে বলেন। ভর্ৎসুর কথা মত প্রতিটি অক্ষৌহিনীর রথ হাতী ঘোড়া পদাতিক সৈন্য সংখ্যা লিখে যোগ করে। যোগফলকে আঠারো দিয়ে গুণ করে বাণ বিস্মিত হয়। বিস্মিত বাণ বলে, আঠারো অক্ষৌহিনী অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধকোটি মানুষ হাতী ঘোড়া রথ একস্থানে সমবেত হয়ে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়।

দুজনের মধ্যে বিপুল বাহিনী নিয়ে নানা কথাবার্তার সাথে ভর্ৎসু বলেন, মহাভারত গ্রন্থ দিন দিন বিরাট আকার ধারণ করছে। মহাভারত গ্রন্থের লিপিকারগণ গ্রন্থ নকল করার কালে আপন মনের নানা কথা কাহিনি যোগ করে করে ক্রমশ গ্রন্থের আকৃতি এবং বিষয়বস্তুকে স্ফীত করে চলছেন।

বাণের প্রশ্নের উত্তরে ভর্ৎসু বলেন, মহাভারতের যুদ্ধের সময়কাল নিয়ে নানা মতামত আছে—তবে বেদগ্রন্থে এর উল্লেখ নেই। আলাপে আলাপে রাত গভীর হয়ে যায়।

পরদিন সকালবেলা ভর্ৎসুর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে বাণ বিস্মিত হয়। ভর্ৎসুর সম্মুখে জোড় হস্তে কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছে। চন্দ্রপুর আশ্রমে লোহিতাক্ষের মারফতে কৃষ্ণের সাথে বাণের পরিচয় হয়েছিল। লোহিতাক্ষের সাথে কৃষ্ণ চন্দ্রপুরের রাজকীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করত। বাণকে দেখে কৃষ্ণের বিস্ময়।

কথাবার্তাশেষে কৃষ্ণ দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বাণকে বাহিরে আসতে বলে। ভর্ৎসু কড়া মেজাজে বাণকে বলেন, এখন বাহিরে না গিয়ে বাণ যেন তার কাজকর্ম শেষ করে।

কৃষ্ণ বের হয়ে গেলে ভর্ৎসু বাণকে বলেন, তিনি চান না কৃষ্ণ বাণের সাথে কথাবার্তা বলুক। তিনি কৃষ্ণের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন, কৃষ্ণ স্থাণ্বীশ্বরের সম্রাট প্রভাকরবর্দ্ধনের পুত্র স্থানীয়। বর্দ্ধন রাজবংশের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন, এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম সম্রাট পুষ্পভূতি প্রভাকর বর্দ্ধনের পুত্র কন্যাদির পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন, তাঁর দুই পুত্র এবং এক কন্যা পুত্রদ্বয় এবং কন্যার নাম মনে নেই তবে দুই পুত্রের নামের সাথে বর্দ্ধন শব্দ যুক্ত আছে পুত্রদ্বয় নিতান্ত কিশোর। বারো তেরো বয়স হতে পারে।

কৃষ্ণ সম্পর্কে আলোচনায় ভর্ৎসু বলেন, তাঁর অনুমান বাণের সাথে কৃষ্ণের পরিচয় হয়েছে চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রামে। কৃষ্ণ চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমে অধ্যয়ন করেছে। ভর্ৎসু সম্রাট প্রভাকরবর্দ্ধনের অনুরোধে সেখানে অধ্যয়ন করার ব্যবস্থা করে দিয়ে ছিলেন। কৃষ্ণের সমবয়সী আরো দুটি ছেলেকে প্রভাকর বর্দ্ধন কাশী এবং তক্ষশিলায় অধ্যয়ন করার জন্য পাঠিয়েছেন।

বাণ উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রভাকরবর্দ্ধনের প্রান্তৃযত্নর প্রশংসা করে। ভর্ৎসু বাণের মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলেন, বাহ্যিক সৌন্দর্য বাহ্যিক পবিত্রতাই সবকিছু নয়। গভীর দৃষ্টিতে তাকালে মোহিনী নারীর নাভির তলায় দেখা যায় বিষ্ঠা।

বাণ ভর্ৎসুর এমনি ধরনের কঠিন কঠোর বিশ্লেষণ শুনে সাবধান হয় ।

কিছুক্ষণ পর ভর্ৎসু বাণকে জিজ্ঞাসা করেন বাণ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পাঠ করেছে কিনা? এবং অর্থশাস্ত্রগ্রন্থ সম্পর্কে বাণের ধারণার কথা জিজ্ঞাসা করেন। বাণ কঠিন ভাষায় বলে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ভীষণ কঠিন ক্রূর এবং নিষ্ঠুর।

বাণের কঠিন কঠোর মন্তব্য শুনে ভর্ৎসুর মুখে ম্লান হাসি ফুটে ওঠে। তিনি বলেন, এই নিষ্ঠুর শাস্ত্র কথা রাজা মহারাজাদের কাছে বেদবাক্য। চন্দ্রপুর রাজকীয় বিদ্যাশ্রমে এই অর্থশাস্ত্র রাজা মন্ত্রী সেনাপতি ধনী বণিক এদের পুত্রদেরে যত্ন করে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শাস্ত্রে, গুপ্তচর বৃত্তিকে রাজ্যশাসনের মস্ত স্তম্ভ রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাজাগণ তাদের সন্তানাদি সহ অতি বিশ্বাস যোগ্য ছাত্রদেরে রাজ্যশাসনের নানা বিষয় সহ গুপ্তচর বৃত্তি শিক্ষার জন্য সেখানে প্রেরণ করেন। কৃষ্ণ তেমনি একজন ছাত্র। তাকে প্রেরণ করেছেন সম্রাট প্রভাকরবর্দ্ধন। প্রভাকরবর্দ্ধন, এমনিভাবে আরো দুজনকে পাঠিয়েছেন। একজনকে পাঠিয়েছেন তক্ষশিলায় অন্যজনকে কাশী।

ভর্ৎসু প্রসঙ্গত বলেন, এই চাণক্য কী ভীষণ শঠনীতির প্রবর্তক তা বাণ কল্পনা করতে পারবে না। চাণক্য নীতিতে মানবতা দয়া দাক্ষিণ্য ভালোবাসা বিশ্বাস কিছু নেই। শুধু নিজে বেঁচে থাকো। নিজে বেঁচে থাকার জন্য যে কোনও ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারো। তাই রাজা-মহারাজাদের সত্যিকার ভাই বোন মাতা-পিতা বন্ধুবান্ধব কেউ নেই। রাজা-মহারাজাগণ তাই একা সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ভর্ৎসু বাণকে বলেন, তিনি বেরিয়ে যাচ্ছেন। মহারাজা প্রভাকরবর্দ্ধনের সাথে সাক্ষাৎ করে এখনই ফিরে আসবেন। ফিরে এসেই আবার যাত্রা শুরু হবে। ভর্ৎসু দরজায় দাঁড়িয়ে বাণের দিকে তাকিয়ে, নিচু গলায় বলেন, বাণ যেন সাবধানে থাকে। কোনওভাবেই যেন প্রকোষ্ঠের বাইরে না যায়।

অর্দ্ধপ্রহরের মধ্যে ভর্ৎসু ফিরে এলেন এবং যাত্রা শুরু হল।

*　　　　*　　　　*

স্থাণ্বীশ্বর নগরীর সোজা সরল পথ ধরে গাড়ি ছুটে চলে। পথের দুধারে ছোটো বড়ো অট্টালিকা, ফুলের বাগান দোকানপাট। অজস্র রুচিসম্পন্ন সুন্দর পোষাকের নরনারীর মাঝ দিয়ে গাড়ি এগিয়ে গিয়ে, নগরীর ঘেরা পাঁচিলের সীমানায় পৌছায়। গাড়ি পাঁচিলের বন্ধ ফটকের মুখে পৌছাল ফটকের দরজা খুলে যায়। গাড়ি ফটক অতিক্রম করে।

ফটক অতিক্রমের পর দেখা যায় সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশ। রাস্তার পাশে কদর্য হাটবাজার। রাস্তার পাশে জীর্ণ কুঁড়ে ঘরের সাড়ি। কুঁড়ের সামনে স্তূপ স্তূপ আবর্জনা। আবর্জনার কাছে উলঙ্গ অর্দ্ধ উলঙ্গ নারী পুরুষ, শিশু। পথের উপর নিশ্চিন্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে শূকর, কুকুর ও মোরগ। কখনো দেখা যায় রাস্তার পাশে মাছ ধরার জাল টাঙানো। পথের পাশে, গাছের তলায় কলাপাতার উপর ছাগ শূকর গরুর কাটা মাংস বিক্রি হচ্ছে। সূর্যের ভীষণ উত্তাপ। রাস্তার উপর দিয়ে কালো নোংরা জল একে বেঁকে বয়ে যাচ্ছে। কাদায় মোরগ শূকর। ভীষণ দুর্গন্ধ।

ভর্ৎসু বলেন, এখানে চণ্ডালদের বাস। চণ্ডালগণ নগরদেয়ালের বাইরে থাকে। নগরে প্রবেশ

করলে চণ্ডালগণ গলায় ঘন্টা বেঁধে চলা ফেরা করে। ওরা অস্পৃশ্য।

আবার সেই চলা। চলার যেন বিরাম নেই। দিনের বেলা পথ চলা। রাত্রিবেলা পান্থশালায় বিশ্রাম। একই পান্থশালায় কখনো বা একাধিক দিনরাত্রি বিশ্রাম তার পর চলা। গাড়ি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে এগিয়ে চলে।

পথে শকট চালক বিষয়ে কথা উঠ ভর্ৎসু বলেন, শকট চালকের নাম গোহক। গোহক তার সুহৃদ দেহরক্ষী ভৃত্য। বছর কুড়ি আগে ওকে নালান্দায় আবিষ্কার করেছিলেন। দেখেছিলেন সে জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর পা জড়িয়ে কাঁদছে। মহিষের মতো ভীষণ আকৃতির কালো কুচকুচে একটা মানুষ শিশুর মতো কাঁদছে দেখে ভর্ৎসু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে গেলেন। সন্ন্যাসী বলেন তিনি তীর্থ পরিক্রমা শেষে চীনদেশে ফিরে যাচ্ছেন। সন্ন্যাসী চলে যাচ্ছেন বলে সে কাঁদছে।

সন্ন্যাসী বলেন, বছর তিন আগে তিনি নালান্দার পাশের গ্রাম বংশীবন থেকে যখন ফির ছিলেন তখন হঠাৎ করে তিন ডাকাত তাকে আক্রমণ করে। সন্ন্যাসী আত্মরক্ষার জন্য তার পা চালালেন। গোহক ধরাশায়ী হল। বাকী দুজন পালিয়ে গেল।

সন্ন্যাসীর কথা শুনে ভর্ৎসু গোহকের দিকে তাকিয়ে দেখে ছিলেন তার বন্য মহিষের মতো আকৃতি। ঘন কালো শরীরে স্তূপ স্তূপ মাংস পেশী ভর্ৎসুভাব ছিলেন ক্ষীণদেহী সন্ন্যাসী কীভাবে এমনি অবিশ্বাস্য কাণ্ড করলেন? বছর তিন আগে গোক ধরাশায়ী হয়ে এমনিভাবে ভেবেছিল - কী করে এমন কাণ্ড হল?

চীনা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভর্ৎসুকে বলেছিলেন, আত্মরক্ষার জন্য কিছু শারীরিক কৌশল শিক্ষা তাদের ধর্মের অনত্যম শিক্ষণীয় সাধনা কর্ম। এই বিদ্যার নাম 'ক্রতু'। সংস্কৃত ভাষায় ক্রতু অর্থ যুদ্ধ যেমন ইন্দ্রের এক নাম শতক্রতু। অর্থ হচ্ছে শতযুদ্ধ বিজয়ী।

ভর্ৎসু তখন গোহককে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আশ্রয় দিয়েছিলেন ভৃত্য রূপে কিন্তু প্রায় বছর তিন গোহক ভর্ৎসুর গুরু রূপে কাজ করেছে। ভর্ৎসুকে চৈনিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আত্মরক্ষার দৈহিক কৌশল শিখিয়েছিল। গোহকের মুখে 'ক্রতু' শব্দ উচ্চারিত 'করটু' রূপে।

ভর্ৎসু বলেন, পরবর্তীকালে, আত্মরক্ষার সাথে তিনি আক্রমণের কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। আক্রমণের কৌশল শিখিয়েছিলেন আর একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী শ্রীবিজয় থেকে এসেছিলেন। আক্রমণের হাতিয়ার ছিল প্রায় হাতখানেক লম্বা দুটি শক্ত লাঠি। দুটি লাঠি আবার হাতখানেক লম্বা হালকা শিকলে আটকানো। ভর্ৎসু আসনের তলা থেকে আত্মরক্ষার দুটি বংশ খণ্ড বের করে দেখান। শিকলে যুক্ত বংশখণ্ড দেখে বাণ তেমন গুরুত্ব দেয় না।

* * *

গঙ্গার উত্তরতীর ধরে গাড়ি পূর্ব দিকে এগিয়ে চলে। একদিন ভর্ৎসু বলেন, তারা কান্যকুব্জের ধারে কাছে এসেছেন।

গাড়ি গ্রাম পার হয়ে মাঠের পথ ধরে চলছে। বাঁ দিকে মস্ত মাঠ, ডান দিকে গঙ্গা সূর্য মাথার উপর থেকে মাত্র পশ্চিমে হেলেছে মাঠের উত্তর সীমায় দূরে দেখা যায় বিচ্ছিন্ন কিছু কুঁড়েঘর,

বাঁশবন গাছপালা। গাড়ি কিছু পথ এগিয়ে গেলে দেখা যায় মাঠের উত্তরের গাঁ থেকে একটি পথ গঙ্গাতীরের বড়ো পথে এসে যুক্ত হয়েছে। গাড়ি এই পথের সঙ্গমস্থলে পৌঁছানোর খানিক আগে, একটি শবদেহবাহী দল, উত্তরের পথ ধরে এসে গঙ্গাতীরের পথে উঠে পূর্বদিকে এগিয়ে যায়। শবদেহবাহী দলটি পথ জুড়ে চলছে। গাড়ি শবদেহবাহী দলটির পিছনে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে।

বাণ দেখে চারজন লোক বাঁশের খাটিয়ায় মৃতদেহ বহন করে আগে আগে চলছে। খাটিয়ার পিছনে ছোটো একটি খাট বহন করে নিয়ে চলছে দুজন লোক। খাটের উপর আসন করে বসে আছে এক কিশোরী বধূ। বধূর মুখ পশ্চিম দিকে। মুখে পড়ছে সূর্যের প্রখর রোদ। মাথায় লাল ওড়না। কপালের সিঁদুর গলে নাকের উপর দিয়ে নামছে। টকটকে রাঙা মুখের শ্বেত চন্দন ঘামে ছড়িয়ে গেছে। আগুন রঙের বারাণসী সিল্কের শাড়ি। কানে গলায় হাতে ফুলের মালা। প্রখর রোদে সব ফুল শুকিয়ে গেছে।

বাণ লক্ষ করে অগ্নিশিখার মতো দিব্য নারী আসন করে স্থির হয়ে বসে আছে। সারা দেহে সূর্যালোক বিকিরণ করছে।

বাণের দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসু বলেন, তাদের যাত্রা শুভ। অনেক অনেক শুভচিহ্নের মধ্যে একটি হচ্ছে 'দিব্যস্ত্রী'। এই হচ্ছে দিব্যস্ত্রী সতী হতে চলছে। স্বামীর সাথে স্বর্গগামিনী সতীদর্শন এক মহাপুণ্য কর্ম।

বাণ ভর্ৎসুর বর্ণনায় আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। আহা! এমন একটি সুন্দরী কিশোরীকে পুড়িয়ে ফেলবে? বাণ কিছু বলতে সাহস পায় না। গাড়ি ধীরে ধীরে শববাহী দলের জটলা অতিক্রম করে এগিয়ে চলে। ভর্ৎসুর আদেশে গোহক তীব্রগতিতে গাড়ি চালায়। বাণ লক্ষ করে গাড়ির পর্দা সরিয়ে ভর্ৎসু রাস্তার পাশে কী যেন খুঁজে চলছেন।

কিছুক্ষণের মাঝে ভৎসুর ইঙ্গিতে গাড়ি থামে। রাস্তার বাঁ দিকে ঝোপঝাড় গাছপালা। ঝোপঝাড়ের পাশে একটি কুঁড়েঘর। দরজা বন্ধ। বন্ধ দরজার উপর চুন দিয়ে কিছু আঁকিবুঁকি। ভর্ৎসু দরজায় আঁকা দুর্বোধ্য আঁকিবুঁকি বাণকে দেখিয়ে বলেন- এই আঁকিবুঁকি শুঁড়িদের চিহ্ন।

ভর্ৎসুর কথা শুনে বাণ জিজ্ঞাসা করে এই গৃহে কোন বিষয়ের বিদ্বান অর্থাৎ সূরী বাস করেন? উল্লেখ্য শুঁড়ী এবং সূরী দুটি সম্পূর্ণ আলাদা শব্দ। সূরী অর্থ জ্ঞানী পণ্ডিত ইত্যাদি।

বাণের কথা শুনে ভর্ৎসু অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। বাণকে 'পণ্ডিত মশাই' সম্বোধন করে বলেন, এটি শুঁড়ি অর্থাৎ শৌণ্ডিকের গৃহ। এখানে মদ্য বিক্রয় হয়।

মদের দোকানে ভর্ৎসু ? আবার বাণের মনে প্রশ্ন। ভর্ৎসুর সাথে বাণ এবং গোহক ঘরের ভিতরে ঢোকে। জানালা নেই, অন্ধকার। উগ্রগন্ধ। ভর্ৎসু দোকানের সব হাড়ি পাতিলসহ মদ কিনছিলেন। ভর্ৎসুর নির্দেশে দোকানি গাড়ির ভিতর খড় বিছিয়ে মদের সবগুলি পাত্র তুলে দেয়। দোকানি বলে, সামনে শ্মশান এবং ধারে কাছে আর মদের দোকানপাট নেই।

গাড়ির ভিতর বসার স্থান নেই। ভর্ৎসু এবং বাণ গাড়ির পিছনে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে চলেন। কিছুক্ষণের মাঝেই দেখা যায় রাস্তার বাঁ পাশে মস্ত বটগাছ। গাছের তলায় ইটের ভাঙা মন্দির।

মন্দিরের সামনে গঙ্গার চরে শ্মশান। শ্মশানে আধপোড়া কিছু কাঠ।

বটের তলায় মন্দিরের সামনে গাড়ি থামে। ভর্ৎসুর নির্দেশে গোহক মাঝারি আকৃতির একপাত্র মদ বটগাছের গোড়া এবং মন্দিরের বারান্দায় ছিটিয়ে দেয়। ভর্ৎসু গঙ্গার তীরের শ্মশানের দিকে তাকিয়ে গভীরভাবে কী যেন হিসাব নিকাশ করছেন। বাণ লক্ষ করে গোহক চুপিচুপি শূন্য পাত্রের তলা জিভ দিয়ে চাটছে। দূর থেকে ভেসে আসে ঢাকের গুড়গুড় শব্দ।

শ্মশানযাত্রীদের দেখা যায়। বাণ এবং গোহককে মন্দিরের বারান্দায় বসিয়ে ভর্ৎসু তাদের শরীরে এক ভাঁড় মদ ঢেলে দিয়ে তাদের পাশে বসেন। তাদের পাশে মস্ত মদের হাঁড়ি। হাতে মদের ভাঁড়।

গোহক ঘন ঘন হাতের শূন্য ভাঁড়ের দিকে এই সাথে পাশের মদ্যপূর্ণ হাঁড়ির দিকে তাকায়। সাহস পায় না। মাছির ঝাঁক এসে চারদিক ছেয়ে ফেলছে। মন্দিরের কাছাকাছি কয়েকটি কুকুর উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। মদের গন্ধে চারদিক ম-ম ।

শ্মশানযাত্রী দল ঢাকঢোল বাজিয়ে বাজিয়ে বটগাছের তলায় মৃতদেহ এবং সতীর খাট নামিয়ে রাখে। গঙ্গার তীরে তখনো রোদের ভীষণ উত্তাপ। রোদ খা খা করছে।

গোহক মদ্যপ। গোহক মদ খেতে সাহস পাচ্ছে না দেখে বাণ উপলব্ধি করে ভর্ৎসু কোনও এক নাটকের অবতারণা করেছেন। বাণ মস্ত কোনও এক নাটকের অপেক্ষায় থাকে। অলিখিত নাটকের লেখক পরিচালক এবং নায়ক চরিত্রে আছেন স্বয়ং ভর্ৎসু। বাণ এবং গোহক মৃতসৈনিক চরিত্রের অভিনেতা।

ভর্ৎসু নাটকের উদ্ঘাটন করলেন। ভর্ৎসু তার কপালে লাল রঙের পট্টি বেঁধে উঠে দাঁড়িয়ে নেশাখোরের মত টলতে লাগলেন। বাণ, তার নাটকের অভিজ্ঞতা অনুসারে ভর্ৎসুর সাথে দাঁড়িয়ে ভর্ৎসুর ভঙ্গি নকল করতে থাকে ।

শ্মশানযাত্রীদল মদের পাত্র এই সাথে ভর্ৎসুর মদ্যপানের অভিনয় দেখে হতাশ হয়ে যায়। মদের দোকান বন্ধ। মদ কিনতে পারেনি। এদিকে চড়া রোদ শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করা সম্ভব নয়।

শ্মশানযাত্রীদল, একজন দুজন করে পদ্মগন্ধে পাগল ভ্রমরের মত ভাঙা মন্দিরের বারান্দায় ত্রিদেবকে পরিক্রমা করে। প্রসন্ন ভর্ৎসু মাঝে মাঝে দুএকটি মধু পিপাসু ভ্রমরকে তৃপ্ত করেন। শেষ পর্যন্ত সব শ্মশানযাত্রী মদ্যপানে যোগ দেয়। বটের তলা গুলজার হয়ে উঠে।

শ্মশানযাত্রীদের দলের পুরোহিত একা সতীর খাটের পাশে বসে নিঃশব্দে গুলজারিদের লক্ষ করেন।

বাণ লক্ষ করে ভর্ৎসু মাঝেমাঝে মদের ভাঁড় হাতে করে শ্মশানবন্ধুদের গলা জড়িয়ে মন্দিরের পিছন দিকে যাচ্ছেন।

বটগাছেব ছায়ার খাটের উপর সতী বসে আছে। সতীর সামনে তার স্বামীর শবদেহ। বাণ লক্ষ করে সতীর কোমরে মোটা রশি বাঁধা। রশি কোমরের দুদিক থেকে বের হয়ে খাট পেঁচিয়ে আছে। সতীর পক্ষে দাঁড়ানো এমনকী নড়াচড়া পর্যন্ত সম্ভব নয়। ভর্ৎসু, এলোমেলো পায়ে সতীর

চারদিকে হাঁটাহাঁটি করেন। মুখে মাতালের বিড় বিড় প্রলাপ।

ভর্ৎসু যেন ভূতনাথ। চারদিকে মাতাল শ্মশানবন্ধু। ভর্ৎসুর ভাষা গ্রাম্য অশ্লীল। ভর্ৎসুর বক্তব্য বিষয় সামনের সুন্দরী নারী। সুন্দরী নারী কেন আগুনে ছাই হবে ? ভর্ৎসুর বুকে এলে তার বুকের আগুন ঠান্ডা হবে।

কুকুরগুলি একে দুয়ে কাছাকাছি এসে উবু হয়ে বসে কিসের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

ভর্ৎসুর নেশার ঘোরে কথা এই সতীনারীর বাজার দর কত হবে? তুরীয়ানন্দে মগ্নদের মধ্যে বাজারদর নিয়ে সংলাপ। পাঁচগন্ডা দশগন্ডা করে মস্ত দাম একশ গন্ডা পর্যন্ত উঠে গিয়ে শেষ হল। হঠাৎ একজন বলে উঠে রাজা মহারাজাগণ এই সতীর জন্য একশ ষাট গন্ডা কড়ি পর্যন্ত খরচ করতে পারেন। একশ ষাট গন্ডা কড়ি অর্থাৎ অষ্টপণ বা অর্দ্ধ টাকা।

ভর্ৎসু একে একে সব কজন শ্মশানবন্ধুদের গলায় গলা মিলিয়ে মন্দিরের এদিক সেদিকে চক্কর দেন। সবার কানে কানে বলেন, সুন্দরীর মূল্য হিসাবে তিনি প্রত্যেককে তিনশ বিশ গন্ডা কড়ি অর্থাৎ সম্পূর্ণ একটি টাকা দিতে পারেন। প্রস্তাব শুনে দু একজন ভর্ৎসুর পায়ে হাত দিয়ে বলে ভর্ৎসু নিশ্চয়ই রাজা মহারাজা। সবাই রাজি হয়।

বাদ সাধলেন পুরোহিত। ভর্ৎসু পুরোহিত সম্পর্কে অতি নিরীহ একটি প্রস্তাব রাখলেন। তুরীয়ানন্দে মগ্ন পুরুষগণ আলোচনায় স্থির করল ভর্ৎসুর নিরীহ প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য। মৃত্যুর দরজা দিয়েই সত্যিকারের আলোকময় এবং মহাপুণ্যময় জীবনে প্রবেশ করা যায়। সেই মৃত্যুর দরজা যদি আলোকময় অগ্নি হয় তা হলে চমৎকার হবে। স্থির হয় শবের সাথে পুরোহিতকে সতী করা হবে। একজন এই প্রস্তাবের ভাষার সামান্য সংশোধন করে বলে সতী নয় সতা করা হবে। ধ্বনিভোটে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পুরোহিতের সামনে এসব কথাবার্তা হয়েছে।

হঠাৎ করে পুরোহিত খরগোস হয়ে গেলেন। ছুট ছুট ছুট। গঙ্গার চরের উপর দিয়ে ছুট। ইঙ্গিত পেয়ে গোহক চিতা হয়ে গেল। পুরোহিত শেষ পর্যন্ত গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গোহক তাকে জল থেকে তুলে আনল। সম্পূর্ণ সিক্ত পুরোহিতের দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসু মন্তব্য করেন বেশ ভালোই হল। গঙ্গা স্নান হয়ে গেছে। পবিত্র সতা হবে।

পুরোহিত ভীষণ ভয় পেয়ে শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। বটগাছের তলায় শবদেহ এবং সতীর সামনে, শ্মশানযাত্রীদল সারিবদ্ধ হয়ে বসেন।

ভর্ৎসু, বাণের দিকে তাকিয়ে, নিজের ডান হাত বাণের সম্মুখে রেখে বলেন, গাড়িভাড়া এবং সরাইখানার দেনা শোধ করতে। বাণ তার টাকার থলে ভর্ৎসুর হাতে প্রদান করে। ভর্ৎসু, টাকার থলে বাণের হাতে দিয়ে বলেন, সবাইকে এক টাকা করে দিতে। বাণ, ভর্ৎসুর নির্দেশমতো সবাইকে এক এক টাকা প্রদান করে। শ্মশানযাত্রীদলে পুরোহিত সহ মোট চৌদ্দজন। ভর্ৎসু পুরোহিতকে দুটাকা দিতে নির্দেশ প্রদান করেন। বাণের পনেরো টাকার থলে শূন্য হয়।

ভর্ৎসুর এবার নারীরত্ন অধিকারের পালা। গোহক এবং বাণ সতীর শরীরের বাঁধন খুলে দেয়। ভর্ৎসু গোঁফে তা দিয়ে দিয়ে গ্রাম্য অশ্লীল ভাষায় সতীকে দাঁড়িয়ে উঠে রূপ দেখাতে আদেশ করেন। সতী ভর্ৎসুর হুকুম তামিল করে না। ভর্ৎসুর আবার ভীষণ হুঙ্কার।

বাণ অনুভব করে বধূটিকে সুদীর্ঘ সময় বেঁধে রাখার ফলে ওর শরীর অবশ হয়ে গেছে। কানে কানে ভর্ৎসুকে তার ধারণার কথা বলে। ভর্ৎসু, ভীষণ এক হুঙ্কার ছেড়ে গোহককে আদেশ দেন সতীকে পাঁজাকোলা করে গাড়ির ভিতর ফেলে দিতে। গোহক হুকুম তামিল করে। ভর্ৎসু এবং বাণ গাড়িতে চড়ে বসলে গাড়ি চলতে শুরু করেন। চলা শুরু করা মাত্র গাড়ির পেছন দিক থেকে পুরোহিত মা-মা ডেকে ছুটে চলেন। ভর্ৎসুর আদেশে গোহক গাড়ি থামায়। পুরোহিত ভর্ৎসু এবং বাণের পায়ের কাছে লুটিয়ে থাকা সতীর মাথায় হাত রেখে মা সম্বোধন করে বলেন, যা হয়েছে তা খুব ভালো হয়েছে। পুরোহিত ভর্ৎসুকে বলেন, তিনি এই সতীর বাবার বন্ধু। একগুঁয়ে এই দাম্ভিক পণ্ডিত বন্ধু, নিজের মেয়েকে জোর করে সতী করতে পাঠিয়েছে। তিনি কোনও অনুরোধ বা প্রার্থনা গ্রাহ্য করেননি। পুরোহিত তার কোমরে গোঁজা দুটি টাকা বের করে সতীর আঁচলে বেঁধে বলেন "মাগো ! ঈশ্বর তোর সহায় হোন"।

বাণ লক্ষ করে দীর্ঘ সময় ধরে এই নারী স্তব্ধ হয়েছিল। তার চোখে মুখে কোন ভাবান্তর বা অভিব্যক্তি ছিল না। পুরোহিতের কথা শুনে কিছু বলে না। শুধু দুচোখ দিয়ে জল গাড়িয়ে নামে।

কিছুক্ষণের মাঝে ভর্ৎসু এবং বাণ লক্ষ করেন তাদের পায়ে বসে থাকা সতীর শরীর ডানে বাঁয়ে নেশাগ্রস্তের মতো টলছে। ভর্ৎসু সন্ধিসমাসযুক্ত কঠিন বৈদিক ভাষায় বলেন, বাণের শরীরের জল শুকিয়ে যেমনটি হয়েছিল সতীর তাই হয়েছে। ওর শরীর শুষ্ক হয়ে গেছে। এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে। ভর্ৎসুর নাটকীয় সংলাপে বাণ উপযুক্ত ভাষা ব্যবহার করে। ভর্ৎসু বলেন, এই সতীদাহ নাটক এখনো শেষ হয়নি। সতীকে বাঁচাতে হলে ভয় দেখিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। বেশি পরিমাণে জল খাওয়াতে হবে। এই নারী স্বাভাবিকভাবে জল খাবে না। অন্ধসংস্কার মৃত্যুকে ভয় পায় না।

হঠাৎ আবার ভর্ৎসুর কণ্ঠ চড়ে গেল। কুৎসিত অশ্লীল ভাষায় বাণকে আদেশ করলেন এই মুহূর্তে সতীর কাপড় চোপড় খুলে ফেলতে। ভর্ৎসু দুহাতে গোঁফে তা দিয়ে দিয়ে সতীর দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বলেন, শাড়ি কাপড় অলঙ্কার এসব কিছু নারীদেহের রূপ ঢেকে রাখে।

বাণ ভালো করেই জানে নাটক হচ্ছে কিন্তু ভর্ৎসুর ভীষণ অভিনয়ের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারে না। ভর্ৎসু ভীষণভাবে বাণকে আদেশ দেন। বাণ এই কঠিন অভিনয়ে ব্যর্থ হয়।

এবার সতীদাহ নাটকে ভর্ৎসুর সংলাপ "তা হলে আমাকেই হাত লাগাতে হবে"। ভর্ৎসু সতীর কাঁধের উত্তরীয় টেনে সরিয়ে ফেলেন।

এবার মহাজ্ঞানী ভর্ৎসু এবং বাণের নিদারুণ বিস্ময়ের পালা। মহাবিস্ময়। বাণ এবং ভর্ৎসুর সংলাপের মতো সন্ধিসমাসযুক্ত বৈদিক ভাষায় সতী বলে ওঠে "অভিনয়ের আর কোনও প্রয়োজন নেই। আমাকে কী করতে হবে সেই আদেশ প্রদান করা হোক"।

খানিক নীরবতার পর ভর্ৎসু সুললিত সংস্কৃত ভাষায় বলেন, আদেশ হচ্ছে জল খেতে হবে। প্রচুর জল খেয়ে বাঁচতে হবে।

সতী ভালো করে কথা বলতে পারে না। গলা কাঠ হয়ে গেছে। কাঁপা গলায় বলে, বেঁচে থাকার সাধ প্রত্যেক প্রাণীর অনুভূতির মধ্যে বিদ্যমান। সৃষ্টির পরমা প্রকৃতি প্রতি প্রাণীর মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা যুক্ত করে রেখেছেন। তার নিজের সতী হবার সাধ ছিল না। জোর করে তাকে সতী করা হচ্ছিল।

ভর্ৎসু ক্রমাগত মিছরি গোলা জল সতীকে খাইয়ে গেলেন। গোহক মাঝে মাঝে গাড়ি থামিয়ে জল এনে দেয়। ভর্ৎসু সতীর শরীরে জল ঢেলে সম্পূর্ণ ভিজিয়ে রাখেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। ভর্ৎসু তার পরিকল্পনামতো নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাতে না পেরে পাথের পাশে একটি সাধারণ পান্থশালায় রাত কাটানোর ব্যবস্থা করেন। পান্থশালায় ব্যবস্থা তেমন খারাপ নয়। দুটি প্রকোষ্ঠ পাওয়া গেল। একটিতে বাণ এবং ভর্ৎসু অন্যাটিতে সতী। দীর্ঘ পথ পরিক্রমার বাণ লক্ষ করেছে গোহক সাধারণত গাড়িতে রাত কাটায় এবং ঘোড়াটিকে গাড়ির সাথে বেঁধে রাখে।

সতী ভীষণ ক্লান্ত এবং শ্রান্ত। ভর্ৎসু স্থির করেন পরদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম করবেন।

পরদিন সকাল থেকে ভর্ৎসুর সাথে দীর্ঘ কথাবার্তা চলে। সতীর পিতৃদত্ত নাম সাবিত্রী। সে পণ্ডিত ব্রাহ্মণের একমাত্র সন্তান। শিশুকালেই মায়ের মৃত্যু হয়েছে। ঠাকুর্দা ঠাকুমার কোলে শৈশব কেটেছে। ঠাকুর্দা এবং বাবা দুজনই পণ্ডিত। কিন্তু বাবা এবং ঠাকুর্দার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। মানসিকভাবে দুজন দুই মেরুর অধিবাসী।

বাণ সতীকে অর্থাৎ সাবিত্রীকে আকাশ-পাতাল পার্থক্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।

সাবিত্রী বলে, তার শৈশব ঠাকুর্দার কাছে কেটেছে। ঠাকুর্দার জীবন দর্শনে তার মানসিকতা রূপ লাভ করেছে। ঠাকুর্দা বলতেন, দেবতা ধর্ম দর্শন মানুষ সৃষ্টি করেছে। মানুষের জীবনে পাপ পুণ্য বোধ মস্ত এক আরোপিত অনুভূতি। ঠাকুর্দার সাথে থেকে সাবিত্রী নানা শাস্ত্রগ্রন্থ সাহিত্য দর্শন পাঠ করেছে। ধর্মবিশ্বাস লোকাচার পাপপুণ্য সব কিছু বিচার এবং বিশ্লেষণের পদ্ধতি, ঠাকুর্দার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আয়ত্ত করেছে।

সাবিত্রী তার ঠাকুর্দার জীবনদর্শন নিয়ে নানা কথাবার্তার পর বলে, তার বাবা ছিলেন ভীষণ গোঁড়া। বাবার জ্ঞান এবং বোধের মধ্যে ছিল স্থবির দম্ভ। স্বাভাবিকভাবে এসব নিয়ে বাবার সাথে তার তীব্র মতবিরোধ সৃষ্টি হত।

ইতিমধ্যে ঠাকুর্দার মন্ত্রশিষ্য এক যুবকের সাথে সাবিত্রীর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বাবা এই যুবককে সহ্য করতে পারতেন না। হঠাৎ করে বলতে গেলে প্রায় একই সাথে ঠাকুর্দা ঠাকুমার মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুর পর বাবা আরো ভীষণ হয়ে উঠলেন। সাবিত্রী বলতে গেলে আত্মরক্ষার জন্য ঠাকুর্দার মন্ত্রশিষ্য যুবককে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নেয়। সাবিত্রীর এই সিদ্ধান্তে বাবা সীমাহীন ক্ষুব্ধ এবং হিংস্র হয়ে ওঠেন। বাবার ধারণা, তিনি তার পূর্ব এবং উত্তর প্রজন্মের কাছে পরাজিত। শুধু তাই নয়, কন্যার ভাবী স্বামী ও তার জীবনবোধের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর অধিবাসী।

বাবার আপত্তি অগ্রাহ্য করে সাবিত্রী বিয়ে করে স্বামীর সাথে পাশের গ্রামে চলে যায়। বিয়ের বছর খানেক পর তার একটি কন্যাসন্তানের জন্ম হল। অন্যদিকে, সাবিত্রীর বাবা সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গভাবে ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকেন।

কথা বলতে বলতে সাবিত্রী ক্লান্ত হয়ে ওঠে। বাণ এবং ভর্ৎসু, চুপ করে অপেক্ষা করেন।

নীরবতাভঙ্গ করে সাবিত্রী আবার তার কাহিনি বলতে শুরু করে। সন্তানের জন্মের কিছুদিন পর থেকেই তার স্বামীর শরীর অসুস্থ হতে থাকে। সাধারণ সর্দি কাশি ক্রমে ভীষণ হয়ে উঠে। কাশির সাথে রক্ত দেখা যায়। স্বামীর রাজরোগের সংবাদ তার বাবার কানে পৌছায়।

সাবিত্রী বল্লে, তার বাবা কন্যাস্নেহে বিগলিত হয়ে প্রায়ই কন্যার বাড়ীতে এসে দারুণ সান্ত্বনা দিতেন। রোগ যতই কঠিন হতে লাগল ততই তার বাবার মুখে পৈশাচিক উল্লাস প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। পিতা সতীদাহের মাহাত্ম্য নিয়ে মৃত্যু পথযাত্রী জামাতার সাথে শাস্ত্রালোচনা করতে লাগলেন। সাবিত্রীর স্বামী সতীদাহের ঘোর বিরোধী। সে বলে, সতীদাহ নরহত্যার একটি ঘৃণ্য কৌশল।

সাবিত্রীকে তার স্বামী বলেছিলেন সে যেন সতী না হয়। সতী না হয়ে নবজাতিকা কন্যাকে বাঁচিয়ে রাখে। সাবিত্রী ভর্ৎসু এবং বাণের দিকে তাকিয়ে বলে তার স্বামী যখন বলেছিলেন সতী না হয়ে নবজাতিকা কন্যাকে বাঁচিয়ে রাখার কথা তখন তার পিতা ভীষণ এক অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিলেন। অট্টহাসির মাঝে বলেছিলেন "মৃত মানবের মতামতের কোনও মূল্য নেই"। স্বামীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে নেমেছিল।

সাবিত্রী বল্লে, তার বয়স যেদিন সতেরো বৎসর পূর্ণ হয় সে দিন অর্থাৎ গতকাল স্বামীর মৃত্যু হল। পিতা এলেন শাস্ত্রবিধান নিয়ে। সাবিত্রী তার স্বামীর শবদেহের পাশে বসে আছে। কোলে তিন মাস ব[illegible]সর শিশু কন্যা। সতীদাহ নিয়ে পিতার সাথে শাস্ত্রীয় তর্ক শুরু [illegible]। পিতা বল্লেন, সাবিত্রী মৃত্যুভয়ে ভীতা হয়ে তর্ক করছে। সাবিত্রী বলে, সে মৃত্যুভয়ে ভীতা নয়। সে প্রতিবাদ করছে অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। সাবিত্রী বলে, তার পিতার মুখে তখন হিংসা এবং ক্রোধের নৃত্য চলছে। পিতার আদেশ তখনই সাবিত্রীকে শক্ত রশি দিয়ে বাঁধা হয়। তিন মাসের শিশুকন্যা চীৎকার করে কাঁদছে। শক্ত কঠিন দড়ি, সাবিত্রীর হাত পা স্তন পেঁচিয়ে বুকে বাঁধা।

সাবিত্রী ক্লান্ত। কথাবার্তার পর আবার সে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। দুপুরবেলা ভর্ৎসু ঘুম ভাঙিয়ে তাকে খাবার খেতে দেন। ঘুমের ঘোরে খাবার শেষ করে আবার ঘুমিয়ে থাকে।

পড়ন্ত বেলায় গোহক পান্থশালার উঠানে ঘোড়াকে খাবার দাবার দিচ্ছে। বাণ এবং ভর্ৎসু গঙ্গার তীরে বসে নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলেন। ক্রমে পশ্চিম আকাশ রাঙা করে সূর্য গঙ্গার জলে ডুবছিল।

তর্জন গর্জন শুনে বাণ এবং ভর্ৎসু পিছন ফিরে দেখেন কিছুলোক পান্থশালার দাওয়ায় বসে মদ খাচ্ছে।

কাছাকাছি পান্থশালার জনৈক কর্মীকে পেয়ে বাণ লোকগুলির কথা জিজ্ঞাসা করে। কর্মচারী বলে ওরা খুনে ডাকাত। কোতোয়ালির লোকেরা পর্যন্ত ওদেরকে ভয় পায়।

বাণ যখন কথাবার্তা বলছিল, তখন সাবিত্রী তার কামরা থেকে বের হয়ে গঙ্গার তীরে বাণ এবং ভর্ৎসুর পাশে এসে দাঁড়ায়।

ভর্ৎসু এবং বাণ লক্ষ করেন ডাকাত দল তাদের তর্জন গর্জন থামিয়ে সাবিত্রীর দিকে চেয়ে আছে। এরপর একজন দুজন করে জনা ছয় সাত ডাকাত গঙ্গার পারে এসে ওদেরে ঘিরে দাঁড়ায়।

বাণ আতঙ্কিত হয়ে গোহকের দিকে তাকায়। গোহক একমনে ঘোড়ার সেবা করে চলছে।

ডাকাতদল সাবিত্রীর কাছাকাছি এলে ভর্ৎসু দাঁড়িয়ে অঞ্জলিবদ্ধ হাতে ডাকাতদের দয়া করতে বিনীতভাবে অনুরোধ করেন। ভর্ৎসুর জোড়বদ্ধ দুটি হাত তার বুক ছুঁয়ে আছে।

বাণ স্থির করে সাবিত্রীর গায়ে হাত পড়ার আগেই সে ডাকাতদেরে আক্রমণ করবে। বাণের ভাবনা শেষ হতে না হতেই ভীষণ কাণ্ড। ভর্ৎসুর বুকের উপর তার জোড়বদ্ধ বিনীত হাতে দুটি দুদিকে বিদ্যুতের মত ছুটে গিয়ে ডাকাতদের গলায় আঘাত করে। দুটি ডাকাত মাটির ঢেলার মতো বালির উপর লুটিয়ে পড়ে। অন্য ডাকাতরা ভর্ৎসুর দিকে তেড়ে আসে। এবার একসাথে ছুটে ভর্ৎসুর দুটি পা। আরো দুটি ডাকাত মুখ থুবড়ে পড়ে।

সবকটা ডাকাত মিলে এক সাথে ভর্ৎসুকে আক্রমণ করে। ভর্ৎসু বিদ্যুৎগতিতে তার হাত পা চালিয়ে আঘাত করে করে আত্মরক্ষা করে চলেন। উত্তেজিত বাণ একটি ডাকাতকে আক্রমণ করে। আক্রমণ করতে না করতেই বাণ আঘাত খেয়ে লুটিয়ে পড়ে।

বাণকে লুটিয়ে পড়তে দেখে ভর্ৎসু তাঁর কোমরে গোঁজা, শিকলে বাঁধা দুইখণ্ড লাঠি বের করে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে ডাকাত দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুহূর্তে মধ্যে সবকটি ডাকাত বালির উপর লুটিয়ে পড়ে।

ভর্ৎসুর আদেশে পান্থশালার বিস্মিত কর্মীগণ ডাকাতদেরে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে।

বাণের আঘাত তেমন গুরুতর নয়। কিছুক্ষণের মধ্যে উঠে দাঁড়ায়।

ডাকাত দলের সাথে সংঘর্ষের খবর পেয়ে কাছাকাছি কোতোয়ালির কর্মচারী কজন হাজির হয়। বাণ এবং অন্যেরা বিস্মিত হয়ে দেখে কোতোয়ালির সর্দার ভর্ৎসুর পায়ে লুটিয়ে ফিসফিস করে কী বলছে। ভর্ৎসু ডাকাতদের কান্যকুব্জের প্রধান কোতোয়ালিতে পাঠাতে নির্দেশ দেন। কোতোয়ালির সর্দ্দার এবং অন্যান্য কর্মচারীগণ আহত ডাকাতদের টেনে টেনে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

ডাকাতদের নিয়ে চলে যাবার পর গোহক ভর্ৎসুর শিকলে বাঁধা দুই খণ্ড লাঠি গঙ্গার জলে পরিষ্কার করে ভর্ৎসুর হাতে দেয়। ভর্ৎসু যথাস্থানে রাখেন।

বাণ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে গোহককে জিজ্ঞাসা করে ডাকাতদলের আক্রমণকালে সে কেন এল না। বাণের প্রশ্নের উত্তরে ভর্ৎসু বলেন, এ বিষয়ে গুরু শিষ্যের শর্ত আছে। প্রথমে শিষ্য লড়াই করবে। শিষ্য যদি হেরে যায় তখন গুরুদেব যুদ্ধক্ষেত্রে আসবেন। ভর্ৎসু গোঁফে তা দিয়ে দিয়ে বলেন, এই বিদ্যায় তাঁর গুরুদেব হচ্ছে গোহক।

* *

পরদিন ব্রাহ্ম মুহূর্তেভর্ৎসু সাবিত্রীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বাণসহ তিনজন গঙ্গার তীরে গিয়ে

দাঁড়ালেন। পূর্বাকাশে আরক্তিম হয়ে উঠেছে। ভর্ৎসুর কণ্ঠ মমতায় ভেজা।

ভর্ৎসু সাবিত্রীকে গঙ্গায় নেমে স্নান করতে বলেন। সাবিত্রী ধীরে ধীরে গঙ্গার জলে নামে। ভর্ৎসু তীর থেকে মমতা মাখানো কণ্ঠে সাবিত্রীকে তার পরিধেয় বস্ত্র খুলে ফেলতে বলেন। সাবিত্রী গলা জলে নেমে তার পরিধেয় বস্ত্র খুলে ভর্ৎসুর দিকে তাকায়। ভর্ৎসু বলেন, বস্ত্র ভাসিয়ে দিতে। লাল বস্ত্র গঙ্গার স্রোতে ভেসে যায়। ভর্ৎসুর নির্দেশ মতো সাবিত্রী তার গলা কান হাতের সব অলঙ্কার গঙ্গার জলে বিসর্জন দেয় কপাল এবং সিঁথির সিঁদুর গঙ্গার জলে ধুয়ে মুছে ফেলে। ভর্ৎসু বলেন, কোমরে বাঁধা তাগা বিসর্জ্জন দিতে। সাবিত্রী তার কোমরের তাগা বিসর্জন দেয়। সাবিত্রী, ভর্ৎসুর নির্দেশ মতো সাত বার গঙ্গার জলে ডুব দিয়ে স্নান শেষ করে।

ভর্ৎসু বাণের দিকে তাকিয়ে বাণকে কঠিনতম এক আদেশ দিলেন। ভর্ৎসুর কঠোর আদেশ শুনে বাণ চমকে ওঠে। ভর্ৎসু বলেন, মানুষের নবজন্মের এই সুফলা মুহূর্তে বাণ এমন কিছু বলুক যে বলা নবজীবনকে পরিপূর্ণ করে সম্মুখে পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার শক্তি জোগায়।

বাণ ভর্ৎসুর দিকে তাকিয়ে থাকে। ভর্ৎসু আবার বলেন বাণ এমন কিছু বলবে যে কথা প্রচলিত শাস্ত্রের কথা নয় প্রচলিত কাব্যের কথা নয়। অরুণ রাঙা পূর্ব দিগন্তের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাণ তার নিজের কথা বলবে। একথা হবে বাণের একান্ত আপন উপলব্ধির কথা।

ভর্ৎসুর কঠিন নির্দেশ শুনে, বাণের মনে হল, গুরুদেব তাঁর শিষ্যের মেধা এই সাথে অনুভূতির পরীক্ষা নিচ্ছেন। বাণ, উদিত সূর্যের দিকে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে, আপন হৃদয়ে মন্থন করে তার অনুভূতির বাঙময় রূপচিত্র অনুসন্ধান করে। মস্তিষ্কের অণু পরমাণুতে ভাবনার তীব্রস্রোত প্রবাহিত হয়। বাণ অনুভব করে তার চৈতন্য পরম শূন্যতার মাঝ দিয়ে এক লোহিতলোক উজ্জ্বল লোকে প্রবেশ করেছে। লোহিতালোকের মাঝ থেকে হৃদকমলে ভেসে আসে বাণী কণ্ঠ। বাণ গুন গুন করে উচ্চারণ করে। "বিহগ কুরু দৃঢ়ং মনঃ স্বয়ং ত্যজ শুচমাস্ব বিবেক মার্গানি।"

ভর্ৎসুর চোখে মুখে তৃপ্তির ছায়া। গঙ্গাজলে স্রোত সাবিত্রীর চুলের বয়ে ঝরছে। বাণ লক্ষ করে গঙ্গাজলের ধারা ছাপিয়ে অশ্রুবিন্দু সাবিত্রীর চোখ থেকে কপোল বেয়ে বিগলিত হচ্ছে।

সাবিত্রী অঞ্জলি বন্ধ করে আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে ভর্ৎসু এবং বাণের দিকে তাকিয়ে বলে এই বাণী তার পরম সম্পদ। পরম আশ্রয়। এই বাণীর ভাষা 'ওরে বিহঙ্গ! মন দৃঢ় কর, শোকের পথ পরিত্যাগ করে জীবনের সত্যিকার অনুভূতির পথ আশ্রয় করে এগিয়ে চল'। সাবিত্রী, বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে, সে শোক দুঃখ বেদনা পরিত্যাগ করে জীবনের পথে এগিয়ে যাবে। সে শুদ্ধ সংস্কার মুক্ত বিবেকের অনুগামী হবে।

ভর্ৎসু সাবিত্রীকে বলেন, 'সাবিত্রী ! তোমার এই নবজন্ম, তোমার পুরোনো নাম, পুরোনো পরিচিতি, সংস্কার সব কিছু তোমার বস্ত্রালঙ্কারের মত গঙ্গাজলে ভেসে যাক । এই নবজন্মে তোমার নাম হোক বিহঙ্গমা।

বিহঙ্গমা গঙ্গা জলে দাঁড়িয়ে উদিত সূর্যের দিকে অঞ্জলি বদ্ধ হাতে অস্পষ্ট ধ্বনিতে প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করে। বাণ এবং ভর্ৎসু লক্ষ করেন সাবিত্রীর ঠোঁট দুটি থরথর করে কাঁপছে।

ভর্ৎসু এবং বাণ ধীরে ধীরে চরের উপর দিয়ে গঙ্গাতীরের দিকে এগিয়ে যান।

সর্ব বসন ভূষণ মুক্ত, আবরণহীনা নব জীবনে প্রতিষ্ঠতা বিহঙ্গমা গঙ্গাজল থেকে তীরে এসে ওঠে। তীরে ভর্ৎসু তার ধোয়া ধুতি রেখে গেছেন। বিহঙ্গমা ধুতি পরে পান্থশালায় ঢোকে।

* * *

আবার যাত্রা শুরু। গঙ্গার তীর ধরে গাড়ি এগিয়ে চলে। সূর্য যখন প্রায় মাথার উপর উঠে এসেছে তখন বাণ লক্ষ করে গঙ্গা নদী মস্ত এক বাঁক নিয়েছে। ভর্ৎসু বলেন, গঙ্গা অতিক্রম করে কান্যকুব্জে পৌঁছাতে হবে। গঙ্গার পশ্চিমতীরে কান্যকুব্জ।

ভর্ৎসু কান্যকুব্জ সম্পর্ক নানা গল্প কাহিনি বলেন। মহাভারতের যুগে পঞ্চালের রাজধানী ছিল কাম্পিল নগরে। পরবর্তীকালে রাজধানী স্থাপিত হয় কান্যকুব্জে। নানা সময়ে কান্যকুব্জের নানা নাম হয়েছে যেমন কুশস্থল, কুসুমপুর ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে মাথার উপর থেকে সরে গিয়ে সূর্য আরো পশ্চিমে হেলে গেছে। গাড়ির মোটা পর্দার ফাঁক দিয়ে বর্শাফলকের মতো রোদের রেখা বাণের উপর এসে পড়ছে। রোদের উজ্জ্বল ফলকে দেখা যায় অজস্র বালিকণা উড়ছে। বাণ অন্যমনস্কভাবে রোদের ফলায় ভাসমান বালির কণা হাতের মুঠোয় ধরার খেলা করছে।

ভর্ৎসু বাণের এই অন্য মনস্ক খেলা দেখে বাণকে বলেন, "ত্রসরেণু ধরার চেষ্টা হচ্ছে বুঝি?" ত্রসরেণু নিয়ে কথা ওঠে। ভর্ৎসু বলেন. মহর্ষি কণাদ এ সম্পর্কে অনেক কিছু লিখে গেছেন। 'ত্রস' অর্থ গতিশীল।

বাণ ভর্ৎসুকে জিজ্ঞাসা করে পরমাণুর নামই কি ত্রসরেণু? ভর্ৎসু বলেন, কণাদের মতে 'পরমাণু' হচ্ছে বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ বিশেষ। পরমাণুকে আর ভাঙা যায় না। পরমাণু অতি সূক্ষ্ম। পরমাণুকে চোখে দেখা যায় না। দুটি পরমাণু মিলে সৃষ্ট হয় একটি দ্বাণুক। তিনটি দ্বাণুক মিলে সৃষ্ট হয় একটি ত্রসরেণু এসরেণুকেচোখে দেখা যায়। সূর্যালোকে যে সূক্ষ্ম কণাগুলি দেখা যাচ্ছে এগুলি হচ্ছে ত্রসরেণু।

বাণ আবার তার মুঠির মধ্যে ত্রসরেণু ধরার খেলায় মাতে। বাণ সূর্যের তীক্ষ্ণ সরলরেখার দিকে তাকিয়ে বলে সে কখনো কুব্জ আলোর রেখা দেখেনি। কুব্জ অর্থাৎ বাঁকা শব্দ নিয়ে কথা ওঠে। কুব্জ শব্দ আলোচনায় কান্যকুব্জ , শব্দ প্রবেশ করে। বাণ কান্যকুব্জ নগরীর নাম কীভাবে সৃষ্ট হল এই কথা ভর্ৎসুকে জিজ্ঞাসা করে। ভর্ৎসু বলেন কান্যকুব্জ নামের ইতিহাস তার জানা নেই।

বিহঙ্গমা আলোচনার যোগ দেয়। বিহঙ্গমা বলে, কান্যকুব্জ নাম প্রসঙ্গে রামায়ণে একটি কাহিনি আছে। কাহিনি এমনি ধরনের — রাজা কুশনাভ একটি নগরী স্থাপন করেন। নগরীর নাম ছিল মহোদয়। রাজা কুশনাভের ছিল একশটি সুন্দরী কন্যা। বায়ুদেবতা হঠাৎ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে রাজকন্যাদেরে অভিশাপ প্রদান করেন। অভিশাপে সুন্দরী রাজকন্যাদের দেহ কুব্জ হয়ে গেল। কন্যাকুব্জ থেকে নগরীর নাম কান্যকুব্জ হয়ে যায়।

কান্যকুব্জ নগরীর প্রাচীন কাহিনি শুনে বাণ এবং ভর্ৎসুর প্রসন্ন দৃষ্টি বিহঙ্গমার উপর পড়ে।

ভর্ৎসু বলেন এই কান্যকুব্জ নগরী বর্তমানকালে মৌখরি রাজাদের রাজধানী। মৌখরি বংশের বর্তমান রাজার নাম অবন্তীবর্মা। মৌখরি বংশের রাজাগণবিদ্যান এবং শিল্পানুরাগী। অবন্তীবর্মার বড়ো কুমারের নাম গ্রহবর্মা।

সন্ধ্যায় কান্যকুব্জ নগরীতে পৌছে গাড়ি মস্ত এক দোকানের সামনে দাঁড়ায়। ভর্ৎসু বাণকে সঙ্গে নিয়ে দোকানে প্রবেশ করেন। দোকানে নানা ধরনের কাপড়। ভর্ৎসুকে দেখে দোকানের কর্মচারীগণ এমনকি ক্রেতাগণ পর্যন্ত উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করে।

বাণ বুঝতে পারে বিহঙ্গমার জন্য বস্ত্র খরিদ করা হবে। বিহঙ্গমা সারাদিন ধরে ভর্ৎসুর ধুতি পরে আছে। ভর্ৎসু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নানা ধরনের বস্ত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ভিন্ন ভিন্ন রঙের কিছু চীনাংশুক বস্ত্র মনোনীত করেন। দোকানের মালিক জনৈক প্রৌঢ় ব্যক্তি ভর্ৎসুর কাছে এসে জোড় হাতে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করেন ভর্ৎসু অন্য কিছু জিনিসপত্রের প্রয়োজন আছে কিনা? ভর্ৎসু ভেবেচিন্তে এক এক করে নানা ধরনের জিনিসপত্রের নাম বলেন। প্রৌঢ় ব্যক্তি নামগুলি টুকে রাখে। লেখা শেষ হলে প্রৌঢ় ব্যক্তি বলতে গেলে দোকান থেকে ছুটে বের হয়ে যায়। বাণ এবং ভর্ৎসু দোকানে বসে অপেক্ষা করেন। বাণ লক্ষ করে দোকানের লোকজন ভর্ৎসুকে উৎসুক হয়ে লক্ষ করছে। ভর্ৎসু উপর দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে অনবরত তার গোঁফে তা দিচ্ছেন। দোকানে কেনা-বেচা সম্পূর্ণ বন্ধ।

খানিক বাদে প্রৌঢ় দোকানি বড়োসড়ো পুটলি হাতে করে দোকানে প্রবেশ করে হাঁপাতে থাকেন। জিনিস সবকিছু পাওয়া গেছে জানিয়ে দোকানি টুকে রাখা জিনিসপত্রের দামের সাথে পাঁচটি মেখলা এবং উত্তরীয়ের মূল্য লিখে মনোযোগের সাথে টাকাকড়ির অঙ্ক যোগ করেন। যোগ করা শেষ হলে আবার পরীক্ষা করে পত্রটি ভর্ৎসুর হাতে প্রদান করেন। ভর্ৎসু পত্রের উপর তার স্বাক্ষর প্রদান করেন। দোকানী ভর্ৎসুর স্বাক্ষরিত পত্র সযত্নে দোকানের কেনা-বেচার টাকা-কড়ি রাখার কাঠের বাক্সে তুলে রাখেন।

প্রৌঢ় দোকানি জিনিসপত্রের পুটলিটি নিজের হাতে গাড়িতে তুলে দেন। গাড়ি সুবৃহৎ রাজ পথেব অজস্র গাড়িঘোড়া মানুষের মাঝ দিয়ে বিশাল রাজকীয় অতিথি নিবাসে প্রবেশ করে।

বাণের মনে হয় ভর্ৎসু যেন মুকুটহীন রাজা। ভর্ৎসুকে ঘিরে অতিথিশালার বড়ো ছোটো সব ধরনের কর্মচারীদের মধ্যে দারুণ ব্যস্ততা। কর্মচারীগণ তিনজনকে অতিথি নিবাসের একটি সুসজ্জিত কক্ষে নিয়ে গিয়ে বসায়। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনজন তিনটি আলাদা কক্ষে প্রবেশ করেন।

পরদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে ভর্ৎসু বাণ এবং বিহঙ্গমাকে নিয়ে পথে নামেন। এবার গাড়ির চালক স্বয়ং ভর্ৎসু। গাড়ি গঙ্গার তীরে পৌছায়। তিনজন স্নান করেন। স্নান শেষে রাজপথ ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। প্রভাত সূর্যের সোনালি রোদে সব কিছু ঝলমল করছে।

রাজ অতিথি নিবাসের সামনে এসে দেখা যায় অজস্র মানুষের ভীড়। সবাই নানা ধরনের জিনিসপত্র নিয়ে ব্যস্ত। নানা ধরনের জিনিসপত্র এদিক ওদিকে ছড়ানো।

অতিথি নিবাস সাজানো হচ্ছে। রাজপথ থেকে অতিথি নিবাসের শ্বেত প্রস্তরের পথ জল ঢেলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হচ্ছে। শ্বেতপ্রস্তরের পথের দুই পাশের মাটিতে নানা রঙের বালি

বিছিয়ে বিচিত্র ব্যবস্থা হচ্ছে। বাণ বিচিত্র শিল্পকর্ম দাঁড়িয়ে দেখে। বাণের পাশে আলপনা অঙ্কনের বিহঙ্গমা। ভর্ৎসু, অতিথি নিবাসে তার কক্ষে প্রবেশ করেন।

বাণ লক্ষ করে মজুর শ্রেণীর লোকেরা বেতের টুকরি ভর্তি করে সাদা বালি আর সাথে মাটির কলসি এনে রাখছে। বাণ আল্পনার কাজে ব্যস্ত জনৈক ব্যক্তিকে এসব বালি দিয়ে কী করা হবে জিজ্ঞাসা করে। লোকটি বলে বালিতে রং মিশিয়ে বিভিন্ন ধরনের রঙিন বালি তৈরি করা হবে। রঙিন বালিতে বহল মিশিয়ে আল্পনা সাজানো হবে। বাণ বহল কী প্রকারের জিনিস জানতে চাইলে লোকটি বলে বহল হচ্ছে এক ধরনের আঠা। এই বহল বালিতে মিশিয়ে আল্পনা আঁকা হলে বালি বাতাসে উড়ে যায় না। লোকটি বলে বহল হচ্ছে আখের রস। কলসিগুলিতে আখের রস আনা হয়েছে। বহল প্রসঙ্গে আরো বলে ছোটো ছোটো সূক্ষ্ম শিল্পকর্মে আখের রসের বদলে চন্দন পিষে বহল তৈরি করা হয়।

বিহঙ্গমা এই সাজসজ্জার কারণ জিজ্ঞাসা করলে লোকটি বলে অতিথি নিবাসে মহারাজা অবন্তীবর্মা রাজকুমার গ্রহবর্মাকে নিয়ে এসে রাজগুরু ভর্ৎসুকে প্রণাম করবেন।

লোকটির মুখে 'রাজগুরু ভর্ৎসু' এই কথা শুনে বিস্মিত বাণ এবং বিহঙ্গমা পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। দুজন পায়ে পায়ে ভর্ৎসুর কক্ষে প্রবেশ করে।

দুজন, ভর্ৎসুর কক্ষে প্রবেশ করে দেখে তিনি মহা উৎসাহে পুঁটুলির জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেখছেন। বিহঙ্গমার দিকে তাকিয়ে বলেন, বিহঙ্গমাকে এখন সাজগোজ করতে হবে। সাজ হবে নাটকীয় সাজগোজ। সাজগোজের পর জীবন নাটকের অভিনয়। উপযুক্ত সংলাপ সৃষ্টির দায়িত্ব সম্পূর্ণ নিজের।

বিহঙ্গমা পুঁটুলি সহ জিনিসপত্র নিয়ে নিজের কক্ষে প্রবেশ করে। বিহঙ্গমা সেজেগুজে কিছুক্ষণের মধ্যে ভর্ৎসুর কক্ষে প্রবেশ করলে বাণ স্তব্ধ হয়ে যায়।

বিহঙ্গমার মোহিনী রূপ দেখে অজ্ঞাত কারণে বাণের হৃদয়ে হাহাকার জেগে ওঠে।

বিহঙ্গমার রূপসজ্জা দেখে, ভর্ৎসুর মুখমণ্ডল প্রসন্ন হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ভর্ৎসু সাধারণ কিছু কথাবার্তার পর, বিহঙ্গমাকে সরাসরি তার আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনা স্বপ্ন এবং সাধের কথা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে বলেন। ভর্ৎসু বলেন, আজ বিহঙ্গমাকে মহারাজ অবন্তীবর্মার হাতে অর্পণ করা হবে। মহারাজকে বলা হবে বিহঙ্গমা তার আকাঙ্ক্ষা অনুসারে জীবন গড়ে তুলবে। নবজীবন সৃষ্টির সব সুযোগ সুবিধা বিহঙ্গমাকে দিতে হবে।

বিহঙ্গমা ভর্ৎসুর চোখে চোখ রেখে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে আমার ইচ্ছা আমার পুরোনো জীবন কথা পরিচয় সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাবে। আমি সম্পূর্ণ একা। আমার পরিচয় আমি বিহঙ্গমা। আমি পরিপূর্ণ একটি মানুষ। কোনও পুরুষের সাথে যুক্ত নারীরূপে খণ্ডিত মানুষ নই। আমার গর্ভে, যদি কোনও দিন সন্তান জন্ম নেয় সেই সন্তানের পরিচয় হবে আমার পরিচয়ে। কোনও পুরুষের পিতৃত্বের পরিচয়ে সন্তানের পরিচিতি হবে না। কঠোর শ্রমে আমি অর্থ অর্জন করব অর্থ ভোগ করব। কোনও পুরুষ আমার অন্নদাতা বস্ত্রদাতা আশ্রয়দাতা হতে পারবে না।

বাণ, বিস্ফারিত চোখে দেখে বিহঙ্গমা দুচোখে দ্বাদশ সূর্যের বহ্নিদাহ।

কক্ষে নিস্তব্ধতা নামে। রাজদূত ভর্ৎসুর কক্ষে এসে সংবাদ দেয় মহারাজ অবন্তীবর্মা রাজ অতিথি সদনের নাটভবনে অপেক্ষা করছেন।

রাজদূতকে অনুসরণ করে তিনজন নাটমন্দিরে প্রবেশ করেন। বাণ, নাটমন্দিরের সাজ সজ্জা লক্ষ করে। মাথার উপর বৃহৎ চন্দ্রাতপ। দেয়ালস্তম্ভ নানা বর্ণের ফুল এই সাথে আমি এবং অশোক পাতায় সুন্দর করে সাজানো। ভবন জুড়ে গন্ধধূপের মৃদু সুবাস।

নাটভবনে ভর্ৎসু প্রবেশ করলে মহারাজ অবন্তীবর্মা তার আসন থেকে উঠে এসে ভর্ৎসুকে প্রণাম করেন।

মহারাজা অবন্তী বর্মার রাজমুকুট গুরুদেব ভর্ৎসুর চরণ স্পর্শ করে। মহারাজের সাথে কুমার গ্রহবর্মা ভর্ৎসুকে প্রণাম করে। কুমার গ্রহবর্মা নদশ বছরের ফুটফুটে কিশোর।

ভর্ৎসু সাধারণ কুশলবার্তা পর বিহঙ্গমার কথা বলেন। অবন্তীবর্মা ভর্ৎসুর নির্দেশ মতো বিহঙ্গমার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মহারাজা অবন্তী বর্মা ভর্ৎসুর নির্দেশ মতো বিহঙ্গমার দায় দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বিহঙ্গমার দিকে প্রসন্ন মুখে তাকিয়ে বিহঙ্গমাকে তার নাম জিজ্ঞাসা করেন। বিহঙ্গমা উত্তরে বলে তার নাম বিহঙ্গমা। অবন্তীবর্মা তার গোত্রের নাম জিজ্ঞাসা করলে বিহঙ্গমা বলে তার গোত্র ভর্ৎসু। মহারাজের জিজ্ঞাসার উত্তরে বিহঙ্গমা বলে তার বাবার নাম ভর্ৎসু, তার ধর্মের নাম ভর্ৎসু।

বাণ লক্ষ, করে নাগেশ্বরের লৌহ কাষ্ঠের মূর্তি ভর্ৎসু তার উত্তরীয় দিয়ে গোঁফ মুছছেন। চোখের জল, কপোল বেয়ে এসে গোঁফ ভিজিয়ে দিয়েছে।

বিহঙ্গমাকে সঙ্গে নিয়ে অবন্তী বর্মা চলে গেলে ভর্ৎসু আবার যাত্রার জন্য প্রস্তুতি আরম্ভ করেন।

* * *

এবার গঙ্গার দক্ষিণ তীরে ধরে যাত্রা। এবার চলার সমাপ্তি হবে কৌশাম্বী নগরে। কৌশাম্বী নগরে ভর্ৎসুর বিদ্যাশ্রম পথে মানুষের ভিড়। মুখে মুখে রটে গেছে রাজগুরু মহাজ্ঞানী ভর্ৎসু তীর্থ পরিক্রমা শেষ করে ফিরে এসেছেন। পথে মাঝে মাঝে গাড়ি থামাতে হচ্ছে। ভর্ৎসুকে কেন্দ্র করে ভক্তজনের সমারোহ। ভর্ৎসুর উপদেশ আশিস বিতরণ।

আঠারো দিনের মাথায় গাড়ি পৌছাল গঙ্গাতীরের মস্ত নগরে। বাণের ধারণা হয়েছিল কৌশাম্বী নগরী। ভর্ৎসু বলেন — এই হচ্ছে বাণের আকাঙ্ক্ষিত প্রয়াগ নগরী। বাণ, প্রয়াগতীর্থ নিয়ে ইতিপূর্বে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেছিল।

বাণ দেখে গঙ্গাধারায় যমুনায় সরস্বতীর ধারা এসে মিলিত হচ্ছে। দুটি আলাদা রঙের জলধারা। গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে নীল-লোহিত জলধারায় সঙ্গম। ভর্ৎসু এবং বাণ গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গমে স্নান করেন।

পরদিন ভোরে প্রয়াগ থেকে যাত্রা শুরু হয়। গাড়ি চলে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে। প্রয়াগ থেকে

ষোল ক্রোশ দূরে কৌশাম্বী নগরী। দ্বিতীয় দিনের প্রথম প্রহরে গাড়ি পৌছায় কৌশাম্বী নগরের ভর্ৎসুর শিক্ষাশ্রমে।

বাণ আনুষ্ঠানিকভাবে ভর্ৎসুকে গুরুপদে বরণ করে ক্রমাগত প্রায় চার বৎসর নানা শিক্ষা গ্রহণ করে। শিক্ষা গ্রহণ করে রাজনীতি অর্থনীতি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের। শিক্ষা গ্রহণ করে রথ হাতি ঘোড়া নৌকা চালানোর কৌশল।

শিক্ষা গ্রহণ করে আত্মরক্ষা এবং আক্রমণের কৌশল। দুধর্ষ গোহক, শেষ পর্যন্ত কুস্তি আক্রমণ এবং আত্মরক্ষার পরীক্ষায় বাণের কাছে পরাজয় স্বীকার করে।

চার বছর শিক্ষা গ্রহণ করে বাণ গঙ্গার ধারা ধরে তার বাড়ীর পথে যাত্রা করে। অনেক দিন পর বাণের নৌকা পালিতকগঞ্জের নৌ-ঘাটে পৌছায়। বাণ পালিতক থেকে যখন প্রীতিকূটে পৌছান তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। বাণকে ঘিরে তার আত্মীয় পরিজন দাঁড়ালেন। নানা প্রশ্ন নানা কথা। বাণ এবং তার আত্মীয় স্বজন দিনক্ষণের হিসাব নিকাশ করে দেখলেন লোহিতাক্ষের করণ্ডীপোতে উঠে যাত্রা করার দিন থেকে ঠিক চার বছর সাত মাস পর বাণ প্রীতিকূটে ফিরে এসেছে।

বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন দেখে, তাদের একান্ত পরিচিত বাণ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এখন বাণ এখন কঠিন কঠোর শক্ত যুবক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাণ ফিরে এসেছেন। পরদিন সকাল থেকে প্রীতিকূট গমগম করছে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধবের ভীড়। প্রণাম প্রদান এই সাথে গ্রহণ, মস্তকে আঘ্রাণ গ্রহণ এবং প্রদানে বাণ ব্যস্ত।

দ্বিপ্রহরে ভিতর বাড়ীতে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য প্রবেশ করে দেখেন, চারিদিকে আত্মীয় স্বজন, পরিচিত অর্দ্ধ পরিচিত, ছোটো-বড়ো নানা বয়সের মেয়েদের জটলা। অনেকের সাথে মালতী পিসি। পিসির সাথে তাঁর বান্ধবী চক্রবাকিকা। চক্রবাকিকাকে ছুঁয়ে বসে আছে সুন্দরী তরুণী। তরুণী মাথা নুইয়ে দুহাতের চম্পাকলির মত আঙুল দিয়ে তার চাদরের কোণ পাকিয়ে চলছে। উজ্জ্বল রং। নীলাভ চোখ। চুলে সোনালি রঙের হালকা ছটা। তরুণীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বাণের চোখে স্থলপদ্ম ভেসে ওঠে। প্রভাতের সদ্য ফোটা শ্বেত স্থলপদ্ম নয়। দিনের প্রথম প্রহরের শেষ লগ্নের গোলাপি আভায় মাখা স্থলপদ্ম।

অনেকের সাথে দুজন প্রাচীনা বাণকে দেখছিলেন। দেখছিলেন বাণের তন্ময় দৃষ্টি পিসিমা জিজ্ঞাসা করেন বাণ তরুণীটিকে চিনতে পেরেছে কিনা ? নিরুত্তর বাণকে পিসিমা বলেন এই তার বনবিড়ালি। বাণের মনে পড়ে ঘটনার পর ঘটনা। বাবার প্রেতক্রিয়ার কাকবলির কালে কাককে ঢিল মারা। ময়ূরকে আক্রমণ করে নাস্তানাবুদ করা। প্রখর দুপুরে গাছ থেকে আমলকি পেড়ে দেওয়ার জন্য বাণকে হুকুম দেওয়া।

পিসিমার দিকে তাকিয়ে বলে চিনতে পেরেছে বন্ধু ময়ূরের বোন। ময়ূরের বোন পিসীমার দিকে তাকিয়ে বলে তার নিজের একটি নাম আছে এই সাথে পরিচয় আছে। পিসিমা তার মুখে প্রশ্রয়ের হাসি ভাসিয়ে বলেন — নাম বাণী।

বাণের মনে হয় বাণীর রূপ এই সাথে উচ্ছলতা মিলে মিশে তার সৌন্দর্য সম্পূর্ণ অন্যখাতে বইছে। এই রূপ তার দেখা অন্য নারীদের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার মনে হচ্ছিল দারুণ দামাল সৌন্দর্য চিত্রপটে স্তব্ধ হয়ে সামনে ভেসে আছে।

হঠাৎ করে পিসিমার জিজ্ঞাসা বনবিড়ালিকে কেমন লাগছে? পিসিমার প্রশ্নে, মুখ দিয়ে ফিচকে বের হয় পণ্ডিত বাণভট্টের তীর্যক ভাষার পুষ্পবাণ। বলেন বন-বিড়ালি হয়ে গেছে মন-মরালী। পক্ষকালের মাঝেই বাণে সাথে বাণীর বিয়ে হল।

*   *   *

বিয়ের আটমাস পর বাণীর পাশে বাণ শুয়ে আছেন। বাণের চোখে ঘুম নেই। রাত্রির তৃতীয়

প্রহর। আকাশে চাঁদ। বাতাসে সমুদ্র গর্জন। কুলুঙ্গির প্রদীপ ক্ষীণ।

বাণী গভীর ঘুমে অচেতন। বাণ বিছানায় উঠে বসেন কুলুঙ্গির ক্ষীণ প্রদীপের চঞ্চল আলো। প্রদীপের চঞ্চল আলো বাণীর মুখমণ্ডল গ্রীবা বক্ষস্থল নাভির উপর কাঁপছে। হিরণ্যবাহ্ নদীর স্বর্ণ প্রবাহ। মনে পড়ে উম-ইয়ামের দেহ। এমনি কঠিন স্তন। সব কথা গুরুদের ভর্ৎসুকে বলা হয়েছিল। প্রেমের ব্যর্থতার কথা। গুরুদেব বলেছিলেন, ক্ষুদ্রতম পরমাণু থেকে বিরাট নক্ষত্র পূর্ণ আকাশ, এক অজ্ঞাত কঠিন নিয়মে বাঁধা। এই প্রেম, এই কাম তেমনিভাবে দেহে মনে অজ্ঞাত নিয়মের কঠিন শৃঙ্খলে বন্দী। এই নিয়ম বহমান সৃষ্টির অলঙ্ঘ্য চক্র।

ঘুমন্ত বাণীর ঠোঁট নড়ে উঠে। অস্পষ্ট কী যেন বলছে। বাণ, ঠোঁটের কাছে কান পেতে বাণীর কথা বুঝতে চেষ্টা করেন। বাণীর কথা ক্রমে স্পষ্ট হয়।

"বৈকুণ্ঠে কুণ্ঠিতাস্ত্রে মহিষ মতিরুষং পৌরুষোপনিঘ্নং
নির্বিঘ্নং নিঘ্নতী বঃ শময়তু দুরীতং ভূবিভাবাভবানী"।

তার পাশে গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন এই নারীকে বাণ চিনতে পারেন না। বনবিড়ালী মন মরালী হয়ে এখন আবার আশ্চর্যভাবে সিংহবাহিনী ভবানী হয়ে উঠেছে। বাণ, এই কবিতায় দেবী ভবানীর চিত্ররূপ অঙ্কন করেছেন। কবিতাটি এখনো শেষ হয়নি। তিনি ভেবে পাচ্ছেন না কখন এই নারী অর্দ্ধসমাপ্ত কবিতাটি পাঠ করল? শুধু পাঠ নয়, স্বপ্নের ঘোরে সুললিত ছন্দে আশ্চর্য সুন্দরভাবে আবৃত্তি করে গেল।

বাণ এই কবিতায় লিখেছেন সব দেবশক্তি যখন স্তব্ধ—ভীষণ ভয়ালের কাছে পরাজিত। তখন দেবী ভবানী, মৃত্যুর অধিপতি যমের তাণ্ডবকারী মহিষকে হত্যা করে পৃথিবীতে শান্তি নিয়ে আসেন পুষ্টি নিয়ে আসেন। ধ্বংস করেন সব অমঙ্গল অকল্যাণকে।

রাত্রির শেষ পাদে বিছানায় বসে ধ্যানস্থ বাণ নিজকে অনুসন্ধান করেন। গুরুদেব বলেছিলেন, প্রতিটি মানুষ তার দেহে পুষ্টভাব অনুসারে সুখের পরিবেশ সৃষ্টি করে পরিবেশ ভেঙে গেলে দুঃখ পায়। নর-নারীর প্রেম-ভালোবাসা কাম, তেমনি প্রতিটি মানুষের দেহে স্থাপিত অণু, পরমাণুর অনিবার্য প্রবাহ।

"দুঃখ থেকে কি মুক্তি নেই"? বাণের এই প্রশ্নের উত্তরে ভর্ৎসু বলেছিলেন, মানুষ যদি তার বিনষ্ট পরিবেশ অতিক্রম করে, তার আকাঙ্ক্ষা অনুসারে নূতন পরিবেশ নির্মাণ করতে পারে তা হলে অবশ্যই দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। সুখ অথবা দুঃখের জন্য ব্যক্তি অথবা আধার গৌণ। বাণ তখন বলেছিলেন, তিনি যে ভালোবাসায় ডুবেছিলেন এবং যে ভালোবাসা তাকে অন্তহীন দুঃখ দিয়েছে, সেই ভালোবাসা সেই আনন্দকে পুনর্নির্মাণের জন্য যদি অন্য নারীকে কেন্দ্র করে, অন্য পরিবেশ সৃষ্টি করেন তাহলে কি সেই আনন্দ সেই ভালোবাসা আবার ফিরে আসবে? দুঃখ থেকে কি মুক্তি পাবেন?

প্রশ্ন শুনে বাণের দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে, ভর্ৎসু ধীরে ধীরে বলেছিলেন, বাণ এবং উম-ইয়ামের তখন যে বয়স ছিল সেই বয়স হচ্ছে সৃষ্টির উৎসকাল। অনিবার্য প্রবহমান

প্রকৃতি, সেই মানসিক ভাবকে প্রেম সংজ্ঞা দিয়ে সৃষ্টির উৎস শক্তিকে দুর্বার করে তুলেছে।

গুরুদেব কথা শুনে বাণ দুঃখ পেয়ে আর্দ্র কণ্ঠে বলেছিলেন, তাদের প্রেম তাদের ভালোবাসা কি মূল্যহীন মিথ্যা? বাণের সজল কণ্ঠের কথা শুনে ভর্ৎসু আবার কিছুক্ষণ মৌন থেকে সস্নেহে আর একটি কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। বলেছিলেন "বাণ! তোমাদের মধ্যে প্রেম ভালোবাসা মিথ্যা নয়। কিন্তু এই প্রেম ভালোবাসা অতীন্দ্রিয় নয়। সেই প্রেম-ভালোবাসার উৎস ছিল তোমাদের দেহজাত বাস্তব কাম"।

গুরুদেব ভর্ৎসু তার কথার রেশ টেনে এরপর বলেছিলেন, বাণ যদি উম-ইয়ামের মতো অন্য নারীকে আশ্রয় করে নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে ব্যর্থ কাম বা প্রেম নূতন রূপ লাভ করে মনের শূন্যতা পূরণ পারে।

বাণ গুরুদেবের কথায় নিদারুণ ব্যথা পেয়েছিলেন। দিনের পর দিন গুরুদেবের এমনি কঠিন কঠোর কথা তার হৃদয় চিরে রক্তাশ্রু ক্ষরণ করে প্রবাহিত হয়েছিল। কিন্তু বাণীর সাথে বিবাহের পর তিনি বিস্মিত হয়েছেন, কখন যে তার মানসিকতার পরিবর্তন শুরু হয়েছিল, সেই দিনক্ষণ তার অনুভূতিতে ধরা দেয়নি। বাণীর দেহমনের অতলে অবগাহন করে আবার তিনি ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে উঠেছেন। বাণীকে আশ্রয় করে ভালোবাসা পল্লবিত হয়ে উঠেছে। হৃদয়ে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে গুরুবাক্য। বাণীকে তিনি ভালোবাসেন। এই ভালোবাসা গাঢ়তম হয়ে উঠেছে রাত্রির শেষ যামে। দেহ মনে বাণী অপরূপা।

গুরুদেব বলেছিলেন, জীবজগতে মানুষ এক আশ্চর্য প্রাণী। মনের অনুভূতি দেহের নিয়মের সাথে মিলে মিশে কামকে পরিচালিত করে। বাণ খানিক আগে বাণীর কবিতা শুনে নূতন রূপে উপলব্ধি করেছেন গুরুবাক্য। বাণীর দেহ তাকে তৃপ্ত করেছে। বাণীর মানসিক গঠন এই তৃপ্তিকে গভীরতায় এগিয়ে নিয়েছে। বাণীর মানসিক গঠন বাণের উপলব্ধির সাথে প্রবাহিত। বাণীর অনুভূতির বীণাতারের সাথে বাণের জীবন ঝঙ্কার মুখর।

পৌষের তুহিন শীত। ঘুমের ঘোরে শিমুল লেপ সরে গেছে। কুন্দেন্দু তুষার হার ধবলা বাণীর দেহে প্রদীপালোকের প্রবাহ। সাবধানে ধীরে ধীরে লেপ টেনে ঘুমন্ত বাণীর দেহ ঢেকে দেন বাণ।

* * *

প্রভাতী আহ্নিক শেষ হতে না হতেই বিদ্যাশ্রমে শিশুদের সুতীব্র কাকলি। বাণ সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখেন বালক ব্রহ্মচারীগণ আশ্রমের প্রবরসেন গৃহের মাঠে দল বেঁধে চিৎকার চেঁচামেচি করছে।

আশ্রমে অনেক ময়না পাখি আনা হয়েছে। অনেকগুলি খাঁচা। পাখিগুলি একসাথে নানা শ্লোক আবৃত্তি করছে। ময়নাপাখির সাথে বালক ব্রহ্মচারীগণের কণ্ঠ মিলে মিশে মস্ত এক হৈ চৈ কাণ্ড।

মাস কয়েক আগ থেকে তিনি প্রীতিকূট আশ্রমকে নূতন করে গড়ার কাজে লেগেছেন।

গো প্রপলীতে লোহিতাক্ষের সাথে হুন্ডি বিষয়ে কথাবার্তায় জানতে পেরেছেন, হুন্ডির অর্থ এই সাথে লবণ ব্যবসায়ের বিপুল টাকা তার নামে জমা হয়ে আছে। এই টাকার ব্যবহার শুরু হল বিদ্যাশ্রমকে নূতন করে গড়ার কাজে। আমূল পরিবর্তন হল বিদ্যাশ্রমের। চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমের আদলে তৈরি হল নানা বিভাগ। এক একটি মস্ত আয়তক্ষেত্রে নির্মাণ করা হল এক একটি বিভাগ। আয়তক্ষেত্রের চারদিকে চারটি দীর্ঘ গৃহ। এক দিকে রান্না এবং খাবার ঘর। উল্টোদিকে মস্ত পাঠ ভবন। দুই পাশে ব্রহ্মচারী এবং অধ্যাপকদের বাসগৃহ। অধ্যাপকগণের বাসগৃহে দুজন অধ্যাপক তাদের পরিবারসহ বাস করেন। অধ্যাপক দুজন ব্রহ্মচারীদের প্রভাতীয় যজ্ঞ, অধ্যয়ন ইত্যাদি পরিচালনা করেন। অধ্যাপক পত্নীগণ, বিভাগের ব্রহ্মচারী, অধ্যাপক এবং বিভাগের অন্যান্য কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ভোজন ইত্যাদির ব্যবস্থায় থাকেন। ব্রহ্মচারীগণ, অধ্যাপক পত্নীদেরে গুরুমা বলে সম্বোধন করে। রান্না এবং খাবার ঘরের পিছনে পুকুর। বিভাগের আয়তক্ষেত্রের ঘরগুলির সামনে লম্বাভূমির উপর ফুল এবং সোমলতার বাগান। বাগানগুলি বাসের কঞ্চির কারুকার্থ করা বেড়া দিয়ে ঘেরা। আয়তক্ষেত্রের মাঝখানে খোলা মাঠ। মাঠে সবুজ দুর্বাঘাস।

বাণ প্রীতিকূট বিদ্যাশ্রমকে এমনি ধরনের সাতটি বিভাগে সাজিয়েছেন। প্রতিটি বিভাগের এক একটি নাম যেমন বাৎস্যগৃহ কুবেরগৃহ কালিদাসগৃহ ব্যাসদেবগৃহ ভট্টার হরিচন্দ্রগৃহ প্রবর সেনগৃহ এবং ভর্ৎসুগৃহ।

ব্রহ্মচারীদের উল্লাস প্রবরসেনগৃহের মাঠে দাঁড়িয়ে তিনি দেখছেন। প্রতিটি গৃহের ব্রহ্মচারীদের বাসভবনে বিভিন্ন বয়সের এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্রহ্মচারীগণ মিলে মিশে বাস করে।

বছর কয়েক হল ভট্ট ব্রহ্মবীর স্বামী প্রীতিকূট বিদ্যাশ্রমে অধ্যাপক রূপে যোগ দিয়েছেন। রাজা জয়নাগের প্রতিনিধি নারায়ণদেব তাঁকে বপ্প ঘোষ বাটের নূতন কুমারীভূমিতে তাম্রপত্র প্রদান করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ব্রহ্মবীর স্বামী শিশু শিক্ষার জন্য ময়নাপাখি ব্যবহারের জন্য পরামর্শ দিয়ে ছিলেন। শিশুশিক্ষার জন্য ময়নাপাখির ব্যবহার একটি প্রাচীনপ্রথা। এমনি ব্যবস্থা চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমে বহুকাল ধরে প্রচলিত।

মাস আটেক আগে ময়নাপাখির বাচ্চাগুলি আশ্রমে আনা হয়ে ছিল। ইতিমধ্যে বহু অধ্যাপক, এক একটি পাখিকে এক একটি করে শ্লোক আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেন। সবগুলি ময়নাপাখি মিলে, বলতে গেলে মস্ত এক গ্রন্থের আবৃত্তি প্রস্তুত হয়ে গেছে।

অন্যদিকে প্রীতিকূট বিদ্যাশ্রমের বংশানুক্রমিক শিক্ষক বাণের জেঠতুতো ভাই গণপতি অধিপতি তারাপতি শ্যামল এইসাথে আত্মীয় পরিজন বারবাণ বাসবাণ অনঙ্গবাণ সূচীবাণ প্রমুখদের শিক্ষাপ্রদান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ দিয়েছেন ভট্ট ব্রহ্মবীর স্বামী, রুদ্রের পিতা উন্মীলন স্বামী এবং বাণের জেঠামশাই হংসবেগদেব। বেদ পুরাণ ইতিহাস রাজর্ষিচরিত মহাভারত ব্যাকরণ সাহিত্য প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ অংশ বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যতালিকায় চিহ্নিত করা হয়েছে।

ময়নাপাখি এই সাথে ব্রহ্মচারীদের মিলিত কলকাকলিতে বাণের মনে পড়ে চণ্ডকের কথা। মাস-দেড়েক হয়ে গেল এখনো চণ্ডক বাড়ী থেকে ফিরে আসেনি। চণ্ডক এই ময়না পাখিগুলিকে

সংগ্রহ করে আশ্রমে এনেছিল। চণ্ডকের বাড়ী শোনবিলের দক্ষিণ পূর্ব কোণে, বিলাল গ্রামের পক্কন পল্লীতে। চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমে দক্ষিণ দিকে বিলাল গ্রাম।

চণ্ডক প্রায় শখানেক ময়নাপাখির বাচ্চা নিয়ে মাস কয়েক আগে প্রীতিকূট আশ্রমে এসেছিল। বাল্যজীবনে চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমের কাছে চণ্ডকের সাথে তার প্রথম পরিচয় । বয়সের দিক থেকে চণ্ডক সমবয়স্ক। আশ্রমে পাখিগুলি আনার পর বাণ তাকে পাখিগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং তদারকির কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। তখন থেকে চণ্ডক প্রীতিকূটে বাস করতে আরম্ভ করেছে।

চণ্ডক মাসখানেক আগে ভীষণভাবে আহত হয়েছিল। তাকে লাঠিপেটা করেছিল কুতকুট্ট মন্দিরের গুণ্ডার দল। গুণ্ডারা গুহন দীনের লোক। এই গুহনদীনের গুণ্ডার দল, প্রীতিকূট বিদ্যাশ্রম সহ ব্রাহ্মণ্যাধিবাসের ভূমির তাম্রপট্ট পুড়িয়ে দিয়েছিল।

একদিন সকালবেলা, খাঁচা থেকে পালিয়ে যাওয়া ময়নার পিছু পিছু চণ্ডক কুতকুট্ট মন্দির চত্বরে ঢুকে ছিল। তারপর ভীষণ লাঠিপেটা। আহত চণ্ডক বিশ্রামের জন্য বাড়ী গিয়েছে। বাণ স্থির করলেন চণ্ডকের বাড়ী বিলাল গ্রামের পক্কন পল্লীতে গিয়ে তার খোঁজ করবেন।

* * *

দুদিন পর যাত্রা করলেন বিলাল গ্রামের উদ্দেশে। বপ্প ঘোষ বাট ঘাট থেকে শোনবিলের জল কেটে ছিপ দক্ষিণ পূর্ব দিকে তীব্রবেগে এগিয়ে চলে। পনেরো বৈঠার মাঝারি ছিপ।

ছিপ শোনবিলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পৌছায়। সামনে চন্দ্রপুর পাহাড়ের দক্ষিণ দিকের সত্রচূড়া। সত্রচূড়ার পাদদেশে বিলের গা ঘেঁষে বিলাল গ্রাম। বিলাল গ্রামে বিলাল নামক নরগোষ্ঠীর বসবাস। বিলাল শ্রেণীর নরগোষ্ঠীকে সাধারণভাবে চণ্ডাল বলা হয়।

শীতে শনবিল শুকিয়ে জল অনেক দূরে সরে গেছে। ঝকঝকে সাদা বালির চরভূমিতে ছিপ থামে। বাণ সাদা বালির চরভূমি পার হয়ে কুশঘাস নলখাগড়ার মাঝ দিয়ে পাচলা পথের উপর দিয়ে বিশাল গ্রামে পা রাখেন। গ্রামে উঠামাত্র নেড়ি কুকুরের ঝাঁক তাকে ঘিরে ফেলে। কুকুরের ঝাঁক বিকট হট্টগোল শুরু করে। কুকুরের ডাক শুনে একটি কুঁড়েঘর থেকে জনৈক তরুণী বের হয়ে বাণকে দেখে। বিলাল তরুণী বাণকে চিনতে পারে। তরুণী দিনকতক আগে, বিদ্যাশ্রমে বাঁশবেতের তৈরি নানা ধরণের টুকরি, ছোটো বড়ো পাত্র বিক্রি করতে গিয়েছিল। বাণ পছন্দ করে অনেকগুলি, বেতের তৈরি ছোটো ছোটো পাত্র খরিদ করেছিলেন। বেতের তৈরি ছোটো ছোটো পাত্রগুলি, ব্রহ্মচারীদের চিড়ামুড়ি খাবার পাত্র হিসাবে বাণের পছন্দ হয়েছিল।

বিলাল তরুণীর নির্দেশমতো তিনি চণ্ডকের বাড়ীর উদ্দেশে পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলেন। উঠানের মাঝ দিয়ে পথ। উঠানের দুধারে ছনবাঁশের নিচু কুঁড়ে ঘরের সারি। বাণের পিছনে নেড়ি কুকুরের শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রার মাঝে মাঝে উলঙ্গ অর্দ্ধ উলঙ্গ কৃষ্ণকায় ছেলেমেয়ে। মানুষ এবং কুকুরের বিকট হট্টরোল। বাণ লক্ষ করেন, তার পিছনে অনুসরণকারী শোভাযাত্রা সমদূরত্ব রেখে তাকে অনুসরণ করে চলছে। শোভাযাত্রা কোন সময়েই কাছাকাছি আসছে না।

উঠানপথের দুধারে নানা ধরনের কাজ চলছে। তৈরি হচ্ছে পাখি মাছ এমনকী বাঘ ভালুক ধরার জন্য নানা ধরনের জাল। বাঁশ চিরে তৈরি হচ্ছে বেত। বেত দিয়ে তৈরি হচ্ছে ডালা কুলা

টুকরি চাটাই। শান দেওয়া হচ্ছে ধনুকের তীর বর্শার ফলাকে। বাঁশের খুঁটিতে টানটান করে টাঙানো জংলি বেতের উপর শুকানোর জন্য ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে কাঁচা মাছ এবং মাংস। মাটিতে বাঁশের কঞ্চি পুঁতে টানটান করে শুকানো হচ্ছে গরু এবং মহিষের কাঁচা চামড়া। পথের উপর এবং পথের পাশে ছড়িয়ে আছে মাছের কাটা মাংসের হাড়, কুকুর মানুষ এবং শূকরের বিষ্ঠা।

উঠানের দুধারের কুঁড়েঘরগুলি গায়ে গায়ে লাগানো। মাঝে মাঝে দুএকটি কুঁড়েঘরের মাঝখানে সামান্য ফাঁক। এই সব ফাঁকে বসে উলঙ্গ হয়ে নারী পুরুষ বাহ্য করে করে রঙ্গ তামাসা করছে। ওদের পিছন দিকে নাক ফুলিয়ে অপেক্ষা করে আছে শূকর। কুঁড়ে ঘরের সামনে, গরুর কাঁচা চামড়ার উপর লম্বা হয়ে পড়ে আছে উলঙ্গ মাতাল স্ত্রী পুরুষ। নেড়ি কুকুর জিভ দিয়ে চাটছে উলঙ্গ মাতালদের গুহ্যদ্বার।

পক্কন পল্লীতে পৌঁছানোর আগেই চণ্ডকের সাথে তার দেখা। কোনও কথা নয়। বাণ তাকে নিয়ে এক ছুটে ছিপে ওঠেন। ছিপ শনবিলের জল কেটে ব্রাহ্মমন্যাধিবাসের দিকে এগিয়ে চলে।

চণ্ডক দীর্ঘদেহী। মাথায় প্রায় বায়ুবিকারের মত। তবে বায়ুবিকারের মত তার পিঠ বাঁকা নয়। বড়ো বড়ো চোখ। পাকানো শক্ত পেশী। চুল লম্বা। কপালের উপর লাল কাপড়ের ফেট্টিবাঁধা।

এতদিন হয়ে গেল সে প্রীতিকূটে কেন পৌঁছাল না এই প্রশ্নের উত্তরে চণ্ডক বলে—শরীর তার ভালো আছে তবে লজ্জায় যেতে পারেনি। কুতকুট্ট মন্দিরে লাঠিপেটা প্রসঙ্গে চণ্ডক কথা বলে। বাণকে বলে তার হাতে তখন লাঠি ছিল না তাই মার খেয়েছে। বাণ জিজ্ঞাসা করেন হাতে লাঠি থাকলে সে কী করত? চণ্ডক পঞ্চমুখে বীরত্বের কথা বলে।

* * *

প্রীতিকূটে পৌঁছানোর দিন কতক পর এক বিকালে চণ্ডককে নিয়ে বাণ বিদ্যাশ্রমের ভর্ৎসুগৃহের পাঠভ...ন প্রবেশ করেন। তখন ছুটি হয়ে গেছে। পাঠভবনের দরজা ব.. করে বাণ চণ্ডককে বলেন তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে। বাণের হাতে সেই দুখণ্ড কাঠ। কাঠ দুটি হালকা শিকলে — আটকানো।

চণ্ডক প্রথমে আক্রমণ করতে রাজি হয় না। শেষ পর্যন্ত বাণের কঠিন আদেশে হালকাভাবে আক্রমণ করে। বাণ প্রতিবার চণ্ডকের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নেন। ক্রমে চণ্ডকের আক্রমণ জোরদার হতে থাকে। নাস্তানাবুদ হয়ে শেষ পর্যন্ত চণ্ডকের আক্রমণ ভীষণ হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রতিবার বাণের দুখণ্ড লাঠির মাঝখানের হালকা শিকলে বাঁধা পড়ে তার লাঠি। প্রতিবার লাঠি চলে যায় বাণের হাতে। বিস্মিত হয়ে চণ্ডক পরাজয় স্বীকার করে।

পাঠভবনের বন্ধ দরজার ভিতরে মাস ছয়েক ধরে ক্রমাগত বাণ চণ্ডককে নানা ধরনের দৈহিক শিক্ষা দিয়ে চলেন। শেষ পর্যন্ত চণ্ডক আত্মরক্ষা এবং আক্রমণে ভীষণ হয়ে ওঠে।

বাণের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়ে চণ্ডক দুর্দান্ত হয়ে ওঠে। প্রতিক্ষণে মনে পড়ে কুতকুট্ট মন্দিরের লাঠিপেটার কথা। হাত তার নিশপিশ করে। অপেক্ষা বেশি দিন করতে হয়নি। এক সন্ধ্যায় বন্দরপুর থেকে করালীসহ গুহদীনের গুণ্ডারা নৌকায় বপ্প ঘোষ ঘাটে ভিড়ে। চণ্ডক কোমরে একজোড়া ছোটোলাঠি গোঁজে, মাতালের অভিনয় করে বেসামাল অবস্থায় করালীকে

ধাক্কা দেয়। করালী মুখ থুবড়ে কাদায় পড়ে যায়। হা-রে-রে করে গুণ্ডাদের লাঠি ওঠে। মুহূর্তমাত্র গুণ্ডা সব মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

চণ্ডকের এমন কাণ্ডে বাণ ক্রুদ্ধ হলেন। ক্রুদ্ধ হবার কারণ তিনি বার বার চণ্ডককে বলেছিলেন, এই যুদ্ধবিদ্যা অত্যন্ত গুপ্তবিদ্যা। অবস্থা চরমে না পৌঁছালে এর ব্যবহার করতে নেই।

বাণকে এমনি উপদেশ দিয়েছিলেন গুরুদেব ভর্ৎসু। তিনি বলেছিলেন, সাধারণভাবে কোন ব্যক্তি যেন জানতে না পারে প্রতিপক্ষ এক ভীষণ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। প্রতিপক্ষ যদি বুঝে নেয় এই ব্যক্তি আত্মরক্ষা এবং আক্রমণে নিপুণ, তাহলে আক্রমণের কৌশল বদলে দূর থেকে ভল্ল অথবা বতীর দিয়ে আঘাত হানতে পারে। বাণ, চণ্ডককে এসব উপদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু চণ্ডক উপদেশ পালন করেনি। বাণ উপলব্ধি করেন চণ্ডক যদিও সুবিশাল দেহ এবং প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী কিন্তু মানসিক দিকে অত্যন্ত দুর্বল। বাণ স্থির করেন চণ্ডকের মানসিক বৃত্তিকে উন্নত এবং সংযত করার জন্য আরো কিছু করতে হবে।

চণ্ডকের এই ঘটনা প্রীতিকূট এবং কুতকুট মন্দিরের পরস্পরের সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটাল।

করালী চণ্ডকের এমনি আচরণের প্রতিকারের জন্য গুহনদীনকে বলেছিল। গুহনদীন কিছু করতে সাহস করেনি। গুহনদীন ভাল করেই জানে, শ্রীগোপাল এবং রাজা জয়নাগের প্রতিনিধি নারায়ণদেব বাণকে স্নেহ করেন। অন্যদিকে প্রীতিকূট বিদ্যাশ্রমের অধ্যাপক ভট্ট ব্রহ্মবীর স্বামী নারায়ণ দেবের গুরুতুল্য।

* * *

ইতিমধ্যে, বাণের বিবাহের দুবছর একমাস হয়ে গেছে। সেদিন ছিল জ্যৈষ্ঠের সকাল। গ্রীষ্মের ভীষণ সূর্য তখনো প্রকট হয়ে উঠেনি। বাণের বাসগৃহের সামনে আত্মীয় স্বজনের ভীড়। অধিকাংশ স্ত্রীলোক। সকলের মুখে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ছায়া। বাণীর সন্তান জন্ম নিবে।

আশ্রমের জ্যোতিষী জলঘড়ির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন। জন্মলগ্ন স্থির করতে সঠিক সময় নির্দ্ধারণ একান্ত আবশ্যক। প্রসূতিগৃহের দরজায় একাধিক মঙ্গলঘট মুষল এবং একসারি পুতুল। দরজার উপরে নূতন পাতার মালা। দরজা দিয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশপথের মেঝের উপর বাঘের চামড়া পেতে রাখা হয়েছে। দরজার কাঠের পাল্লায় চালের গুঁড়ি গুলে স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা। বাসের টুকরি ঘন করে গোবর দিয়ে লেপে, এর উপর মস্ত করে স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা হয়েছে ছোটো বড়ো কড়ি এবং কার্পাস ফুল দিয়ে। ষষ্ঠীদেবীর মূর্তিগুলি হলুদ দিয়ে রং করা কাপড়ে সাজানো। ষষ্ঠীদেবীর পাশে কার্তিকের মূর্তি। কার্তিকের হাতে শক্তিদণ্ড। ময়ূরের উপর লাল কাপড়ের পতাকা। দরজার সামনে মস্ত থালার উপর কুঙ্কুম দিয়ে আঁকা চন্দ্র সূর্য। গোল কাঁচা মাটির ঢেলায় বাঁশের অজস্র কাঠি পুঁতে এবং কাঠিগুলিকে সোনালী রঙ্গে রঞ্জিত করে তৈরি করা হয়েছে কদম ফুলের গুচ্ছ।

প্রসূতিগৃহের কাছাকাছি বুড়ো ছাগল বাঁধা। বুড়ো ছাগল মঙ্গলচিহ্ন। ছাগলের পাশে বসে বেদমন্ত্র পাঠ করে করে শান্তিজল ছিটিয়ে দিচ্ছেন পুরোহিত। মালতী পিসি এই সাথে অন্যান্য

বয়স্কাগণ মাদুরের উপর বসে ডান হাত গালে রেখে সূতিকামঙ্গল গীত গেয়ে চলেছেন।

উঠানের এদিক ওদিকে পায়চারি করছেন বাণ। হাতে কথাসরিৎসাগর গ্রন্থ। বাণের মনে পড়ে পক্ষকালের আগের ঘটনা। এক বিকালে বিদ্যাশ্রম থেকে বাড়ী ফিরে চমকে উঠেছিলেন। পালকের উপর বাণী বসে আছে। ঘরের ভিতর পিসিমা এবং অনেক নানা বয়সের মহিলা। পালকের সবদিক থেকে ঝুলছে লম্বা চুল দিয়ে বাঁধা নিম এবং অশ্বত্থ পাতা। শিয়রের দিকে নিদ্রা মঙ্গল কলসি। কলসিতে রাখা হয়েছে নানা ঔষধির শিকড় বাকড়। পালক বেষ্টন করে মেঝের উপর শাকিনী-ডাকিনী তাড়ানোর ভস্মের গণ্ডি।

বাণ দেখছিলেন কাণ্ডকারখানা। জেঠাইমা থালায় করে এনেছেন ছোটো ছোটো কয়েকটি পাত্র। পাত্রগুলিতে ভাজা শালিধানের গুঁড়া, খৈ ঘন জমাট দৈ। ঘরের মেঝে সাদা আলপনায় সাজানো। মাঝখানে নকসি কাটা আসন পাতা। জেঠাইমা নকসিকাটা ছোটো আসনের সামনে হাতের থালা নামিয়ে সস্নেহে বাণীকে পালক থেকে নামিয়ে আসনের উপর বসিয়ে ছিলেন। বাণী লজ্জায় মাথা নিচু করে বসেছিল।

সেদিন বাণ প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিলেন পূর্ণগর্ভবতী নারীকে কেন্দ্র করে সুন্দর একটি সামাজিক উৎসব। সেদিন পূর্ণগর্ভবতী বাণীর সাধভক্ষণ উৎসব হচ্ছিল।

সকলের কথা উল্লাস এবং হাসির শব্দে তার অতীত রোমন্থন কেটে যায়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। পুত্রসন্তান। বাণের গৃহপ্রাঙ্গণ উৎসবমুখর হয়ে উঠে। সবাই কারণে অকারণে হাসছে আর কথা বলছে। সবাই বাণের কাছে এসে বাণকে কীসব কথা বলছে। এমনি করে কিছু সময় পার হলে ধাত্রী দরজা খুলে বাণকে ভিতরে আসতে বলে। বাণ প্রবেশ করেন। প্রসূতিগৃহের ভিতর অরিষ্ঠপল্লবের রক্ষাধূমে ধূমায়িত। সাপের খোলস, ভেড়ার শিং পোড়ার তীব্র কটুগন্ধ।

বাণ দেখতে পেলেন পালকরা দেবধূপের স্বপ্নলোকে দেবী সরস্বতী। বাণীর পাশে শিশুপুত্র মুখে হাসি। বাণী কাঁথা জড়ানো শিশুপুত্র বাণের দিকে তুলে ধরে। বাণ হাতের পুঁথি বাণীর পাশে রেখে কাঁথা পেঁচানো শিশুকে দুই হাতে ধরে বলেন 'এতো পুটলী! পুলিন্দা!' বাণের এমনি কথা শুনে বাণীর সাথে ধাত্রী হেসে ওঠে। ধাত্রী, বাণের দিকে চেয়ে বলে "শুধু হাতে পুত্রের মুখ দেখা চলবে না। কিছু দিয়ে পুত্রের মুখ দেখতে হয়।" ধাত্রীর কথা শুনে বাণ অসহায় বোধ করে এদিকে ওদিকে তাকান। সাথে টাকা কড়ি কিছু নেই। হঠাৎ চোখে পড়ে সোমদেবের লিখা কথা সরিৎসাগরের গ্রন্থখানি। বাণ গ্রন্থখানি বাণীর হাতে দিয়ে বলেন,'এই নাও ! সোমদেবের কথা সরিৎসাগরের গ্রন্থ। আমার পুলিন্দার মুখ দেখে এই গ্রন্থখানি তাকে দিলাম।' বাণী গ্রন্থখানি অঞ্জলিবদ্ধ হাতে নিয়ে প্রথমে নিজের কপালে ছুঁইয়ে তারপর পুলিন্দার মাথায় ছোঁয়ালেন। এরপর বাণের দিকে তাকিয়ে বলেন তোমার পুলিন্দার চেয়ে এই বই অনেক ভারী।' বাণ বলেন — 'আমাদের পুলিন্দা বড়ো হয়ে এমনি অনেক গ্রন্থ আঙ্গুলের ডগার নাচাবে।'

বাণ শিক্ষাশ্রমের ব্যস্ততায়, শিশু পুলিন্দার নিত্যনূতন লীলায় বাণীর পূর্ণতায় স্বপ্নের মতো দিন কাটাতে লাগলেন। প্রতিটি দিন জীবনকে ভরে দিতে থাকে নিত্যনূতন আনন্দে। পুলিন্দার ছয়মাস বয়সের উৎসবে তার নূতন নামকরণ হল 'ভূষণ'। কিছুদিনের মাঝে, পুলিন্দা -ভূষণের

মুখে কুন্দকলির মত দাঁতের কণা দেখা দিল।

* * *

হেমন্তের মৌমাছির গুঞ্জন পদ্মের গন্ধ ছাপিয়ে বাতাসে ভেসে উঠে যুদ্ধের দামামা, রক্তের গন্ধ।

এক দুপুরে, প্রীতিকূটে হঠাৎ করে লোহিতাক্ষ এসে হাজির হলেন। বন্ধুকে দেখে বাণের খুশি ধরে না। মহা উৎসাহে নূতন করে ঢেলে সাজানো বিদ্যাশ্রম দেখিয়ে বলেন — এই তার আনন্দ! এই তার গর্ব। লোহিতাক্ষ বলেন, এসব খবর তার জানা হয়ে গেছে এমনকী বাণ যে নূতন ভূষণে সেজে উঠেছেন সে খবর ও তিনি পেয়ে গেছেন। লোহিতাক্ষের মুখে উচ্চারিত "নূতন ভূষণ শব্দ শুনে বাণ অনাবিল আনন্দে হেসে ওঠেন।

চণ্ডক পান সুপারি কর্পূর এবং লবঙ্গ দিয়ে বাটা সাজিয়ে লোহিতাক্ষ এবং বাণের সামনে রাখে। সে এখন বাণের পাশে থাকে ছায়ার মতো। ইতিমধ্যে বাণের কঠিন নির্দেশে সে আদিম বন্যতা থেকে কিছু মুক্ত হয়েছে।

বাণ লক্ষ করেন লোহিতাক্ষ যেন কিছু বলার জন্য উস-খুস করছেন। শেষপর্যন্ত বাণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন কিছু কথা আছে তবে ভীষণ গোপনীয়। এখানে বলা যাবে না। কারণ, দেয়ালের কান আছে। "দেয়ালের কান আছে" বাক্য নিয়ে আবার দুবন্ধুর হাসাহাসি এবং রসিকতা।

অনেক দিন পর দুবন্ধু দুপুরের খাবার খেতে এক সাথে বসেন। সলজ্জ বাণী পরিবেশন করে। পুরোনো দিনের কথা ঘটনা নিয়ে দুজনের রসিকতা এই সাথে হাসি।

পড়ন্ত বেলায় দুবন্ধু প্রীতিকূট থেকে খাসোক পুষ্করিণীর পাশ দিয়ে উত্তর দিকে এগিয়ে চলেন। ঝোপ জঙ্গলের মাঝ দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ। আঁকাবাঁকা এই পায়ে চলার পথ ব্রাহ্মণ্যাধিবাস তথা শাম্মলীর উত্তর সীমার গঙ্গিনিকায় এসে পৌঁছেছে।

পায়ে চলার পথ বৃহৎ জাটলী অতিক্রম করে গঙ্গিনিকার চর ভূমিতে গিয়ে শেষ হয়েছে। জাটলী হচ্ছে ঝোপঝাড়। বৃহৎ জাটলী অতিক্রম করে গঙ্গিনিকা চরের বালির উপর বসে কথা শুরু হয়।

তখনো সন্ধ্যা হয়নি। খানিক দূরে চণ্ডক বসে আছে। চণ্ডকের হাতে পানের পুটুলি। সামনে সাদাবালির দীর্ঘ ধু-ধু চর। চরভূমির পর গঙ্গিনিকা। গঙ্গিনিকার জলে পড়ন্ত বেলার গৈরিক আভা। নানা রঙের অজস্র পালতোলা নৌকা। গঙ্গিনিকার উত্তর তীরে অস্পষ্ট হরিনগর। হরিনগরের উত্তরে উদ্ধত, নীল প্রাগজ্যোতিষপুর পর্বতমালা।

কাছাকাছি জন প্রাণী নেই। তবুও বাণের কানে প্রায় ঠোঁট ছুঁইয়ে লোহিতাক্ষ বলেন, যুদ্ধ অনিবার্য। স্থাণ্বীশ্বরের পুষ্পভূতি বংশের মহারাজা প্রভাকর বর্দ্ধনের মৃত্যু হয়েছে। প্রভাকর বর্দ্ধনের কন্যা রাজশ্রীর স্বামী কান্যকুব্জের রাজা। গ্রহবর্মাকে পরাজিত এবং হত্যা করে রাজ্যশ্রীকে বন্দী করা হয়েছে।

"কান্যকুব্জ দখল, গ্রহবর্মাকে হত্যা এবং রাজ্যশ্রীকে বন্দী কে করেছে?" বাণের এই জিজ্ঞাসার জবাবে লোহিতাক্ষ বলেন" এসব ঘটনার নায়ক জনৈক মালবরাজ। কিন্তু এই মালবরাজের নাম এবং তিনি মালবের কোন অংশের অধিপতি তা এখনো জানা যায়নি।

"যুদ্ধ বিগ্রহের কেন্দ্রভূমি ভারতের মধ্যঅঞ্চল। কিন্তু ভারতবর্ষের এই সুদূর উত্তর-পূর্ব কোণে কেন এই উত্তেজনা?" বাণের জিজ্ঞাসার জবাবে লোহিতাক্ষ বলেন, ঘটনা জট পাকিয়ে, ক্রমশ পূর্ব দিকে এগিয়ে আসছে। মহারাজা প্রভাকরবর্দ্ধনের দুই পুত্র। জেষ্ঠ রাজ্যবর্দ্ধন কনিষ্ঠ হর্ষ বর্দ্ধন, কন্যার নাম রাজ্যশ্রী। জেষ্ঠ কুমার রাজ্যবর্দ্ধন, বোন রাজ্যশ্রীকে বন্দী এবং ভগিনীপতি গ্রহ বর্মাকে হত্যা করার সংবাদ পেয়ে, ভীষণ ক্রোধান্বিত হয়ে মালবরাজকে আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু মালবরাজের মিত্র জনৈক গৌড়রাজ, কূটকৌশলে রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা করেছে।

যুদ্ধ নিয়ে দুজনের মধ্যে নানা সম্ভাবনা নানা কারণ বিচার বিশ্লেষণে দেখা গেল সম্পূর্ণ বিষয়টি এখনো অস্পষ্ট এবং ধোঁয়াটে। সাধারণ বিশ্লেষণে দেখা গেল, এই অঞ্চল অধিকারী রাজা জয়নাগ, জনৈক মালবরাজের মিত্র।

লোহিতাক্ষ যুদ্ধের পরিস্থিতি বিশ্লেষণে বলেন, ইদানীং নিহত জেষ্ঠকুমার রাজ্যবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধন আক্রমণ করার জন্য ভীষণভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। হর্ষবর্দ্ধনের যুদ্ধায়োজন প্রসঙ্গে এই অঞ্চলের আদি রাজা ভাস্করবর্মার প্রসঙ্গ আসে। লোহিতাক্ষ বলেন, তিনি অতি গোপনীয় সূত্র থেকে জানতে পেরেছেন ভাস্করবর্মা যুদ্ধের জন্য বিপুল আয়োজনে ব্যস্ত।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর বাণ তাদের আদ্যরাজা ভাস্করবর্মা প্রসঙ্গ বলেন, এই সুযোগ ভাস্কর বর্মন তার হারানো রাজ্য আবার হয়তো বা ফিরে পেতে পারেন। লোহিতাক্ষ এ প্রসঙ্গে বাণের জ্যেষ্ঠতাত হংসবেগ দেব সম্পর্কে একটি গোপনীয় সংবাদ প্রদান করেন। সংবাদ শুনে বাণ বিস্মিত হন। লোহিতাক্ষ বলেন, বর্তমানে হংসদেব ভাস্কর বর্মনের রাজ্য প্রাগজ্যোতিষপুরে আছেন। ভাস্করবর্মা জরুরি পরামর্শের জন্য তাঁকে অতিগোপনে ডাকিয়েছেন। বাণ ভালো করেই জানেন তার জ্যেষ্ঠতাত হংসদেব, ভাস্করবর্মাকে স্নেহ করেন। ভাস্করবর্মার পিতা সুস্থিতবর্মা হংস দেবের প্রিয় মিত্র ছিলেন।

আবার স্তব্ধতা। লোহিতাক্ষের কণ্ঠের চড়াসুরে স্তব্ধতা ভাঙে। তিনি খানিক দূরে ভক্ত গরুড়ের মতো বসে থাকা চণ্ডককে ডাকেন। চণ্ডক এসে দুবন্ধুকে পান সাজিয়ে দেয়। লোহিতাক্ষ মুখে পান পুড়ে সরসকণ্ঠে অন্য প্রসঙ্গে কথা শুরু করেন। ইতিমধ্যে বাণের নির্দেশে চণ্ডক যথাস্থানে চলে গেছে। লোহিতাক্ষ সরসকণ্ঠে বাণের বাল্যবন্ধু শশের গল্প আরম্ভ করেন। দিন কতক আগে প্রাগজ্যোতিষ পুরের সমুদ্রবন্দর তাম্রবিলে তার সাথে দেখা হয়েছিল। বর্তমানে শশ ঘোড়ার রপ্তানির ব্যবসা করে। ইতিমধ্যে বাণ তার বহু বাল্য বন্ধু-বান্ধবের সাথে মিলিত হয়েছেন অনেকের সাথে দেখা হয়নি তবে কে কোথায় আছে সে সব খবর পেয়েছেন কিন্তু শশ কোথায় আছে সে খবর কেউ দিতে পারেনি। লোহিতাক্ষের কাছে শশের সংবাদ পেয়ে বাণ উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞাসা করেন শশ ঘোড়া রপ্তানি করার মতো এত বড়ো ব্যবসায়ে কীভাবে হাত দিল? এই ব্যবসায়ে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন।

লোহিতাক্ষ বলেন, তিনি মূলধন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে ছিলেন। উত্তরে শশ বলেছে সে অসুরবিবর থেকে গুপ্তধন পেয়েছে। অসুরবিবর প্রসঙ্গে শশ বাণের প্রতি শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

বাণ জিজ্ঞাসা করেন, শশ কীভাবে শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল? লোহিতাক্ষ বলেন সে বলেছে বাণ তাকে শিখিয়েছে অসুরবিবরের চিহ্ন। যদি কোন গাছের কাণ্ড সোজা সরল না হয়ে আঁকাবাঁকা হয় তা হলে বুঝতে হবে এই গাছের গোড়ায় অসুর বিবর আছে। এই গাছের গোড়ার মাটি সরালে পাওয়া যাবে প্রাচীনকালে গোপনে রাখা অসুরদের সোনাদানা হীরা-মণি-পান্না। এমনি এক আঁকাবাঁকা গাছের গোড়ায় পেয়েছে গুপ্তধন।

বাণ শশ সম্পর্কে আর কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। কাদম্বরী দেবকুলিকার ধনকুবেরের মুখ মনে পড়ে। নৌকা করে ধনকুবেরের সব ধন চোর নিয়ে গিয়েছিল।

লোহিতাক্ষ বলেন, তিনি শশের মুখ থেকে এক নিদারুণ সংবাদ পেয়েছেন। শশ অবশ্য সেই সংবাদের গুরুত্ব জানে না এবং বুঝতে পারে না। সে লোহিতাক্ষকে তার অশ্বব্যবসার রমরমা অবস্থা প্রসঙ্গে বলেছে বর্তমানে তার ঘোড়াগুলির দারুণ চাহিদা । যে কোনও দামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। হিমালয় পর্বতের উত্তর দিক থেকে পাহাড়ি পথ ডিঙিয়ে চীনা বণিকরা নানাধরনের ঘোড়া নিয়ে আসে। শশের কর্মচারীগণ লোহিত্য নদীর উত্তরতীরে গিয়ে ঘোড়া খরিদ করে তাম্রবিল বন্দরে নিয়ে আসে। এখন আর তাম্রবিল থেকে জাহাজে করে ঘোড়া রপ্তানি করতে হয় না। এখন মস্ত এক বণিক ছোটো বড়ো নৌকায় ঘোড়াগুলি নিয়ে যায় কাটিগড়া বন্দরে।

লোহিতাক্ষ এবার খুব নিম্নস্বরে বাণকে বলেন, তিনি শশের মুখে কাটিগড়া বন্দরের নাম শুনে সাবধান হয়ে যান। এরপর এটা ওটা নানা কথার ফাঁকে জানতে পারেন, অস্বাভাবিক দাম দিয়ে ঘোড়াগুলি খরিদ করছে গুহনদীন। গুহনদীন ঘোড়াগুলি খরিদ করে অতিগোপনীয় ভাবে উপহার দিচ্ছে ভাস্করবর্মাকে।

নিশ্চুপ বাণ, লোহিতাক্ষের দিকে তাকিয়ে থাকেন। লোহিতাক্ষ বলেন ঘোড়া ক্রয়-বিক্রয় এবং উপহার, এই বিষটি অতিগোপনীয় এবং জটিল। গুহনদীন প্রকৃত পক্ষে রাজা জয়নাগের প্রশ্রয়প্রাপ্ত বণিক। এবার সে, অতি গোপনে ভাস্কর বর্মাকে তোয়াজ করছে। কারণ, সে হয়তো হিসাব নিকাশ করে দেখেছে এবারের যুদ্ধে ভাস্কর বর্মা জয়ী হতে পারেন। ভাস্করবর্মা জয়ী হলে তার ব্যবসা বাণিজ্যের পালে অনুকূল হাওয়া লাগবে। অন্যদিকে রাজা জয়নাগের অনুকম্পা তার ভাণ্ডারে জমা আছে।

বাণ সরাসরি প্রশ্ন করেন, এমনি পরিস্থিতিতে লোহিতাক্ষের নিজস্ব ধারণা এবং করণীয় কর্ম কী হতে পারে? লোহিতাক্ষ খানিকবাদে বলেন, শশের ঘোড়া বিক্রয় গুহনদীনের ক্রয়, আদ্যরাজাকে উপহার দেওয়া এই সমগ্র বিষয়টি তার ধারণা লাভজনক। গুহনদীনের এই উপহারে আদ্যরাজার লাভ হচ্ছে। বর্তমানে কামরূপের দরজায় যুদ্ধ এসে হাজির হয়েছে। ঘোড়া, যুদ্ধ বিগ্রহের মস্ত সম্পদ। সুতরাং সমগ্র বিষয়টি কামরূপের পক্ষে একান্ত শুভ এবং মঙ্গলজনক।

লোহিতাক্ষ, তিনি ইতিমধ্যে মস্ত একটি করণীয় কর্ম সমাধা করে ফেলেছেন। সেটি হচ্ছে

শশকে উপহার দেওয়া। প্রথমে তিনি সস্নেহে বলেছিলেন, শশ যেহেতু বাণের বন্ধু, তাই শশ তারও মিত্র। তিনি শশের গৌরবে গৌরবান্বিত। অল্প বয়সে এত বড়ো ব্যবসা করছে। এই বলে তিনি তাকে আস্ত একটি দিনার উপহার দিয়েছেন।

বাণ অবাক বিস্ময়ে বলেন সম্পূর্ণ একটি দিনার উপহার? বাণের বিস্মিত ভাব লক্ষ করে লোহিতাক্ষ বাণকে পণ্ডিতমশাই সম্বোধন করে বলেন উপহার দেওয়া বিষয়টি একান্ত কূটনৈতিক। আপাতত বাণের না বুঝলেও চলবে। লোহিতাক্ষের কথা এবং মুখভঙ্গির যুগল মিলন দেখে বাণ হাসতে থাকেন।

লোহিতাক্ষের পিতা শ্রীগোপাল এসব বিষয়বৃত্তান্ত কি জানেন? বাণের প্রশ্নের জবাবে লোহিতাক্ষ বলেন, পিতাকে সবকিছু জানিয়েছেন। তিনি খুশি হয়েছেন। খুশি হবার কারণ এই অঞ্চলের বংশানুক্রমিক অধিপতি হচ্ছেন বর্মন রাজবংশ। বর্মন রাজবংশ এই অঞ্চলের 'আদি' রাজবংশ । কথায় কথায় সন্ধ্যা ঘন হয়ে গেছে। শুক্লা ষষ্ঠীর চাঁদের আলো চরভূমির শুভ্র বালির উপর স্তব্ধ হয়ে আছে। বাণ, তন্ময় হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন। বাণের তন্ময়তা উপলব্ধি করে লোহিতাক্ষ নীরবে অপেক্ষা করেন। অনেকক্ষণ কোন কথা নেই। শেষপর্যন্ত নীরবতা ভঙ্গ করেন লোহিতাক্ষ। তিনি বলেন, তার ছিপ পালিতক ঘাটে অপেক্ষা করছে। আজ রাতের মধ্যেই তাকে গোপ্পলতে ফিরে যেতে হবে। এই সাথে বলেন, চারদিন পর তিনি, চন্দ্রপুর নগরে নারায়ণদেবের সাথে দেখা করতে যাবেন। চন্দ্রপুর নগরে যাত্রার কারণ তার নিজস্ব কিছু ব্যবসা বাণিজ্য।

চন্দ্রপুরনগরী নিয়ে দুজনের মধ্যে আলোপ আলোচনা হবার পর বাণ চন্দ্রপুরনগরীতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। লোহিতাক্ষ বলেন, ঠিক চারদিন পর শুক্লা দশমীর চাঁদ অস্ত যাওয়ার মুহূর্তে, বাণকে আজকের এই আড্ডা স্থানে পৌছাতে হবে। গঙ্গিনিকা নৌকা অপেক্ষা করবে। লোহিতাক্ষ চন্দ্রপুর নগরীতে যাত্রার গোপনীয়তার গুরুত্ব সম্পর্কে বাণকে আবার সাবধান করেন।

গাছ গাছালির মাঝ দিয়ে তিনজন নিশ্চুপভাবে প্রীতিকূটে ফিরে এলেন। সেখানে লোহিতাক্ষের ঘোড়া অপেক্ষা করছিল। লোহিতাক্ষকে নিয়ে ঘোড়া শুক্লাষষ্ঠীর স্তিমিত অস্তমান জ্যোৎস্নায় মিলিয়ে যায়।

* * *

বাণ শুক্লা দশমীর সন্ধ্যা থেকে চন্দ্রপুর নগরে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। চণ্ডককে নির্দেশ দিয়েছেন তারা মধ্যরাতে গঙ্গিনিকার ঘাটের দিকে যাত্রা করবেন।

শ্বেত ঈগলের ডাকে মধ্যরাত ঘোষিত হয়। খাসোক পুষ্করিণীর পাশ দিয়ে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে যেতে হবে শুনে চণ্ডক ভীষণ ভয় পায়। চণ্ডকের ধারণা এই জঙ্গলি পথে যত রাজ্যের ভূত প্রেত দৈত্যদানবের স্থায়ী ঘরবাড়ী। শুক্লা দশমীর চাঁদের আলো তখনো উজ্জ্বল। খুব সাবধানে নীরবে দুজন জংলিপথ ধরে উত্তর দিকে এগিয়ে চলেন। বাণের সম্মুখে চণ্ডক। বাণ লক্ষ করেন, চণ্ডক তার কোমরে গোঁজা থলে থেকে কী সব বের করে সামনে ছিটিয়ে ছিটিয়ে চলছে।

বাণ প্রশ্ন করলে বলে সে ভূত খেদানোর অস্ত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। এই প্রসঙ্গে এক কাহিনি

বলে। তার ছোটোবাবা বলেছেন, এই অস্ত্র বহুদিন আগে ছোটো বাবার ঠাকুদার ঠাকুদা পেয়েছিলেন এক যবন নাবিকের কাছ থেকে। ঠাকুদার ঠাকুদা যবন নাবিকের সাথে কাজ করতেন ইন্দ্রঘর বন্দরে। যবন নাবিক রাত বিরেত যেখানে সেখানে মদ খেতে এই সাথে নানা রকমের মেয়ে মানুষের কাছে যেত। মানত না শ্মশান মশান। রাতের বেলায় পথে চলার কালে তার হাতে থাকত আড়াআড়ি ছোটো ছোটো দুটি কাঠের টুকরা। যবন, মাঝখানে পেরেক আঁটা কাঠের টুকরা দুটিকে বলত "করসো"। ভূতপ্রেত দত্যি দানাবরা করসোকে ভীষণ ভয় করে।

বাণকে নীরব শ্রোতা পেয়ে চণ্ডকের দারুণ উৎসাহ। তার ছোটোবাবার বলা করসো কাহিনি বলতে শুরু করল। ছোটো বাবার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার মনিব যবন বণিক বলেছিল, অনেক অনেক দিন আগে তাদের ঠাকুর বিশুকে কিছু পাজি নচ্ছার শয়তান এমনি এক মস্ত কাঠের করসোতে হাতে পায়ে পেরেক গেঁথে টাঙিয়ে রেখে মেরে ফেলেছিল। বিশু ঠাকুর মরে যাবার পর করসোতে ভর করে থাকলেন। তখন থেকে ভূত প্রেতরা করসো দেখলেই ভীষণ ভয় পায়। ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়।

চণ্ডকের বলা করসো কাহিনি শেষ হয়ে গেছে মনে করে বাণ কিছু বলতে গেলেন। বলা হল না কারণ চণ্ডকের কাহিনি তখনো শেষ হয়নি। চণ্ডক বলে, এক শীতের রাতে যবন বণিক তার পোষা মেয়ে মানুষের ঘর থেকে ভীষণ নেশা করে ফিরছে। যেই না শ্মশানের কাছে এল তখন করসোর কথা মনে পড়ল। করসো মেয়েমানুষের ঘরে ফেলে এসেছে। শ্মশানের কাছাকাছি পথের দুধারে সরষের ক্ষেত। খেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। নেশা টেশা ছুটে গেছে। হঠাৎ তার মনে পড়ল সরষে ফুলের চারটি পাপড়ি ঠিক যেন করসো। ফুলসুদ্ধ সরষের ডাল একটা হাতে নিয়ে বিশু ঠাকুরের নাম জপে জপে শ্মশান পার হয়ে গেল। ভূতপ্রেতরা কিছু করতে পারল না। ভূত, প্রেত-দত্যি দানব এই সরষের ফুল দেখে পালিয়ে গেল।

চণ্ডক তার কথা চালিয়ে যায়। বলে সরষে ফুল তো সব সময় গাছে ফুটে থাকে না। এরপর থেকে সরষের গুটি হয়ে উঠল ভূত তাড়ানোর করসো। যবনরা সরষেকে বলত করসো।

বাণ আপনমনে চণ্ডকের বলা সরষে এবং করসো শব্দের সম্পর্ক নিয়ে ভাবতে থাকেন। বাণের মনে পড়ে অনেক দিন আগে চন্দ্রপুর আশ্রমের অন্ধমুনি অগস্তি বলেছিলেন, ভারতীয় ভাষা এবং গ্রীকদের ভাষায় 'ক' এবং 'স' ধ্বনি নিয়ে নিদারুণ ঠেলাঠেলি। একই শব্দ কখনো বা যবনরা "ক' ধ্বনিতে উচ্চারণ করে আবার সেই শব্দটি ভারতীয়রা 'স' ধ্বনিতে উচ্চারণ করে। বাণ গভীরভাবে চণ্ডকের বলা সরষে এবং করসো শব্দ দুটি নিয়ে ভাবতে থাকেন। ভূত প্রেত তাড়ানোর জন্য বিশেষ করে সাদা সরিষার ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ।

ভূত প্রেত দৈত্যদানো, করসো এবং সরষের গল্পের মাঝ দিয়ে সহজেই চরে এসে পৌছালেন। শুক্লা দশমীর চাঁদ তখন ডুবু ডুবু করছে। সাদা বালুর উপর অস্তমান চাঁদের আলোয় স্তব্ধ বিস্ময় অনুভব করে করে বাণ হঠাৎ দেখেন সাদা বালির উপর জমাট অন্ধকারের কয়েকটি খণ্ড সর্পিল গতিতে গঙ্গিনিকার জলরাশির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাণকে হঠাৎ থমকে যেতে দেখে চণ্ডক বলে এগুলি ভূত নয়। কুমির । রাত্রি বেলা কুমির জল থেকে চরে উঠে খেলা করে। চণ্ডক একটি সর্পিল

গতির চলমান অন্ধকারের দিকে ছুটে গিয়ে তার শিকলে আঁটা লাঠির একটি খণ্ড দিয়ে কুমিরের লেজে আঘাত করে। প্রাণপনে ছুটে জলে লাফিয়ে পড়ে কুমির।

* * *

চরের কাছাকাছি গঙ্গিনিকার জলে বাঁধা একটি ছোটো নৌকা অদূরে বাঁশের লগি পুঁতে আটকানো মস্ত নৌকা। বাণ এই যাত্রার ভীষণ গোপনীয়তা চণ্ডককে বুঝিয়ে বলেন চণ্ডক প্রতিজ্ঞা করে এই কথা কাকপক্ষীও টের পাবে না। চণ্ডককে চরে রেখে বাণ ছোটো নৌকায় উঠে বড়ো নৌকায় পৌছান। বড়ো নৌকায় পৌছে দেখেন লোহিতাক্ষ নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। বাণ লোহিতাক্ষের লেপের তলায় ঢুকে ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকালবেলা দাঁড় ঠেলার শব্দে ঘুম থেকে জেগে উঠেন বাণ। জনাকয়েক মাল্লা দাঁড় ঠেলে ঠেলে এগিয়ে নিচ্ছে নৌকা। নৌকা গঙ্গিনিকার সীমা পার হয়ে উঠেছে বরাকে। বরাক লোহিত্য আরো সব বহু নদী এসে নেমেছে গঙ্গিনিকায়। গঙ্গিনিকা সমুদ্রের মত সুবিশাল। গঙ্গিনিকায় স্রোতের তীব্রতা নেই। গঙ্গিনিকা হেলেদুলে ধীর গতিতে এগিয়ে গেছে দক্ষিণ দিকে। দক্ষিণ সমুদ্রের ধারে কাছে গিয়ে এই গঙ্গিনিকা কখনো বা নাম নিয়েছে গঙ্গাসাগর আবার কখনো বা পশ্চিমসাগর।

বরাকের মাঝ দিয়ে নৌকা পুব দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পূর্ব আকাশে সবে মাত্র লাল সূর্য উদিত হয়েছে। বাণ মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রকৃতির লীলা অনুভব করেন। বরাকের জলে উদিত সূর্যের খেলা, নদীর দুই তীরের সবুজ গাছ গাছালির উপর নানা রঙের বিচিত্র লীলা । বাণ, প্রকৃতির অপরূপ রূপ প্রত্যক্ষ করে করে আপন মনে কালিদাসের কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেন। বাণের ভাবনা ছিন্ন হল লোহিতাক্ষের কথায়। লোহিতাক্ষ ঘুম থেকে উঠে বাণের পাশে এসে বসেন।

দিনের প্রথম প্রহরের শেষ দিকে নৌকা বরাকের দক্ষিণ তীরে নোঙর করে। বাণকে নিয়ে লোহিতাক্ষ তীরে নেমে দক্ষিণ দিকে কিছুক্ষণ এগিয়ে ছোটো একটি গঞ্জে পৌছালেন। গঞ্জ থেকে এক ঘোড়ায় টানা গাড়ি ভাড়া করে আরো দক্ষিণে এগিয়ে চলেন।

কিছু পথ পার হয়ে গাড়ি বড়ো সড়কে ওঠে। এই সড়কপথ সুদূর দক্ষিণের পার্বত্য ভূমি থেকে নেমে এসেছে। দীর্ঘ পার্বত্য অঞ্চলের মাঝ দিয়ে এই সড়ক, চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রম অঞ্চল অতিক্রম করে পৌছেছে চন্দ্রপুরনগরীতে। চন্দ্রপুরনগরী থেকে উত্তর বিদ্যাশ্রম অঞ্চল দিকে কিছু এগিয়ে অলকপুরী থেকে নেমে আসা সড়কের সাথে মিলিত হয়েছে। সম্মিলিত সড়ক পথ পূর্বদিকে বাঁক নিয়ে বন্দরপুরের বরাক নদীর তীরে এসে হয়েছে সমাপ্ত। এটি প্রাচীন বাণিজ্যপথ। এই পথ দিয়ে বণিকগণ মালপত্র নিয়ে বন্দরপুর থেকে নৌকা করে বরাক অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক নৌবন্দর কাটিগড়ায় পৌছায়।

লোহিতাক্ষ এবং বাণকে নিয়ে গাড়ি যখন চন্দ্রপুর নগরীতে পৌছাল তখন বিকাল হয়ে গেছে। প্রাসাদরক্ষীদের নানা জিজ্ঞাসা বাদ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দুজন পৌছালেন নারায়ণ দেবের মন্ত্রণাকক্ষে। প্রবেশ করে চমকে গেলেন লোহিতাক্ষ। সেখানে নারায়ণদেবের পাশে বসে আছেন গুহনদীন এবং করালী।

নারায়ণদেব স্বাগত করলেন লোহিতাক্ষ এবং বাণকে। দুজনকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন গুহনদীন। তিনি লোহিতাক্ষের প্রতি একটা শুষ্ক নমস্কার জানিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। গুহনদীন বাণকে গ্রাহ্য করলেন না। বাণ যেন তার চোখে অদৃশ্য। গুহনদীনকে অনুসরণ করে করালী প্রস্থান করলেন।

বাণ লক্ষ করলেন, লোহিতাক্ষ এবং নারায়ণ দেবের মধ্যে সংলাপ অস্বাভাবিক সংক্ষিপ্ত। বাণের মনে হল, বিশেষ কোন বক্তব্যাদি সম্পর্কে দুজনের কথাবার্তা ইতিপূর্বে সমাপ্ত হয়ে গেছে। এখন শেষ পরিণতির পালা সম্পন্ন হচ্ছে।

লোহিতাক্ষ, নারায়ণ দেবকে জানালেন পরিকল্পনা মতো জিনিসপত্র আনা হয়ে গেছে। বন্দরপুর দুর্গের সামনে শেষ রাতে চন্দ্র অস্ত যাবার মুহূর্তে নৌকা পৌছাবে। শেষ রাতের অন্ধকারে মালপত্র দুর্গের ভিতর গোপনে পাচার করা যাবে।

লোহিতাক্ষের কথা শেষ হওয়া মাত্র নারায়ণ দেব একজন পার্শ্বচরের কানে ফিস ফিস করে কিছু নির্দেশ দিলেন। পার্শ্বচর কর্মচারীর অশ্ব তীব্র বেগে বন্দরপুরের দিকে এগিয়ে গেল।

নারায়ণ দেবের জনৈক বিশিষ্ট কর্মচারী বাণ এবং লোহিতাক্ষকে রাজকীয় অতিথি শালায় পৌছিয়ে দিল। দুজন প্রথমেই স্নান করলেন। স্নান শেষ করে এসে দেখেন অতিথিশালার কর্মচারীগণ রুপার পাত্রে ভোজন সামগ্রী সাজিয়ে রেখেছে। খাদ্যদ্রব্য দেখামাত্র বাণের মনে পড়ে সারাদিন তারা কিছু খাননি। দুবন্ধু নিশ্চুপ অবস্থায় ভোজনপর্ব সমাপ্ত করেন।

ভোজনের পর সামান্য বিশ্রাম। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাণ লক্ষ করেন লোহিতাক্ষ হঠাৎ করে উঠে গিয়ে নিঃশব্দে অতিথিশালার কক্ষের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। এরপর অতি দ্রুততার দেহের স্বাভাবিক পোশাক পরিচ্ছদ খুলে নিয়েছেন। স্বাভাবিক পোশাকাদির তলায় ছিল অন্য আর এক প্রস্থ পোশাক। এই ধরনের পোশ.. দি এই অঞ্চলের সাধারণ ব্যবসায়ীগণ পরিধান করে। লোহিতাক্ষ তার সঙ্গে রাখা ছোট পুটুলি থেকে দুশখণ্ড সাদা রঙের কার্পাস বস্ত্র বের করেন। একটি খণ্ড দিয়ে অতিদ্রুত পাগড়ি তৈরি করে মাথায় পরিধান করেন। অন্য বস্ত্রখণ্ড বাণের দিকে এগিয়ে দিয়ে বাণকে পাগড়ি নির্মাণ করতে বলেন। বাণ, লোহিতাক্ষের চোখের কঠিন দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে কোন প্রশ্ন না করে, পাগড়ি নির্মাণ করে মাথায় দিলেন। লোহিতাক্ষ বাণকে নিয়ে চুপি চুপি অতিথিশালার পিছন দিকের দরজা দিয়ে রাজপথে পা দেন। রাজপথে উঠে বাণকে বলেন, এমনি ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ এবং পিছন দিকের দরজা দিয়ে বের হবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, নারায়ণ দেবের গুপ্তচরদের চোখে ধুলা দিয়ে চন্দ্রপুরনগরী দেখা।

দুজন রাজপথে ধরে এগিয়ে চলেন। নগরীর ঘরবাড়ি রাজপথ, শুক্লা একাদশীর উজ্জ্বল চাঁদের আলোকে ঝলমল করছে। জ্যোৎস্না, পথের দুধারের দীপস্তম্ভগুলিতে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা এবং পথেব দুদিকের বিপণি গৃহগুলি থেকে বিচ্ছুরিত আলো চন্দ্রপুর নগরীকে মোহিনী বেশে সাজিয়ে রেখেছে। রাজপথে নারীপুরুষের ভীড়। মাঝমাঝে রাজপথেব উপর দিয়ে দ্রুতগতিতে চলে যাচ্ছে দুএকটা অশ্বশকট। পথের পাশের দোকান গুলিতে নানা ধরনের জিনিসপত্র সাজানো। বাণ লক্ষ করেন অধিকাংশ দোকানী গন্ধর্ব অথবা মিশরীয়।

রাজপথ দিয়ে লোহিতাক্ষের পিছনে পিছনে বাণ এগিয়ে চলেন। দুজনের মুখে কথাবার্তা নেই। লোহিতাক্ষ উজ্জ্বল রাজপথ ধরে এগিয়ে এসে একটি বাজারে পৌঁছালেন। বাজারে উজ্জ্বল আলোর সমারোহ নেই। ছোটো বড়ো অজস্র দোকানপাট। সাধারণ মানুষের ভিড়। লোহিতাক্ষ খুঁজে খুঁজে একটি দোকানে এলেন। দোকানে লোহায় নির্মিত নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র সাজানো। নানা জিনিসপত্র পরীক্ষা করে, লোহিতাক্ষ কাঠ চেরার ছোটো বড়ো করাত দেখতে থাকেন। একটি করাত হাতে নিয়ে দোকানি বলেন, তিনি কোন দোকানে এত ভালো করাত দেখেননি।

লোহিতাক্ষের কথা শুনে বাণ করাতটি হাতে নিয়ে দেখেন করাতের গায়ে 'শ্রী' চিহ্ন খোদাই করা। বাণ জানেন, লোহিতাক্ষের ধাতুর কারখানায় উৎপন্ন জিনিসপত্রে এমনি 'শ্রী' চিহ্ন থাকে। বাণ অনুভব করেন, লোহিতাক্ষ মস্ত কিছু একটা করতে চলছেন।

লোহিতাক্ষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে খরিদ করার আগেই করাতের বিশেষ প্রশংসা করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই দোকানি আকাশ ফাটা দাম হাঁকল। লোহিতাক্ষ গো-বেচারা হয়ে বললেন, ভালো জিনিসপত্রের দাম একটু বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। তবে তার আকাঙ্ক্ষা বেশকিছু করাত সংগ্রহ করা।

যদি দাম সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করা হয় তাহলে ভালো হয়। লোহিতাক্ষের প্রার্থনা দোকানির কানে পৌঁছাল না। দোকানি কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত যক্ষমূর্তির মত তার ভুঁড়িতে হাত দুটি রেখে স্থির হয়ে রইল।

লোহিতাক্ষ অতি উত্তম করাতের জন্য দোকানিকে অজস্র প্রশংসা করে অস্বাভাবিক মূল্যে করাত খরিদ করলেন। দোকানি রুপার টাকার দাম পেয়ে তার দোকানের সবকটি করাত বেঁধে দিল। লোহিতাক্ষ বেঁধে রাখা করাতগুলির উপর তার ডান হাতে রেখে আবার গোবেচারা মুখে দোকানিকে জিজ্ঞাসা কর. ন, কাছাকাছি অন্যকোন দোকানে-আরো কিছু করাত পাওয়া যা.ে কিনা। দোকানি বলে, ভাল জিনসপত্র তার দোকান ভিন্ন অন্য কোথা ও পাওয়া যাবে না। তবে সে দিন দুইচার পর আরো করাত দিতে পারবে। ইতিমধ্যে লোহিতাক্ষ সলজ্জভাব দেখিয়ে বলেন, তিনি করাতের ব্যবসা করতে চান।

লোহিতাক্ষ বিস্তারিত ভাবে তার পরিকল্পনার কথা বলেন। দোকানির মুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠে। দোকানি ভেবে নিল সে কেউকেটা হয়ে গেছে। কিছুদিনের মধ্যেই তার করাত নিয়ে করণ্ডীপোত সিংহলে যাবে।

লোহিতাক্ষ ইতিমধ্যে দোকানের সর্বমোট বাইশটি করাত খরিদ করেছেন। দোকানির সাথে আলাপ আলোচনা করে আরো ষাট করাতের অগ্রিম নগদ অর্থ দোকানির হাতে দিলেন লোহিতাক্ষ জানালেন, তিনি নূতন পুরাতন এমনকী ভেঙে যাওয়া করাত খরিদ করবেন।

লোহিতাক্ষের কথা শুনে কৃষ্ণপ্রস্তরের যক্ষমূর্তি আবার তার ভুঁড়িতে হাত রেখে কিছু চিন্তাভাবনা করে বললো, বর্দ্ধকীদের হাতে যে সব করাত আছে, সেগুলি ব্যবহৃত হয়ে হয়ে — উচ্চশ্রেণীর করাত হয়ে উঠেছে। তবে সেগুলির মূল্য আরো কিছু বেশি পড়বে। দোকানি হিসাব নিকাশ করে বর্দ্ধকী অর্থাৎ ছুতারদের ব্যবহার করা করাতের দাম, নূতন করাতের তুলনায় দেড়গুণ

বেশি বলে হাঁকল। লোহিতাক্ষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশসহ রাজি হলেন।

লোহিতাক্ষ একান্ত বিনীতভাবে দোকানিকে বলেন, এই ব্যবসা অতি গোপনীয়, কাউকে বলা উচিত হবে না। দোকানি তার তাম্বুলচর্চিত ঘন খয়েরি জিব বের করে এবং দুহাতে তার কান দুটি ধরে বলে একথা কাকপক্ষীটিও টের পাবে না।

পরবর্তী বিষয় করাতগুলি কীভাবে পৌঁছানো হবে? আলোচনার স্থির হয় সাতদিন পর লোহিতাক্ষের নৌকা এসে করাত গুলি নিয়ে যাবে এবং দেনাপাওনা হিসাব নিকাশ করে নগদা-নগদ কারবার করা হবে।

লোহিতাক্ষ বলেন, সাতদিন পর, তার নৌকা কামলঙ্কা নৌঘাটে এসে ভিড়বে। কামলঙ্কা নৌঘাট চন্দ্রপুর নগরীর পশ্চিমে, পূর্ব-সাগর অর্থাৎ শোন বিলের পূর্বতীরে অবস্থিত। নগদ মূল্যে খরিদ করা করাতগুলি দোকানিকে সমঝিয়ে লোহিতাক্ষ বলেন, এসব করাত সাতদিন পর একসাথে পাঠালেই চলবে। লোহিতাক্ষ তার নৌকা কামলঙ্কা নৌঘাটে কোন্ দিকে থাকবে এবং নৌকার রং ও আকৃতির কথা দোকানিকে ভালো করে বুঝিয়ে বলেন। লোহিতাক্ষ দোকান থেকে উঠে যাবার মুহূর্তে দোকানিকে বলেন, দোকানি যত করাত সংগ্রহ করবে, তার সব কটা নগদ এবং উচিত মূল্যে তিনি ক্রয় করবেন।

বাণ দীর্ঘসময় ধরে কোনও কথা বলার সাহস করেননি। রাস্তায় নেমেই তিনি লোহিতাক্ষকে করাতের কথা জিজ্ঞাসা করেন। লোহিতাক্ষ পথে চলতে চলতে বাণের কানে কানে বলেন যুদ্ধ অনিবার্য। যুদ্ধে রাজা জয়নাগের অজস্র নৌকার প্রয়োজন। করাত ছাড়া কাঠ চেরা যায় না। কাঠ না চিরে নৌকা বানানো যায় না।

বাণের জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বলেন, এই অঞ্চলে একমাত্র তার নিজস্ব লোহার পোতা কারখানায় করাত তৈরি হয়। কারখ...া থেকে এখন বাজারে করাত ছাড়া হবে না। এই সাথে অন্যান্য স্থানের করাতগুলি এমনিভাবে সংগ্রহ করা হবে।

লোহিতাক্ষ, করাত শেষ করে অন্য প্রসঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করেন। সে কথা আরো গোপনীয়। তিনি বাণকে বলেন, তারা যে নৌকা করে এসেছেন সেই নৌকায় ছিল অজস্র অস্ত্র। অস্ত্রগুলি হচ্ছে নানা ধরনের ভল্ল তলোয়ার ছুরিকা ইত্যাদি। অস্ত্রগুলি রাজা জয়নাগের প্রতিনিধি নারায়ণদেবের কাছে বহুমূল্যে বিক্রি করা হয়েছে। আজ শেষরাতে এগুলি নৌকা থেকে বন্দরপুর দুর্গে ঢুকবে।

নারায়ণদেবের অস্ত্রের ভাণ্ডারে এমনিভাবে অস্ত্র পাচারের কথা শুনে বাণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে পড়েন। তিনি তার আবাল্য বন্ধু লোহিতাক্ষকে চিনতে পারেন না। যে ব্যক্তি জয়নাগের পরাজয়ের জন্য এই মাত্র অজস্র অর্থব্যয় করে করাত খরিদ করেছে, সেই ব্যক্তি আবার জয়নাগকে যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য অস্ত্র দিচ্ছে। বাণের কাছে লোহিতাক্ষের চরিত্র এক প্রহেলিকাময় চরিত্র।

বাণ, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে লোহিতাক্ষকে তার মূল উদ্দেশ্যের কথা জিজ্ঞাসা করেন। বাণের কণ্ঠে ক্ষোভের উত্তাপ। লোহিতাক্ষ অনাবিল আনন্দের হাসি হেসে বাণকে জড়িয়ে ধরেন। বলেন, বাণের কণ্ঠের ক্ষোভ তার খুব ভালো লাগছে।

কথা বলে বলে তারা রাজ অতিথিশালার পিছন দিকে দরজার সম্মুখে এসে গেছেন। লোহিতাক্ষ বলেন সব কথা অতিথিশালায় বলবেন।

বাণ এবং লোহিতাক্ষ অতিথি শালার পিছন দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তাদের নির্দ্ধারিত কক্ষে প্রবেশ করলেন। বাণ পাগড়ি খুলে বেতের কেদারায় বসলেন। লোহিতাক্ষ তার পোশাক পরিধান করলেন।

রাতের খাবার দাবার শেষ হলে লোহিতাক্ষ বাণের বিছানায় এসে বাণের কানে কানে কথা শুরু করলেন। তিনি বলেন, নৌকা বোঝাই যে সব অস্ত্রশস্ত্র তিনি নারায়ণদেবের কাছে বিক্রি করেছেন, সেগুলি নারায়ণদেব স্বয়ং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ক্রয় করেছেন। এসব অস্ত্রের মূল্য আগাম দিয়েছেন। লোহিতাক্ষ প্রসঙ্গত বলেন, দিন কতক আগে তিনি নারায়ণ দেবের নিকট থেকে অগ্রিম অর্থ সংগ্রহ করে ফেরার পথে প্রীতিকূটে গিয়ে বানের সাথে দেখা করেছিলেন।

লোহিতাক্ষ বলেন, নারায়ণদেবের কাছে বিক্রি করা এ সব অস্ত্র শস্ত্রের একটি দীর্ঘ কাহিনি আছে। লোহিতাক্ষ তার বিদেশ বাণিজ্য প্রসঙ্গে বলেন, আরব দেশে গিয়ে তার আশাতীত লাভ হয়েছিল। তিনি লক্ষ করেছিলেন আরব দেশে ইস্পাত নির্মিত যুদ্ধাস্ত্রের দারুণ চাহিদা। আরব বণিকদের সাথে কথাবার্তা বলে, তাদের চাহিদা অনুসারে প্রচুর অস্ত্র শস্ত্র লোহার পোতা কারখানায় নির্মাণ করা হয়। তিনি লোহারগণকে নির্দেশ দেন, উচ্চশ্রেণীর ইস্পাত দিয়ে এসব অস্ত্র তৈরি করতে হবে। পরবর্তী যাত্রায় এ সকল ইস্পাতের অস্ত্রাদি নিয়ে করণ্ডীপোত আরবদেশে পৌছায়। আরবীয় বণিকগণ অস্ত্র শস্ত্র দেখে দারুণ খুশি। অস্ত্রগুলি হালকা এই সাথে সুতীক্ষ্ণ।

তলোয়ারের এক কোপে উটের গলা ছিন্ন হয়ে যায়। গোল বাঁধালো মরুভূমির এক ডাকাতের দল। ডাকাতরা তাদের পুরোনো হাতিয়ারের সাথে লড়াই করে নতুন অস্ত্র পরীক্ষা করবে। পরীক্ষা দেখা গেল পুরোনো অস্ত্রের আঘাতে এই ইস্পাতের অস্ত্র ভেঙে পড়ছে। বাণিজ্য মা... খেল। অস্ত্র বোঝাই করণ্ডীপোত ফিরে এল।

ফিরে এসে পুরোনো অভিজ্ঞ লোহারদের সাথে আলাপ আলোচনায় জানা গেল এই বাণিজ্যের সবগুলি অস্ত্র অস্বাভাবিক উত্তাপে অপ্রয়োজনীয় ভাবে একাধিকবার পুড়িয়ে ইস্পাতে পরিণত করা হয়েছে। উচ্চশ্রেণীর ইস্পাত সাধারণ লোহার তুলনায় সহজ ভঙ্গুর। অভিজ্ঞ লোহারদের অভিমত, অস্ত্রের সমগ্র অংশকে এমন ধরনের ইস্পাতে পরিণত করার প্রয়োজন ছিল না। শুধুমাত্র অস্ত্রের অতিপ্রয়োজনীয় ধার অথবা তীক্ষ্ণ অংশকে ইস্পাতে পরিণত করা উচিত ছিল।

বাণ জিজ্ঞাসা করেন, নারায়ণদেব কীভাবে করলেন পরীক্ষা। লোহিতাক্ষ হেসে হেসে বলেন, তিনি নারায়ণদেবকে বলেছিলেন কলাগাছ কেটে ধার পরীক্ষা করতে। নারায়ণদেব এক কোপে বাণ বলেন, এ সব অস্ত্র-শস্ত্র যুদ্ধের ভয়ঙ্করকালে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। লোহিতাক্ষ বলেন— নারায়ণ দেবের যুদ্ধাস্ত্রের দুর্বলতা আদ্য রাজাকে জানাতে হবে। মস্ত দুটি কলাগাছ কেটে দারুণ খুশি। তখনই আগাম অর্থ দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র খরিদ করেছিলেন।

* * *

হেমন্তের মৌমাছির গুঞ্জন পদ্মের গন্ধ ছাপিয়ে বাতাসে ভেসে উঠেছিল যুদ্ধের দামামা

রক্তের গন্ধ। ফাল্গুনে, বাসন্তী কোকিল কুহু - কুহু ডাকল না, আম্রমঞ্জরী গন্ধ ছড়াল না, মধুগুঞ্জনে মৌমাছি ফুলের বুকে চুম্বন করল না। বাণের ভালোবাসার স্বপ্নিল মাতৃভূমির উপর যুদ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

স্থান্বীশ্বরের দ্বিতীয় রাজকুমার হর্ষবর্দ্ধন দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসছেন। পিতা মাতা ভ্রাতার মৃত্যুর পর কিশোর হর্ষবর্দ্ধন ভীষণ ক্রোধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন উত্তর তথা পূর্বভারতের উপর। রাজদূত দেশে দেশে পৌঁছিয়ে দিয়েছে হর্ষবর্দ্ধনের প্রলয়ংকরী ঘোষণাপত্র।

'হে রাজন্য বর্গ ! আমি ভীষণ খড়্গসহ আসছি। হয় নত করুন আপনার শির অথবা গ্রহণ করুন অস্ত্র। হে নৃপতিগণ! হয় আমার চরণ নখদর্পণে প্রত্যক্ষ করুন আপনার রূপ। অথবা, আপনার শাণিত কৃপান দর্পণে প্রত্যক্ষ করুন আপনার বিখণ্ডিত মুণ্ডা।'

প্রথমে হর্ষবর্দ্ধনের শাণিত কৃপান আঘাত হানে রাজা দেবগুপ্তের মালবরাজ্যে। মালব রাজ্যের পূর্বাংশ জয় করে মগধ রাজ্যের দক্ষিণাংশে তার স্কন্ধাবার স্থাপন করেন। বিজিত মালব রাজ্যের পূর্বাংশের গায়ে গায়ে লেগে আছে গৌড়রাজ্য। লোকমুখে প্রচারিত হয়েছে গৌড় রাজ, হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনকে কূটকৌশলে হত্যা করেছেন।

মালবরাজ্য নানা খণ্ডে সুবিশাল অঞ্চলব্যাপী বিস্তারিত। বেশ কবছর আগে মালব রাজ মহাসেনগুপ্ত পূর্বদিকে এগিয়ে এসে কামরূপের রাজা সুস্থিতবর্মনকে লোহিত্য নদীর তীরে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। সুস্থিতবর্মন ছিলেন ভাস্করবর্মনের পিতা।

ইতিপূর্বে মালব রাজ দেবগুপ্ত কান্যকুব্জ দখল করে রাজা গ্রহবর্মাকে হত্যা করে গ্রহবর্মার স্ত্রী রাজ্যশ্রীকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন কান্যকুব্জ জয় করলেন কিন্তু রাজ্যশ্রীকে কারাগার থেকে পালাতে সাহায্য করেছেন জনৈক কুলপুত্র। কারাগারে পাওয়া গেল না । গুপ্তচর প্রধান সংবাদ দিল রাজ্যশ্রী -..সৈনীদেরে নিয়ে কারাগার থেকে পালিয়ে গেছেন —গুপ্তচর প্রধা.., কুলপুত্রের সম্পূর্ণ নাম সংগ্রহ করতে পারেননি। শুধু জানতে পেরেছন সেই ভালো মানুষ কুল পুত্রের উপাধি 'গুপ্ত'। কুলপুত্র গুপ্ত, রাজ্যশ্রীকে মুক্ত করে অতিগোপনে মস্ত এক ছৈ দেওয়া বাণিজ্য নৌকায় তুলে দিয়েছেন। নৌকা গঙ্গার স্রোত বেয়ে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেছে।

এমন সংবাদে হর্ষবর্দ্ধন যেন দিশাহারা হয়ে গেলেন। খানিক বাদে জনৈক ব্যক্তি গুপ্তচর প্রধানের কানে কানে কিছু বলে। গুপ্তচরপ্রধান বিনীতভাবে হর্ষবর্দ্ধনকে নিবেদন করেন সেই কথা। রাজ্যশ্রী দক্ষিণ সমুদ্র উপকূলে যেতে পারেন। হর্ষদেব সংবাদের উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। গুপ্তচর প্রধান বলেন, গ্রহবর্মার পিতার স্নেহধন্যা এক তরুণী রাজনটী কথা প্রসঙ্গে বলেছিল, রাজ্যশ্রী তাকে বলেছিলেন দক্ষিণ সমুদ্র উপকূলে সুন্দর একটি বৌদ্ধ আশ্রম আছে। এই আশ্রমটি নির্মাণ করেছেন গ্রহবর্মার জনৈক প্রিয় বান্ধব। রাজ্যশ্রী, তার প্রিয় বান্ধবী রাজনটীকে স্বামীর প্রিয় বন্ধু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছিলেন।

রাজ্যশ্রীর প্রিয় বান্ধবী রাজনটীর কথা শুনে হর্ষের চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হর্ষবর্দ্ধন গুপ্তচর প্রধানকে নির্দেশ প্রদান করেন যে কোনভাবে এই রাজনটীকে তার সম্মুখে উপস্থিত করতে হবে।

কিছু দিনের মধ্যেই গঙ্গার প্রবাহ ধরে হর্ষবর্দ্ধনের বিপুল বাহিনী দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলে।

* * *

পূর্ব ভারতে হর্ষবর্দ্ধনের এই ভীষণ আক্রমণের সুযোগ নিলেন ভাস্কর বর্মন। ছিনিয়ে নেওয়া তার ভালোবাসার কামরূপকে ফিরে পাবার এক মস্ত সুযোগ। ভাস্কর বর্মন এই কঠিন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ রাজদূত রূপে নির্বাচন করলেন হংসবেগ দেবকে। হংসবেগদেব মহাপণ্ডিত সর্বজনশ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় পিতৃদেব সুস্থিত বর্মনাদেবের প্রিয় বান্ধব। হংসবেগদেবের ভ্রাতৃষ্পুত্র বাণভট্টদেব কামরূপের বিশিষ্ট জ্ঞানীপণ্ডিত।

হংসবেগদেব প্রথমে তিথি নক্ষত্র বিচার, হর্ষবর্দ্ধনের যাত্রাপথের ভৌগোলিক পরিবেশ বিশ্লেষণ এবং গুপ্তচর মাধ্যমে সংবাদ সংগ্রহ করেন। উদ্দেশ্য হর্ষবর্দ্ধনের যাত্রাপথের সঠিক স্থান সময় নির্দ্ধারণ করা। হর্ষবর্দ্ধনের আক্রমণ পথ এবং সময় কাল পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে একদিন প্রাগজ্যোতিষ পুরের অসামান্য রাজদূত যাত্রা করলেন। অজস্র নৌকা নদীর উজান ঠেলে পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলে। মহারাজ হর্ষদেবকে প্রদেয় ভাস্কর বর্মনের ঐতিহাসিক উপহার সম্ভারে নৌকাগুলি পরিপূর্ণ।

হংসদেবের সঠিক হিসাব মত দুদিন পর তিনি মিলিত হলেন হর্ষদেবের সাথে। হর্ষদেব, তার যাত্রাপথে সাময়িক বিশ্রামের জন্য স্থাপন করেছেন স্কন্ধাবার।

সাধারণত রাজকীয় উপহারে বহু সামগ্রীর সাথে থাকে একাধিক সুন্দরী নারী। সুন্দরী নারী উপহার প্রদান, অন্যতম রাজকীয় প্রথা। বয়োবৃদ্ধ মহাজ্ঞানী পণ্ডিত রাজদূত হংদেব সর্বপ্রথম জোড়হস্তে বিনীতভাবে, হর্ষদেবকে বলেন "চতুঃসমুদ্র যার কাছে নগণ্য গ্রাম, তাকে কন্যা উপহার দেওয়া গ্রাম্যতা মাত্র।"

।কশোর হর্ষবর্দ্ধন সবেমাত্র হাতে নিয়েছেন রাজদণ্ড। নানা ঘটনার প্রেক্ষিতে কিশোর হর্ষ তার স্বাভাবিক বয়সের তুলনায় অনেক বেশি কঠিন কঠোর হয়ে উঠেছেন। জীবনের উপর ঘটনার তীব্র সংঘাতে ইতিমধ্যে তাঁকে অনেক কঠিন দায়দায়িত্ব ক্রূরভাবে সম্পন্ন করতে হয়েছে। তার সম্মুখের বহু পরিচিত ব্যক্তির গুরুভার ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য পদমর্যাদা বয়স ইত্যাদি অস্বীকার করে কঠিন এবং করণীয় কর্ম সম্পাদন করতে হয়েছে। কিন্তু হংসদেবের প্রগাঢ় ব্যক্তিত্ব এবং বাচন ভঙ্গির সম্মুখে মহারাজা হর্ষবর্দ্ধন স্বপ্নের মতো ফিরে গেলেন বালক মানসিকতার পরিপূর্ণ হর্ষচরিতে।

হংসদেব যুক্তি সহকারে সুললিত ভাষায় প্রকাশ করলেন রাজা ভাস্কর বর্মনের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং মনোভাবের কথা। হংসদেব বলেন, ভাস্কর বর্মন এবং হর্ষবর্দ্ধনের এই পরিচয় হবে বন্ধুত্বের এবং ভালোবাসার মৈত্রী। দুজনের মিলন হবে দাস্য ভাবহীন বন্ধুত্বের বন্ধনে। হর্ষদেব স্বীকার করলেন ভাস্কর বর্মনের বন্ধুত্ব।

হর্ষবর্দ্ধনের উদ্দেশে, ভাস্কর বর্মন প্রেরিত উপহার তালিকায় প্রথম উপহার একটি দান পত্র। আভোগ ছত্রের দানপত্র। বরুণসত্র আভোগ হচ্ছে প্রাগজ্যোতিষপুরের একটি জীবন্ত স্বর্ণখনি। প্রতিদিন এই খনি থেকে বিশেষ ধরনের উচ্চশ্রেণীর মূল্যবান, অতি উজ্জ্বল সোনা আহরিত হয়। এই সাথে বেত নির্মিত সূক্ষ্ম কারুকার্য যুক্ত পেটেরায়, নানা ধরনের উজ্জ্বল রঙের বহুবিধ চীনাংশুক

বস্ত্র। প্রাগজ্যোতিষপুরের বিখ্যাত, গণ্ডার চর্মে নির্মিত কাদরঙ্গ বর্ম। চীনাংশুক বস্ত্রের উপর অঙ্কিত সূক্ষ্ম শিল্পমণ্ডিত চিত্রপট। শিমুল তুলায় নির্মিত কোমল বালিশ। সবুজ রঙের কবুতর। স্নিগ্ধ সবুজ এবং উজ্জ্বল সোনালি হলুদ, সরস খোসাযুক্ত সুপারি। সুগন্ধি গৌশীর্ষম চন্দন। সুবজ বেতে নির্মিত ঝুড়িতে অনেক মৃগনাভী। ঝুড়ি-ঝুড়ি সুগন্ধি জাতীফল কক্কোল। সুগন্ধিমধুর মদিরা। শুকনো লাউয়ের চিত্রিত আধারে নানা ধরনের সূক্ষ্ম চিত্রাঙ্কনের উপযোগী বহু তুলিকা। পাট-নির্মিত বস্ত্রের বহু চিত্রপট। জলহস্তীর দন্তে নির্মিত নানাধরনের চক্র। বহু গজমুক্তা। হস্তীদন্তে নির্মিত নানা ধরনের শিল্পসামগ্রী। বহু শীতলপাটি। একটি শিক্ষিত বন-মানুষি।

হংসদেব দূতকর্মে সফল হলেন। হর্ষবর্দ্ধনের বাহিনীর সাথে যুক্ত হল ভাস্কর বর্মনের বাহিনী। মিলিত বাহিনী দুর্বার বেগে এগিয়ে চলে —দক্ষিণ দিকে।

* * *

হর্ষবর্দ্ধন এবং ভাস্কর বর্মনের সম্মিলিত বাহিনী গঙ্গার প্রবাহ ধরে দুর্বার বেগে এগিয়ে আসছে। কামরূপ বিন্ধ্যারণ্য এই সাথে কৈলাস পর্বতের মানুষ ভীষণের অপেক্ষায় থর থর করে কাঁপছে।

বাণ, অধ্যাপক এবং শুভানুধ্যায়ীগণের সাথে পরামর্শ করে প্রীতিকূট বিদ্যাশ্রমে ছুটি ঘোষণা করলেন।

গোপাধ্যক্ষ শ্রীগোপাল এবং তার পুত্র লোহিতাক্ষ এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্তরের গোপবাহিনীর সাথে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা এবং সভা-সমিতি সম্পন্ন করলেন। শ্রীগোপাল অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের মোকাবিলার জন্য গোপদের কড়া নির্দেশ দিলেন। শ্রীগোপালের কঠিন আদেশ যুদ্ধের অরাজকতার মোকাবিলায় ব্যর্থ গোপদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।

করালী বন্দরপুর গিয়ে গুহনদীনের সাথে মিলিত হয়েছে। হুলুস্থুল দেখা দিয়েছে চন্দ্রপুর নগরীতে। রাজা জয়নাগের বাহিনী নারায়ণদেবের নির্দেশ অনুসারে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। চন্দ্রপুরনগরী আক্রান্ত হবার বিশেষ সম্ভাবনা উত্তর দিক থেকে। উত্তর দিকে বরাক নদীর অন্য তীরে হরিনগর। হরিনগর, প্রাগজ্যোতিষপুর রাজ্যের অন্যতম নদীবন্দর এবং সমৃদ্ধশালী নগরী।

নারায়ণদেব অনিবার্য আক্রমণের মোকাবিলার জন্য তার বাহিনীকে রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রস্তুত করে রেখেছেন। তাঁর বাহিনীর বিশেষ যুদ্ধ নিপুণ সৈনিকগণকে, বন্দরপুরঘাট এবং শাম্মলীর উত্তর সীমার গঙ্গিনিকার তীরে সমবেত করেছেন। এ সব গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল রক্ষী সৈনিকগণের হাতে দেওয়া হয়েছে ইদানীং লোহিতাক্ষ বিক্রিত আধুনিকতম তীক্ষ্ণ ধার অস্ত্র।

শাম্মলী অঞ্চলের রাস্তাঘাটে জনমানুষ নেই। মানুষ দরজাপাট বন্ধ করে ঘরে বসে আছে। ভীষণ ভয়ে সবাই আতঙ্কিত। সবাই জানে যুদ্ধকালে সৈনিকগণ যে কোনও মানুষকে পথ বা ঘর থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধের কাজে লাগিয়ে দেয়। সেনিকদের কাছে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ ধনী বা দরিদ্রের ভেদাভেদ নেই।

এক দুপুর। সূর্য মধ্যাকাশে। চারিদিক নিস্তব্ধ। বাণ, প্রীতিকূটের বাসগৃহ থেকে পথে নামেন। পথে নেমে আপন মনে পায়ে পায়ে উত্তরের পথ ধরেন। খাসোক পুকুরের ধার দিয়ে উত্তর

সীমান্তের গঙ্গিনিকার দিকে এগিয়ে চলেছেন। খাসোক পুকুর তীরের পথের দুধারে গভীর অরণ্য। দুধারে ঝোপঝাড় এই সাথে সুবিশাল গাছ আকাশ ছেয়ে আছে। রৌদ্র ছাওয়া মধ্যদিনে পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

পায়ে চলা জংলী পথের এদিকে ওদিকে মাঝে মাঝে পাতার ফাঁক দিয়ে ঝলমলে রোদ পড়ছে। তিনি লক্ষ করেন এমনি রোদে গুচ্ছ গুচ্ছ উজ্জ্বল হলুদ ফুল ফুটে আছে। বাণের মনে পড়ে মাস দুই তিন আগে এপথ ধরে গঙ্গিনিকার তীরে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল চণ্ডক। চণ্ডক ভূত প্রেতের ভয়ে সরষে ছিটিয়ে ছিটিয়ে চলছিল। সেই সরষের ফুল এই ভীষণ বসন্তে মৃদু বাতাসে থর থর করে কাঁপছে।

ফুল একটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন চণ্ডকের বর্ণনামতো সত্যিসত্যিই প্রতিটি ফুলে মাত্র চারটি করে পাপড়ি। ভাবনা হয় সংস্কৃত 'সিদ্ধার্থক' শব্দকে হটিয়ে "সর্ষ" শব্দ এত প্রাধান্য কেন পেল? বাণ, অশরীরীর অস্তিত্ব এবং অলৌকিক বিশ্বাসাদি নিয়ে নানা কথা চিন্তা করে করে এগিয়ে চলেন।

হঠাৎ তাঁর কানে আসে অলৌকিক মানব কণ্ঠস্বর। চারিদিকে ভীষণ অরণ্য। জনপ্রাণী নেই। বাণের শিরদাঁড়া বেয়ে হিমেলস্রোত নামে। তা হলে চণ্ডকের ধারণাই কি সত্য ? খাসোক পুকুরের চারদিক ভূতপ্রেতের আবাসভূমি ?

অস্পষ্ট মানবকণ্ঠের কথোপকথন উপর দিক থেকে ভেসে আসছে। অলৌকিক কণ্ঠে আলোচিত হচ্ছে শাস্ত্র। একটি কণ্ঠ বলছে 'পুত্র -পৌত্র হিরণ্য রথ সুন্দরী স্ত্রী সর্বাবিধ প্রলোভন বীতরাগ।' অন্য কণ্ঠ এরপর বলছে —'আত্মা অশব্দ অস্পর্শ, মৃত্যুর পর এই আত্মা পক্ষিত্ব পশুত্ব এমনকী বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হয়।'

ভয়ে ভয়ে বাণ উপরের দিকে তাকিয়ে আকাশবাণীর উৎস, অনুসন্ধান করেন। হঠাৎ চোখে পড়ে পাতার ঘন আড়ালে একটি পায়ের পাতার তলা। শ্রীচরণ অনুসরণে প্রথম এক ব্যক্তি এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তিরা লৌকিক শরীর দৃশ্যগোচর হয়। বাণের একান্ত পরিচিত শাম্মলীর দুই পুরোহিত। পুরোহিত দুজনের মধ্যে পরস্পর ঝগড়াঝাটি সর্বজনজ্ঞাত। যজমানের উপর পরস্পরের অধিকার নিয়ে নিত্যনতুন কলহ।

বাণ, উপর দিকে তাকিয়ে পুরোহিত দুজনের নাম ধরে ডাকেন। স্তব্ধ হয় অলৌকিক আকাশবাণী। বাণকে দেখে দুজন কাঠবিড়ালির মতো ভূমিতে নেমে পা রাখেন। পুরোহিত দুজন বাণের সামনে কাঁচুমাচু হয়ে বলেন, গৌড় সেনাদের ভয়ে তারা গাছে চড়ে লুকিয়ে আছেন। সৈন্যরা তাদেরে ধরে যদি বোঝা বহন করার কাজে লাগিয়ে দেয়?

বাণ খাসোক পুকুর অঞ্চল অতিক্রম করে গঙ্গিনিকা তীরের জাটলী ঝোপের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলেন। কিছু পথ এগিয়ে চোখে পড়ে গৌড় সেনারা জাটলী ঝোপে লুকিয়ে বসে আছে। সৈনিকদের দৃষ্টি গঙ্গিনিকার উত্তর তীরের হরিনগের দিকে। বাণ দেখেন, গঙ্গিনিকার উত্তর তীরের জলরাশির উপর অস্পষ্ট অসংখ্য নৌকার কালো ছায়া।

বাণ, এই অঞ্চলে শ্রদ্ধেয় এবং বিশেষ পরিচিত। জনৈক উচ্চপদস্থ গৌড় সেনা অধিনায়ক

তাঁকে চিনতে পারে। সেনা অধিনায়ক বিনীতভাবে বাণকে এ স্থান ছেড়ে চলে যেতে অনুরোধ করে। সেনা অধিনায়ক বলে, প্রাগজ্যোতিষপুরের নৌবাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। বাণ উত্তর দিকে তাকিয়ে লক্ষ করেন ইতিপূর্বে দেখা নৌকার কালো ছায়া এখন গঙ্গিনিকার জলে দুলছে। বাণ প্রীতিকূটে ফিরে গেলেন।

*　　　　*　　　　*

মাত্র ছয় দিনের মধ্যে যুদ্ধ সমাপ্ত হল। চন্দ্রপুর বিষয় এই সাথে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পুনরায় আদ্য বর্মন রাজবংশের হস্তীচিহ্নিত পতাকার তলায় আশ্রয় পেল।

নারায়ণদেব, বীরত্বের সাথে প্রতিরোধ সংগ্রাম করেছিলেন কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। ভাস্কর বাহিনীর আক্রমণে নারায়ণদেবের সুদক্ষ এবং নিপুণ যোদ্ধাগণের শোচনীয় মৃত্যু ঘটল। যুদ্ধের প্রথমলগ্নেই নারায়ণদেবের সৈনিকগণের সুতীক্ষ্ণ ইস্পাত নির্মিত তলোয়ার ভল্ল এমনকি ছুরিকাগুলি পর্যন্ত ভেঙে খান খান হয়ে গেল। এমনিভাবে নিরস্ত্র অবস্থার শোচনীয় ভাবে নারায়ণদেবের মৃত্যু হল।

ভাস্কর বাহিনী শাল্মলী পালিতক কালিকাশ্রম কাদম্বরী অঞ্চলাদি দখল করে ঝড়ের বেগে দক্ষিণ দিকে বিন্ধ্যাঞ্চলের দিকে এগিয়ে গেল। কামরূপের শাল্মলী অঞ্চলের দক্ষিণে বিন্ধ্যাঞ্চল। বিন্ধ্যাঞ্চলের কুলাচলে আদ্য বর্মন রাজবংশের অন্যতম রাজপ্রাসাদ। কুলাচলের ভূমিতে গায়ে গায়ে সংলগ্ন দুটি প্রাসাদ। একটিতে বাস করতেন ভাস্কর বর্মন অন্যটিতে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুপ্রতিষ্ঠিত বর্মন। কূটকৌশলে গৌড়ের নৃপতি জয়নাগের সেনাপতি নারায়ণ দেব এই প্রাসাদ থেকে ভাস্কর বর্মন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত বর্মনকে বন্দী করেছিলেন।

চন্দ্রপুর বিষয় সহ কামরূপের বিস্তারিত অঞ্চল জয় করার পর ভাস্কর এবং হর্ষের মিত্রতা প্রগাঢ় হ... উঠে। হর্ষবর্দ্ধন ভাস্কর বর্মনের কুলাচল প্রাসাদের একটিতে তাঁ.. জয়স্কন্ধার স্থাপন করলেন। একান্ত পাশাপাশি বসবাস দুজনের মধ্যে গভীর পরিচিতির সুযোগ সৃষ্টি করে ছিল।

দুজনের মধ্যে প্রগাঢ় মিত্রতা কিন্তু এই মিত্রতা হালকা বন্ধুত্ব নয়। দুজনের ব্যক্তিত্বের মধ্যে মস্ত ব্যবধান। প্রথমটি বয়সের পার্থক্য। এই যুদ্ধজয়ের সময় কালে হর্ষের বয়েস সতেরো - আঠারো, অন্যদিকে ভাস্করের বয়েস প্রায় একত্রিশ-বত্রিশ। দ্বিতীয়ত, হর্ষের মানসিকতা ছিল উচ্ছ্বাস এবং আবেগপূর্ণ এইসাথে তিনি ছিলেন কবি এবং ভাবুক প্রকৃতির। অন্যদিকে ভাস্কর ছিলেন স্বল্পবাক্ গুরুগম্ভীর এবং একান্ত আদর্শবাদী। দুজনের মধ্যে ছিল স্নেহ এবং শ্রদ্ধার সম্পর্ক। হর্ষবর্দ্ধন, ভাস্কর বর্মনকে শ্রদ্ধা করতেন।

উল্লেখ্য, এই যুদ্ধবিজয় সময়কালে, বাণভট্ট ছিলেন ছাব্বিশ সাতাশ বছরের এক উচ্ছল প্রাণপূর্ণ যুবক। তার শিশুপুত্র পুলিন্দা অর্থাৎ ভূষণ তখন সবেমাত্র হাঁটিহাঁটি পা পা করতে শিখেছে।

*　　　　*　　　　*

হর্ষবর্দ্ধনের কুলাচল প্রাসাদের জয়স্কন্ধবারে গুপ্তচর রাজ্যশ্রী সমর্থক খবর নিয়ে এল। কুলাচলের দক্ষিণের বিন্ধ্যাগিরিতে রাজ্যশ্রীর সন্ধান পাবার সম্ভাবনা আছে। গাঙ্গিনিকার জেলেরা

নাকি দেখেছে একটি ছৈ দেওয়া বাণিজ্য নৌকায় কিছু মেয়েছেলে। মেয়েদের দেহে ছিল রাজকীয় বস্ত্র কিন্তু বস্ত্রগুলি মলিন এই সাথে শতচ্ছিন্ন।

হর্ষবর্দ্ধন, গুপ্তচরের সংবাদ বিশ্বাস করলেন। ইতিপূর্বে কান্যকুব্জের গুপ্তচর প্রধান এমনি সংবাদ দিয়েছিল। কান্যকুব্জের গুপ্ত সংবাদের উৎস সন্ধানে জনৈকা রাজনটীকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। বন্দিনী রাজনটী রাজ্যশ্রীর বান্ধবী। হর্ষবর্দ্ধন শতচেষ্টা করেও বন্দিনীর মুখ খুলতে পারেননি।

বলতে গেলে সেই মুহূর্তে স্বল্প সংখ্যক সৈন্যসহ যাত্রা করলেন। যাত্রাপথ কুলাচলের দক্ষিণ দিকে। প্রথমে পৌছালেন বনগ্রামে। বনগ্রামের পর বিন্ধ্যারণ্যের ভীষণ অরণ্যের আরম্ভ। বিন্ধারণ্যের দক্ষিণ সীমান্তের অটবী সামন্ত শরভকেতু। শরভকেতুর পুত্র ব্যাঘ্রকেতু অরণ্যজাত নানা উপহার সামগ্রীসহ হর্ষবর্দ্ধনকে স্বাগত করে। ব্যাঘ্রকেতু এই বিন্ধ্যারণ্য পথ অভিজ্ঞ এক দুঃসাহসী শবর যুবককে অরণ্য পথ প্রদর্শনের জন্য হর্ষবর্দ্ধনের নিকট উপস্থিত করেছে। শবরযুবকের নাম ভূকম্প। ভূকম্পের নির্দেশমতো বাহিনী সহ হর্ষবর্দ্ধন এগিয়ে চলেন।

ভয়াল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে, ভূকম্প একটি স্থানে এসে দাঁড়ায়। সেখানের অরণ্য নিবিড় নয়। অনেকগুলি ছোটো বড়ো ঝরণা, স্থানটিকে বেষ্টন করে প্রবাহিত হচ্ছে। ভূকম্প হর্ষবর্দ্ধনকে বলে, এখানে একটি বৌদ্ধ আশ্রম আছে। আশ্রমের কর্তার নাম দিবাকর মিত্র।

হর্ষবর্দ্ধনের বিশ্বাস গাঢ় হয়। কান্যকুব্জে, ইতিপূর্বে গুপ্তচর প্রধানের মুখে শুনেছেন গ্রহবর্মার জনৈক মিত্র, দক্ষিণ সাগর সংলগ্ন স্থানে একটি বৌদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন।

হর্ষবর্দ্ধন, আশ্রমে প্রবেশ করে দিবাকর মিত্রের সাথে সাক্ষাৎ করেন। হর্ষবর্দ্ধন যখন তার সাথে রাজ্যশ্রী সম্পর্কে কথা বলছিলেন, সেই মুহূর্তে জনৈক বৌদ্ধশ্রমণ এসে রাজ্যশ্রী সম্পর্কে সংবাদ দেয়। বৌদ্ধশ্রমণ বলে, আশ্রমের অতি কাছে, জনৈকা রাজকন্যা তার সহচরীদের সাথে অগ্নিতে আত্মাহুতি দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

হর্ষবর্দ্ধন, দিবাকর মিত্র এবং সংবাদদাতা শ্রমণসহ দ্রুত সেখানে উপস্থিত হন। উপস্থিত হয়ে দেখেন রাজ্যশ্রী তার সহচরীদের সাথে প্রজ্বলিত অগ্নির সম্মুখে আত্মাহুতি দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন।

লেলিহমান অগ্নি শিখার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রাজ্যশ্রী আর্তরবে বিলাপ করছেন —"হে বিধি! আজ কোথায় গেলেন আমার পিতৃ-ভ্রাতৃ পুষ্পভূতি বংশের প্রিয় কুটুম্বিনী, আমার স্বামী গ্রহ বর্মার মৌখরী বংশের কুললক্ষ্মী ? হে বিধি! কোন্ পাপে তুমি আমার স্বামীর মৌখরী বংশ পরিত্যাগ করে পিতৃভ্রাতৃ পুষ্পভূতি বংশে আশ্রয় নিলে? হে আমার ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন ! তুমি আজ কোথায়? কোথায় গেল তোমার ভগ্নীপ্রীতি?"

রাজ্যশ্রীর পিছনে দাঁড়িয়ে, দিবাকর মিত্রসহ হর্ষ বর্দ্ধন শ্রবণ করেন রাজ্যশ্রীর আর্ত বিলাপ। দিবাকর মিত্রের করুণা বিগলিত হয়। তিনি অনুভব করেন রাজ্যশ্রী প্রিয় ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর সংবাদ এখনো জানতে পারেনি।

হর্ষবর্দ্ধন এবং দিবাকর মিত্র, রাজ্যশ্রী এবং তার সহচরীগণকে আত্মাহুতির মুখ থেকে

ফিরিয়ে আনেন।

দিবাকর মিত্রের পরম সত্য এবং স্নেহের বাণীতে রাজ্যশ্রী কিছু পরিমাণে আত্মস্থ হলেন।

রাজ্যশ্রী ঝরনার প্রবাহমান জলে তার সদ্যমৃত স্বামীর প্রেতক্রিয়া সম্পাদন করলেন।

হর্ষবর্দ্ধন, সাময়িকভাবে রাজ্যশ্রীকে দিবাকর মিত্রের আশ্রমে রেখে এলেন। রাজ্যশ্রীকে বলে গেলেন, কিছুদিনের মধ্যে তারা কান্যকুব্জে গমন করবেন।

* * *

হর্ষবর্দ্ধন এবং ভাস্কর বর্মনের পরবর্তী পরিকল্পনা গঙ্গিনিকা অর্থাৎ পশ্চিম সাগর অতিক্রম করে রাজা জয়নাগের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অধিকার করা।

পরিকল্পনানুসারে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হল। দিন কয়েকের মধ্যে ভাস্কর বর্মনের বিপুল নৌবহর পশ্চিম সাগর অতিক্রম করে কর্ণসুবর্ণ অধিকার করে। যুদ্ধে রাজা জয়নাগ শোচনীয় ভাবে পরাজিত এবং ভাস্করের হাতে বন্দী হন। কিন্তু কোনা অজ্ঞাত কারণে হর্ষবর্দ্ধন রাজা জয়নাগকে মুক্তি দিলেন। জয়নাগ কর্ণসুবর্ণ পরিত্যাগ করে কর্ণসুবর্ণের উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রস্থান করলেন।

জয়নাগের মুক্তি ভাস্কর বর্মনের মনঃপুত হয়নি। কিন্তু কূটীল রাজনৈতিক কৌশলানুসারে, বিষয়টিকে তিনি সহজভাবে গ্রহণ করেন।

* * *

যুদ্ধ শেষ হয়েছে। চন্দ্রপুর বিষয় তথা কামরূপের মানুষ স্বস্তি লাভ করেছে। আদ্যরাজ বংশের রাজা ভাস্কর বর্মন আবার ফিরে এসে শাসনভার গ্রহণ করেছেন।

যুদ্ধের তাণ্ডবে বসন্তের শোভা প্রকৃতির রূপ বিলাসী বাণের চোখে ধরা দেয় নি। কোকিলের গান ভ্রমরের গুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

বসন্তের পর গ্রীষ্মের দারুণ অগ্নিবাণ নিয়ে বৈশাখ এল। গ্রীষ্মের ধূসর পিঙ্গল জটা ছড়িয়ে গেল রুদ্ররূপে। বাণের চোখে প্রকট হয়ে দেখা দিল ময়ূর শাল্মলীর গ্রীষ্মের ভৈরব রূপ। সূর্যের প্রখর কিরণে খণ্ডিত হল গ্রীষ্মের শৈশবকাল। ক্ষয়ে এল নক্ষত্রবতী রাত্রির সময় কাল। অট্টহাসের মতো ফুল্ল হল মল্লিকা ফুলের শুভ্রতা। সিন্দুরিত হয়ে উঠল প্রতি গ্রামের সীমান্তরেখার মাদার ফুলের সমারোহ। শুকিয়ে এল জল। পুকুরের মুষ্টিবদ্ধ পাঁকজলে চিৎ হয়ে সাঁতার কেটে মরে গেল পুঁটিমাছ। দীঘির কাদা শুকিয়ে প্রখর সূর্যের দাবদাহ ঝলসে গেল কচ্ছপ। গঙ্গিনিকার লবণাক্ত বালুর চরে দমকা হাওয়ায় খেপে ওঠে বালির ঝড়। শুকনো অরণ্যের দাবাগ্নি খ্যাপা হাওয়ায়, কিলকিল করে ছড়িয়ে যাচ্ছে দিক-বিদিকে। দাবাগ্নি নেমে এসে পুড়িয়ে দিচ্ছে বোরো ধানের পাকা খেত। আগুনে ঝলসে পাকাধান খৈ হয়ে ফেটে গিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে আগুনের বুকে।

সেদিন এমনি এক ভীষণ দুপুর। সূর্যের অগ্নিবর্ষণে মুলি বাঁশ কাল ভৈরবের ডম্বরুর মতো ফাটছে। বন্ধ ঘরের শীতলপাটিতে শুয়ে বাণ, বাণীর সাথে গল্প করছেন। পাশে ঘুমন্ত শিশু পুত্র পুলিন্দা। পুলিন্দা, পাটির এককোণে লেপ্টে আছে গলন্ত সোনার মত।

বাণীর একই জিজ্ঞাসা "সেই মেয়েটি কি খুবই সুন্দরী ?" গল্প হচ্ছিল সেই সতীদাহের সতী বিহঙ্গমাকে নিয়ে। বাণ, বাণীর প্রশ্নের জবাব প্রায়ই এক ধরনের দিয়ে থাকেন। সেদিনও বলেন —"নিশ্চয়ই সুন্দরী, খুব সুন্দরী। তবে আমার বাণী নখের যোগ্য নয়। বাণীর আবার প্রশ্ন, এই মেয়ের সাথে বাণের আবার দেখা হতে পারে কিনা ? বাণ বলেন, তার সৌভাগ্য হলে তিনি অবশ্যই আবার সেই নারীকে দেখবেন।

বাণের এমনি কথায় বাণী অনেকক্ষণ কিছু না বলে তার ভূষণের গায়ের বিগলিত ঘাম মুছিয়ে দিতে থাকেন। ঘাম মুছে মুছে মানুষ যেমনিভাবে স্বপ্নের ঘোরে কথা বলে তেমনিভাবে আপন মনে বলেন - "তোমার হয়তো বা সৌভাগ্য ! কিন্তু সে দেখা হবে আমার পরম দুর্ভাগ্য"

বাণীর স্বপ্নঘোর ভেঙে যায়। বন্ধ দরজায় শব্দ ওঠে। কে একজন বাণকে ডাকছে। বাণ দরজা খুলে দেখেন তার পারশব ভাই চন্দ্রসেন। চন্দ্রসেন উত্তেজিত। তিনি বলেন, মহারাজ কৃষ্ণদেবের দূত এসেছেন। দূত এসেছেন বাণের সাথে দেখা করতে। বিষয় অত্যন্ত গুরুতর।

বাণ, ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘর থেকে হয়ে দেখেন সুন্দর এক পুরুষ বাণের জন্য অপেক্ষা করে আছেন। বাণকে দেখে তিনি নমস্কার করে বলেন, তার নাম মেখলক। মহারাজ কৃষ্ণদেবের রাজদূত। মেখলকের সারা দেহে দূরভ্রমণের চিহ্ন। পোশাক ধূলি-ধূসর।

মহারাজ কৃষ্ণদেব বাণের পরিচিত। প্রথম পরিচয় চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমে। কৃষ্ণদেব এবং লোহিতাক্ষ ছিলেন চন্দ্রপুর রাজকীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র। চন্দ্রপুর রাজকীয় বিদ্যালয়ে রাজা মহারাজা, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বণিক শ্রেষ্ঠদের সন্তান দেরে রাজনীতি অস্ত্র বিদ্যাসহ নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। বাণের মনে পড়ে, অতি অল্পক্ষণের জন্য কৃষ্ণদেব সম্পর্কে আলোচনায় গুরুদেব ভর্ৎসু রাজাদের রাজনৈতিক কূটকৌশল এবং গুপ্তচরবিদ্যা সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছিলেন।

গুরুদেব বলেছিলেন, নৃপতিগণ তাদের অতি নিকট আত্মীয় স্বজনকে শিক্ষা সংস্কৃতি ধর্ম ইত্যাদি শিক্ষা দিবার জন্য দূর-দূরান্তে প্রেরণ করেন। মূল উদ্দেশ্য গুপ্তচর বৃত্তি।

হর্ষবর্দ্ধনের পিতা প্রভাকর বর্দ্ধন তার পুত্রতুল্য কৃষ্ণদেবকে ভারতের এই সুদূর পূর্বপ্রান্তে বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। কৃষ্ণদেব নিশ্চয়ই প্রভাকর বর্দ্ধনের গুপ্ত নির্দেশ অনুসারে এই অঞ্চলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। হর্ষবর্দ্ধন তাই পূর্বাঞ্চল আক্রমণকালে এই অঞ্চল সম্পর্কে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং বিশেষজ্ঞ কৃষ্ণদেবকে সঙ্গে এনেছেন।

বাণ, কৃষ্ণদেবের মুদ্রাঅঙ্কিত পত্র খুলে দেখেন পত্রটি সংক্ষিপ্ত সরল। চিঠিতে কৃষ্ণদেব বাণকে সম্বোধন স্পষ্ট আখরে লিখেন "মেখলকের মুখে, আমার বক্তব্য জানতে পারবেন। আপনি বিজ্ঞ। আশা করি আপনার সাফল্যের কথা চিন্তা করে আপনার স্বাভাবিক দীর্ঘসূত্রিতা ত্যাগ করবেন।"

চিঠি পাঠ করে বাণ, মেখলকের দিকে তাকান। মেখলক বলেন, এটি রাজনৈতিক গুপ্ত চিঠি। তাই চিঠিতে সব কথা লেখা হয়নি। চিঠি কোনও কারণে অন্যের হাতে পৌঁছে যেতে পারে।

মেখলকের কথা শুনে বাণের মনে ভীতির সঞ্চার হল। মেখলক বলেছেন, কিছু দুষ্টলোক

বাণ সম্পর্কে নানা মিথ্যা বিষয় প্রচার করে মহারাজ হর্ষবদ্ধনকে বিষাক্ত করে তুলেছে। অবশ্য কৃষ্ণদেব বলেছেন, তার ব্যক্তিগত ধারণা কিছু দুষ্টলোক বাণ সম্পর্কে মিথ্যা কথা রটনা করেছে।

বাণ, আকাশ পাতাল ভাবছেন। তাঁর ধারণা এই মিথ্যা রটনার কেন্দ্রবিন্দু করালী এবং গুহনদীন। বাণের মাথায় দুশ্চিতার জটিল স্রোত কুণ্ডলী পাকাতে থাকে। করালী এবং গুহনদীন, এরা দুজন তার বিরুদ্ধে কী রটনা করতে পারে? হয়তো বা বলেছে, উম-ইয়ামের সাথে তার প্রেম কাহিনি। কাহিনিতে মিশিয়েছে কৃষ্ণসর্পের গরল। মাস কয়েক আগে করালী এবং গুহন দীন তাকে নায়ায়ণ দেবের প্রাসাদে দেখেছে। হয়তো এই প্রসঙ্গে হর্ষবর্দ্ধনের কানে উঠিয়েছে, তিনি হর্ষবর্দ্ধনের শত্রু এবং নারায়ণদেবের লোক ? গুহনদীন অশ্ব উপহারের মাধ্যমে ভাস্করের প্রিয় ব্যক্তি হয়ে তাকে হয়তো বাণ সম্পর্কে খারাপ কিছু বলেছে।

নানা কারণে বাণ, করালীর চক্ষুশূল। করালী ব্রাহ্মণ্যধিবাসের দানপত্র আগুনে পুড়িয়েছে। চণ্ডকের সাথে তুমুল গণ্ডগোল করেছে। বর্তমানে করালীর কূতকুট্ট দেবমন্দির অপেক্ষা বাণের প্রীতিকূট বিদ্যাশ্রম জন মানসে শ্রদ্ধার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। বাণের স্থির বিশ্বাস এই মিথ্যা রটনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে করালী এই সাথে গুহনদীন।

বাণের মাথা উত্তপ্ত হয়ে উঠে। বাণ, তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে কিছু স্থির করতে পারছেন না। এমনি অস্থির অবস্থায় হঠাৎ তার চোখে ভেসে ওঠে মস্ত এক জোড়া গোঁফ সমেত উজ্জ্বল মুখ মণ্ডল। গুরুদেব ভর্ৎসুর প্রশান্ত মুখচ্ছবি। গুরুদেবের কণ্ঠস্বর তাঁর কানে ভেসে ওঠে — "রাজাকে বিশ্বাস করবে না। কিন্তু প্রকাশ্যে রাজাকে অস্বীকারও করবে না। মাথার উপর রাজার আশীর্বাদের মঙ্গলহস্তকে পরম কৃতজ্ঞ ভাব প্রদর্শন সহ গ্রহণ করবে। কিন্তু জানবে এই রাজহস্ত স্পর্ধিত সিংহ নখরমাত্র।'

বাণের মুখে প্রশান্তির ছায়া দেখা দেয়। মেখলক বলেন, "কৃষ্ণদেব বলেছেন, কেবল বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডা মেরে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। এমনিভাবে জীবন কাটালে অরণ্যের নিষ্ফল গাছের মত জীবন ব্যর্থ হবে। যেকোনওভাবে আলস্য ত্যাগ করে মহারাজাধিরাজ হর্ষ দেবের সাথে সাক্ষাৎ করুন।"

মেখলক বাণের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, "কৃষ্ণদেব আরো বলেছেন মহারাজাধিরাজ হর্ষদেব সম্পর্কে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তিনি মহান হৃদয়ের অধিকারী। হর্ষদেব সৎ এবং প্রজারঞ্জক নৃপতি।"

বাণ, অতিথিশালায় মেখলককে নিয়ে স্নান আহার এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে চন্দ্রসেনকে অনুরোধ করেন। স্থির হল আগামীকাল প্রভাতে মেখলকের সাথে বাণ হর্ষবর্দ্ধনের উদ্দেশে যাত্রা করবেন।

যাত্রাপথ হবে পরিচিত চণ্ডিকা অরণ্যের মাঝ দিয়ে। প্রীতিকূট থেকে হর্ষবর্দ্ধনের কুলাচল প্রসাদের জয়স্কন্ধাবার, আড়াই দিনের হাঁটা পথ।

*　　　*　　　*

শেষ রাতে উঠে স্নান-আহ্নিক এবং শিবপূজা সাঙ্গ করে বাণ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন।

পরিধান করলেন শ্বেত ক্ষৌমবস্ত্র। গলায় শুভ্র পুষ্পমাল্য। সারাদেহ শ্বেত চন্দনে চর্চিত। শিখায় বাঁধলেন সাদা ফুল এই সাথে শ্বেত সরিষা। কানের উপর স্থাপন করলেন মাঙ্গলিক কর্ণফুল। গুরুজনেরা একে একে বাণকে করলেন আশীর্বাদ। সাক্ষাৎ দেবী মহাশ্বেতার মত মালতী পিসির আশীর্বাদ কালে বাণের চোখে অশ্রুবিগলিত হল। মালতী পিসি দরজার সম্মুখে রেখেছেন পূর্ণকুম্ভ। কুম্ভ মুখে আম্রপল্লব।

কুলদেবতার কক্ষে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দেবতাকে একান্ত চিত্তে সমর্পণ করলেন দীর্ঘ প্রণাম। প্রণামশেষে, কুলদেবতা আসনের নিচে সঙ্গোপন রাখা শিকলে আটকানো দুই খণ্ড ক্ষুদ্র লাঠি কোমরে গুঁজে দরজা খুলে বের হলেন।

দরজা খুলে দেখেন সামনে দাঁড়িয়ে সলজ্জ বাণী। কোলে শিশুপুত্র। ভূষণকে কোলে রেখে বাণী তাঁকে প্রণাম করেন। বাণীর কোলে পুলিন্দা গভীর ঘুমে অচেতন।

বাণ যাত্রার মন্ত্র উচ্চারণ শেষ করে দক্ষিণ চরণে প্রথম পদক্ষেপ প্রদান করে পথ চলা শুরু করলেন।

প্রীতিকূট থেকে বাণ চন্দ্রসেন এবং মেখলক এই তিনজন দীর্ঘযাত্রা শুরু করেন। প্রীতিকূট থেকে এদের সাথে এক শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছেন বাণের বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় স্বজন। শোভাযাত্রায় শেষ হয় বপ্প ঘোষ বাটের নৌ ঘাটে। সেখান থেকে তিনজন এগিয়ে চলেন দক্ষিণ দিকে।

বাণ চন্দ্রসেন এবং মেখলক, কালিকাশুভ্র এবং কাদম্বরী দেবকুলিকা অতিক্রম করে ভীষণ পথে পা রাখলেন। বাণের স্মৃতিতে গাঁথা ভীষণ চণ্ডিকারণ্য পথ। সন্ধ্যার মুখে তিনজন পৌছালেন চণ্ডিকা মন্দিরে। মন্দিরে প্রণাম এবং স্বল্প বিশ্রাম করে পৌছালেন মল্লকূট গ্রামে। মল্লকূট, চণ্ডিকা মন্দিরের প্রায় সংলগ্ন একটি গ্রাম। এই গ্রামে বাণ প্রায় মাসখানের বাস করেছিলেন। মল্লকূটে চন্দ্রসেনের মা বাস করেন। বাণ এবং মেখলক মল্লকুটে পৌছে জগৎপতির বাড়িতে উঠলেন। জগৎপতি বাণের অন্যতম প্রিয় বান্ধব। চন্দ্রসেন, তার মায়ের বাড়িতে গেলে বাণ-জগৎপতি এবং মেখলক প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত আড্ডা এই সাথে গান গেয়ে কাটালেন। বায়ুপুরাণ গ্রন্থখানি, জগৎপতির প্রায় কণ্ঠস্থ। এই সাথে সুমধুর তাঁর কণ্ঠস্বর। তিনি গান এবং এই সাথে আবৃত্তি করলেন বায়ুপুরাণের কথা।

ভোর হলে আবার পথ চলা। দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলা। এবার পথে চলেছেন দুজন। চন্দ্রসেন রয়ে গেছে মল্লকূট গ্রামে। পড়ন্ত বেলায় সুবিশাল গঙ্গিনিকার প্রবাহ নৌকায় অতিক্রম করে পৌছালেন অন্য তীরে। অন্য তীরে ছোট্ট একখানি গ্রাম। গ্রামের নাম যষ্ঠিগ্রহক। সন্ধ্যায়, রাত কাটাবার জন্য আশ্রয় নিলেন এই যষ্ঠিগ্রহক গ্রামে।

প্রভাতে আবার পথ চলা। লক্ষ মনিতার নগরী। অজিরা নদীর তীরে মনিতার নগরী।

ইতিপূর্বে বাণ, মনিতার নগরীসহ অন্যান্য কাছাকাছি বহুস্থানে পরিভ্রমণ করে গেছেন। এই অঞ্চলে সুবিশাল স্থান জুড়ে বহু দেবদেবীর দেবস্থান অবস্থিত। এই দেবস্থানে আছে লিঙ্গদেবতার মন্দির। এই মন্দিরের পুরোহিত চন্দ্রগোমী স্বামী মহাজ্ঞানী পণ্ডিত। গুরুদেব ভর্ৎসুর প্রিয় বান্ধব।

এই মন্দিরে বাণ দিনকতক বাস করে গেছেন। দেবস্থান অঞ্চলের নিকট পশ্চিমে গোপ্লপল্লী। সেখানে আছেন তার বান্ধব লোহিতাক্ষ এবং লোহিতাক্ষের পিতা শ্রীগোপাল।

বাণ লক্ষ করেন, মনিতার নগরীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীকে মেখলক অজিরাবতী নদী বলে। বাণ এই অঞ্চল পরিভ্রমণকালে, সাধারণ লোকমুখে এই নদীর নাম জিরি বা জিরা বলতে শুনেছিলেন। কিন্তু পুরোহিত চন্দ্রগোমী স্বামী বলতেন অজিরাবতী নদী। নদীর এমন ধরনের নাম সম্পর্কে বাণ চন্দ্রগোমী স্বামীকে প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তরে তিনি নাম পরিবর্তন সম্পর্কে বলেছিলেন, জিরি বা জিরা নাম অতিপ্রাচীন। এই অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীগণ এই নাম রেখে ছিল। নামটি সাধারণভাবে জলবাচক শব্দ। জল শব্দ থেকে জিরি বা জিরা নাম হয়েছে। যেহেতু এই ধারা সুবৃহৎ জলপ্রবাহ তাই এই অঞ্চলের প্রাচীন শবরগণ নদী নামের পূর্বে তাদের ভাষায় 'বৃহৎ এবং পুরুষ বাচক উপসর্গ 'উ' ধ্বনি যুক্ত করেছে। 'উ' ধ্বনি যুক্ত হয়ে শবরভাষায় নদীর নাম হয়েছে 'উজিরা' নদী। পরবর্তীকালে 'উজিরা' হয়ে উঠেছে 'অজিরা'। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ, নদী নামের শেষে 'বতী' শব্দ যোগ করে গুরুগম্ভীর গালভরা নামাকরণ করেছেন অজিরাবতী নদী।

দুজন ঠিক দুপুর বেলা মনিতার নগরে পৌছালেন। মনিতার নগরে বাণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সহ বড়োসড়ো একটি বাড়ীর ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। মেখলক তাকে নিয়ে সাজানো গুছানো এই বাড়ীতে প্রবেশ করলেন।

অতিদ্রুত স্নানাহার এবং সন্ধ্যাহ্নিক সমাপ্ত করে বাণ মেখলকের সাথে হর্ষবর্দ্ধনের কুলাচল প্রাসাদের জয় স্কন্ধাবারের সম্মুখে পৌছালেন। কুলাচলে পাশাপাশি দুটি প্রাসাদ। একটিতে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন অন্যটিতে বাণের আদ্যরাজা মহারাজা ভাস্কর বর্মন।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়ে আসছে। বাণের পা আপনা আপনি এগিয়ে যায় মহারাজা ভাস্কর বর্মনের প্রাসাদের দিকে। প্রাসাদের সন্মুখে হাতি ঘোড়া উট এই সাথে অজস্র মানুষের ভিড়।

প্রাসাদ দুটির মাঝখানের সুবিশাল প্রাঙ্গণে হা-পিত্যেশ করে বসে আছেন। কাছাকাছি এবং সুদূর, অঞ্চলের নানা ছোটো বড়ো সামন্তনৃপতি এবং সর্দারগণ। সবাই মহারাজদের শ্রীচরণ দর্শনের জন্য ব্যাকুল। বাণের সাথে মেখলককে দেখে ময়ূর শাল্মল পালিতক চন্দ্রপুরের বাণের পরিচিত কিছু মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে। মেখলককে প্রভু সম্বোধন করে, প্রার্থনা করে। প্রার্থনার বিষয় রাজদর্শনের আকাঙ্ক্ষা। প্রার্থনাকারী দু একজনের চাপাকণ্ঠের আবেদন বাণের কানে প্রবেশ করে। তারা মেখলকে বলে, সঙ্গে কিছু স্বর্ণমুদ্রা এনেছে। মুদ্রাগুলির কিছু অংশ মেখলককে প্রদান করে বাকি অংশ মহারাজের শ্রীচরণে অর্পণ করতে চায়।

বাণের ধারণা ছিল মেখলক সাধারণ রাজকর্মচারী। কিন্তু এখানে এসে উপলব্ধি করলেন, মেখলককে শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শন করছে। মেখলক গম্ভীর মুখে প্রার্থনাকারী মেখলক দায়িত্ব পূর্ণ উচ্চপদের অধিকারী। অন্যান্য রাজকর্মচারীগণদের বলেন, সময় এবং সুযোগ মতো তারা রাজদর্শনের সুযোগ পাবেন।

বাণ সঙ্গোপনে মেখলককে বলেন, এখানে উপস্থিত অধিকাংশ ব্যক্তি শঠ এবং প্রবঞ্চক।

গোপনে জনৈক ব্যক্তিকে দেখিয়ে বলেন, এই ব্যক্তি জাল তাম্রপত্র নির্মাণ করে পালিতকগঞ্জের কুলপুত্র বায়ুবিকারের সাত পুরুষের জমি বাড়ী দখল করে ফেলেছে।

বাণ প্রথমে প্রবেশ করেন আদ্যরাজা ভাস্কর বর্মনের প্রাসাদে। দূর থেকে দেখলেন আদ্যরাজা সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে আছে পাত্র মিত্র আমাত্যগণ। দূর থেকে দেখে হঠাৎ কবি বাণের চোখে মনে হল সিংহাসনে সগৌরবে বসে আছে মস্ত এক হস্তী। হাতি বর্মন রাজবংশের পবিত্রচিহ্ন। বর্মন রাজবংশের পতাকা হস্তীচিহ্ন লাঞ্ছিত। ভাস্কর বর্মন যেন বর্মন বংশের সমস্ত শক্তি পুণ্যগৌরবের সম্মিলনে হয়ে উঠেছেন এক পরম পবিত্র গজ। শত সহস্র অহঙ্কারীর দর্প ভূমিসাৎ করে সগৌরবে সিংহাসনে উপবিষ্ট। ভাস্কর বর্মন যেন এক দর্পসাৎকারী গজ। বাণের কল্পনার এই মহাগজ্যের নাম হল, দর্পশাত।

স্তব্ধ বাণ দাঁড়িয়ে দেখেন মহাগজ দর্পশাতকে। দর্পশাত দর্পে যেন দুলছে, দানে গলছে। দর্পশাত মুখে অধ্যাপক বিনয়ে নম্র শিষ্য, ক্ষমায় বুদ্ধ—ক্রোধে বহ্নিবর্ষ।

দূর থেকে বাণ লক্ষ করলেন, দর্পশাত ভাস্কর বর্মনকে পরিবেশন করে আছেন গন্ধর্ব সর্দারগণ। বিন্ধ্যগিরির গন্ধর্ব সর্দারদের সাথে বর্মন রাজবংশের মৈত্রী দীর্ঘদিনের। এই মিত্রতা বিশেষভাবে স্থাপন করেছিলেন ভাস্কর বর্মনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুপ্রতিষ্ঠিত বর্মন। সুপ্রতিষ্ঠিত বর্মন, এই মিত্রতায় লাভ করে ছিলেন শত সহস্র যুদ্ধহস্তী।

দর্পশাত ভাস্কর, গন্ধর্ব সর্দারদের হাতে স্বাক্ষর করে তুলে দিচ্ছেন ভূমিদানপত্র। ভাস্করের হাতে মসীলিপ্ত সরস লেখনী। বাণের মনে হচ্ছে, দর্পশাত তার শুণ্ড দিয়ে ধরে রেখেছে এক মধুর রসযুক্ত ইক্ষুখণ্ড। ইক্ষুখণ্ড থেকে নির্গত হচ্ছে মধুর রস।

আদি বরাহজাত এই বর্মন রাজবংশ। বাণের মনে হল পরমোজ্জ্বল এই দর্পশাত স্বয়ং যেন আদিবরাহের মূর্তিমান দক্ষিণহস্ত।

দর্পশাত ভাস্কর, বাণের মনে বিচিত্র রঙের ইন্দ্রধনু সৃষ্টি করে চললো। বাণের কবিমনে, কল্পনার ইন্দ্রধনুর রং, নানা রঙের ধ্বনিতে রূপায়িত হল। মনের পটে সৃষ্ট হল অনবদ্য এক বাঙময় চিত্ররূপ। বাণ বীজমন্ত্রের মতো সঙ্গোপনে আবৃত্তি করলেন —

চিন্তাসাধন কল্পনাকুল ধিয়াং ভূয়ো বনে বিদ্ধিষাম।

আয়াতঃ কথমপ্যয়ং স্মৃতি পথং শূন্যীভবশ্চেত সাং

নাগেন্দ্র সহতে ন মানসগতানাশাগজেন্দ্রান পি ।। ”

দর্পশাত দুর্বার দর্পশাত ভয়ঙ্কর। মহারাজের হাতে পরাজিত হয়ে বহু নৃপতি পালিয়ে গেছেন গভীর অরণ্যে। অরণ্যবাসী নৃপতিগণ ভাবনা কল্পনায় আকাশ কুসুম রচনা করে চিন্তা করেন আবার তারা নষ্ট রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করবেন। এই চিন্তার সাথে সাথেই তাদের মানসনেত্রে ভেসে ওঠে, ভীষণ দর্পশাত ভাস্করের প্রতিচ্ছবি। মানসনেত্রে এমনি ভীষণ প্রতিচ্ছবি দেখে তাদের স্বপ্নে গড়া আকাশকুসুম কল্পনা ভেঙে খানখান হয়ে যায়। পরাজিত অরণ্যবাসী নৃপতিগণের মানস কল্পনার আকাশ কুসুম ভাবনা দর্পশাতের অসহ্য।

ব্যস্ত সমস্ত মেখলক, বাণের সঙ্গে হর্ষদেবের স্কন্ধাবার রাজসভায় প্রবেশ করে।

*　　　　*　　　　*

রাজসভার প্রবেশপথ থেকে দূরে অর্দ্ধশায়িত হর্ষবর্দ্ধনকে বাণ দেখতে পান। অস্তমান সূর্যের আভা বাতায়নের রক্তিম চীনাংশুক আবরণী ভেদ করে অর্দ্ধশায়িত হর্ষদেবের উপর পড়ছে। বাণ পায়ে পায়ে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের দিকে এগিয়ে চলেন। হর্ষদেবের দেহ এলিয়ে আছে শীতল পাথরের পালঙ্ক। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তার একান্ত কাছাকাছি বসে আছেন। অর্দ্ধশায়িত হর্ষদেবের পালঙ্কের একধারে তার বীণা। পালঙ্কের এদিকে ওদিকে সুন্দরী সেবাদাসীগণ চোখে মুখে যৌবন তরঙ্গলীলার পুষ্পবাণ ছুঁড়ে টলমল করছে। হর্ষদেবের চোখে সহজ হাসিচ্ছটা। সভায় সম্মিলিত সকলকে মৃদু-মধুর হাস্য বিলিয়ে কৃতার্থ করছেন।

ক্রমে বাণের চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে হর্ষদেবের রূপমাধুর্য। তিনি হিসাব করে দেখলেন, হর্ষদেবের বয়স সতেরো-আঠারো। এমনি বয়েসে এমন সুদীর্ঘ এবং বলিষ্ঠগঠন দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন। প্রশস্ত বক্ষস্থল। সুদৃঢ় সুপুষ্ট দুটি উরু। দীর্ঘ বলিষ্ঠ পেশীযুক্ত দুটি বাহু। উজ্জ্বল রক্তাভ গৌর দেহবর্ণ। দীর্ঘকেশ প্রান্তে মালতী ফুলের মৌলিমান। চিবুকে ঈষৎ কৃষ্ণ শ্মশ্রুরেখা। সুগঠিত সুগোল কন্ঠে স্বর্ণহার। কর্ণে হীরককুণ্ডল। কুণ্ডল বেষ্টন করে আছে সুগন্ধি পুষ্প। বাণের চোখে পড়ে কটি ভ্রমর সুগন্ধি পুষ্প আবর্তন করে উড়ছে। বাণের অনুভূতিতে ধরা দেয় হর্ষদেবের মানসিকতা। অজস্র হাসি, অজস্র কথার ফাঁকে ফাঁকে হর্ষদেব ভ্রমরের গুঞ্জন বীণাধ্বনি উপলব্ধি করছেন।

বাণ লক্ষ করলেন যে সুন্দরী বিলাসিনী হর্ষদেবের শ্রীচরণ সেবা করছিল তার হাত থেকে হঠাৎ খসে পড়ল হর্ষদেবের একটি সুপুষ্ট কমলচরণ। বিলাসিনী কেঁপে ওঠে। হর্ষদেব, বিলাসিনীর দিকে মধুর একখণ্ড হাসি ভাসিয়ে দিলেন। তিনি হেসে হেসে তার পাশে রাখা বীণা দিয়ে স্পর্শ করলেন বিলাসিনীর ফুলডোরে সাজানো মাথা।

বাণ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেবে চললেন হর্ষদেবের কথা। হর্ষদেবকে বিশ্বাস করা কি উচিত? হর্ষদেব তখন পালঙ্কে এলায়িত হয়ে সহজভাবে হাস্য পরিহাস করছেন। হর্ষদেবের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বাণের ষষ্ঠ অনুভূতি কথা বলে উঠল। হর্ষদেব সম্পর্কে বিশ্বাসের কথা। বাণ, হর্ষদেব সম্পর্কে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির সাথে আলাপ শুরু করলেন।

বাণ তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অনুভূতিকে প্রশ্ন করলেন "দুষ্ট কলিকালকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, হর্ষ কেমন ব্যক্তি?

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জবাব দিল —"কলিকাল উত্তর দিবে, হর্ষদেব দুর্গম্য। সে চেষ্টা করে ও হর্ষদেবের অন্তরে প্রবেশ করতে পারেনি।"

"হর্ষ সম্পর্কে পরস্ত্রীকে প্রশ্ন করলে, পরস্ত্রী কী জবাব দিবে ?"

বাণের এই প্রশ্নের উত্তর এল ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কাছ থেকে "পরস্ত্রী বলবে, মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন অপদার্থ।"

বারাঙ্গনার মনোভাব কী হবে? এই প্রশ্নের উত্তর এল, "বারাঙ্গনা চটুল হাসির সাথে বলবে,

হর্ষদেব মহাধূর্ত।'

বাণ, সহজভাবে হর্ষবর্দ্ধনের দিকে এগিয়ে গেলেন। ইতিপূর্বে মেখলক, দৌবারিককে বাণের পরিচয় প্রসঙ্গ জানিয়ে গেছে।

হর্ষদেবের সম্মুখে উপস্থিত হলে দৌবারিক অতিসংক্ষেপে হর্ষদেবকে বললেন —"উনি বাণভট্ট।"

দৌবারিকের কথা হর্ষদেবের কানে গেল কিন্তু তিনি বাণের দিকে তাকালেন না। হর্ষদেবের পাশে বসে ছিলেন তার প্রিয় বন্ধু মালবের রাজপুত্র। হর্ষদেব, মালবের রাজপুত্রের দিকে তাকিয়ে বাণ সম্পর্কে মন্তব্য করলেন "উনি এক মহাভুজঙ্গ।"

হর্ষদেবের মুখে "উনি এক মহাভুজঙ্গ" এই ভীষণ বাক্য শুনে রাজসভা স্তব্ধ। স্তব্ধ মালব রাজপুত্র। স্তব্ধ বাণ।

স্তব্ধ বাণের কর্ণে গুরুদেব ভর্ৎসুর কণ্ঠ ভেসে উঠে "বাণ ! সাবধান। সিংহের নখশীর্ষের মত, এই বক্র গুরুভার অঙ্কুশ, তোমার মাথার উপরে স্থাপিত। সে অঙ্কুশ সহ্য করবে না, তোমার সামান্যতম অবিনয়। সাবধান। বাণ ! সাবধান।"

বাণ সাবধান হলেন। বাণের মনে হল এই ভুজঙ্গ শব্দের উপমায় তাকে পরাজিত রাজা জয়নাগের লোক হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। জয়নাগ নামের নাগ অর্থ সর্প অর্থাৎ ভুজঙ্গ। নাগ বা সর্পের অন্য প্রতিশব্দ কাকোদর। ভাস্কর বর্মন এবং অন্যান্য নৃপতিগণ রাজা জয়নাগকে 'কাকোদর' শব্দের ছায়ায় কাক বলে বিদ্রূপ করতেন।

'দুর্বার গতিতে বাণের মাথায় চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হয়ে চলছে। তার সম্মুখে হর্ষদেব। হর্ষদেবের ঈষৎ পাশ ফেরা বলিষ্ঠ দেহ, এই সাথে মালতী মালায় আবদ্ধ মাথার দীর্ঘ কেশরাশি দেখে বাণের মনে হল হর্ষদেব এক স্পর্দ্ধিত সিংহ। কেশরফোলা সিংহ, এই মুহূর্তেঅস্তমান লোহিত সূর্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে স্তব্ধ করে দিয়ে সূর্যের অস্তগমন।

এমন পরিবেশে বাণের শিল্পচেতনা মুহূর্তের মধ্যে হর্ষ সম্পর্কে কিছু শব্দের মালা আপন মনে গেঁথে নিল। কেশরী হর্ষ পূর্বভারতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মুহূর্তে হয়তো স্পর্দ্ধা ভরে ভেবে ছিলেন, কাক জয়নাগ অথবা তীব্র বরাক নদী তাকে বাধা দিতে পারবে না। কেশরী হর্ষ আপন মনে হয়তো এমনি ভাবে চিন্তা করেছিলেন —

"ধৃত ধনুষি বাহুশালিনী শৈলা ন নমন্তি যত্তদাশ্চর্যম।

রিপু সংজ্ঞকেষু গণনা কৈব বরাকেষু কাকেষু।'

হস্তে ভীষণ ধনুকধৃত বীরকে দেখে, পাহাড় পর্বত তার সম্মুখে বিনত হয়। শত্রুর ভীষণ বিক্রম যার পদানত। সেই রুদ্র ভীষণকে বরাক অথবা কাক কী করতে পারে।

কল্পনায় বাণ, হর্ষের মুখে ছন্দোময় ভাষা বসিয়ে মনে হল মেখলক বলেছিল হর্ষদেব শিল্প সাহিত্যে আগ্রহী। তিনি বীণাবাদন এবং কবিতা রচনায় বিশেষ পটু।

এমনি ভাবনা চিন্তায় বাণ স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। এতক্ষণ ভয়ের যে ছায়া তাকে আচ্ছাদিত

করে রেখেছিল মুহূর্তের মধ্যে তা সরে গেল।

বাণ, হর্ষের কথার উত্তর দিলেন। হর্ষের কথা শুনে বাণের মনে প্রথম যে ধারণা হয়েছিল সেই জয়নাগ প্রসঙ্গের ধারে কাছে গেলেন না। বাণ স্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন, রাজাধিরাজ হর্ষদেবের ভুজঙ্গ উচ্চারণের মধ্যে স্পষ্ট অশ্রদ্ধার ইঙ্গিত আছে। অন্যের মুখে কোন কিছু শুনে এবং এই শোনা কথাকে বিচার বিশ্লেষণ না করে পরমসত্য বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। এই কথা বলে আবার হর্ষদেবের দিকে তাকালেন। হর্ষদেবের মুখ তখনো অন্যদিকে। হর্ষদেব, বাণের দিকে তাকালেন না।

বাণ, তখন তার আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। বললেন তিনি ব্রাহ্মণ, তিনি সোমরসপায়ী। যথাসময়ে তার উপনয়ন বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। বেদ অধ্যয়ন সাঙ্গ হয়েছে। বর্তমানে বিবাহ করে গৃহস্থ জীবনে প্রবেশ করেছেন।

হর্ষদেব, বাণের কথার কোন জবাব দিলেন না।

বাণ, কিছুক্ষণ নীরবতা পর হর্ষদেব উচ্চারিত 'ভূজঙ্গ' শব্দ প্রসঙ্গে বললেন "কা মে ভুজঙ্গাতা !" বাণের এমনি প্রশ্নে স্পষ্টত তিনটি ভাব প্রকাশ করে। বলাবাহুল্য, বাণ এমনি ধরনের শব্দাদি প্রয়োগে বিশেষ পারদর্শী। কা-মে ভুজঙ্গতা— এই বাক্যের প্রথম অর্থ হচ্ছে কী দেখলেন আমার ভুজঙ্গতা ? অর্থাৎ সর্পস্বভাবের লাম্পট্য ?

দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে 'কামেতেই বর্তমান আমার ভুজঙ্গতা। তৃতীয় অর্থ হচ্ছে কোন্ রমণীকে আমার ভুজবন্ধনে আবদ্ধ দেখলেন ?"

বাণ, ভুজঙ্গ শব্দকে কামকেন্দ্রিক করে বিশ্লেষণ করে চলছেন। তিনি বলেন, তার শৈশব ছিল চাপল্যে পরিপূর্ণ দুরন্তকাল। শৈশবের এই দুরন্ত চাপল্য, মানব জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ মাত্র। অন্যদিকে তার জীবনের কেশোরের প্রাণপূর্ণ উচ্ছ্বাস পূর্ণ চাপল্য, ইহলোক অথবা পরলোকের রীতিনিয়ম এই সাথে ধর্মীয়শাস্ত্রবিরোধী নয়।

বাণের মুখে আবার তাঁর স্বাভাবিক তীর্যক বাকভঙ্গিমায় উচ্চারিত কিছু বাক্য। এই বাক্যে তিনি ইতিমধ্যে উচ্চারিত তার বক্তব্যকে লৌকিক পারলৌকিক এই সাথে হর্ষদেবের রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থার সাথে সম্মিলিত করেন। তিনি বলেন "এমনি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার মধ্যে কেউ অন্যায় করতে পারে না।"

বাণের কণ্ঠে দুষ্ট সরস্বতী এসে ভর করেন। বাণ, তীর্যক ভাষার মিছরির ছুরি চালাতে আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, রাজাধিরাজ হর্ষদেবের সুগত বুদ্ধের মত সুশান্ত শাসনে ভ্রমরগণ তাদের একান্ত পানীয় মধু পর্যন্ত ভয়ে ভয়ে পান করে। চপল চঞ্চল শাখা মৃগগুলি পর্যন্ত রেখে ঢেকে তাদের চাঞ্চল্য প্রকাশ করে। চক্রবাক পক্ষীরা একান্ত লজ্জায় অতি সংগোপনে তাদের প্রিয় বধূদের জানায় সোহাগ। মাংসাশী পশুগণ, অনুকম্পায় বিগলিত হয়ে সলজ্জভাবে ভক্ষণ করে মাংস।

বাণ তার তীক্ষ্ণ ধার মিছরির ছুরি গুটিয়ে হর্ষদেবকে নিজের চরিত্র সম্পর্কে বলেন, সময় এবং সুযোগ এলে হর্ষদেব হয়তো বা তাকে কোনও দিন চিনতে পারবেন।

বাণের এমনি ক্ষুরধার বাক্যে হর্ষবর্দ্ধন প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেন না। তিনি, বাণের দিকে না তাকিয়েই বললেন—"আমার শ্রুতিগোচর হল।"

হর্ষদেবের সভাভঙ্গ হল।

* * *

বাণ সন্ধ্যার নীলছায়ার মাঝ দিয়ে তার আবাসস্থলের দিকে এগিয়ে চলেন। অজিরাবতী নদী তীরে মনিতার নগরী আলোকের মালায় সেজে উঠেছে।

তিনি গম্ভীরভাবে হর্ষদেবের মনোভাব বিশ্লেষণ করে করে এগিয়ে চলেন। নানা কথা, নানা কার্যকারণ বিচার বিশ্লেষণ করে তার মনে বিশ্বাস জন্মাল হর্ষদেব তাকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করেন না। হর্ষদেব, হয়তো বা রাজকীয় গাম্ভীর্যের মাধ্যমে তাকে সম্মোহিত করার চেষ্টা করছেন। মহারাজা হর্ষবর্দ্ধন হয়তো বা তাকে একান্ত কাছে পেতে চান।

বাণের ধারণা সত্য হল। পরদিন সূর্যোদয় মুহূর্তে মেখলক বাণের আবাসে এল। সে বাণের প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ দেহভঙ্গি প্রদর্শন করে জ্ঞাপন করল রাজাধিরাজ হর্ষদেব মহাপণ্ডিত বাণভট্টকে একান্তভাবে কাছে পেতে চান। হর্ষদেবের সাহিত্য সঙ্গীত প্রীতিপূর্ণ হৃদয় মহাজ্ঞানী বাণভট্টের সঙ্গ কামনা করে।

বাণ, হর্ষদেবের সাথে সাক্ষাৎ করে আপন করণীয় কর্মাদি সম্পর্কে জ্ঞাত হলেন। বাণ হিসাব করে দেখলেন তার হাতে এখন বহুমুক্ত সময় আছে।

তিনি প্রীতিকূটে না ফিরে কাছাকাছি বন্ধু বান্ধবের বাড়ী গিয়ে আড্ডা দিতে থাকলেন। আড্ডা। দীর্ঘ আড্ডা।

* * *

প্রায় মাস ছয়েক পর প্রীতিকূটে ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে গ্রীষ্ম বর্ষা শেষে শরৎকাল এসে গেছে। প্রীতিকূট সহ ব্রাহ্মণধিবাসের পথের কাদা তখন শুকিয়ে আসছে।

বাড়ীতে পৌছে তার মেজাজ খারাপ হয়ে উঠল। উঠান ভর্তি গোবরের ঘুঁটে আর ঘুঁটে। কিছু শুকিয়ে আসছে —কিছু সদ্য সাজানো। চারদিকে গোবরের গন্ধ। ঘুঁটে টপকে টপকে কিছু এগিয়ে এসে তার মেজাজ শান্ত হয়ে এল। ঘরের বারান্দায় সম্মুখে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঘেরা সোমলতার বাগান। সুপুষ্ট সোমলতা শরতের উজ্জ্বল দুপুরের রোদে ঝকঝক করছে।

* * *

বাণের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। মহারাজাধিরাজ সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন সম্মান প্রদর্শন করেছেন —প্রীতিকূটের মহাপণ্ডিত বাণভট্টকে। বাণকে দেখার জন্য মানুষ আসছে দলে দলে। ব্রাহ্মণাধিবাসে বপ্প ঘোষ বাট কালিকাশ্রম কাদম্বরী দেবকুলিকা পালিতক নৌ-ঘাটসমেত সমগ্র ময়ূর শাম্মল অগ্রহারের মানুষ প্রীতিকূটে এসে ভিড় করেছে। এত মানুষ এল, বাণ সকলের সাথে কথা বলার সুযোগ পেলেন না। পেলেন না আদর আপ্যায়ন করার সুযোগ।

সবাই চলে গেলে রাতের বেলায় একান্ত আপন জনের সাথে কথাবার্তা গল্প। আপনজনের

মধ্যে ছিলেন বাণের একজন জেঠামশাই। তাঁর নাম কবি। কবি অত্যন্ত গুরুগম্ভীর । সহজে কথাবার্তা বলেন না। কথাবার্তা না করার বিশেষ কারণ কথা বলতে গেলে মুখে কথা লাগে। পরিবারের এমন আনন্দ এবং গৌরবের শুভক্ষণে তিনি মুখ খুললেন। বললেন —'বন্ন ! আমরা খুব খু-খু খুশি। কারণ তুমি আলস্য পরিত্যাগপূর্বক প-প-পরমেশ্বরের সাথে দেখা করেছ।'

পরমেশ্বর অর্থাৎ মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন। বাণ, জেঠামশাইয়ের কথায় কিঞ্চিৎ ধাক্কা খেলেন। জেঠামশাইয়ের মুখেও তার আলস্য নিয়ে কথা।

কথাবার্তা শেষে গান। বায়ুপুরাণ থেকে পাঠ করলেন সুদৃষ্টি এবং সূচিবাণ। বাঁশী বাজাল মধুকর এবং পারাবত। গভীর রাত পর্যন্ত চলে এই সঙ্গীত উৎসব। বাণের পাশে তার কিশোর বয়স্ক জেঠতুতো ভাই শ্যামল। বাণ ওকে গভীর স্নেহ করেন। শ্যামল আবদারের সুরে বাণকে গল্প বলতে অনুরোধ করে। পরমেশ্বরের গল্প। বাণ গল্প বলতে আরম্ভ করেন। গল্পে গল্পে রাত ভোর হয়।

* * *

ভোর হতে না হতেই বহুলোক এল প্রীতিকূটে । বিষয় অত্যন্ত জরুরি। বাণকে এই কাজ করতেই হবে। কাজ হচ্ছে ময়ুর-শাল্মল অগ্রহায়ণে ব্রাহ্মণ্যাধিবাসের জন্য নূতন দানপত্র রচনা।

ইতিমধ্যে ভাস্কর বর্মন, কর্ণসুবর্ণ নগরীতে জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করেছেন। ভাস্কর বর্মন তার পিতা সুস্থিত বর্মন এবং জেষ্ঠ ভ্রাতা সুপ্রতিষ্ঠিত বর্মনের শাসনকালের সমস্ত বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীগণকে নতুনভাবে নিয়োগপত্র দান করে রাজকীয় কর্মে বহাল করেছেন। শ্রীগোপালকে চন্দ্রপুর বিষয়ের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে পঞ্চম মহাশব্দ উপাধি প্রদান করেছেন।

করালী ব্রাহ্মণ্যাধিবাসের ভূমির দানপত্র পুড়িয়ে ফেলেছিল। বর্তমানে ভূমিকর সম্পর্কীয় ..মস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। পুড়ে যাওয়া সেই দানপত্র, শ...নেক বছর আগে মহারাজ ভূতিবর্মন নির্মাণ করেছিলেন। মহারাজা ভূতিবর্মন, মহারাজা ভাস্কর বর্মনের ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা। মহারাজা ভূতিবর্মন, সেই তাম্রপত্র ভূমিচ্ছিদ্র নীতি অনুসারে প্রস্তুত করেছিলেন। ভূমিচ্ছিদ্র নীতি অনুসারে দানপত্র রচিত হলে ভূমিকর দিতে হয় না।

করালীর দানপত্র পুড়িয়ে দেবার ভীষণ কাণ্ডে ব্রাহ্মণ্যাধিবাসে ভূমিকর প্রদানের প্রশ্ন উঠেছিল। শ্রীগোপালের পরামর্শে এবং নারায়ণ দেবের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত ভূমিকর দিতে হয়নি। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ভূমিকর প্রদানের খড়গ মাথার উপর খাঁড়া হয়ে আছে।

ব্রাহ্মণ্যাবিবাসের ব্রাহ্মন্যগণের একান্ত অনুরোধ, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বাণকে নূতন তাম্রপত্রের খসড়া লিখে দিতে হবে।

বাণ, বিনীতভাবে প্রীতিকূটে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কথা শোনেন। বাণের চোখে ভেসে ওঠে করালী লেলিহান অগ্নিশিখায় তাম্রপত্র নিক্ষেপ করছে।

বাণের দৃষ্টি উপস্থিত সকলের মাথার উপর দিয়ে দক্ষিণাকাশে স্থির হয়। গাছের ফাঁকে, কুতকুট্ট মন্দিরের রক্তিম পতাকা বাতাসে কাঁপছে। তার দৃষ্টি কঠোর হয়ে আসে। তিনি স্থির করেন, নতুন তাম্রপত্র অবশ্যই রচনা করবেন। কিন্তু নূতন তাম্রপত্রে, 'কুতকুট্ট' নাম লেখা হবে না।

কুতকুট্ট স্থানে লিখা হবে 'বলিচরুসত্র'।

বাণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

দিন কয়েকের মাঝেই লোহিতাক্ষের লোহার পোতা কারখানা থেকে গোটা দশেক ঝকঝকে মসৃণ তাম্রপত্র এল। তাম্রপত্রের খোদাইকারী সম্পর্কে ভাবতে হল না। বাল্যবন্ধু কালিয়া আছে।

কালিয়া, ময়ূর শাল্মল অগ্রহারের সর্বত্র বাসনপত্রে নাম খোদাই করে থাকে। কালিয়া, বাল্যবন্ধু বন্নের প্রস্তাব শুনে প্রথমে আতকিয়ে উঠেছিল। বাণের অভয় দানে তাম্রপত্র খোদাই করতে রাজি হয়।

এক কৃষ্ণচতুর্দশীর গভীর রাতে বাণ তার আরাধ্য শিবপূজা সাঙ্গ করে দানপত্রের খসড়া লিখতে শুরু করলেন। সর্বপ্রথম তার আরাধ্য শিবস্তুতি লিখিত হল।

"প্রণম্য দেবং শশিশেখর প্রিয়ং পিনাকিনং ভস্মক নৈর্বিভূষিতং ।

বিভূতয়ে ভূমিতাং দ্বিজন্মনাং করোমি ভূয়ঃ স্ফুট বাচমুজ্বলাং ।।'

ক্রমশ মহারাজ ভাস্কর বর্মনের বংশাবলীর নামধাম পরিচয় লিখে সমাপ্ত করলেন। এরপর সমস্যা তীব্র হয়ে উঠে। ভূতিবর্মনের মূল তাম্রপত্র হাতে নেই। করালী পুড়িয়ে দিয়েছে।

শ্রীক্ষিকুণ্ড বর্মন রাজবংশের ভূমি জরিপ সংক্রান্ত বিষয়ের প্রাচীন এবং অভিজ্ঞ রাজ কর্মচারী। ক্ষমতায় এসে ভাস্কর বর্মন তাকে "সীমা প্রদাতা চন্দ্রপুরি নায়ক" পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীক্ষি কুণ্ড, ভূমির মাপজোক, এবং দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণগণের নাম গোত্র সহ একটি তালিকা প্রস্তুত করে বাণের হাতে অর্পণ করলেন।

উল্লেখ্য, ভূতি বর্মনের ভস্মীভূত দানপত্র প্রায় শতবর্ষ পূর্বে রচিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে জনসংখ্যা এবং ভূমি ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে বিপু- পরিমাণে। ভূমিভাগ বৃদ্ধিপেয়েছে গঙ্গিনিকা এবং কৌশিকা নদীর নব নব চরভূমি সৃষ্টির মাধ্যমে। দানপত্রে, নবসৃষ্ট ভূমির বিতরণ এবং এই সাথে চরভূমির মাধ্যমে ভবিষ্যতকালে যে নবভূমিভাগ সৃষ্ট হবে, সেই ভূমির বিতরণ ব্যবস্থার নির্দেশ প্রদান করা হল।

তাম্রপত্র খোদাই করার পদ্ধতি হিসাবে বাণ খসড়া পত্রের উল্টো দিকে ভুসোকালি মাখিয়ে, তাম্রপত্রে ছাপ তুলে দেন। কালিয়া ছাপের উপর বাটালি চালিয়ে আখর সমূহ স্পষ্ট করে তুলে।

কিন্তু তাম্রপত্র রচনা সহজ হল না। তামার পাতে বাটালি চালানোর কালে কালিয়ার হাত লেগে ভুসো কালি ছাড়িয়ে যায়। বাণকে যখন তখন কালিয়ার কাছে যেতে হয়। অন্যদিকে বাণের কাছে অনবরত অজস্র মানুষের আনাগোনা। তাম্রপত্রে দানগ্রহীতা রূপে তাদের নাম ঢুকিয়ে দেওয়া ভূমির পরিমাণে বৃদ্ধি করে লেখা—এই সব তাদের আবেদন নিবেদন। ফাঁকতালে কালিয়ার কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদন প্রলোভন রক্তচক্ষু প্রদর্শন।

বিষয়টির সহজ সমাধান করলেন শ্রীগোপল। বাণ এবং কালিয়াকে তাম্রপত্র রচনার জিনিস পত্র সহ পাঠিয়ে দিলেন কর্ণসুবর্ণ নগরীতে। সেখানে ভাস্কর বর্মন, জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করেছেন। কর্ণসুবর্ণে গিয়ে কালিয়া এহ সাথে বাণ, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। দ্রুত কাজ এগিয়ে চলে।

নানা কার্যকারণে, অতিক্রুত তাম্রপত্র নির্মাণ কর্ম সমাপ্ত করার নির্দেশ প্রদান করেন শ্রীগোপাল।

কালিয়া অতিক্রুত তাম্রপত্রের খোদাই কর্ম শেষ করার জন্য তার পূর্বপরিকল্পনা পরিত্যাগ করে, আখর গুলি বাটালির আঘাতে আঘাতে কৌণিক ভাবে নির্মাণ করতে শুরু করে। গোল এবং শিল্পমণ্ডিত লতানো আখর নির্মাণে বহু সময়ের প্রয়োজন। বলাবাহুল্য, তাম্রপত্রের উপর ভুসো কালিতে অস্পষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতি আখরগুলিকে কালিয়া সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে কাজ করে চলে।

ভাস্কর বর্মনের এই দানপত্র রচনায় সাতটি তাম্রপত্র ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম তাম্রপত্র থেকেই কালিয়ার দৌরাত্ম্যপনা শুরু হয়েছে। এই পত্রে বাণের স্বহস্ত লিখিত হেতুঃ, চক্রভূঃ, নরক ঃ, ক্ষিতীশ্বর, সমুদ্র ঃ, আরো বহু শব্দের বিসর্গগুলি ছেঁটে দিয়েছে। এই প্রথম পত্রে বাণ লিখিত দত্ত দেব্যাং, রত্নবত্যাং, ইত্যাদির অনুস্বার লোপাট করে দিয়েছে। দানভূমির অঞ্চলের নাম ময়ূর শাল্মল। এই নামের 'ময়ূর' শব্দের দীর্ঘ উকারকে বানিয়েছে হ্রস্বউকার। দানগ্রহীতা অধিকাংশ ব্রাহ্মণের উপাধির শেষ অংশ 'স্বামী' কালিয়া এইসব নাম লিখতে গিয়ে প্রথম থেকেই স্বামী শব্দের স্থানে লিখে গেছে শুধুমাত্র 'স্বা'।

কালিয়া তার নিজস্ব উচ্চারণ ভঙ্গিতে দানগ্রাহীতাদের নামের উচ্চারণ পালটিয়েছেন । প্রদত্ত ভূমিসীমার একদিকে আছে 'খাসোক পুষ্করিণী'। কালিয়া তার নিজস্ব উচ্চারণে খোদাই করেছে 'পুষ্কিরিনী'। বাণের নিজের গোষ্ঠীর জনেক দান গ্রহিতার নাম 'কুষ্মাণ্ড পত্র'। খোদাই করেছে কুষ্মাণ্ডপত্র। মহেশ্বর স্বামী, তার বাটালির আঘাতে হয়ে উঠেছে 'মঘেশ্বর স্বা'।

কালিয়া দ্রুত খোদাই করে চলে। সপ্তম সংখ্যক তাম্রপত্র খোদাই করতে এসে দারুণ উত্তেজিত। এই অংশে বিখ্যাত সব মানুষের সাথে খোদাই হবে কালিয়ার নাম।

'সেক্যকার কালিয়া' অর্থাৎ তাম্রপত্রের খোদাইকারী কালিয়া।

কালিয়ার নিজের নাম খোদাই করার আগে মাত্র তিনটি নাম খোদাই করা বাকি। তিনটির নামের প্রথম নাম কালিয়ার প্রিয়বন্ধু বাণের নাম। বাণের নাম খোদাই করার আগে তার বাটালি উদাস হয়ে থেমে গেল। বাণ তার আবাল্য বন্ধু। বাণ, পরমেশ্বরের কাছ থেকে সম্মান পেয়েছে তবু কালিয়াকে ভোলেনি। এত বড়ো কাজের জন্য তাকে ডেকে এনেছে।

সাধারণ তাম্রপত্রে সম্পূর্ণ নাম লিখার রীতি প্রচলিত। বাণ, তাম্রপত্রের রচনাকারী এই সাথে তাম্রপট্টের উপর ভুসোকালি দিয়ে লিখে দিয়েছেন তাম্রপত্রের বিষয়বস্তু। তিনি, তাম্রপট্টে উপর নিজের হাতে লিখে দিয়েছেন ঃ "শাসইতা লেখায়িত চ বসুবাণ।"

কালিয়া বাণের কথা ভাবে। বাণ নামে সবাই তার এই প্রিয় বন্ধুকেই জানে। বাণের অন্যসব আত্মীয়-পরিজনদের নামের সাথে এই বাণ শব্দ সংযুক্ত। যেমন বারবাণ বাসবাণ অনঙ্গবাণ সূচিবাণ। কিন্তু তার এই প্রিয় বন্ধুর বেলায় আস্ত নাম বসুবাণ বলার প্রয়োজন রাখে না। শুধুমাত্র এই রাজকীয় তাম্রপত্রে বাণ নিজের হাতে তার সম্পূর্ণ নাম বসুবাণ লিখে দিলেন।

বাণের নামের আগে "শাসইতা লেখায়িতচ" খোদাই করে সে তার বাল্য স্মৃতির স্রোতে ভেসে যায়। বাণকে, তার বাল্যবন্ধুরা "বস্ন" বলতেন। কালিয়ার জিহ্বায় নাম হয়ে যেত বস্তু। বস্তু উচ্চারণ শুনে বাণ হাসত বলত। বস্তু অর্থ ষাঁড়। কালিয়া লজ্জা পেত। চিন্তায় ডুবে ডুবে

কালিয়ার বাটালি, বসুবাণ স্থানে খোদাই করল বসুবন্ন। কালিয়ার চিন্তার স্রোত উজিয়ে চলে। বাটালি বন্ন শব্দের উপর ছোট্ট হালকা একটি আঘাত হানে। 'ন্ন' এর উপর সৃষ্ট হয় একটি রেফ চিহ্ন। সম্পূর্ণ নামটি হয়ে উঠল বসু বর্ন্ন।

বসু বর্ন্ন খোদাই করে বাটালি চলে গেল পরবর্ত দিবাকর প্রভঃ নামের স্থানে। দিবাকর প্রভ খোদাই করে চোখে পড়ে তৃতীয় নাম । তৃতীয় নাম দত্তকার পূর্ণ। এখানে নামের মাথার রেফ আছে। এই রেফ দেখে তার চোখে ধরা পড়ল প্রিয়বন্ধু বন্ন নামের উপর ভুলবশত রেফ পড়ে গেছে। দিবাকর প্রভ নাম লিখা শেষ হয়নি। নামের শেষের বিসর্গ খোদাই হয় নি। বিসর্গ খোদাই করা হল না। তৃতীয় নাম খোদাই করা হল। দত্তকার পূর্ণ নামের 'পূর্ণ' শব্দ তার বাটালিতে খোদিত হল 'পুন্নো'।

দুটি নামের মধ্যে 'রেফ' উল্টোপাল্টা করে কালিয়া মনে মনে শান্তি লাভ করল।

তাম্রপত্রের ভুলভ্রান্তি শেষ পর্যন্ত যদিও বাণের চোখে ধরা পড়েছিল—কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায় ছিল না। দানপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করার তিথি স্থির হয়ে গেছে।

*　　　　*　　　　*

শুভ দিনে, ব্রাহ্মণ্যা ধিবাসের করালীর দখল করা চণ্ডিকা মন্দিরের বলিচরুসত্রের প্রাঙ্গণে, ভাস্কর বর্মনের এই দানপত্র ঘোষিত হল। পাঠ করলেন বাণ। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রপুর বিষয়ের শাসনকর্তা, প্রাপ্ত পঞ্চ মহাশব্দ শ্রীগোপাল, চন্দ্রপুরিনায়ক সীমাপ্রদাতা শ্রীক্ষিকুণ্ড। শ্রীগোপালের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন ন্যায় করণিক জনার্দন স্বামী, ব্যবহারি হরদত্ত, কায়স্থ দুন্ধুনাথ এবং অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি।

বলিচরুসত্রের প্রাঙ্গণ পূর্ণ করে উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণ্যাধিবাসের দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণ্যর এবং তাদের আত্মীয়স্বজন। ভাস্কর বর্মনের এই তাম্রপত্র প্রদান উৎসব প্রত্যক্ষ করতে এলেন, দূর-দূরান্তের বহু মানুষ।

তাম্রপত্র পাঠ সমাপ্ত হলে শ্রীগোপাল ঘোষণা করেন মহারাজা হর্ষবর্দ্ধন মহাপণ্ডিত বাণভট্টকে তার সভাপণ্ডিত পদে অলংকৃত করতে অনুরোধ করেছেন। সমবেত জনতা, আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে আনন্দ প্রকাশ করল।

দিনক্ষণ বিচার করে এক প্রভাতে বাণ, হর্ষবর্দ্ধনের রাজধানী স্থান্বীশ্বরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাণ স্থান্বীশ্বরের পথে যাত্রা করলেন। শ্রীগোপাল যাত্রার রাজকীয় ব্যবস্থা করতে চেয়ে ছিলেন। বাণের একান্ত ইচ্ছা অতি সাধারণভাবে কোনও পূর্ব সংবাদ বা প্রচার না করে রাজধানীতে পৌঁছা। নদী এই সাথে সমুদ্রপথ দিয়ে চন্দ্রপুর অঞ্চল থেকে ভারতবর্ষের বিস্তারিত অঞ্চলে গমনা-গমন, মাঝি মাল্লাদের কাছে জলভাত। ব্যবসায়ীগণের নিত্য আনাগোনা। গঙ্গা এই সাথে অন্যসব নদী এবং সমুদ্রপথে পশ্চিম ভারত থেকে নানা শ্রেণীর মানুষজন পূর্বভারতে এসে বসবাস শুরু করেছেন। বিশেষ করে দেড় দুই শত বৎসর আগে গুপ্তরাজাদের সময়কালে পশ্চিম ভারতের মহারাষ্ট্র গুর্জর রাজস্থান এ সকল অঞ্চল থেকে, বহু ব্রাহ্মণ্যগণকে ভূমিসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করে পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। বাণের সময়কালে পশ্চিম ভারত থেকে আগত লাট অঞ্চলের দ্বিজগণ বিশেষ শ্রদ্ধেয় এবং সম্মানিত ব্রাহ্মণ। পশ্চিম থেকে আগত ব্রাহ্মণগণ চন্দ্রপুরসহ অন্যান্য অঞ্চলে যজ্ঞসহ নানা বৈদিক দেবতাদির পূজা আর্চার প্রচলন করেছেন। শুধু যজ্ঞাদির প্রচলন নয়, এই সাথে তারা পূর্বভারতীয় অঞ্চলের বহু ভৌগোলিক বিভাগের নব নব নামকরণ করেছেন। পশ্চিম ভারতীয় অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ তাদের মনোজগতে বহন করে আনয়ন করেন তাদের পরিচিত এবং প্রিয় কিছু স্থান নাম। এসব নামের বীজ বপন করেন নবাগত ভূখণ্ডে। বীজ অঙ্কুরিত হয়। পূর্বভারতীয় অঞ্চলে বহু জনপদ নদী পাহাড় নতুন নামে সেজে ওঠে। পূর্বভারতীয় অঞ্চলে অঙ্কুরিত এসব নতুন নামের মধ্যে উল্লেখ্য —বিন্ধ্য কৈলাস মহাকাল কনকলস দশন লাতু ইটা প্রভৃতি।

পালিতক নৌ-ঘাট থেকে বাণ তার সুদীর্ঘ যাত্রা শুরু করলেন। তার যাত্রা শুরু হল মস্ত এক সদাগরি নৌকায়। তাঁর মনে পড়ে মস্করী অর্থাৎ পর্যটক তাম্রচূড়ের কথা। সে অনেকদিন আগে, যখন রাজা জয়নাগ কামরূপ আক্রমণ করেছিলেন তখন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিল চন্দ্রপুর নগরী থেকে স্থান্বীশ্বর নগরী আটশত ক্রোশ দূরে। তাম্রচূড় এই দূরত্ব জলপথের হিসাবে করেছিল।

বাণ, তার দীর্ঘ যাত্রাপথ সম্পর্কে অনেক দিন ধরে নানা জল্পনা কল্পনা চিন্তা ভাবনা করেছেন। নৌকা পালিতক ঘাট থেকে প্রথমে গঙ্গার স্রোত বেয়ে উত্তর দিকে যাবে। তারপর নৌকা পশ্চিম মুখী হয়ে এগিয়ে যাবে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নৌকা স্রোতের বিপরীত দিকে অগ্রসর হবে। তাছাড়া নানাঘাটে নৌকা বদলাতে হবে। নানা ঘাটে নৌকা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য অপেক্ষা করবে। রাতের বেলা নোঙর করে থাকবে। এই সাথে বাণের মনে কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা আছে সেটি হচ্ছে

পথের ধারে কিছু তীর্থস্থান দর্শন করা।

চলার পথেব সূক্ষ্ম হিসাব নিকাশে তাঁর মনে হয়েছে, নৌকা প্রতিদিন চার ক্রোশের বেশি এগিয়ে যেতে পারবে না। প্রতিদিন চার ক্রোশ পথ এগিয়ে চলা এই হিসাবে তার ধারণা হলে আটশত ক্রোশ পথ প্রায় দুইশত দিনের পথ। দুইশত দিন প্রায় সাত মাস।

* * *

নৌকা পরিবর্তন করে করে স্থান্বীশ্বরের সরস্বতী নদীর ঘাটে পৌছে বাণ হিসাব করে পেলেন পথে দুইশত পনেরো দিন কেটেছে। তিনি তার পথ চলাকালে ভেবে চিন্তে স্থির করেছেন প্রথমেই সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সাথে দেখা করবেন না। স্থান্বীশ্বরে দিন কতক হবে তার অজ্ঞাতবাস। অখ্যাত এবং নগণ্য কোনও এক পান্থশালা হবে তার অজ্ঞাতবাসের আশ্রয় স্থান। অজ্ঞাতবাসকালে তিনি স্থান্বীশ্বর নগরী এবং তার লোকজন সম্পর্কে কিছু ধারণা সংগ্রহ করবেন। সরস্বতী নদীর নৌঘাটের কাছাকাছি পেয়ে গেলেন এই আদর্শ পান্থনিবাস।

স্থান্বীশ্বর নগরী দর্শন সেই সাথে নগরীর লোকজন সম্পর্কে কিছু ধারণা সংগ্রহ করার সুমহান বাসনা ভুলে গিয়ে পান্থনিবাসে রাত দিন ঘুমাতে লাগলেন। স্নান আহ্নিক ভোজনও গভীর নিদ্রার মাঝ দিয়ে তার দীর্ঘ ছয়দিন কেটে গেল। ছয়দিনের পর মনে হল স্থান্বীশ্বরী নগরী দেখা উচিত। পথে নামার আগে পান্থশালার ঝাপসা আয়নার নিজের মুখ প্রত্যক্ষ করলেন। মনে হল, তিনি শকুন্তলা নাটকের দুর্বাসার অভিনয় করবেন। কাছাকাছি নরসুন্দর ছিল। নরসুন্দর ক্ষুর চালিয়ে তাকে সাজিয়ে দিল। সাধারণভাবে সাজগোজ করে পথে নামলেন। আরোহণ করলেন, অতিসাধারণ একটি এক ঘোড়ার টানা গাড়িতে। গাড়োয়নকে জানালেন মনোবাসনা। মনোবাসনা হচ্ছে স্থান্বীশ্বর নগরী দর্শন। পরিক্রমা শুরু হল। গাড়োয়ান খুশী। সে তার ইচ্ছামতো পথে গাড়ি নিয়ে চলছে।

বাণের ভালো লাগছে স্থান্বীশ্বর নগরী। ছিমছিমে সাজানো গুছানো। নগরী দেখে দেখে তাঁর মাথায় তাঁর একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট পূর্ণ সাহিত্যাদর্শ খেলা শুরু করল। বাণ ভাবলেন, কোন মুনি বা ঋষিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় "গুরুদেব ! স্থানীশ্বর নগরী কী ধরনের নগর ?" বাণের মাথায় এর উত্তর এল গুরুদেব বললেন "আহা" স্থান্বীশ্বর হচ্ছে পবিত্র তপোবন। বানের মাথায় এল, এমন প্রশ্ন যদি কোন বেশ্যাকে করা যায় তাহলে বেশ্যা নিশ্চয়ই উত্তরে বলবে "স্থান্বীশ্বর হচ্ছে কামদেবের রাজধানী।" সৈনিক প্রশ্নের উত্তরে বলবে —"বীরক্ষেত্র"। বিদ্যার্থী বলবে "গুরুকুল"। নটদের কাছে হবে "গন্ধর্ব নগরী।" শত্রুদের কাছে যমপুরী। কামী পুরুষদের কাছে "অপ্সরা দেশ।

গাড়ি সরস্বতীর তীর ধরে চলছে। নদীর তীরে পাশাপাশি দুটি মৃত্যুশিলা। মৃত্যুশিলার চারদিকে সুন্দর ফুলের বাগান। গাড়োয়ান বলে, মহারাজ প্রভাকর বর্দ্ধন এবং তার মহারাণী যশোবতীর মৃত্যুশিলা। বছর আড়াই তিন আগে এদের মৃত্যু হয়েছে।

বাণের কানে আসে গাড়োয়ানের কথা। সে আপনমনে কথ্যভাষায় কী সব বলছে। বাণ, ইতিপূর্বে যখন, পশ্চিমসহ উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন তখন এই অঞ্চলের কথ্যভাষার সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। বাণ, কান পেতে শোনেন গাড়োয়ান বলছে — "ওরে ভণ্ড ! ওরে

পাপী! দেবী দেবতাদের খুন করে, মূর্তিশিলা বানিয়ে ভণ্ডামি করছিস কেন?

বাণ, গাড়োয়ানকে এমন কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। গাড়োয়ানের ধারণা ছিল, গাড়ির আরোহী মগধের লোক। কথাবার্তা বুঝতে পারবে না। বাণকে মগধের অধিবাসীরূপে কল্পনার কারণ চন্দ্রপুরাদি অঞ্চলে মগধের পোশাক পরিচ্ছদ এবং বহু সামাজিক রীতিনীতি প্রচলিত। বাণের পরিধানে মাগধীয় পোশাক।

গাড়োয়ান কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে বলে "স্থাথীশ্বরের সম্রাট, হর্ষবর্দ্ধনের হাত, অসংখ্য খুনের রক্তে রঞ্জিত।"

গাড়োয়ানের মুখে ভীষণ কথা শুনে বাণ চমকিয়ে উঠেন। তার ষষ্ঠইন্দ্রিয় তাঁকে সাবধান করে। মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকেন।

গাড়ি চলতে শুরু করে। নিস্তব্ধতা কাটে গাড়োয়ানের গানের গুনগুন সুরে।

নিয়তির্বিধায় পুংসাং প্রথমং সুখমুপরি দারুণং দুঃখম

কৃত্বালোকং তরলা তভিদিব বজ্রং নিপাতয়তি।

বাণ বিস্ময়ে চমকে ওঠেন। সুরসেনী প্রাকৃতের কথ্য ভাষাভাষী গাড়োয়ান বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় গান গাইছে। প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ সুস্পষ্ট এবং বিশুদ্ধ। গানের বিষয় হচ্ছে নিয়তির খামখেয়ালির স্বেচ্ছাচারিতা। নিয়তি প্রথমে সুখসমৃদ্ধির কথা বলে মানুষের গৃহে প্রবেশ করেই মেয়েদের তার ভীষণ দুঃখের কালোপাখা। নিয়তি তরলিত মধুর স্নিগ্ধ আলোর আশ্বাস দিয়ে এসে ঘটায় ভীষণ বজ্রপাত।

"ঘটায় ভীষণ বজ্রপাত" ভাবতে না ভাবতেই, বাণ হুমড়ি খেয়ে ছিটকে পড়েন গাড়ির বাইরে। অন্য গাড়ির ধাক্কায় দুর্ঘটনা ঘটছে। অন্য গাড়ির আরোহী কেউকেটা একজন রাজকর্মচারী। কোতোয়াল, বাণ গাড়োয়ান এই সাথে গাড়ি আটক করে।

জ্যেষ্ঠ, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ কোতোয়ালদের হুঙ্কার। গাড়োয়ান তার মাথার পাগড়ি খুলে, পাগড়ি দিয়ে চোখ মুখ প্রায় ঢেকে মাথা নিচু করে মেঝের উপর বসে আছে। বাণের মনে হল, বেচারা গাড়োয়ান ভীষণ ভয় পেয়েছে।

বাণ সময় সুযোগমতো তার কোমরে বাঁধা থলে থেকে রুপার চকচকে একটি আস্ত টাকার টোপ ফেলেন। কনিষ্ঠ কোতোয়াল একজন বড়শি গিলে। বাণ সংক্ষিপ্ত পত্র লিখেন "কৃষ্ণদেব ; রাজপ্রাসাদ। বাণভট্ট ; কোতোয়ালি।' কনিষ্ঠ কর্মচারী লম্বা ছুট দেয়। ফিরে এসে এমনি চকচকে আস্ত একটি রুপার টাকা পাবে।

দেখতে না দেখতে ঝড়ের বেগে কৃষ্ণদেবের পাঁচ ঘোড়ার টানা রথ কোতোয়ালির সম্মুখে হাজির। কোতোয়াল বাহিনীসহ কোতোয়ালী কম্পিত। গাড়োয়ান বাণের হাত ধরে বলে সে যে সব কথাবার্তা বলেছে সে সব মিথ্যা কথা। বাণ, সাবধানে একান্ত গোপনীয়ভাবে তাকে বলেন, সে যেন সুযোগমতো দেখা করে।

গাড়োয়ান মুক্ত হয়ে পালিয়ে যায়। কোতোয়ালিতে পড়ে থাকে তার পাগড়ি এই সাথে

ঘোড়া সহ গাড়ি।

বাণকে নিয়ে কৃষ্ণদেব রাজকীয় পান্থশালায় প্রবেশ করেন। বাণের জন্য নির্দ্ধারিত হয় বিশেষ একটি প্রকোষ্ঠ। বাণের মনে পড়ে, তার ভ্রমণকালে গুরুদেব ভর্ৎসুর জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছিল রাজকীয় পান্থশালার বিশেষ এই কক্ষটি।

কৃষ্ণদেব, সাধারণ কুশলবার্তাদি জিজ্ঞাসা করে বলেন, আগামী পরশু সকালবেলা তিনি এসে বাণকে রাজসভায় নিয়ে যাবেন । বাণ যেন প্রস্তুত হয়ে থাকেন।

নির্দ্ধারিত দিনের ভোরে কৃষ্ণদেব এসে বাণকে জাগালেন। ঘুম ভেঙেই বাণের মনে হল, তিনি আজ রাজসভায় যাবেন। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের মুখোমুখি বসবেন। তার মেরুদণ্ড বেয়ে তীব্র শিহরণ প্রবাহিত হল।

কৃষ্ণদেব সঙ্গে করে এনেছেন গৌড়দেশীয় মহার্ঘ্য সুক্ষ্ম রেশম পট্ট এবং কার্পাস বস্ত্র। সাদা ফুলফুলের মালা। পদ্মপাতায় শ্বেত চন্দন পঙ্ক এই সাথে একটি ক্ষুর।

বাণের স্নান আহ্নিক শেষ হলে কৃষ্ণদেব বলেন, তিনি এখন জীবন নাটকের অসাধারণ এক মহানায়কের প্রসাধন করবেন। কৃষ্ণদেব নিজের হাতে বাণের গোঁফ দাঁড়ি মুণ্ডন করে অঙ্গে নববস্ত্র পরিয়ে দিলেন। মাথায় বেঁধে দিলেন শ্বেতপট্ট বস্ত্রের উষ্ণীষ। ললাটে শ্বেতচন্দন। গলায় শ্বেত পুষ্প মালা। সাজগোজ শেষ হলে বাণ একটি শ্বেতপুষ্প তাঁর গ্রন্থিশিখায় স্থাপন করলেন।

পাঁচ ঘোড়ার রথে বাণের যাত্রা শুরু হল। বাণের পাশে কৃষ্ণদেব। রথের সম্মুখে দিয়ে রাজকর্মচারীগণ, সাদা পোশাকে এবং সাদা ঘোড়ায় চড়ে অনবরত ঘোষণা করে চলছে চন্দ্রপুরের মহাপণ্ডিত, বশ্যবাণী কবি চক্রবর্তী শ্রী শ্রী বাণভট্ট রাজসভায় গমন করেছেন।" রাস্তার দুধারের বাড়ীঘরে দরজা জানালা খুলে সবাই দেখছে রাজকীয় পাঁচঘোড়ায় টানা গাড়িতে উপবিষ্ট বাণকে। কোন কোন বাড়ী থেকে বাণের রথে পুষ্প বৃষ্টি হচ্ছে।

গাড়ি রাজসভার কাছাকাছি পৌছায়। সেখানে মস্ত এক স্বাগত তোরণ। তোরণ নানা ফুল পাতা এবং পতাকায় সাজানো। কৃষ্ণদেবের ইঙ্গিতে তোরণের সম্মুখে রথ থামে।

সেখানে বাসন্তীরঙের চীনাংশুক বস্ত্রে সজ্জিতা এক ঝাঁক মোহিনী নারী। পুষ্পালঙ্কারে ভূষিতা। হাতে পুষ্প স্তবক, সুগন্ধি জলের ঝাড়, শঙ্খ। মোহিনীদলের প্রধানা রথের কাছে এসে বাণের কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন শ্বেত সুগন্ধি পুষ্পমালা। বেজে ওঠে অজস্র শঙ্খ। মুক্ত হয় গন্ধবারির নির্ঝর। ফুলে ফুলে ভরে উঠে রাজকীয় রথ।

বাণ লক্ষ করেন, মোহিনী শ্রেষ্ঠা তার গলায় মাল্যদান করে মুগ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। বাণের মুগ্ধদৃষ্টি বর্ষিত হয় মোহিনীশ্রেষ্ঠার স্বপ্নিল চোখে। ক্রমে মুগ্ধদৃষ্টি বিগলিত হয়ে আলিঙ্গন করে মোহিনীর প্রতি অঙ্গে। বাণ স্থান কাল ভুলে তাকিয়ে থাকেন তার দিকে। তন্ময় বাণ কে এই নারী ? একি স্বপ্ন ! একী পূর্ব জন্মের সুহৃদ -সখা-বধূ ?

কৃষ্ণদেব বাণকে নিয়ে প্রবেশ করেন রাজসভায়। কৃষ্ণদের আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন বাণের পরিচয়। দাঁড়িয়ে উঠে স্বাগত করেন রাজ সভায় উপস্থিত সকল সামন্ত নৃপতি রাজকর্মচারী

বণিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বাণ উপবেশন করেন তার জন্য নির্দ্ধারিত আসনে।

বাণ, সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের প্রতি প্রণাম নিবেদন করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেন হর্ষদেবকে। অনেকদিন পূর্বে তাকে প্রথম দেখেছিলেন আদ্যরাজা ভাস্কর বর্মনের কুলাচল প্রাসাদের স্কন্ধাবারে। বাণের মনে হল হর্ষদেবের পোশাক পরিচ্ছদ অলঙ্কার এমনকী রাজসভায় তার অর্দ্ধশয়ান ভঙ্গিটি যেন একই ধরনের।

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন, ইন্দুকান্তমণির পালঙ্কে অর্দ্ধশয়ান। পালঙ্কের উর্দ্ধদেশে শ্বেত শুভ্র চন্দ্রাতপ। মণিময় স্তম্ভগুলিতে সোনার শিকলে ঝোলানো, মুক্তোফলে নির্মিত পুষ্পগুচ্ছ। রাজসভার চতুর্দেয়াল ছুঁয়ে, স্তবকে স্তবকে সেজে দাঁড়িয়ে আছে রূপসী বারবিলাসিনী। স্বর্ণদণ্ডের চামর মৃদুমন্দ আন্দোলন করে বাতাস করছে, সুন্দরী যুবতীর দল।

হর্ষদেবের প্রতি অঙ্গ শ্বেতচন্দনে চর্চিত। গলায় পুষ্পমাল্যসহ সূক্ষ্ম সোনার হার। বাহুতে স্বর্ণ কেয়ূর। মণিমুক্তার মুকুটে মালতী ফুলের মালা। হাতে বীণা।

বাণের চোখে পড়ে কিছুদিনের মাঝেই হর্ষদেবের দেহে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। কৈশোর ভেঙে উঁকি দিচ্ছে যৌবন।

হর্ষদেব বাণের দিকে তাকিয়ে তাঁর দক্ষিণ হাত তুলে ধরেন। মুখে স্নিগ্ধ হাসি। বাণ অঞ্জলি বদ্ধ হাতে উঠে দাঁড়ান। রাজসভার গুঞ্জন থেমে যায়। থেমে যায় সুন্দরীদের হাতের স্বর্ণচামর। উঠে দাঁড়ানোমাত্র বাণের মনে হল এতক্ষণ তিনি সংলাপবিহীন রাজসভা পণ্ডিতের মূক অভিনয় করছিলেন। এবারের অভিনয়ে যুক্ত হবে সংলাপ। কিন্তু সংলাপ তো লেখা হয় নি। হঠাৎ তার কানে ভেসে উঠল সংলাপ। জীবন নাটকের পার্শ্বচরিত্র এক ঘোড়ার টানা গাড়ির গাড়োয়ান। গাড়োয়ানের কণ্ঠে সংলাপ "হর্ষবর্দ্ধনের হাত খুনের রক্তে লাল।" এরপর গুরুদেবের কণ্ঠে অন্য সংলাপ 'রাজ হস্ত, সিংহের রক্তাক্ত নখর।'

গুরুদেবের কণ্ঠসংলাপে সৃষ্ট হল বাণের সংলাপ। উচ্চারিত হল —

"জয়তি জ্বলতপতাপ জ্বলন প্রাকার কৃত জগদ্রক্ষঃ

সকল প্রণয়ি মনোরথ সিদ্ধি শ্রীপর্বতো হর্ষঃ

জয়হোক মহারাজাধিরাজ হর্ষদেবের। হর্ষদেব তার বজ্রপ্রতাপ প্রাকারে রক্ষা করছেন জগৎ। হর্ষদেব সর্বমঙ্গলের মহাকল্যাণের মহাপর্বত। হর্ষদেব বিশ্বমানবের চির আকাঙ্ক্ষার সর্বসিদ্ধিদাতা।

রাজসভা মুখর হয়ে উঠে সাধু! সাধু! রবে। হর্ষদেব তার সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। সভাভঙ্গের ঘন্টাধ্বনি গম্ভীর নাদে রাজসভার মণিমাণিক্য গাঁথা দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। বাণের মনে হয়, এই প্রতিধ্বনিত ধ্বনি যেন সুদূর কালবৈশাখীর গুরুগুরু গর্জন।

* * *

কৃষ্ণদেব, বাণকে নিয়ে সেই রাজকীয় রথে সরস্বতী তীরের একটি সাজানো বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। এই সুবৃহৎ এবং সুচারু ভাবে সজ্জিত রাজকীয় বাড়ীটি সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের রাজা সভা পণ্ডিত বাণভট্টের জন্য নির্দ্ধারিত।

বাণের জন্য নির্দ্ধারিত বাড়ীতে নানা ধরনের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য গুটিকতক কর্মচারী নিয়োজিত। কাজকর্মের নির্দেশ দিচ্ছেন জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজপুরুষ। খাবার দাবার প্রস্তুত হয়ে ছিল। বাণ এবং কৃষ্ণদেব একসাথে আহার করলেন। কৃষ্ণদেব চলে গেলে বাণ সাজানো পালঙ্কে বিশ্রাম নিতে গিয়ে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন।

ঘুম ভাঙে সন্ধ্যায়। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজপুরুষ মৃদু কণ্ঠে তাঁকে ডেকে তুললেন। বাণ তার আড্ডার জন্য নির্দ্ধারিত সাজানো কক্ষে প্রবেশ করে হতবাক । স্বয়ং হর্ষদেব এসে উপস্থিত হর্ষদেবের মুখমণ্ডলে লেগে আছে রহস্যপূর্ণ হাসি। হর্ষদেবের পোশাক পরিচ্ছদ অতি সাধারণ। সঙ্গোপনে এসেছেন বাণের সাথে সাক্ষাৎ করতে। প্রাঙ্গণে গুটি কয়েক অস্ত্রধারী অঙ্গরক্ষক।

দুজনের প্রথম দিকের কথাবার্তায় স্বাভাবিক আড়ষ্টতা। ক্রমে কথাবার্তা সহজ হয়ে ওঠে। বীণা নিয়ে কথা ওঠে। হর্ষদেব বলেন, তিনি খেলাচ্ছলে বীণায় হাত দিয়েছিলেন। মৃদুমন্দ পদবিক্ষেপ বীণা তার কাছে এসে এখন প্রাণে মিশে গেছে।

কৃষ্ণদেব সম্পর্কে বাণের সাধারণ ধারণা আছে। তিনি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দীক্ষায় চন্দ্রপুর রাজকীয় শিক্ষাশ্রমের স্নাতক। সেই শিক্ষাশ্রমে রাজনীতি অর্থনীতি যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদির সাথে সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয় । কিন্তু হর্ষদেব সম্পর্কে তার কোনও ধারণা নেই।

বাণ, হর্ষদেবের কথাবার্তায় লক্ষ করেন হর্ষদেব সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কে সচেতন। সাহিত্য শিল্পের নানা বিষয় তার জ্ঞাত। হর্ষদেব কথা প্রসঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য দিক্‌পাল ব্যাসদেব ভট্টার হরিচন্দ্র নাট্যকার ভাস এমনকী প্রাকৃত ভাষায় লিখিত 'সেতু বন্ধ্যাখ্য' নামক রাম বিষয়ক গ্রন্থের লেখক প্রবরসেন সম্পর্কে ও তার সুগভীর জ্ঞান বিদ্যমান।

হর্ষদেব বাণের সাথে কথাবার্তায় সহজ হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে বাণের মনে হয় তিনি যেন বপ্প ঘোষ নৌ ঘাটে বসে কোন এক পুরোনো বন্ধুর সাথে আড্ডা দিচ্ছেন। হর্ষদেব বলেন, ইদানীং একটি বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভাবছেন। তার আকাঙ্ক্ষা এই বিষয় নিয়ে একটি নাটক রচনা করা। এই নাটকের মধ্যে স্বাভাবিক মানবীয় প্রেম-ভালোবাসা আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপদান তার একান্ত মনোবাসনা।

বাণের অনুরোধে হর্ষদেব তার নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে কথা বলেন। জনৈকা রাজকুমারী জাহাজে দেশে যাত্রা করেছেন। মধ্যপথে ভীষণ ঝড়ে জাহাজ ডুবে যায়। সমুদ্রের জলে ভেসে ভেসে শেষ পর্যন্ত তীরের আশ্রয় লাভ করেন রাজকুমারী। অন্য দেশের এই সমুদ্রতীর। এই দেশের মানুষ রাজকুমারী দেখতে পেয়ে রাজার কাছে নিয়ে আসে। রাজা রাজকুমারীকে মহারাণীর কাছে পৌঁছে দেন। মহারাণীর করুণা হয় এবং তাকে আশ্রয় দিয়ে নিজস্ব পরিচারিকারূপে সঙ্গে রাখেন।

মহারাণী অথবা মহারাজা কি এই রাজকুমারীর পরিচয় জানতে পেরেছিলেন? বাণের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে হর্ষদেব বলেন যে এই কন্যা তার পরিচয় গোপন রেখেছিল। তাই মহারাজা অথবা মহারাণী তার প্রকৃত পরিচয় জানতে পারেননি। অসামান্য রূপসী রাজকুমারীর রূপে, রাজা মুগ্ধ। কিন্তু রাণীর ভয়ে, রাজা এই রূপসীকে প্রেম নিবেদন করতে পারেন না। রাজার মনে অসহ্য প্রেম দাহন অগ্নি জ্বলছে। রাজা জলে ভেসে আসা সুন্দরীকে সঙ্গোপনে প্রেমনিবেদনের চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রেম দানা বাঁধে না।

"প্রেম দানা বাঁধে না"। এই বলে হর্ষদেব, বাণের দিকে তাকিয়ে দুষ্টুমির হাসি হাসেন। অধীর আগ্রহে বাণ জিজ্ঞাসা করেন —"তারপর ? তারপর কী হল?" বাণের অকৃত্রিম আগ্রহ হর্ষদেবের ভালো লাগে। তিনি বলেন, মুশকিল আসান রূপে আবির্ভূত হলেন রাজমন্ত্রী। মন্ত্রী, রাজার প্রিয় বান্ধব। মন্ত্রী, সুকৌশলে একে একে সব বাধার জট খুলে দিলেন। তারপর হল শুভ মিলন। রাজা এবং রাজকুমারীর শুভপরিণয়।

বাণ এবং হর্ষদেবের মধ্যে নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে নানা আলোচনার পর বাণ নায়ক নায়িকা এবং নাটকের নাম কী হতে পারে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে হর্ষদেব বলেন, এ সম্পর্কে এখনো চিন্তা ভাবনা করেননি। তবে সমুদ্রের জলে ভেসে আসা রাজকুমারীর নাম 'সমুদ্র' শব্দের সাথে মিলিয়ে কিছু করা যেতে পারে। বাণ বলেন - "সমুদ্রের অন্যতম নাম রত্নাকর।" হর্ষদেব উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, নায়িকার নাম রত্নাকরী রাখা যেতে পারে। 'হর্ষদেব' 'রত্নাকরী' উচ্চারণ করেই আবার ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলেন - 'রত্নাকরী নয়। নায়িকার নাম হবে রত্নাবলী।'

বাণের মুখে প্রসন্ন হাসির রেখা দেখা দেয়। হর্ষদেব বলেন, নায়িকার নাম অনুসারে নাটকের নামও হবে রত্নাবলী।

হর্ষদেব, নায়িকা এবং নাটকের নাম স্থির করে বলেন নায়কের নাম হবে উদয়ন।

হর্ষদেবের চোখে মুখে তৃপ্তির স্নিগ্ধ আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকে। তার মনে হয় অনেক দিন ধরে তার বুকে চেপে থাকা মস্ত এক বোঝা নেমে গেছে। হর্ষদেব উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, আজই তিনি রত্নাবলী নাটক লিখতে শুরু করবেন।

হর্ষদেবের প্রস্থানের পর আকাশ-পাতাল ভাবনায় জড়িয়ে ধরে বাণকে। চোখে ভেসে উঠে প্রীতিকূটনী বাণীর কোলে পুলিন্দা। বাণী উদাস চোখে চেয়ে আছেন আকাশের দিকে। বৃদ্ধ কর্মচারী কাছে এসে সস্নেহে বাণকে চিন্তা-ভাবনা না করতে বলেন। তিনি বলেন, এই বাড়ীতে বাণের দেখা শোনার জন্য তিনি আছেন তার সাথে আরো অনেক কর্মচারী আছেন। বৃদ্ধের সস্নেহ কণ্ঠ শুনে বাণের মনে হয় অনেক দিন পর প্রীতিকূটের কোন এক এক খুল্লতাতের স্নেহ যেন তার উপর বর্ষিত হচ্ছে। বাণ, বৃদ্ধের দিকে চোখ তুলে তাকান। বাণের চোখে কৃতজ্ঞতার ছায়া টলমল করে।

* * *

সরস্বতী তীরের রাজকীয় বাড়ীতে নিঃসঙ্গপ্রায় বাণের দিনগুলি ধীরগতিতে কাটছে। মাঝে মধ্যে কৃষ্ণদেব বাণের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে আসেন। বাণ মাঝেমাঝে ধরা-চূড়া পরে রাজসভায় গিয়ে বসেন। স্থাণ্বীশ্বর নগরীর সর্বত্র সদা সমারোহ। নিদারুণ হৈ-রৈ হট্টগোল। হর্ষদেব রাজধানীর বাইরে চলে গেলে রাজসভা বসে না। বাণ ক্লান্তি অনুভব করেন।

প্রায় চারমাসের মাথায় বাণের কাছে খবর এল গুরুদেব ভর্ৎসুর শরীর ভাল নেই। তাঁর ভীষণ অসুখ।

গুরুদেব অসুস্থ এ সংবাদ তিনি একটি চিঠির মাধ্যমে জেনেছেন। চিঠিতে লেখকের নাম ঠিকানার হদিস নেই। চিঠি পেয়ে বাণ নিদারুণ বিচলিত। লেখকের নাম ঠিকানাহীন এই চিঠিকে তিনি অস্বীকারও করতে পারেন না। চিঠির লেখক কোন পণ্ডিতজন। বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় চিঠি

লিখিত বাণের প্রথম ধারণা হয়েছিল এই চিঠির লেখক কৃষ্ণদেব হতে পারেন। খুব সাবধানে রেখে ঢেকে কৃষ্ণদেবের সাথে গুরুদেব প্রসঙ্গে নানা কথাবার্তা বলে তিনি উপলব্ধী করেছেন। কৃষ্ণদেব গুরুদেবের কোনও সংবাদ জানেন না।

আকাশ পাতাল ভেবে শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন তিনি গুরুদেবকে দেখতে যাবেন। হর্ষদেবের সাথে দেখা করে তিনি যাত্রা করলেন। যাত্রা করলেন পরিচিত স্থলপথে নয়। এবারের যাত্রা নৌকা পথে। হর্ষবর্দ্ধনের সভাপণ্ডিত বাণভট্টেরযাত্রা রাজকীয় ব্যবস্থা যুক্ত নৌকায় শুরু হল।

নীল আকাশে শ্বেতশুভ্র খণ্ড মেঘরাশি। নদীর দুই তীরে কাশফুল। আকাশ পথে বলাকার মহাযাত্রা। পরিপূর্ণ শরৎ। বাণ অন্যমনস্ক। স্রোতের টানে এই সাথে দাঁড়ের ঠেলায় নৌকার গতি দ্রুত। নৌকার মাস্তুলে রাজকীয় পতাকা। অন্যান্য নৌকার উৎসুক দৃষ্টি। নৌকা ক্রমাগত এগিয়ে চলছে। রাতদিন অবিরাম চলছে। এমনি করে চলে চলে নৌকা পৌছাল প্রয়াগ তীর্থক্ষেত্রে। গঙ্গা - যমুনার সঙ্গমে স্নান করে আবার যাত্রা। এবারে নৌকা যমুনার স্রোতের বিপরীত এগিয়ে চলছে। প্রয়াগ থেকে দুদিনের পথ অতিক্রম করে পৌছালেন কৌশাম্বী। যমুনার উত্তর তীরে কৌশাম্বী।

পড়ন্ত বেলায় গুরুদেবের শয্যাপাশে উপস্থিত হলেন। গৃহাভ্যন্তরে অন্ধকারের কালো ছায়া। গুরুদেবের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলেন। স্পর্শে ভীষণ উত্তাপ।

পরদিন প্রত্যুষে দেখলেন, আশ্রমের নানা স্থানে গুরুদেবের আরোগ্যের জন্য নানা ধরনের পূজা-আর্চ্চা হচ্ছে। একস্থানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যজ্ঞ। প্রজাপতি সোম অগ্নি ইন্দ্র দ্যাবা-পৃথিবী এবং ধন্বন্তরীর উদ্দেশ্যে মন্ত্রপাঠ হচ্ছে। মন্ত্রপাঠ করে দুর্বাপত্রের গুচ্ছ দৈ এবং ঘির পাত্রে ডুবিয়ে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হচ্ছে। আশ্রমের অন্যান্য দিকে মহামায়ূবী শিব রুদ্রৈকাদশীর উদ্দেশে পাঠ করা হচ্ছে মন্ত্র।

বাণের অনুভূতিতেপরম বৈরাগ্যের ধূসর ছায়া। বাণ প[illegible]র পায়ে এগিয়ে চলেন। আশ্রম প্রান্তের এক মহাবটের তলায়, গুরুদেবের ভক্তগণ কথা বলছে। বাণের কানে আসে এক বৃদ্ধের কথা। বৃদ্ধ বলছে - "গুরুদেবের উপর নিশ্চয়ই ভর করেছে, কোনও মস্ত এক পিশাচ।" বৃদ্ধের কথার উত্তরে অন্যজন বলছে -"না দাদু ! না ! পিশাচ - টিশাচ নয়। ললাটের লিখন। শুধুমাত্র ললাটের লিখন।" আর একজন কথার জের টেনে বলছে —'ললাটের লিখন তো বটেই। তা না হলে বৈদ্যগণ কেন ভুল করবে?"

"বৈদ্যগণ কেন ভুল করবে?" এই উক্তির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাদবাকি সব লোক। এরপর "বৈদ্যগণ কেন ভুল করবে?" এই উক্তিকারক তার বক্তব্যের ব্যাখ্যা করে বলেন, গত রজনীতে তার চক্ষে নিদ্রা ছিল না। গুরুদেবের কথা ভাবছেন আর ভাবছেন। এমনি করে করে যখন রাতের তৃতীয় প্রহর এল তখন বটের একটি শিকড়ে মাথা রেখে শরীর এলিয়ে দিলেন। সেই মুহূর্তেই স্বপ্নে গুরুদেব এসে তাকে বলছেন, চিকিৎসা ভুল হচ্ছে। গুরুদেবের কণ্ঠস্বর শুনে ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। উঠে বসে স্বপ্নের নক্ষত্র ক্ষণ বিচার করে দেখলেন— এ স্বপ্ন মিথ্যা হতে পারে না।

স্বপ্ন কাহিনি শেষ হলে, জনৈক প্রৌঢ় সুদীর্ঘ শ্বাস উদ্গীরণ করে বলতে শুরু করলেন —"না হে না! সংসার অনিত্য। জন্ম মৃত্যু তার লীলা। প্রৌঢ়ের গুরু গম্ভীর কণ্ঠস্বর এই সাথে তার

দেহভঙ্গি দেখে, বটতলায় জনতা চুপ করে, তার দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রৌঢ় সুযোগ পেয়ে আর এক শ্লোক ঝাড়লেন - "মাতৃ পিতৃ সহস্রানি পুত্রদারা শতা নিচ; যুগে যুগে ব্যতীতানি কস্যতে কস্য বা ভবান।'

প্রৌঢ় শ্লোকটি আবৃত্তি করে সকলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন সবাই ছড়াটি খাচ্ছে। তারপর ছড়াটির অর্থ সহজভাবে ভাঙ্গিয়ে বলেন "বুঝলে হে বুঝলে ! হাজার মা বাপ আছে। ওরে ভাই ! হাজার ছেলে আছে ; হাজার স্ত্রী আছে। এমনি করে যাচ্ছে যুগের পর যুগ। তুই কে রে ? ওরা তোর কে ?"

বাণ কান পেতে শুনেন, সহজ সরল মানুষের কথাবার্তা। গুরুদেব প্রায়ই বলতেন, পৃথিবীর সব শব্দ কান পেতে শুনবে। সব দৃশ্য চোখ মেলে দেখবে। পৃথিবীর কোন কিছুই ফ্যালনা নয়। পৃথিবীর সব কিছু নিয়েই পূর্ণ হয় জীবন।

আবার পায়ে পায়ে চলা শুরু হয়। এমনি করে উপস্থিত হলেন যমুনার তীরে। যমুনার জলে অবগাহন করে সিক্ত বস্ত্রে সমাপ্ত করেন সন্ধ্যাহ্নিক । সন্ধ্যাহ্নিক করে ভাবতে থাকেন গুরুদেবের কথা। গুরুদেব এই ঘাটে বসে বসে বলেছিলেন, কৌশাম্বীর প্রাচীন কথা। রাজপুত্র কুশাম্বের নাম অনুসারে হয়েছিল এর নাম। গঙ্গার প্রলয়ঙ্করী বন্যায় হস্তিনাপুর ডুবে গেলে কুরুরাজ নিচক্ষু এখানে স্থাপন করেছিলেন তার রাজধানী। এখানে বাস করেছিলেন বুদ্ধদেব। এখানে মহারাজ অশোক নির্মাণ করেছিলেন স্তম্ভ। বাণের মনে পড়ে, গুরুদেব তাকে নিয়ে গিয়ে একটি স্তম্ভ দেখিয়ে ছিলেন।

বাণের চোখে ভাসে সেই স্তম্ভ। স্তম্ভের গায়ে কী সব পাথুরে আঁকিবুকি লেখা ছিল। গুরুদেব মৃদু হেসে তাকে বলেছিলেন এসব লেখা বাণ পাঠ করতে পারবে কি ? জবাবের অপেক্ষা না করেই গুরুদেব বলেছিলেন, এখানে লেখা হয়েছে নানা ধরনের জিনিসপত্রের নাম। জিনিসপত্র দান করেছিলেম চারুবাকী। চারুবাকীর পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছিলেন, অশোকের অন্যতম পত্নীর নাম চারুবাকী।

অতীতের চিন্তায় নিমগ্ন বাণ। কাছাকাছি বহু মানুষ জনের কথাবার্তায় বাণের চৈতন্য হয়। নদীর তীরে মস্ত এক নৌকা ভিড়েছে। নৌকা থেকে ঝাঁক বেঁধে রূপসী মেয়েরা নামছে। হঠাৎ বাণের নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল। নৌকা থেকে নামছে সেই স্বপ্নলোকের নারী। স্থাম্বীশ্বরের পথে তার গলায় পুষ্পমাল্য দিয়েছিল। স্বপ্নলোকের এই নারী যমুনাপুলিনের শ্বেতশুভ্র বালির উপর দিয়ে আশ্রমের দিকে যাচ্ছে। তার সাথে মোহিনী নারীর ঝাঁক। বাণের কবি কল্পনার ভেসে ওঠে, এক ঝাঁক মরাল। মরাল শ্রেণী মালা হয়ে উড়ে যাচ্ছে, শরতের শ্বেতশুভ্র মেঘের মাঝ দিয়ে। মালার মধ্যমণি, তার জন্ম জন্মান্তরের ভালোবাসা।

* * *

বাণ আশ্রমে গিয়ে গুরুদেবের কক্ষে প্রবেশ করেন। প্রভাতে উজ্জ্বল আলোতেও কক্ষের অভ্যন্তরে নীলাভ ছায়া। গুরুদেবের শয্যার কাছে গিয়ে তাঁকে নিরীক্ষণ করেন। কক্ষের অভ্যন্তরে ঘি ঔষধমিশ্রিত তেল এই সাথে পাঁচনের তীব্র কটুগন্ধ। শিয়রের কাছে বরফপিণ্ড। বিছানার পাশে ছোটো বড়ো পাত্রে ছানার জল। কক্ষের দেয়ালগুলি সজল সবুজ পদ্মপত্রে আচ্ছাদিত।

বাণ লক্ষ করেন, গুরুদেবের ললাটের শিরাগুলি হয়ে উঠেছে নীল। গুরুদেব হা করে নিঃশ্বাস গ্রহণ করছেন। নীল তার জিহ্বা।

বৈদ্য, গুরুদেবের বুকে চন্দন বুলিয়ে দিচ্ছেন ।

বাণের বুকে ভীষণ জ্বালা । ভীষণ যন্ত্রণা। বাণের চোখে ভেসে ওঠে মহাকালের প্রলয়নৃত্য। বাণের মনে পড়ে গুরুবাক্য। তিনি বলতেন, জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি মৃত্যু। শোক নয়। ব্যথা নয়। হাহাকার নয়। শোক-ব্যথা হাহাকার মানুষের জীবনে বিপুল ব্যাধি। এ ব্যাধির নেই কোনও চিকিৎসা। মৃত্যুর দক্ষিণাপথে পরম সত্যের সাথে হয় পরিপূর্ণ সঙ্গম।

বাণের কণ্ঠে নিঃসৃত হয়, ঋকবেদের দশম মণ্ডলের মন্ত্র —

"শুকিং শূকং শল্ম লিলং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং সুবৃতং সুচক্রম।

আরোহ সূর্যে অমৃতস্য লোকং স্যোনং পত্যে বহতুং কৃনুষ্ম।

ঋকমন্ত্র শুনে, গুরুদেব তাকালেন বাণের দিকে। গুরুদেবের সেই দৃষ্টিতে কি ছিল, তা বাণের অনুভূতিতে ধরা দিল না।

বাণ আবৃত্তি করেছেন, ঋকবেদের দশমমণ্ডলের বিবাহমন্ত্র। শোক নয়, নয় হাহাকার। এই মন্ত্র গুরুদেবের মহামিলনের অভিসার মন্ত্র। হে বধূ ! তোমার পতিগৃহের পথ ; শাল্মলী পলাশ ফুলে ছেয়ে আছে। তোমার চলার পথের রথচক্র, মধুময় হয়ে আবর্তিত হবে। হে বধূ সূর্যা ! তুমি তোমার সংসার পিতৃগৃহের পূর্ণতার উপহার নিয়ে পতিগৃহে গমন কর।

বাণ লক্ষ করেন, গুরুদেবের চোখের মণিদ্বয় ক্ষীণ আন্দোলিত হচ্ছে। মুখে জেগে উঠেছে প্রশান্ত হাসির সূক্ষ্ম রেখা। হঠাৎ কেঁপে উঠে দেহ। তারপর ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয় সর্বদেহ। স্তব্ধ হয় নিঃশ্বাস। গুরুদেবের মহাপ্রয়াণ ঘটে। শরতের উজ্জ্বল সূর্য তখন মধ্যাকাশে।

*　　　　*　　　　*

রাজসূয় যজ্ঞের মতো হাজার হাজার ভক্তের সম্মিলনে গুরুদেবের শ্রাদ্ধ শান্তি সমাপ্ত হয়েছে। পরদিন উষালগ্নে বাণ যমুনায় অবগাহন করে সন্ধ্যাহ্নিক শেষে বালুকার উপর বসে আছেন। ধীরে ধীরে পূর্ব দিগন্তে উঁকি দিয়েছে সূর্য। ভাবছেন গুরুদেবের কথা। আবার পূর্ব স্মৃতির সমুদ্রে চলে তার সন্তরণ। স্মৃতি — অজস্র স্মৃতি। ক্রমে সূর্যালোক প্রখর হয়ে উঠে। তিনি তার মুণ্ডিত শির সিক্তবস্ত্রে ঢেকে, এবার স্মৃতির সমুদ্রের অগাধ জলরাশির তলায় তলিয়ে যান। কণ্ঠে আসে অতল তলের জলকন্যার সঙ্গীত। বাণ ফিরে দেখেন, তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সেই স্বপ্নলোকের কন্যা। তিনি তাঁর অজান্তে উঠে দাঁড়ান স্বপ্নলোকের কন্যা, তার দিকে নানা বর্ণের চীনাংশুক বস্ত্রের একটি থলি এগিয়ে ধরে। বাণ নিস্তব্ধ। বাণের চোখে চোখ রেখে কন্যা আবৃত্তি করে —

বিহগ কুরুদৃঢ়ং মনঃ স্বয়ং

ত্যজ সুচিমাস্ব বিবেক বন্ধানি"

বাণের হৃদয়ে উন্মোচিত হয় বহু দূরের এক ভীষণ দৃশ্য। অগ্নিবর্ণ বস্ত্রে সজ্জিতা এক

সালংকারা নারী। তাকে জীবন্ত দগ্ধ করতে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে, ভীষণ এক পিশাচগোষ্ঠী। সূর্যের প্রখর দাহনে রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল। আকাশে স্থির দৃষ্টি।

তীব্রগতিতে ভেসে উঠে অন্য ছবি। গঙ্গার স্রোতে ভেসে যাচ্ছে তার ফুলমালা বস্ত্র। এই সেই সতী নারী বিহঙ্গমা।

চীনাংশুক বস্ত্রের অভ্যন্তরে রৌপ্যমুদ্রা। বিহঙ্গমার কণ্ঠে জেগে উঠে কোন সে সুদূরপাড়ের কাকলির মৃদুগুঞ্জন। শিহরিত হয় বাণের অনুভূতি। শিহরিত হয় সর্বঅঙ্গ।

বিহঙ্গমা বলে, 'এখানে পনেরোটি রৌপ্য মুদ্রা আছে। এই মুদ্রা ব্যয় করে আপনি আমাকে ক্রয় করেছিলেন।' ''বিহঙ্গমার মুখমণ্ডলে প্রস্ফুটিত নন্দনবনের পারিজাত আভা। এরপর কথায় স্নিগ্ধ হাসির সুর মাখিয়ে বলে —'আমি কিন্তু এর সুদ দিতে পারব না। জন্মজন্মান্তর মাথায় করে রাখব এই ঋণের সুখ।'

বিহঙ্গমা, সন্ধ্যা মিলালে আসে বাণের অস্থায়ী বাসকক্ষে। কথা হয় অনেক কথা। বিহঙ্গমা একে একে বলে তার কথা। প্রায় আট বছর আগে গুরুদেব তাকে সমর্পণ করেছিলেন সম্রাট অবন্তীবর্মার চরণে। অবন্তীবর্মা পরম মমতায় করে দিয়েছিলেন চৌষট্টি কলাবিদ্যা শিক্ষার সুযোগ। শিক্ষা শেষে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন রাজনর্তকী পদে।

বিহঙ্গমা বলে, কন্যাসম স্নেহে তাকে গ্রহণ করেছিলেন সম্রাট অবন্তী বর্মা। রাজ প্রাসাদে ছিল তার নিত্যআনাগোনা। কুমার গ্রহবর্মার কিশোরী বধূ রাজ্যশ্রী হয়ে উঠেছিল প্রিহ-সহচরী।

খানিক স্তব্ধতায় কাটিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বিহঙ্গমা বলে, গ্রহবর্মা নিহত হবার পর মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন তাকে বন্দী করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তার রাজধানী স্থান্বীশ্বরে।

বিহঙ্গমার কথা এবার বাণ সম্পর্কে। দীর্ঘ দিন বাণের কোন'ও সংবাদ তার জানা ছিল না। সে জানত না বাণ হর্ষবর্দ্ধনের সভাপণ্ডিত হয়েছেন। রাজপণ্ডিতের সংবর্দ্ধনা ছিল তার আনুষ্ঠানিক কর্ম। সেই রাজকর্ম করতে গিয়ে-মহাবিস্ময়। জানতে পারল তার জীবনের পরম পুরুষ বাণভট্টদের মহাসম্মানিত হর্ষদেবের সভাপণ্ডিত।

প্রসঙ্গত বাণের স্থান্বীশ্বরের বাসভবনের প্রসঙ্গ ওঠে। বিহঙ্গমা বলে এই সংবাদ তার জানা আছে। অনেক অনেকদিন প্রত্যুষে, সে বাণকে সরস্বতীর জলে স্নান শেষে নদী তীরে সন্ধ্যাহ্নিক করতে দেখেছে।

বিহঙ্গমা বলে, গুরুদেবের অসুস্থতার সংবাদেরপত্রটি সেই লিখেছিল এবং নিজের হাতে বাণের বাড়ীতে রেখে গিয়েছিল।

স্থান্বীশ্বরে প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে বাণ বলেন, আগামী প্রভাতে তিনি যাত্রা করবেন। বিহঙ্গমার ইচ্ছা কাছাকাছি অঞ্চলে পুরোনো প্রিয়জনের সাথে দিনকতক কাটানো।

* * *

স্থান্বীশ্বরে ফিরে গিয়ে বাণের অস্বস্তি। আবার সেই একাকীত্বের দুঃসহ যন্ত্রণা। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন সৈন্যসামন্ত নিয়ে দূরদেশে রাজ্যবিস্তারে অভিযানে রত। রাজসভা বসে না।

মাঘ মাস। সরস্বতীর জল শুকিয়ে গেছে। নদীর বুক জুড়ে বালির চর। বালির মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে বইছে সরস্বতীর ক্ষীণধারা। বাণের বাসভবনের বিপরীত দিকে সরস্বতীর অন্যকূলে শিবমন্দির। গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় মন্দির চূড়ার লাল পতাকা।

এক প্রত্যুষে সন্ধ্যাহ্নিক শেষে নদীর বালুকারাশির উপর দিয়ে অন্যতীরের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেন। সম্মুখে নদীতীরের দীর্ঘ শির তরুদল। তরুদলের শীর্ষ দেশে শিবমন্দিরের লাল পতাকা। বাতাসে আন্দোলিত লাল পতাকার উদিত সূর্যের রক্তবর্ণ সূর্যালোক নৃত্য করছে।

মন্দির প্রাঙ্গণে পৌছে দেখেন তখন সবেমাত্র পূজারী এসেছেন। পুরোহিত করজোড়ে বিনীত ভাবে বাণকে স্বাগত করেন। মন্দির প্রাঙ্গণের একধারে মস্ত বটগাছ। বাণের চোখে পড়ে এক ভিখারি বটগাছের তলায় শুয়ে আছে। ভিখারি শুয়ে শুয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাণকে লক্ষ করছে। বাণের মনে হয় এমনি চোখ এবং চোখের দৃষ্টি তার পরিচিত। বাণ বটগাছের দিকে এগিয়ে গেলে ভিখারি পাশ ফিরে উল্টোদিকে মুখ করে থাকে। সন্দেহ গাঢ় হয়। তিনি উল্টোদিকে গিয়ে মুখ লক্ষ করেন। চিনতে পারেন এই সে গাড়োয়ান। যে বলেছিল "হর্ষবর্দ্ধনের হাত খুনের রক্তে লাল।"

বাণ এবং গাড়োয়ানের মধ্যে চাপা কণ্ঠে কথাবার্তা শুরু হয়। গাড়োয়ান জেনে গেছে বাণের পরিচয়। বাণভট্ট হর্ষবর্দ্ধনের সভাপণ্ডিত। রাজ সম্মানে সম্মানিত। সে বাণকে অবিশ্বাস করে। একই কথা পুনরাবৃত্তি করে বলে সে হর্ষবর্দ্ধনের সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলেছে।

বাণের মাথায় দুষ্ট সরস্বতী ভর করেন। বাণ বিশুদ্ধ এবং আলঙ্কারিক সংস্কৃত ভাষায় বলেন, তিনি গাড়োয়ানের নাম ধাম কীর্তিকাহিনি সব কিছু জানেন। গাড়োয়ানের মুখে ভয়ের নীল ছায়া দেখা দেয়। সে তার অজান্তে বাণের বাচনভঙ্গির অনুকরণে বিশুদ্ধ এবং আলঙ্কারিক সংস্কৃত ভাষায় বাণকে জিজ্ঞাসা করে তিনি তার সম্পর্কে কী জানেন তা যদি দয়া করে ব্যক্ত করেন তাহলে আনন্দিত হবে। বাণের মুখমণ্ডল স্বচ্ছ হাসিতে ভরে ওঠে। সহজভাবে বলেন তিনি কিছুই জানেন না। একটুখানি রসিকতা করেছেন মাত্র। তবে সাধারণ একজন গাড়োয়ান, এমন বিশুদ্ধ সংস্কৃত বলতে পারে না এ বিষয়ে তিনি স্থির নিশ্চিত।

বাণ আশ্বাস দিয়ে বলেন, সত্যিই তিনি কিছু জানেন না এবং তাঁর দ্বারা গাড়োয়ানের অবশ্য কোনও ক্ষতি হবে না।

গাড়োয়ানের মুখ থেকে আতঙ্কের নীল ছায়া অপসৃত হয়। বাণ বলেন,, সম্ভব হলে আজ রাত্রির তৃতীয় প্রহরে সে যেন বাণের বাড়ীতে আসে। তিনি গোপনে অপেক্ষা করবেন।

গাড়োয়ান জবাবে কিছু বলে না এবং তার মুখমণ্ডলে কোনও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয় না।

*　　　*　　　*

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর সবেমাত্র শেষ হয়েছে। সেই মুহূর্তে গাড়োয়ান উপস্থিত হল বাণের বাসভবনে। বাণ প্রস্তুত ছিলেন। প্রস্তুত করে রেখে ছিলেন ফল মূল সহ দুগ্ধজাত খাদ্যবস্তু। বাণের নির্দেশে প্রথমেই তাকে খেতে হল। বাণ লক্ষ করেন, গাড়োয়ান সব খাদ্যবস্তু শেষ করে ফেলেছে এক লহমায়।

কথাবার্তা শুরু হল। বাণ খুব সাবধানে আটঘাট বেঁধে কথাবার্তায় এগিয়ে চলেন। আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলেন, তিনি পূর্ব ভারতের কামরূপের অধিবাসী। চন্দ্রপুর মহাবিদ্যাশ্রমের স্নাতক। মহারাজ হর্ষের সাথে তাঁর কী কারণে এবং কীভাবে সাক্ষাৎ হয়েছিল সে বিষয়টি সম্পূর্ণ চেপে রাখলেন।

ক্রমে গাড়োয়ান মুখ খোলে। সে গাড়োয়ান অথবা ভিখারী নয়। এ দুটি তার ছদ্মবেশ। জীবন বিপন্ন। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে আছে। যে কোন মুহূর্তে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ভীষণ মৃত্যু।

গাড়োয়ান তার কথার জট খুলতে আরম্ভ করে। কথার পর কথা। সে ছিল পরমেশ্বর শিবমন্দিরের পুরোহিত। স্থাণ্বীশ্বরের প্রায় দুইক্রোশ পশ্চিমে সরস্বতীর তীরে সেই প্রাচীন শিবমন্দির।

বাণ তার নাম জিজ্ঞাসা করেন। আবার অজ্ঞাত ভয়ের ছায়া তার মুখে নামে। নাম বলতে রাজি হয় না। বাণ কথা না বাড়িয়ে বলেন, তিনি যদি তাকে একটি নাম উপহার প্রদান করেন তাহলে কেমন হয়। গাড়োয়ান মাথা নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করে। বাণের মুখে কৌতুকের হাসি। বাণ হেসে হেসে বলেন, নূতন নাম হতে পারে বক্রঘোন। এবার গাড়োয়ানে মুখে অনাবিল হাসি। বলে —"ঘোনা" হচ্ছে ঘোড়ার নাক। সে ঘোড়ার নাক আবার মন্দ নয়" এই বলে সে তার নাকের উপর হাতে রেখে কী সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। বাণ বলেন, ঘোড়ার মাধ্যমে পরিচয় কিনা। তাই ঘোড়া সম্পর্কীয় নাম।

বক্রঘোন বলে, এই পরমেশ্বর শিব মন্দিরের সাথে, তাদের বংশের কয়েক পুরুষ ধরে সম্পর্ক। সে এই মন্দিরের পুরোহিত বংশের সন্তান। এই মন্দিরে তার জন্ম। মন্দির প্রাঙ্গণে খেলাধূলা করে বড়ো হয়েছে।

বক্রঘোন শুরু করে তার জীবনের ঘূর্ণিবার্তার কাহিনি। কাহিনির উদ্ঘাটন শিবমন্দিরে, পূজা দিতে আসতেন মহারাণী যশোবতী। সঙ্গে থাকত দুই শিশুপুত্র রাজ্যবর্দ্ধন এবং হর্ষবর্দ্ধন। মন্দিরের প্রায় চারপাশেই মস্ত মস্ত মাঠ। মাঠে দুভাই কন্দুক নিয়ে খেলা করতেন। খেলতে গিয়ে কখনো বা কন্দুক বেশ দূরে চলে যেত। বালক বক্রঘোন দূরে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে। কন্দুক দূর থেকে এনে দুই ভায়ের দিকে ছুঁড়ে দিত। এমনিভাবে, দুই রাজকুমারের সাথে একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এমনিভাবে কয়েক বছর কেটে গেলে রাজ্যবর্দ্ধন এবং হর্ষবর্দ্ধনের সাথে যুক্ত হন প্রায় তাদেরই সমবয়সী কুমারগুপ্ত, মাধবগুপ্ত এবং ভণ্ডী। পাঁচজনের একসাথে চলতো কন্দুক খেলা এবং সে কন্দুক কুড়িয়ে ছুঁড়ে দিত। বক্রঘোন বলে রাজকুমারদের সাথে তার সম্পর্ক ছিল ভৃত্যও বান্ধবের।

বাণের মনে কৌতূহল। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কুমারগণ কি শুধু খেলাধূলাই করতেন? মন্দির বা দেবতার সাথে কোনও সম্পর্ক ছিল না?

এতক্ষণে বক্রঘোন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। সে বলে, যশোবতী এবং কুমারগণের সাথে আসতেন কুমারী রাজ্যশ্রী। রাজ্যশ্রী বলতে গেলে তখন ছিলেন নাবালিকা। যশোবতী সর্বক্ষণ পূজা আর্চ্চায় ব্যস্ত থাকতেন। সাথে থাকতেন রাজ্যশ্রী। হর্ষবর্দ্ধন মাঝে মধ্যে মন্দিরে প্রবেশ করে, পরমেশ্বর শিবলিঙ্গের সম্মুখে ধ্যানমগ্ন হয়ে শিবাস্তোত্র আবৃত্তি করতেন। তিনি নাকি নিত্যনূতন

শিবস্তোত্র রচনা করতেন।

এবার বক্রঘোনের মুখমণ্ডলে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দেয়। বক্রঘোন বলে, বর্তমানে হর্ষবর্দ্ধনের চিরসঙ্গিনী দুই পরম মিত্র তলোয়ার এবং বীণা। এই বীণার সাথে তার প্রথম পরিচয় মন্দিরে। মন্দিরে নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র ছিল। বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে ছিল বীণা। হর্ষবর্দ্ধন এই বীণা নিয়ে টুং টাং করতেন। এমনি করে বীণা তার পরমসঙ্গী হয়ে ওঠে।

পূর্ব স্মৃতির জোয়ারে ভেসে চলে বক্রঘোন। রাজ্যবর্দ্ধন সম্পর্কে কথা শুরু হয়। রাজ্যবর্দ্ধনের সাথে পরমেশ্বর শিবমন্দিরের বিশেষ গভীর সম্পর্ক ছিল না। তার প্রিয় ছিল পরমসৌগত বৌদ্ধ মঠ। এই বিহার ছিল শিবমন্দিরের খানিক দক্ষিণে। রাজ্যবর্দ্ধনের সাথে থাকতেন কুমারগুপ্ত। কুমার গুপ্ত ছিলেন, রাজ্যবর্দ্ধনের পরম মিত্র। অন্যদিকে হর্ষবর্দ্ধনের পরম মিত্র ছিলেন মাধব গুপ্ত এবং ভণ্ডী।

বক্রঘোন হঠাৎ চমকে উঠে কথা বন্ধ করে। বন্ধ দরজার বাইরে শব্দ। বক্রঘোনের সাথে বাণ তাকালেন বন্ধদরজার দিকে। বাণের কানে এল দরজার বাইরে মৃদু শব্দ। তিনি ফিসফিস করে বলেন, তিনি এই ধরনের শব্দের সাথে পরিচিত। বিড়ালের শব্দ। বক্রঘোনের চোখে অবিশ্বাসের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠে। বাণ বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে গেলে বক্রঘোন উঠে দাঁড়ায়। চোখে ত্রস্ত দৃষ্টি। হঠাৎ সে ইঁদুরের মতো বাণের খাটের তলায় গলিয়ে যায়। দরজার ওপর পরিচিত বিড়াল ঢুকে। দরজা আবার বন্ধ হলে বক্রঘোনের উদয় হয়। বক্রঘোন লজ্জিত হয়ে বলে, সে তার জীবনে ভীষণ সব কাণ্ডকারখানা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। মানুষের প্রতি তার বিশ্বাস আর নেই।

বক্রঘোন তার আগের কথার রেশ টেনে কথা শুরু করে। শুরু করে হর্ষবর্দ্ধন এবং ভণ্ডীর কথা। বাণ ভণ্ডীকে খুব ভালো করে দেখেছেন। ভণ্ডী হর্ষদেবের মন্ত্রী এই সাথে তার দক্ষিণ হস্ত। বয়সে হর্ষদেব থেকে বছর পাঁচেকের বড়ো। বর্তমানে তার বয়স চব্বিশ পঁচিশ হতে পারে। বাণ, কুমারগুপ্ত এবং মাধবগুপ্তকে দেখেননি। শুনেছেন হর্ষদেব মাধবগুপ্তকে মগধের কোনও অংশের রাজা বানিয়ে দিয়েছেন।

রাত প্রায় শেষ হয়ে আসছে। মাঘের শীতল বাতাস সরস্বতীর উপর দিয়ে কক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে। বক্রঘোন শীতে কাঁপছে। বাণ তার মেষলোমের কম্বল দিয়ে বক্রঘোনকে আবৃত করেন। কুলুঙ্গির শেষ রাতের ক্ষীণ দীপশিখা, মাঘের হাওয়ায় ক্ষণে ক্ষণে থরথর করে কাঁপছে।

বক্রঘোন কম্পিত দীপশিখার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে কী ভাবতে থাকে। স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলে রাত শেষ হয়ে আসছে। এখন ফিরতে হবে। সে বলে তার বলার অনেক কথা আছে। সে আবার আসবে। হর্ষবর্দ্ধন, কুমারগুপ্ত, মাধব গুপ্ত এবং ভণ্ডী সম্পর্কে তার বহু কথা আছে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে, বাণের দিকে মেষলোমের কম্বল ছুঁড়ে দিয়ে, দাঁতে দাঁত চেপে বলে, রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা করা হয়েছে।

বক্রঘোন দরজা খুলে সরস্বতীর শুষ্ক বুকের উপর দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

বাণ নিস্তব্ধ হয়ে ভাবতে থাকেন বক্রঘোনের কথা। গবাক্ষ দিয়ে তাকিয়ে অপেক্ষা করেন

রক্তরাঙা প্রভাতের । হঠাৎ সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠে কোকিল চিৎকার করে ওঠে। বাণের মনেহয় বসন্ত আর দূরে নয়। দূরে নেই রক্তরাঙা অশোক পলাশের উদ্ধত নৃত্য।

* * *

পরমেশ্বর শিবমন্দির সম্পর্কে বাণের কৌতূহল সৃষ্টি হয়। স্নানাহ্নিক শেষে তার রাজকীয় পাঁচঘোড়ার রথে যাত্রা করেন। স্থাম্বীশ্বর থেকে পথ, নদীর তীর ধরে পশ্চিমে গেছে। পাঁচ ঘোড়ার রাজকীয় রথ, পথিকগণকে সচকিত করে এগিয়ে চলে। প্রথম প্রহরের মাঝেই রথ মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছাল।

মন্দিরের পূজা অর্চনা তখনো শেষ হয়নি। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করে পরমেশ্বর লিঙ্গদেবতার সম্মুখে উপবিষ্ট হয়ে আপন মনে শিবস্তোত্র পাঠ করেন।

বৃদ্ধ পুরোহিত দাঁড়িয়ে উঠে বাণকে স্বাগত করেন।

হঠাৎ করে বাণ বৃদ্ধ পুরোহিতকে বলেন, বছর তিন চার আগে এই মন্দিরে এক জ্ঞানী পণ্ডিত তরুণ পুরোহিতের সাথে তার কথাবার্তা হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষা সাহিত্য এবং শাস্ত্রে সুবিশেষ পারদর্শী সেই তরুণ পুরোহিত।

বৃদ্ধ পুরোহিতের অশ্রু বিগলিত হয়। বলেন, সেই তরুণ ছিল তার একমাত্র পুত্র । অকালে তার মৃত্যু হয়েছে।

বৃদ্ধের মুখে নিদারুণ সংবাদ শুনে বাণ মন্দির থেকে প্রাঙ্গণে নেমে এলেন। তাঁর মুখ দিয়ে নির্গত হল না সামান্যতম সান্ত্বনাবাক্য। প্রাঙ্গণ, সবুজ শ্যামল দূর্বাদলে আচ্ছাদিত। কন্দুক ক্রীড়ার উপযুক্ত স্থান। বাণের মনে হল বক্রঘোনকে বিশ্বাস করা চলে।

ক্রমাগত তিন রাত অপেক্ষার পর বক্রঘোন এল। সে নিঃশব্দে বাণের কক্ষে প্রবেশ করে। তখন রাত্রির তৃতীয় যাম সবেমাত্র শুরু হয়েছে।

বাণ, ভণ্ডী সম্পর্কে বিশেষ.আগ্রহী। বক্রঘোন ভণ্ডীর পরিচয় প্রসঙ্গে বলে ভণ্ডী মহারাজ যশোধর্মনের পৌত্র। যশোধমন হচ্ছেন হর্ষবর্দ্ধনাদির মাতৃদেবী যশোবতীর পিতা।

বাণ, ভণ্ডীর পিতামহ যশোধর্মন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, বক্রঘোন বিস্তারিত পরিচয় প্রদান করে। মহারাজা যশোধর্মন, জীবনের প্রথম দিকে ছিলেন মালবরাজ নরসিংহদেবের সামন্তনৃপতি। তিনি সামন্ত নৃপতি অবস্থায় ভীষণ এক যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই ভীষণ যুদ্ধে হুন সম্রাট মিহিরকুলকে পরাজিত করেন। মিহিরকুলকে পরাজিত করে তার আপন শক্তি এবং ক্ষমতার প্রতি বিশেষ আস্থা আসে। ফলত স্বয়ং 'মহারাজ' উপাধি ধারণ করে মালবরাজ্যের স্বাধীন সম্রাটরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

মহারাজ যশোধর্মনের পৌত্র ভণ্ডী কীভাবে এবং কোন্ পরিস্থিতিতে হর্ষদেবাদির পিতা প্রভাকরবর্দ্ধনের কাছে এলেন — এই কথা বাণ জিজ্ঞাসা করেন।

বক্রঘোন বলে, এ বিষয়ে বিস্তারিত কথা আছে। তবে সংক্ষিপ্ত বিষয় হচ্ছে পরবর্তীকালে মৌখরী বংশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং মহারাজা যশোধর্মনের মালবরাজ্য অধিকার করে। যশোধর্মন,

এমন ভাগ্যবিপর্যয়ের পর পৌত্র ভণ্ডীকে, যশোবতীর কাছে প্রেরণ করেন।

ভণ্ডী যখন তার পিসিমা যশোবতীর কাছে আশ্রয় লাভ করেছিল, তখন তার বয়স মাত্র আট বছর। সেইসময় সবেমাত্র জন্ম নিয়েছে রাজ্যশ্রী।

প্রসঙ্গত বক্রুঘোন বলে, যশোবতীর পিতা এবং মাতা দুজনই স্থাম্বীশ্বরে আশ্রয় নিয়ে বাস করছেন।

বক্রুঘোনকে পুরোনো স্মৃতি ভর করে। অনর্গল কথা বলে চলে। বাণ লক্ষ করেন, সে তার অতিক্রুত কথনে প্রায়শ বাণের অপরিচিত শব্দাবলী ব্যবহার করে। এসব শব্দাবলী স্থাম্বীশ্বর অঞ্চলে প্রচলিত একান্ত লৌকিক কথ্যভাষা।

বক্রুঘোন বলে, ক্রমশ পাঁচ কুমার সম্পূর্ণ দুটি আলাদা অংশে বিভক্ত হয়। পরমসৌগত বৌদ্ধবিহারে গিয়ে গল্পসল্প করতেন রাজ্যবর্দ্ধন এবং কুমারগুপ্ত। পরমেশ্বর শিবমন্দিরে আড্ডা দিতেন হর্ষ ভণ্ডী এবং মাধবগুপ্ত। দু দলের কথাবার্তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। রাজ্যবর্দ্ধন এবং কুমার গুপ্তের কথার বিষয় ছিল সাহিত্য শিল্প ধর্ম এবং দর্শন। অন্যদিকে হর্ষবর্দ্ধনের বিষয় ছিল রাজনীতি কূটনীতি এই সাথে সাহিত্য শিল্প এবং ধর্ম। ভণ্ডীর কথাবার্তা ছিল অন্য ধরনের। সে কথা বলত তাঁর অতীত বংশগৌরব নিয়ে। পিতামহ যশোধর্মন ছিলেন মস্ত বীর। তিনি পরাজিত করেছিলেন বর্বর হুন সম্রাট মিহিরকূলকে।

ভণ্ডীর অতীত বংশগৌরব শুনে শুনে একদিন কুমার গুপ্ত রহস্যচ্ছলে বলেছিলেন তা হলে বলতে হবে মৌখরী বংশের নৃপতিগণ মস্ত মস্ত বীর। তারা পরাজিত করেছিলেন হুন সম্রাট মিহিরকূল বিজয়ী মহারাজ যশোধর্মনকে।

মৌখরী রাজবংশের প্রতি ভণ্ডীর ভীষণ ক্রোধ। তাদের জন্য পিতামহ রাজ্যচ্যুত । তাদের জন্যই পিতামহ পিতামহী সহ তিনি হর্ষবর্দ্ধনের পিতা প্রভাকর বর্দ্ধনের আশ্রয়ে থেকে অপমানিত হয়ে জীবন যাপন করেছেন।

ভণ্ডীর পক্ষে এমন কথার কোন জবাব দেওয়া সম্ভব ছিল না। সে তখন ক্ষিপ্ত হয়ে পরেমেশ্বর শিবমন্দিরের গায়ে অনবরত ঢিল ছুঁড়ছিল।

বাণ, মশগুল হয়ে বক্রুঘোনের কথা শুনছিলেন। বক্রুঘোন মাঝেমধ্যে হাই তুলছিল। হঠাৎ উচ্চস্বরে ক্লান্তির হাই তোলার শব্দ শুনে বাণের মনে হল তিনি অপরাধ করে ফেলেছেন। প্রতিদিন বক্রুঘোনের জন্য প্রস্তুত করে রাখতেন খাবার-দাবার। সেদিনও প্রস্তুত ছিল। দিতে ভুলে গেছেন। দ্রুত খাবার পাত্র বক্রুঘোনের সামনে উপস্থিত করলেন। যথানিয়মে পলকে সম্পূর্ণ খাদ্যপাত্র, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ঝকমক করতে থাকে।

এবার বাণের জিজ্ঞাসার বিষয় কুমারগু প্ত এবং মাধবগুপ্ত । বক্রুঘোন বলে, ভণ্ডীর মতো কুমার গুপ্ত এবং মাধবগুপ্ত প্রভাকর বর্দ্ধনের আশ্রিত দুই কুমার। ভণ্ডী যেমন হর্ষবদ্ধর্নের মামাতো ভাই তেমনি গুপ্ত ভ্রাতৃদ্বয় প্রভাকর বদ্ধর্নের মামাতো ভাই। কুমারদ্বয় মহারাজা মহাসেন গুপ্তের পুত্র।

বক্রঘোনের কণ্ঠে মহাসেনগুপ্ত নাম শুনে, বাণ বললেন, প্রভাকর বর্দ্ধনের মাতৃদেবীরও এমন নাম।

এইমাত্র মস্ত থালা পূর্ণ ফলমূল ছানা ক্ষীর ভোজন করে বক্রঘোন মহাতৃপ্ত। বাণের প্রশ্ন শুনে সে তার কণ্ঠে গুরুগম্ভীর অধ্যাপক সুলভ গাম্ভীর্য আনয়ন করে বলে , গুপ্ত এবং গুপ্তা এ দুটি ভিন্ন লিঙ্গাত্মক উপাধি বিশেষ। প্রথমটি পুরুষ লিঙ্গ দ্বিতীয় বোনের নাম মহাসেন গুপ্তা । মহাসেন গুপ্তা প্রভাকর বর্দ্ধনের জননী।

বক্রঘোনের জিহ্বা, ক্ষেপা অশ্বের ক্ষুরধ্বনির মতো টগবগ করতে থাকে ।সে বলে, যশোধর্মনের রাজ্য গিয়েছিল মৌখরীদের হাতে । মহাসেনগুপ্তের মালবরাজ্য যায় কলচুরিদের হাতে।

মালব রাজ্য নিয়ে বাণের মনে সমস্যা দেখা দেয় । তিনি জিজ্ঞাসা করেন, যশোধর্মন ছিলেন মালবের মহারাজা । অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, মালবরাজ্য ছিল মহাসেনগুপ্তের হাতে।

বাণের সমস্যা শুনে, বক্রঘোন আনন্দিত হয় ।সুযোগ এসে গেল, রাজসভা পণ্ডিত বাণভট্টকে জ্ঞান বিতরণের। তার কণ্ঠে আবার অধ্যাপকের গাম্ভীর্য।সে বলে , পশ্চিম ভারত থেকে পূর্বভারতের মগধ অঞ্চলের দক্ষিণভাগব্যাপী ভারতের মধ্যাংশে যে সুবিশাল পাবর্ত্যভূমি আছে সেই পার্বত্য ভূমির সাধারণ নাম মালব। মালব শব্দের অর্থ পার্বত্যদেশ। সুদীর্ঘ এই পাবর্ত্য মালব অঞ্চলে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একাধিক নৃপতি রাজত্ব করতেন। পূর্ব ভারতের মগধ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের পার্বত্যঞ্চলের রাজা ছিলেন মহাসেন গুপ্ত। এজন্য কখনো কখনো তাঁকে মালবের অধিপতি বলা হত।

বাণ , এই মহাসেন গুপ্তের ভীষণ কীর্তিকলাপের সংবাদ ভালো করেই জ্ঞাত । মহাসেনগুপ্তের সাথে প্রাগজ্যোতিষপুরের বর্মন নৃপতির ভীষণ যুদ্ধ হয়ে ছিল লোহিত্য নদীর বক্ষে । সে দিন ছিল কামরূপের ভীষণ দুঃসময় । বাণ ত... চিন্তা আপন বুকে চেপে রাখেন ।

বক্রঘোন আবার ফিরে আসে ভণ্ডীর প্রসঙ্গে । বলে নি স্বর কানে শুনেছে , ভণ্ডীর কথাবার্তা। রাজ্যশ্রীর বিবাহ যখন মৌখরী কুমার গ্রহবর্মার সাথে স্থির হয়েছিল তখন ভণ্ডীর সেই ভীষণ ক্রুর কথা বলেছিল। ভীষণ ক্রুর কথা উচ্চারণ করেছিল প্রকাশ্যে । তখন উপস্থিত ছিলেন রাজ্যবর্দ্ধন, হর্ষবর্দ্ধন কুমারগুপ্ত, মাধবগুপ্ত এবং স্বয়ং বক্রঘোন। ভণ্ডীর ক্রুর কণ্ঠে বলেছিলেন , রাজ্যশ্রী যে কণ্ঠে পুষ্পামালা অর্পণ করবে সেই ভরাট গলার জন্য সে তার তলোয়ারে শান দিচ্ছে।

রাত শেষ হয়ে আসছে। বক্রঘোন ভীষণ দ্রুত কথা বলেছে। বাণ, বারেবারে স্মরণ করিয়ে দেন সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে। সে তীব্রগতিতে সংক্ষিপ্ত ভাবে তার বক্তব্য বলে চলে। যথা সময়ে রাজ্যশ্রীর বিয়ে হল। রাজ্যবর্দ্ধনকে পশ্চিমদিকে প্রেরণ করা হল হূণ বাহিনীর সাথে সংগ্রাম করতে। প্রভাকর বর্দ্ধন হলেন অসুস্থ । অসুস্থ প্রভাকর বর্দ্ধনকে রেখে যশোবতী অগ্নিতে প্রবেশ করে করলেন আত্মহত্যা । প্রভাকরের মৃত্যুর সাথে সাথে স্থাণ্বীশ্বর রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ জ্ঞানীগুণী মন্ত্রী সেনাপতি বিশিষ্ট সভাসদ পরামর্শদাতা নানা মন্দিরাদির সাধুসন্ত এরা সব স্থাণ্বীশ্বর থেকে পলায়ন করলেন দূর দেশে। করলেন অরণ্য পর্বতে। যারা পলায়ন করার সুযোগ পাননি, তাদের অনেককে হত্যা করা হল। প্রভাকর বর্দ্ধনের পুত্র স্থানীয় বৈদ্য রসায়ন আত্মহত্যা করলেন। এই

কিশোর বৈদ্য ছিল মহারাজা এবং মহারাণীর প্রাণের পুতুল। অনেকের ধারণা, বৈদ্য রসায়নকে গুপ্ত হত্যা করা হয়েছে।

বাণ বিস্মিত হয়ে কাহিনি শুনছেন। বাণের তন্ময় ভাব দেখে বক্রঘোন বলে সব ঘটনাদির কার্যকারণ এখনো জানা যায়নি। রহস্যগুলি আড়ালে আবডালে গা ঢেকে আছে।

বাণের কাছে অগ্নিতে প্রবেশ করে যশোবতীর মৃত্যু এক সমস্যাজনক ঘটনা। তিনি বলেন, সতীদাহ একটি প্রাচীন প্রথা। নারীগণ বিশ্বাস করে সতী হওয়া মস্ত পুণ্যকর্ম। কিন্তু যশোবতী স্বামীর চিতায় সতী হননি। স্বামী তখনো জীবিত ছিলেন। অন্যদিকে আত্মহত্যা মহাপাপ। তাহলে যশোবতী কেন আগুনে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করলেন?

বক্রঘোন বলে, যশোবতীর আত্মহনন নিয়ে, নানা কথা উঠেছে। অনেকের ধারণা এই অপমৃত্যুর জন্য দায়ী হর্ষ এবং ভণ্ডী। হর্ষের প্রশ্রয়ে এবং ভণ্ডীর চক্রান্তে গ্রহবর্মার হত্যা এবং রাজ্যশ্রীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এই ভীষণ সংবাদ গোপনীয় সূত্রে যখন যশোবতীর কানে পৌঁছায় তখন তিনি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। বক্রঘোন বাণের সমস্যাজনিত প্রশ্নের সাথে সুর মিলিয়ে বলে, যশোবতী যখন আত্মহনন করেন তখন প্রভাকরবর্দ্ধন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। যশোবতীর মনে সতী হবার বাসনা থাকলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর চিতায় আরোহণ করে পুণ্যার্জন করতে পারতেন।

বাণ লক্ষ করেন বক্রঘোন যশোবতী প্রসঙ্গে এসে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ক্রোধে তার দুই চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর কারণ এই ভণ্ডী এবং হর্ষ।

হঠাৎ সে সুর নামিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সম্পর্কে বাণের কোনও ধারণা আছে কিনা? বাণ বিনীতভাবে বলেন এই গ্রন্থ সম্পর্কে তার জ্ঞান সুগভীর নয়। ভাসাভাসা ধারণা আছে।

বক্রঘোন বলে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের অন্যতম রীতি হচ্ছে রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হতে পারবে। কৌটিল্যের এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিধান থাকতে ও হর্ষবর্দ্ধনের রাজপদে অভিষিক্ত হবার কালে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। হর্ষবর্দ্ধন রাজা হবার অনুপযুক্ত এই রায় দিয়েছিলেন, স্থান্বীশ্বরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। বক্রঘোন তার কণ্ঠ আরো উচ্চগ্রামে বেঁধে বলে রাজ্যের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ প্রতিবাদ করেছিলেন কারণ তারা জানতেন নিষ্ঠুর হর্ষবর্দ্ধনের কীর্তি কাহিনি।

বাণের দ্রুত জিজ্ঞাসা শেষপর্যন্ত হর্ষদেব কীভাবে রাজা হলেন? বক্রঘোন বলে, শেষপর্যন্ত রাজা হবার পিছনেও ভণ্ডীর চক্রান্ত। হর্ষ তলোয়ার দেখিয়ে বিদায় করেছিল রাজ্যের সমস্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিদের। পিতৃসম প্রধানমন্ত্রীকে বিতাড়িত করে এই আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল অর্বাচীন ভণ্ডীকে। ধূর্তভণ্ডী অস্ত্রের ঝনঝনানির শব্দে স্তব্ধ করে দিল বিজ্ঞদের কণ্ঠস্বর। রাজসভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ প্রাণের ভয়ে ভণ্ডীর প্রস্তাবে হর্ষ সিংহাসনে আরোহণ করল। অন্যদিকে সুযোগ সন্ধানী বৌদ্ধগণ সম্পূর্ণভাবে এই সুযোগ নিল। এই বৌদ্ধগণ হচ্ছে অবলোকিতেশ্বর বৌদ্ধ সম্প্রদায়। তাঁরাগঙ্গার তীরে নিয়ে গিয়ে হর্ষকে বৌদ্ধধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করে।

কোকিল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে, প্রথম ঘুমভাঙা ডাক ডেকে উঠে। কোকিলের ডাক শুনে বক্রঘোন উঠে দাঁড়ায়। বলে, সে হর্ষবর্দ্ধন ভণ্ডী এদের অনেক গোপন সংবাদ জানে। তাকে হত্যা করার জন্য ভণ্ডীর ঘাতক দল পরমেশ্বর মন্দিরে হানা দেয়। বক্রঘোন কোনক্রমে প্রাণে বেঁচে যায় । ঘাতকদল মন্দিরে পৌঁছানোর আগেই সে পালিয়েছিল।

হর্ষবর্দ্ধন সম্পর্কে বক্রঘোন কী ধারণা পোষণ করে? এই প্রশ্ন শুনে বাণের দিকে তাকিয়ে সে তার ডান হাত উপরে তুলে বলে জীবনের অন্তিমক্ষণ পর্যন্ত সে এই মহাপাপী ঘাতককে সংহার করার জন্য প্রতীক্ষণ করবে ।

বাণ, বক্রঘোনের ভীষণ মানসিকতা উপলব্ধি করে চিন্তিত হলেন। বক্রঘোনের জীবন সত্যই বিপন্ন। অন্যদিকে বক্রঘোনের সাথে তার সম্পর্ক প্রকাশ পেলে স্বয়ং বিপন্ন হবেন। এমনকী মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

স্থির করেন, বক্রঘোনকে দূরদেশে পাঠিয়ে দেওয়া উভয়ের পক্ষে মঙ্গলজনক।

তিনি, বক্রঘোনকে খানিক অপেক্ষা করতে বলে, প্যাটরা খুলে কারুকার্যপূর্ণ ছোট্ট একটি কাঠের ময়ূর বের করলেন। দিন কতক আগে তার ছোট্ট পুলিন্দার জন্য কিনেছিলেন।

অতিক্রান্ত একখণ্ড চীনাংশুক বস্ত্র দিয়ে ময়ূরটি আবৃত করে তার উপরে বড় বড় আখরে লিখলেন "পুলিন্দা"। পুলিন্দাটি বক্রঘোনের হাতে দিলেন। এরপর অর্থ-কড়ির আর একটি পুলিন্দা তার হাতে দিয়ে প্রীতিকূটে চলে যেতে বলেন। বিস্তারিত ভাবে প্রীতিকূট বিদ্যাশ্রমের অধ্যাপক এবং যাত্রাপথের বর্ণনা দিলেন।

বক্রঘোনকে নিষেধ করলেন; সে যেন কোনও অবস্থায় প্রকাশ না করে সে স্থাণ্বীশ্বরের অধিবাসী। বলবে, কাশীর অধিবাসী। প্রীতিকূট বিদ্যাশ্রমে উপস্থিত হয়ে ভট্ট ব্রহ্মাবীর স্বামীকে বলবে বাণভট্ট তাকে বিদ্যাশ্রমে প্রেরণ করেছেন। কাশীতে উভয়ে পরিচয় হয়েছে। প্রসঙ্গ ওঠে। বক্রঘোন বলে, বক্রঘোন নামেই তার পরিচয় হবে। বলবে এমন নামাকরণ করেছেন স্বয়ং তার স্নেহশীল অধ্যাপক। সে তার নাকে হাত দিয়ে বলে তার নাক কিন্তু কাকা নয় । দুজনের মুখে উজ্জ্বল হাসি ঝলমল করে ওঠে ।

ইতিমধ্যে অজস্র পাখির কাকলিতে দিক ছেয়ে গেছে। আর সময় নেই । বক্রঘোন সরস্বতীর শুষ্ক বালির উপর দিয়ে ঘন কুয়াশায় মিলিয়ে যায় ।

* * *

শীত বসন্ত পার হয়ে অগ্নিদাহী গ্রীষ্ম এল। এরপর বর্ষার দাক্ষিণ্যে ধরণী হল অভিষিক্ত । সরস্বতীর শুষ্ক বুক বিষ্ণুর মঙ্গলস্পর্শে হয়ে উঠল পীযূষবতী। হিমালয় শিখরে ব্রহ্মার কমণ্ডলু থেকে ধারা নেমেছে।

একদিন শেষরাত থেকে বৃষ্টি। অঝোর বৃষ্টি। বৃষ্টি ভিজে এল রাজদূত। আজ রাজসভা বসবে। খবর পাঠিয়েছেন হর্ষদেব। হর্ষদেব ফিরে এসেছেন স্থাণ্বীশ্বরে।

বাণভট্ট দীর্ঘদিন পর তোরঙ্গ খুলে বের করলেন তার মহার্ঘ বস্ত্রসম্ভার । সেজে গুজে পাঁচ

ঘোড়ার রাজকীয় রথে পৌছালেন রাজসভায়। রাজসভায় তখনো হর্ষদেবের আগমন ঘটেনি। কৃষ্ণদেব রাজসভায় উপবিষ্ট দুজনের সাথে বাণের পরিচয় করিয়েদিলেন।

হর্ষদেব এবার দিগ্বিজয়ে বের হয়ে মণিমুক্তা হীরাপান্নার সাথে এনেছেন দুজন পণ্ডিতকে। একজনের নাম ময়ূর অন্যজন মাতঙ্গ দিবাকর। পণ্ডিত দুজনের সাথে পরিচয় প্রসঙ্গে দু চারটি বাক্য বিনিময়করে বাণের মনে হল পণ্ডিত দুজনই দাম্ভিক।

প্রতিহারীর ঘোষণা নানাবাদ্যধ্বনি এবং উপস্থিত সকলের স্বাগতধ্বনির মাধ্যমে হর্ষদের প্রবেশ করে সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন।

রাজসভা উদ্বোধন হল নবাগত পণ্ডিতদ্বয়ের মঙ্গলস্তোত্র পাঠের মাধ্যমে । পণ্ডিতদ্বয়, স্বরচিত স্তোত্রের মাধ্যমে বন্দনা করলেন হর্ষদেবকে।

বন্দনা শুনে বাণের মনে হয় এমন কবিতা যেন কোথায় পাঠ করেছেন। চিন্তার সমুদ্রে পূর্ণিমার জোয়ার ওঠে। সমুদ্র ভাবনায় মুক্তি পায় উজ্জ্বল এক কাব্যের শুক্তি। পণ্ডিতদ্বয়ের কবিতার মূল উৎস আবিষ্কৃত হয়। বাণের অনুভূতি নিদারুণ লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে। পণ্ডিতগণদের হীনপ্রবৃত্তি তাকে নিদারুণ আঘাত হানে।

বাণ লক্ষ করেন কৃষ্ণদেব এবং হর্ষদেব ঘনঘন দৃষ্টিপাত করছেন তাঁর দিকে। বাণ, কৃষ্ণদেবের চোখের দৃষ্টিতে পাঠ করেন কৃষ্ণদেবের মানসিক ভাষা ।

রাজসভার রীতিনীতি সম্পর্কে বাণের বিশেষ পরিচয় নেই। প্রস্তুত হয়েও আসেননি। অন্যদিকে কবিতা রচনায় তত পটু নন। গদ্য ভাষায় কিছু লেখালেখি অবশ্য করেছেন ।

কিন্তু রাজসভায় কিছু বলতে হবে। বলতে হবে আবার কবিতার ভাষায় । স্বাভাবিকভাবে তিনি বিচলিত।

বাণের চোখে গবাক্ষপথে আকাশ আকাশের তলায় দীর্ঘশির তরুদল । তরুশিখরে অজস্র ধারায় বৃষ্টি নামছে। আকাশ ভরা ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি।

বৃষ্টি ! বৃষ্টি ! বৃষ্টির বিরাম নেই । বৃষ্টির নূপুর নিক্কণ তার কণ্ঠে কবিতার জন্ম দিল। দাঁড়িয়ে অনুষ্টুভ ছন্দে উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি শুরু করলেন-

" নিজবর্ষাহিত স্নেহা বহু ভক্ত জনাম্বিতা ।

সুকালা ইব জায়ন্তে প্রজাপুণ্যেন ভূভুজঃ।"

প্রজার পুণ্যে বর্ষার পূর্ণতা নিয়ে রাজা জন্মগ্রহণ করেন। রাজার করুণায় পূর্ণ হয় অন্ন । অন্নের প্রাচুর্যে রাজা সকলের শ্রদ্ধাভাজন ।

রাজসভায় সাধু বাদ ওঠে। বাণ লক্ষ করেন নবাগত পণ্ডিতদ্বয়ের মুখে ব্যঙ্গের তির্যক হাসি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

কৃষ্ণদেব দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে বলেন, মহাজ্ঞানী বাণভট্টদেব যদি নবাগত পণ্ডিতদ্বয় সম্পর্কে কিছু বলেন তা হলে রাজসভা আনন্দিত হবে । বাণ লক্ষ করেন কৃষ্ণদেবের মুখমণ্ডল পূর্ণ করে, জ্বল জ্বল করছে আনন্দের গর্বমাখা হাসি।

বাণে ইচ্ছা ছিল না অন্যকিছু বলার। হর্ষদেবের দিকে তার দৃষ্টিপাত হলে তিনি লক্ষ করেন হর্ষদেবের চোখে কিছু বলার ইঙ্গিত।

নবাগত পণ্ডিতদ্বয়ের কথা বলার ভঙ্গি এই সাথে তাদের কবিতা শুনে বাণের মন ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। ওরা নির্লজ্জভাবে সর্বসমক্ষে অন্যের কবিতা নিজের রচনা বলে চালিয়ে দিবার প্রচেষ্টা করছে।

ক্রুদ্ধ বাণের মনের কোষ থেকে উন্মুক্ত হয় শাণিত তরবারি। কোষমুক্ত তরবারির দু'দিকে ভীষণ ধার।

বাণ তীক্ষ্ণধার শাণিত তরবারির মত দাড়িয়ে হর্ষদেব এবং সভাসদগণকে নমস্কার জানিয়ে বলেন, মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধদেবের যে প্রশস্তিকীর্তন, নবাগত পণ্ডিতদ্বয় পাঠ করেছেন, তা সর্বাঙ্গসুন্দর কবিতা। এমনি সর্বাঙ্গসুন্দর কবিতা একমাত্র মহৎ কবিদের পক্ষে রচনা করা সম্ভব।

সভা সাধুবাদে গুঞ্জরিত হয়। নবাগত কবিদের মুখমণ্ডল গর্বে পূর্ণচন্দ্র হয়ে ওঠে।

সাধুবাদের গুঞ্জরন স্তিমিত হলে বাণ আবার বলতে আরম্ভ করেন "তবে মহৎ কবিগণ ব্যতীত কিছু যশলোভী ব্যক্তি আছেন তাদের প্রতি সাবধান থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।" বাণ এই প্রসঙ্গে একটি শ্লোক আবৃত্তি করেন।

'অন্যবর্ণ পরাবৃত্যা বন্ধচিহ্ন নিগূহ নৈঃ।

অন্যখ্যাতঃ সতাং মধ্যে কবিশ্চৌরো বিভাব্যতে।'

আমাদের মধ্যে এমন সব কবি আছেন যারা অন্যের কবিতা এদিক ওদিক করে নিজের কবিতা বলে চালিয়ে প্রশংসালাভের চেষ্টা করেন। এসব চৌর্যবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি কোনও দিনই কবিদের কাছে মর্যাদা লাভ করেন না। বরং পাঠকমহলে চোর হিসাবে চিহ্নিত হন।

সাধুবাদে সভা ফেটে পড়ে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় তিনি খুব ভালো করে জানেন অধিকাংশ মানুষ সাহিত্য কাব্যের ধার ধারে না। এ সকল অসংস্কৃত লোক অন্যের সামনে ভাণ করে প্রদর্শন করতে চায়, সে একজন পরম বোদ্ধা।

বাণ উপলব্ধি করেন তার দুমুখো ধারের তলোয়ার অন্তত দুজনকে আহত করেছে। পণ্ডিত দ্বয়ের মুখ থমথমে। হর্ষদেব, মুখের হাসি গিলে ফেলে সিংহাসনে সম্রাট হয়ে বসে আছেন।

বাণের দুমুখো তলোয়ারের রক্তপিপাসা তখনো মিটেনি। তিনি বলেন, এ সকল চৌর্যবৃত্তি সম্পন্ন কবিমন্যাগণ অন্যের মহৎ কবিতায় দুএকছত্র স্বয়ং জুড়ে দিয়ে মনে করেন দারুণ কিছু প্রসব করলেন। তারা নিজের কথায় শুধুমাত্র ছিটিয়ে দেয় পিচ্ছিল আদিরস। বাণ এবার অন্য একটি কবিতা পাঠ করেন।

প্রায়ঃ কুকবয়ো লোকে রাগাধিষ্ঠিত দৃষ্টয়ঃ।

মক্কোকিলা ইব জায়ন্তে বাচালাঃ কামকারিনঃ।"

ঘরে বাইরে সর্বত্র দেখা যায় এ সকল কু-কবিগণকে। এরা কোকিলের মত বাচাল। এদের কবিতার উদ্দেশ্য, আদিমতম কাম-প্রবৃত্তিকে সুড়সুড়ি দিয়ে জাগিয়ে তোলা।

সভায় তীব্র সাধুবাদ ধ্বনি। ময়ূর এবং মাতঙ্গ দিবাকর মস্তক অবনত। সৌভাগ্যবশত সভাভঙ্গের ঘন্টা বেজে উঠে। সবাই মুক্তি পায়।

মধ্যাহ্নে বাড়ীতে পৌঁছে বাণ পেলেন একখানা পত্র। বিহঙ্গমা লিখেছে সে স্থাম্বীশ্বরে এসে গেছে। চিঠিতে লিখেছে আজ সন্ধ্যায় রাজ সভাপণ্ডিত বাণভট্ট যদি দয়া করে তার বাড়িতে পদার্পণ করেন তা হলে পত্রলেখিকা ধন্য হবে। পত্রলেখিকা বিশেষ করে লিখেছে সে সাগ্রহে বাণভট্টের অপেক্ষায় থাকবে। পত্রশেষে, বিহঙ্গমার বিস্তারিত ঠিকানা এই সাথে পথ নির্দেশিকা বিস্তারিতভাবে চিত্রিত হয়েছে।

খাবার দাবারের কথা বিস্মৃত হয়ে পড়তে থাকেন বিহঙ্গমার পত্রখানা। পাঠ শেষ হয় না। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সস্নেহে বাণকে ভোজনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। খাবার গ্রহণ করে আবার প্রতীক্ষা। সন্ধ্যার প্রতীক্ষা। তার মনে হচ্ছিল মহাব্রহ্মাণ্ড কোন ওলট পালট ঘটিয়ে সূর্যকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। মনেহয় স্তব্ধ সূর্য আকাশের কোন এক গুপ্ত অলিন্দে গা ঢেকে বসে আছে। জলঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন গলে গলে নামছে জলের বিন্দু। সময় স্তব্ধ হয়নি। বাণ সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করেন। প্রাঙ্গণের মেঘের নীলছায়া ধীরে ধীরে গভীর হয়ে সন্ধ্যা নামে।

সন্ধ্যার ছায়ায় অভিসারের পথে যাত্রা সুরু হয়। পোশাক-পরিচ্ছদ অতিসাধারণ। ভাড়া করলেন একঘোড়ার টানা অশ্বযান।

গাড়ি এগিয়ে চলে। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টির বিরাম নেই। বিহঙ্গমার নানা কথা ভেবে চলছেন। অগ্নিউজ্জ্বল সতীবেশ। গঙ্গার জলে সর্বরিক্তা। রাজনটীর বেশ। গুরুদেবের পারলৌকিক ক্রিয়ার উদাসিনী বৈরাগ্যরূপ। কানে বিহঙ্গমার কথা ভেসে আসে "আমার গর্ভে যদি কোনও সন্তানের জন্ম হয় তার পরিচয় হবে আমার পরিচয়ে। কোনও পিতার পরিচয়ে নয়। আমি কিন্তু সুদ নিতে পারব না। জন্ম জন্মান্তরমাথায় করে রাখব এই ঋণের সুখ।"

গাড়োয়ানের পরিচিত পথ। সন্ধ্যার ছায়ার এপথে তাদের নিত্য আসা যাওয়া। রাজপুরুষগণ রাজকীয় শকটে এ পথে পা দেন না।

গাড়ি বিহঙ্গমার সাজানো বাড়ীর সম্মুখের দাঁড়ায়। ফটকের অভ্যন্তর গৃহ প্রাঙ্গণে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। উজ্জ্বল আলোতে ঝলমল করছে বৃষ্টি ভেজা ফুল। প্রাঙ্গণে অজস্র ফুল। ফুল দলের মাঝদিয়ে পায়ে চলার সরুপথ। পায়ে চলার ভিজে পথ ধরে বিহঙ্গমার বাসভবনের দিকে এগিয়ে চলেন।

ফটকের সম্মুখে গাড়ির শব্দ শুনে বিহঙ্গমার বাসভবনের বন্ধ দরজা উন্মোচিত হয়। গৃহের অভ্যন্তরে থেকে নানা বর্ণের ফুল মালার মতো বের হয়ে আসে এক ঝাঁক তরুণী। তরুণীর দল বাণকে ঘিরে প্রবেশ করে গৃহের অভ্যন্তরে। বাণ উপবিষ্ট হন, শুভ্র পট্টবস্ত্রাবৃত বেতের আসনে। বেজে ওঠে তরুণীদের হাতের শ্বেত শুভ্রশঙ্খ। কণ্ঠে পরিয়ে দেয় মালতী পুষ্পমালা । তরুণী দল বাণের সর্বদেহে ছড়িয়ে দেয় বৃষ্টিভেজা শ্বেত পুষ্পরাশি।

বাণ লক্ষ করেন, এই কক্ষে একঝাঁক সুন্দরী আছে কিন্তু মোহিনী বিহঙ্গমা নেই। সুন্দরীদের কলকাকলিতে মুখর কক্ষ। বাণের মনে হয়, প্রতিটি নারী যেন আপন রূপের কস্তুরী গন্ধে সম্মোহিত।

বাণের মাথায় ভর করেন তার প্রিয় কাব্যসরস্বতী।

বাণের কাব্যানুভূতি ভাবে, যদি সুন্দরীদের যেকোন একজনকে বলা হয় ওগো রূপসী! কী সুন্দর তোমার অলক্তক রাঙা শ্রীচরণ। কথা শুনেই সুন্দরী নিশ্চয়ই বলবে —ওমা ! আলতা কী ভীষণ ভারী। আলতার ভারে আমি চলতে পারছি না যে।

যদি বলা হয় ওগো সুন্দরী ! তোমার সুন্দর দুটি স্তনে কী অপূর্ব চন্দন চিত্রণ। তখন সুন্দরী নিশ্চয়ই বলবে — মাগো ! চন্দণ কী ভীষণ। কী বিশ্রী। আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।

যদি বলা যায় ওগো "মনমোহিনী! তোমার অঙ্গুলি যেন চম্পককলি। তোমার হস্তে যদি চম্পককলি থাকে তাহলে অঙ্গুলি তোমার, চম্পক মিশে যাবে"। এই কথা শুনেই সে নাকি সুরে বলবে-" ও মশাই! হাতে চম্পককলি নিলে, চম্পকের ভারে যদি আমার কোমর ভেঙে যায়? তখন আমি কী করব?"

বাণের মাথায় কাব্যসরস্বতী চিন্তা করে সুন্দরীর কোমর ভেঙে পড়ার আশঙ্কা গুরুতর বিষয় । তখন বলতে হবে "বালাই ষাট্! তোমাদেরে বানিয়েছে যে ভগবান সে বেঁচে থাক। না হলে তোমাদের মেরামত করবে কে ? বাণের মাথায় কাব্যসরস্বতী আর অগ্রসর হতে পারেন না। এক লবঙ্গলতিকা এসে বাণকে অন্যকক্ষে নিয়ে যায়।

অন্যকক্ষে প্রবেশ করে বাণ বিহঙ্গমাকে দেখেন। তার সব কল্পনা ভেঙে চুরমার হয়ে যায় । কক্ষ ফুলে ফুলে সাজানো। পুষ্প সুবাসে আমোদিত দশদিক। বাণের মনে উঁকি দেয় এই সুবাসই কি নন্দনের পারিজাত সুবাস? মণিময় মাণিকা পালঙ্কে অর্দ্ধশয়ান বিহঙ্গমা। পালঙ্কে গাঁথা এই কি ইন্দুকান্তমণি? রক্ত পদ্মবর্ণ চীনাংশুক উপাধানে বাহুর উপর দেহভার রেখে পদ্মদল করে তার শির স্থাপিতা ফুলডোরে বাঁধা কবরী। চন্দনের চর্চিত ললাট। ললাটের উপর চূর্ণ কুন্তল। এক অপ্সরার ময়ূর পা... বীজনে, চূর্ণ কুন্তলে শিহরণ।

নিস্তব্ধ বাণ। কে এই নারী ? এই কি জন্মান্তরের প্রিয়া? স্বচ্ছ নির্মোকের মত দুকূল ভেদ করে চেয়ে আছে দুটি স্তন। শ্বেতচন্দনের সূক্ষ্ম চিত্রে মণ্ডিত। স্বর্ণবর্ণের মেখলা কিঞ্চিৎ সরে গিয়ে বের হয়ে আছে দুটি চরণরেখা । চরণ দুটি আলতা রাঙা। চরণে মণিমুক্তায় গাঁথা নূপুর।

বিহ্বল বাণ। সম্মুখে তার মোহিনী বিহঙ্গমা । হাতে তার লীলাকমল । মুখমণ্ডলে লৌধ্ররেণুর স্বর্ণালী আভা। কর্ণমূলে কুন্দকলি। মেঘ কজ্জলে নীলপদ্ম আঁখি।

বাণ তাকিয়ে দেখেন বিনম্র বিনীত দুটি নীলপদ্ম । শুভদৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে প্রতীক্ষা করে। আড়ষ্টতা নামে বাণের কণ্ঠে মনে হয় ভুলে গেছেন ভাষা।

শরতের স্নিগ্ধ কুয়াশা সরমে জড়িত নীলপদ্ম থেকে টুপটাপ করে ঝরে পড়ে বাণের পিপাসায় বিশুষ্ক চোখে। সলজ্জ হাসির রাগিনীতে বাণের কর্ণে জেগে উঠে বসে। পালঙ্কের পাশে রাখা স্বর্ণবর্ণ অলাবু বীণায় স্থাপন করে তার দক্ষিণ কর। রিনিকি ঝিনিকি ঝিল্লীরে গেয়ে উঠে অলাবু বীণা। বীণায় সুরের মাথা গাঁথা সমাপ্ত করে ধীর পদক্ষেপে নেমে আসে বাণের পাশে। অজানা গন্ধে বাণের সর্বাঙ্গ শিহরিত। শিথিল হয়ে আসে অঙ্গ। বিহঙ্গমা তার দুটি রক্তকমল দল কর

বাণের দিকে এগিয়ে দেয়। রক্তকমল দলের বুকে সমর্পিত হয়, বাণের লুব্ধ ভ্রমর দক্ষিণ কর। বাণ, পালঙ্কে উপর পা ঝুলিয়ে উপবেশন করেন। বিহঙ্গমা অলাবু বীণার মেঘ নিক্বণ সুর ঝঙ্কারে বাণকে অনুরোধ করে শয্যার উপর দুটি চরণ স্থাপন করতে। বাণের ইতস্তত বৃষ্টিভেজা চরণ যুগল। বিহঙ্গমা তার বক্ষে দুকূল আবরণী হাতে নিয়ে বাণের বৃষ্টিভেজা পা মুছিয়ে দেয়। বিহঙ্গমার স্তন যুগলের শ্বেত চন্দনের উজ্জ্বল সাজ বাণের চোখে ভৈরব বর্ষার বিদ্যুৎচমক হয়ে দেখা দেয়।

বাণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে বিহঙ্গমার রূপ আস্বাদন করেন। বিহঙ্গমার চন্দনপঙ্ক লৌধ্ররেণু ফুল সাজ সবকিছু হঠাৎ একান্ত পরিচিত হয়ে উঠে। বিহঙ্গমার রূপলাবণ্য পূর্বজন্মের স্বর্গচ্যুত হয়ে নেমে আসে বাণের পরিচিত জগতে। ফুল সাজের মোহিনী বিহঙ্গমা অকাল বসন্ত উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে ঘন বর্ষার মেদুর সন্ধ্যায়। বাণ এই কল্পলোকের নায়িকাকে তার বাণীর শ্বেতমরালের পাখার লেখনী দিয়ে চিত্রিত করে ছিলেন স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে। পার্বতী পরিণয়ের উমা এমনি ফুল ডোরে সেজে মৃদুমন্দ পদবিক্ষেপে বের হয়েছিল দেবাদিদেব মহেশ্বরের অভিসারে। অজস্র বসন্তের মধুপ গুঞ্জরণে জেগে উঠে তার চৈতন্য। এই মোহিনী তার ভালোবাসা। গৌরী সাজে তার সম্মুখে এসেছে উম-ইয়াম।

শয্যার উপর বাণের দেহ ধ্যানস্থির। কালের অমোঘ স্রোত উজিয়ে মন চলে গেছে সুদূর কাটিগড়ার রঙ্গমঞ্চে। রঙ্গমঞ্চে অভিহিত হচ্ছে তার রচিত প্রথম নাটক পার্বতী-পরিণয়।

বিহঙ্গমা, ধ্যানস্থির বাণের কণ্ঠ তার মৃণাল বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে। পার্বতী পরিণয় নাটকে এমনি ক্ষণের অভিনয় ছিল দেবাদিদেব মহেশ্বরের চমকে উঠা সে নাটকে বাণ হয়েছিলেন দেবাদিদেব মহেশ্বর। বিহঙ্গমার মৃণাল বাহুর স্পর্শে চমকে ওঠেন। চমকে উঠে শয্যা থেকে নেমে ভূমিতে চরণ নিক্ষেপ করলেন। চরণদ্বয়, তার অজান্তে পায়ে পায়ে গৃহ পরিত্যাগ করে ফটক অতিক্রম করে রাজপথে হাজির হয়।

অঝোর বৃষ্টি। দেহের অগ্নিদাহ বৃষ্টিস্নাত হয়ে নামছে। অজানা অন্ধকার পথে বাণ এগিয়ে চলেন। কণ্ঠে জেগে উঠে বর্ষার সঙ্গীত

"উদ্যদ্বর্হিষি দুর্দুরারব পুষি প্রাক্ষীণ পান্থায়ুষি
শ্চোত দ্বি প্রুষি চন্দ্র রূঢ়ুমুষি সখে হংস দ্বিষি প্রাবৃষি।
মা মুঞ্চোচ্চকুচান্ত সংতত গলদ্বাষ্পাকুলাং বালিকাং।
কালে কালকরাল নীল জলদ ব্যালুপ্ত ভাস্বত্ত্বিষি।

হে সখা! বর্ষা নেমেছে। ময়ূর পেখম মেলেছে। সঘনে দাদুরী ডাকছে। জনহীন পথ। শশিতারাহীনা রজনী। খর বিদ্যুৎ চকিত বৃষ্টিধারা। হংসের হিংসা জাগিয়ে অম্বর সংবৃত মেঘপুঞ্জে।

হে সখা! হেনকালে নীলমেঘের স্বপ্নিল সৌন্দর্যের মাঝে যেয়োনো ছেড়ে অশ্রুভেজে এই কন্যাকে। ছেড়ে যেয়ো না এই বালার সুপুষ্ট স্তনের শিখরকে।

* * *

পরদিন সকালবেলা রাজসভায় যাবার প্রস্তুতি যখন সবেমাত্র সমাপ্ত হয়েছে তখন খবর

এল রাজসভা বন্ধ। জরুরি কাজে হর্ষদের চলে গেছেন দূরদেশে। দরজায় রাজকীয় রথ ছিল প্রস্তুত। রথে চড়ে পৌছালেন বাণ পরমেশ্বর শিবমন্দিরে। মন্দির থেকে গেলেন পরম সৌগত বৌদ্ধবিহারে।

বিহারের পৈঠায় আড্ডা জমে উঠে জনৈক চৈনিক বৌদ্ধসন্ন্যাসীর সাথে। সন্ন্যাস গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট। আড্ডার ভাষা সংস্কৃত। চৈনিক সন্ন্যাসীর ভাষা বাণের অপরিচিত। চৈনিক কণ্ঠে উচ্চারিত সংস্কৃত শব্দাদি, নানা বর্ণের যোগ বিয়োগ সমীকরণে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন বাণ। আবিষ্কার হয় সাধারণ সূত্র। তিনি লক্ষ্য করেন, সংস্কৃত ভাষার "র" এবং "ব" ধ্বনি, চৈনিক উচ্চারণে যথাক্রমে হয়ে যায় "ল" এবং "প"। এই সাথে "গ" ধ্বনি, চৈনিক উচ্চারণে হয়ে উঠে "ক"। "ড" ধ্বনি হয়ে উঠে "ত" ধ্বনি। এমনি ধরনের নানা পরিবর্তন।

সন্ন্যাসী তার নাম বলেন তাও সেং-ফালি। এই চৈনিক নামের সংস্কৃত ভাষায় অর্থ বলেন চান-ত-লুও-তি-পো বাণ পড়ে বাণ বেকায়দায়। সংস্কৃত অর্থ তার বোধগম্য হচ্ছে না। সন্ন্যাসীর মুখে কৌতুকের মৃদুহাসি। বাণকে মহাপরীক্ষায় ফেলেছেন। বাণ, নবাবিষ্কৃত ভাষাসূত্রের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে আবিষ্কার করেন এই চান-ত-লুও-তি-পো নামের প্রকৃত অর্থ। বাণ বিনীত শিক্ষার্থীর মত বলেন, এর অর্থ 'চন্দ্রদেব'।

আলাপ জমে ওঠে। সন্ন্যাসী তার জন্মভূমির নাম বলেন ফান-ইয়াং। জন্মভূমি স্থানকে বিশদ ভাবে প্রকাশ করার জন্য বলেন, ফান-ইয়াং হচ্ছে পেচিং নগরীর খুব নিকটে। ফান-ইয়াং থেকে তার যাত্রাপথের কাহিনি বলতে শুরু করেন। তিনি চীনদেশের একপ্রান্ত থেকে পায়ে হেঁটে পুণ্যভূমি ভারতে এসেছেন।

যাত্রাপথের কাহিনির সাথে উঠে এল এক ভীষণ নাগদেবতার কাহিনি। সন্ন্যাসী বলেন, এই নাগদেবতার কাহিনি পড়েছিলেন একজন বুদ্ধভক্ত চীনা সন্ন্যাসী গ্রন্থে। বাণ সেই বুদ্ধভক্ত সন্ন্যাসীর নাম জিজ্ঞাসা করলে সন্ন্যাসী বলেন, সন্ন্যাসীর নাম ফা হিয়েন। তিনি প্রায় শদুয়েক বছর আগে ভারততীর্থে এসেছিলেন। সন্ন্যাসী নাগদেবতার কাহিনি আরম্ভ করেন।

ভারতের প্রায় দরজায় এক দেশ। দেশের নাম শ্বেতবরষ। শ্বেতবরষ গান্ধার দেশের কাছাকাছি। শ্বেতবরষ দেশ অতিক্রম করে মস্ত এক হ্রদ। এই হ্রদে বাস করত মস্ত ভীষণ এক নাগদেবতা। নাগদেবতা নাগধর্মী হলেও সে বৌদ্ধধর্মকে অন্যান্যদের মত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত না। নাগদেবতা, এই হ্রদ থেকে বহুদূরের এক সঙ্ঘারামের বৌদ্ধ ভিক্ষু একজনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। বহু দূরের এই সঙ্ঘারাম ছিল গান্ধার দেশে। গান্ধারের এই সাঙ্ঘারামের ভিক্ষু রোজ এসে নাগদেবতাকে বুদ্ধদেবের ভালো ভালো কথা বলতেন।

বাণ ইতস্তত করে বলেন, তা হলে গান্ধার দেশ খুব একটা দূরে ছিল না। দূরে থাকলে রোজ রোজ ভিক্ষু আসতে পারতেন না।

সন্ন্যাসী বলেন, ভিক্ষুর ছিল আশ্চর্য একটি আসন। আসনে বসে আদেশ দিলে আসন আকাশপথে অতিদ্রুত উড়ে যেত পারত। এই আসনে চড়ে ভিক্ষু নাগদেবতার কাছে যাওয়া আসা করতেন।

একদিন ভিক্ষুর মহাপাজি চেলা লুকিয়ে থাকে আসনের তলায় এবং ভিক্ষুর সাথে হাজির হয় নাগদেবতার প্রাসাদে। চুপি চুপি দেখতে পেল নাগদেবতা ভিক্ষুকে নানা ধরনের খাবার দাবার সোনার থালা ভর্তি করে দিচ্ছেন। খাবারের গন্ধে চেলার জিভে জল গড়াতে থাকে। সেভাবে সে যদি নাগদেবতা হত তা হলে কতসব খাদ্য খেতে পারত।

ভিক্ষুর আসনে করে চেলা চুপিচুপি সাঙ্ঘারামে ফিরে আসে ফিরে এসে বুদ্ধদেবের কাছে কান্নাকাটি করে প্রার্থনা আরম্ভ করে। বুদ্ধের করুণা হল। বুদ্ধের করুণায় হঠাৎ করে একই সাথে চেলা এবং নাগরাজের মৃত্যু হল। নাগরাজের আত্মা সপ্তমস্বর্গের পথে উড়ে গেল। অন্যদিকে চেলার আত্মা গিয়ে প্রবেশ করল নাগরাজের মৃতদেহে। নাগরাজের মৃতদেহে আবার প্রাণ ফিরে এল।

বাণ বলেন, তার অর্থ চেলা নাগরাজ হয়ে গেল। সন্ন্যাসী তার মাথা দুলিয়ে স্বীকার করেন।

বৌদ্ধভিক্ষুর চেলা নাগরাজ হয়েই শুরু করল বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার। অন্যদিকে কাছাকাছি যত ছোটো বড়ো নাগরাজা ছিল তাদের বেমালুম গিলে ফেলল।

সঙ্ঘারামের ভিক্ষু প্রথমে আঁচ করতে পারেনি। নাগরাজার কাণ্ডকারখানা। এত ভালো নাগরাজা কীভাবে পালটে গেল? ক্রমে বৌদ্ধ ভিক্ষু আঁচ করলেন তার চেলার কাণ্ডকারখানা। এই খবর গেল অশোক রাজার কানে। অশোক রাজা দুঃখ পেলেন। তিনি এই ভালোমানুষ নাগরাজার পুণ্যস্মৃতি রক্ষার জন্য হ্রদের তীরে মস্ত এক স্তূপ নির্মাণ করলেন।

অশোক রাজা স্তূপ নির্মাণ করে যেতে না যেতেই চেলা নাগরাজ স্তূপ ভেঙে চুরমার করে দিল। অশোকরাজা আবার বানালেন। চেলা নাগরাজ আবার ভেঙে দিল। এমন করে ছয় -ছয়বার ভাঙা গড়ার শেষে অশোক রাজার ভীষণ রাগ হল। এবার তিনি সৈন্যসামন্ত গাঁইতি কোদাল নিয়ে এলেন। নাগরাজার হ্রদ বুজিয়ে দেবেন।

দারুণ ভয় পেয়ে চেলা নাগরাজ অশোক রাজাকে আক্রমণ করল। নাগরাজ সৃষ্টি করল ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত। অশোক রাজার সৈন্য সামন্ত আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। চারদিকে জ্বলছে আগুন দাউ দাউ করে। এমন সময় অশোক রাজার মনে পড়ল তার পোষা তিনটি তালবেতালের কথা। তালবেতাল এসে থামিয়ে দিল ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত। দাউ দাউ আগুন নিভে গেল। এবার চেলা নাগরাজ পেল ভীষণ ভয়।

বাণ জিজ্ঞাসা করেন, সন্ন্যাসী ফা হিয়েন গ্রন্থে অশোক রাজার নাম লিখেছেন ?

উত্তরে সন্ন্যাসী বলেন, ফা হিয়েন গ্রন্থে অশোক রাজার নাম লেখা। কিন্তু তিনি নিজে যখন এই হ্রদের তীরের লোকজনদের সাথে কথাবার্তা বলেছিলেন, তখন ওরা রাজার নাম বলেছিল, কনিষ্ক রাজা।

কাহিনি শুনে বাণের দারুণ কৌতূহল। তিনি জিজ্ঞাসা করেন —তারপর কী হল ?

সন্ন্যাসী বলেন, এবার চেলা নাগরাজ, অশোকরাজার পায়ে সটান লম্বা হয়ে কেঁদে কেটে বলে এমনি কাজ আর করবে না। স্তূপ ভাঙবে না। অশোক রাজার দয়া হল। চেলা নাগরাজকে

ছেড়ে দিয়ে আবার স্তূপ নির্মাণ করলেন।

স্তূপ তৈরি হয়ে যাবার পর আবার এল অশোক রাজার কাছে। এসে কাঁচুমাচু হয়ে অশোক রাজাকে বলে তারা অতিহীন নাগজাতি। চটপট মাথাগরম হয়ে যায়। নাগরাজ এবার আস্তিয়ে পস্তিয়ে নিবেদন করে যদি কোন কারণে অথবা অকারণে তাদের মাথা গরম হয়ে যায় সেইক্ষণে অশোক রাজা তাদের মাথা ঠান্ডা করার কথা যেন স্মরণ করিয়ে দেন। স্মরণ করিয়ে দিলেই গরম মাথা ঠান্ডা হয়ে যাবে।

অশোক রাজা মৃদু হেসে বলেন, নাগদের মাথা গরম হয়ে উঠেছে এ সংবাদে কীভাবে জানা যাবে?

নাগরাজ বলে, নাগদের মাথা গরম হয়ে উঠলে পাহাড়ের মাথায় ঘন কালো মেঘ দেখা দিবে। কালো মেঘের মাঝে বিদ্যুৎ চমকাবে। মেঘ ডেকে উঠবে গুরু গুরু শব্দে।

অশোক রাজার মুখের হাসি তখনো মিলিয়ে যায়নি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এমনিভাবে পাহাড় ছাওয়া মেঘ এবং বজ্রের শব্দ শুনে কী করতে হবে ?

নাগরাজ বলে, তখন এই স্তূপ থেকে ঢং ঢং শব্দে ঘন্টা বাজাতে হবে। ঘন্টার শব্দ শোনামাত্র তাদের মাথা ঠাণ্ডা হতে শুরু হবে।

বাণ জিজ্ঞাসা করেন, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী স্বয়ং দেখেছেন কি না এই স্তূপ ? উত্তরে সন্ন্যাসী বলেন তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছেন এই সুন্দর স্তূপ। আকাশছোঁয়া স্তূপ। দূর বহু দূর থেকে দেখা যায় অজস্র আলোর বলয়ে ঘেরা এই স্তূপ। দিনরাত জ্বলে থাকে স্তূপের আলোর মালা। মাঝে মাঝে আকাশে জেগে ওঠে কালো মেঘ। তখনই স্তূপের ঘন্টা বেজে ওঠে ঢং-ঢং-ঢং।

সন্ন্যাসী বলেন, চীন ভারতের এই তীর্থপথে বহু কিছু দেখেছেন। এখন একমাত্র আকাঙ্ক্ষা মহারাজা শিলাদিত্যের রাজধানীর পর সোজা পবিত্র মগধ দেশে পৌছে পুণ্যসঞ্চয় করা। তার ইচ্ছা কিংকিয়া পথে মগধে পৌছানো।

বাণ অবগত আছেন মহারাজা হর্ষবর্দ্ধনের অন্য নাম শিলাদিত্য। কিন্তু কিং কিয়া পথেব নাম কখনো শুনেননি। শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসীকে কিং কিয়া পথের কথা জিজ্ঞাসা করেন।

বাণের প্রশ্ন শুনে চৈনিক সন্ন্যাসীর মুখে বেদনার ছায়া দেখা যায়। বাণ আর কোনও প্রশ্ন না করে গভীরতম শব্দ সমীকরণে কিং কিয়া বিশ্লেষণ করে উত্তর আবিষ্কার করেন। বাণ সন্ন্যাসীর বেদনার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বিনীতভাবে বলেন, তিনি এই শব্দের অর্থ খুঁজে পেয়েছেন। কিং কিয়া পথ অর্থাৎ গঙ্গাপথ।

প্রসন্ন সন্ন্যাসীর মুখে উজ্জ্বল আভা বিচ্ছুরিত হয়। তিনি প্রণত হস্তে বলেন ভগবান কোউয়ান যেন তার এই পুণ্যভুমি চিয়েন চিউদর্শন পূর্ণ করেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বলেন, ভগবান অবলোকিতেশ্বরকে চৈনিক ভাষায় কোউয়ান এবং ভারতবর্ষকে চিয়েন চিউ বলা হয়।

বাণ প্রায় সন্ধ্যাকালে বাড়ী পৌছোলেন।

* * *

অলস সময় বয়ে চলছে। মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছে। বর্ষা পার হয়ে শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত শেষে গ্রীষ্ম হাজির হয়েছে। বাণ ক্লান্ত হয়ে উঠেছেন। আলস্যের ক্লান্তি।

গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায় গুপ্তবেশে জনৈক রাজদূত বাণের বাড়ীতে এসে বাণকে হর্ষদেবের লেখা একটি পত্রপ্রদান করে। সংক্ষিপ্তভাবে হর্ষদেব লিখেছেন, এই রাজদূতের সাথে এখনই বাণ যেন দয়া করে হর্ষদেবের প্রাসাদে আগমন করেন।

বাণ প্রবেশ করেন রাজপ্রাসাদের একটি বিশেষ কক্ষে। দ্বাররক্ষক বাণকে এই কক্ষে পৌছিয়ে দিয়ে গেছে। রাজপ্রাসাদে এই তার প্রথম পদক্ষেপ। কক্ষটি অতি সাধারণ । কক্ষে স্তূপ গ্রন্থ এবং একাধিক বীণা।

হর্ষদেব বাণকে জড়িয়ে ধরেন। রাজ আলিঙ্গনে বাণ গর্ব অনুভব করেন। হর্ষ রত্নাবলী নাটক নিয়ে বসে ছিলেন। পাঠ শুরু করেন হর্ষদেব। বাণের মনে অবাক বিস্ময়। সদা ব্যতিব্যস্ত একজন রাজা কীভাবে লিখলেন এমন একটি নাট্যগ্রন্থ ? গ্রন্থের ভাষা কাব্যিক একই সাথে বুদ্ধিদীপ্ত। বাণের অকৃত্রিম প্রশংসায় হর্ষদেব আনন্দিত হলেন।

সম্পূর্ণ নাটক শুনে বাণ প্রস্তাব করেন এই নাটক মঞ্চস্থ করতে হবে। হর্ষদেব সম্মতি প্রকাশ করে বলেন, এই নাটক বছর দুই পর মঞ্চস্থ করা যেতে পারে। বছর দুইয়ের মধ্যে কান্যকুব্জ নগরীতে হর্ষবর্দ্ধনের দ্বিতীয় রাজধানী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। বর্তমানে কান্যকুব্জ নগরী ছিল গ্রহবর্মার রাজধানী। গ্রহবর্মা হর্ষদেবের একমাত্র বোন রাজ্যশ্রীর স্বামী।

হর্ষদেব তার লেখা রত্নাবলী নাটকের মঞ্চস্থ করার সকল প্রকার দায়দায়িত্ব বাণের হাতে অর্পণ করেন।

বাণ ইতস্তত করেন হর্ষদেবের কথা শুনে। হর্ষদেব অনুভব করেন ইতস্ততর কারণ। তিনি বাণকে বলেন, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বাণ তার কাজ করতে পারেন। স্বয়ং হর্ষবর্দ্ধন বাণের কাজকর্মের উপর দখল ফলাবেন না। এই সাথে রাজকোষ এবং রাজশক্তি নাটকের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।

বাণ সম্মত হলে আনন্দপ্রকাশ করেন হর্ষদেব। তিনি বাণের কাঁধে তার দক্ষিণ হাত রেখে বলেন ইতিমধ্যে অন্য আর একটি নাটকের বিষয় তার মাথায় এসেছে। বিষয়বস্তু কিছু পরিমাণে রত্নাবলী নাটকের ঘটনাবলীর মত। কল্পিত নাটকের নাম হবে প্রিয়দর্শিকা। প্রিয়দর্শিকা নাম হচ্ছে নায়িকার নাম। নায়িকার নামানুসারে এই কল্পিত নাটকের নামাকরণ কল্পনা করেছেন।

বাণ প্রিয়দর্শিকা নাটকের নায়কের নাম কী হবে জিজ্ঞাসা করলে হর্ষদেব বলেন, রত্নাবলীর নায়কের নামের মত এই নাটকের নায়কের নাম হবে উদয়ন।

হর্ষদেব বলেন, নাটকের নায়িকার দুটি নাম স্থির করেছেন। নাট্য কাহিনিতে থাকবে প্রথমাবস্থায় ছদ্মবেশে প্রেমের অভিনয়। ছদ্মবেশী প্রিয়দর্শিকার নাম হবে আরণ্যকা।

বাণ, হর্ষদেবকে অনুরোধ করেন নাটক লেখা আরম্ভ করে দিতে। হর্ষদেবের দীর্ঘনিঃশ্বাস নির্গত হয়। বাণের কানে আসে হর্ষদেবের স্বগত সংলাপ যুদ্ধ যুদ্ধ আর যুদ্ধ।

হর্ষদেবের সাথে দেখা সাক্ষাতের পর প্রায় সপ্তাহকাল কেটে গেছে। বাণের মাথায় পর্বত ভার। নাটক নিয়ে চিন্তাভাবনা।

শেষপর্যন্ত এক সন্ধ্যায় বিহঙ্গমার বাড়ীতে পৌছালেন সেদিন বৃহস্পতিবার। বিহঙ্গমার ছুটির দিন। বাণ প্রবেশ করেন সেই কক্ষে যেখানে একঝাঁক সুন্দরী তাকে ফুলে ফুলে ঢেকে দিয়েছিল। সেই কক্ষে আজ ফুলসাজ ফুলবাস নেই। এই কক্ষে বিহঙ্গমা নিস্পৃহভাবে একটি বেত নির্মিত আসন এগিয়ে দিল। বাণ বসলেন।

বাণ বিহঙ্গমার চোখে চোখ রাখলেন। সে চোখ নীলপদ্ম আঁখি নয়। চোখের দৃষ্টি স্থির। বাণের মনে হল বিহঙ্গমা চোখে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ছায়া। বাতাস পেলেই এ চোখে আগুন জ্বলে উঠবে। মুখে নেই লৌধ্ররেণু। কুন্দকলি নেই কানে। হাতে নেই লীলাপদ্ম ।

দীর্ঘ দশ মাস পর আবার দেখা। বিহঙ্গমা নিশ্চুপ । বাণের কণ্ঠে জড়তা। জড়তা কাটিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, অভিনয়কলা শিল্প কি বিহঙ্গমার অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয় ছিল? বাণ জ্ঞাত আছেন রাজনটীদের শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে চৌষট্টি রকমের শিল্পকলা।

বিহঙ্গমা বাণের জিজ্ঞাসার জবাব না দিয়ে এই প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করে।

বাণ, চিন্তা করলেন সরাসরি কারণ না বলে অন্য কথা বলবেন। কারণ হর্ষদেবের লিখিত নাটকের কথা প্রকাশ পেলে বিহঙ্গমা রাজকর্মী রূপে অভিনয় করতে একান্তভাবে বাধ্য। বাণ, তার নিজের লেখা নাটকের কথা বলেন। বিহঙ্গমার জিজ্ঞাসা অনুসারে নাটকের নাম বলেন"পার্বতী-পরিণয়"। পরবর্তী জিজ্ঞাসা পার্বতী পরিণয়। নাটকের বিষয়বস্তু।

বাণ সহজভাবে তার লিখিত নাটকের বিষয়বস্তু বলতে আরম্ভ করেন। ক্রমে বিষযবস্তুর সাথে একাত্ম হয়ে আবেগে মথিত হয়ে ওঠেন। ভাবাবেগে আপ্লুত বাণ বলে চলেন বয়ঃসন্ধির উমার মহেশ্বর অভিসারের মোহিনী সাজ। কামদেব মদনের অকাল বসন্ত কাহিনি। গৌবী রূপী উম- ইয়ামের সর্ব-সমর্পণের প্রাণস্পর্শী অভিনয়ন মদনভস্মের করুণচিত্র। মহেশ্বরের প্রত্যাখ্যাতা মহাশক্তি উমার কঠোর তপস্যা। নাটকের সমাপ্তিতে হর-পার্বতী মঙ্গল-মিলন। বাণেব কণ্ঠ স্তব্ধ। চোখে জল। নিস্তব্ধ বাণ ক্রমে কান্নায় ভেঙে পড়েন। নিঃস্তব্ধ বিহঙ্গমা। রোদনভরা বাণের অশ্রু দেখে বিহঙ্গমার চোখের নামে অশ্রুধারা । দশমাস আগের সেই ফেলে আসা মেঘমেদুর সন্ধ্যার দৃশ্য ফিবে আসে। বিহঙ্গমা তার কাঁধের উত্তরীয় খুলে মুছিয়ে দেয় বাণের সিক্ত নয়ন।

বাণের চোখের সামনে বিহঙ্গমার শ্বেতশুভ্র স্তনযুগল। শঙ্খশুভ্র স্তনে নেই চন্দনপঙ্ক তিলক। বাণের মনেহয় দেবাদিবের চরণে অর্পিত হবার আকাঙ্ক্ষায় জেগে উঠেছে দুটি শ্বেত শুভ্র শতদল।

কান্নাভেজা কণ্ঠে বাণের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় সর্ব-সমর্পিতা মহেশ্বরী-উমা-স্তুতি-

"হরকণ্ঠ গ্রহানন্দমী লিতাক্ষীং নমান্যুসাম।

কালকূট বিষস্পর্শ জাত মূর্চ্ছাগমামিব।"

হরকণ্ঠ আলিঙ্গনে আনন্দ মুকুলিতা উমা। কালকূট স্পর্শের স্বপ্নিল মূর্চ্ছনা।

বিহঙ্গমা ভাবাবেগে আপ্লুতা । সে আপন মনে জোড় হস্তে আবৃত্তি করে দেবাদিদেব মহাদেবের

ধ্যানস্তোত্র। বাণের মনে হয় তাঁর উমইয়াম তপস্যা করছে। বিহঙ্গমা বাণের অনুভূতির অভ্যন্তরে উম-ইয়াম হয়ে গেল। বাণ, বিহঙ্গমাকে জড়িয়ে উম-ইয়ামের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। বিহঙ্গমা পরম করুণায় বাণকে প্রদান করেন, বেদনার আশ্রয়। বাণ চুম্বনে তাকে ভরে দিলেন। আলিঙ্গনাবদ্ধ বিহঙ্গমা স্থির হয়ে থাকে। বিহঙ্গমার ষষ্ঠইন্দ্রিয় জানিয়ে দেয় বাণের এমন চুম্বন তার জন্য নয়। সে নারী অন্য কোথা, অন্য কোনও জন।

অশ্রু সজল বাণ ফিরে যান।

*　　　　*　　　　*

ইতিমধ্যে, বিহঙ্গমা জেনে গেছে বাণ হর্ষদেবের নাটক নিয়ে ব্যস্ত। বিহঙ্গমার বাড়ীতে বাণের ঘনঘন আসা-যাওয়া।

এক সন্ধ্যায় বিহঙ্গমার বাড়ীতে জনাকয়েক শিল্পীর সাথে বাণের সাক্ষাৎ এবং পরিচয়প্রসঙ্গ হয়। এরা কণ্ঠ-নৃত্য এবং নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্রের শিল্পী।

শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান জনৈক প্রৌঢ়শিল্পী।

তিনি গল্প করতে ভালোবাসেন। তিনি তার শিল্পীগোষ্ঠী সম্পর্কে বলেন, তাঁরা প্রায় বিশ-একুশ বছর আগে চীন দেশের গান-বাদ্যের আসরে গিয়েছিলেন। আমন্ত্রণ করেছিলেন চীন দেশের সম্রাট 'সুই'। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকেও অনেক সঙ্গীত বাদ্য নৃত্য শিল্পী সেখানে হাজির হয়েছিল। সকলের সাথে হয়েছিল পরিচয় প্রসঙ্গ।

বাণের ছিল না এই প্রসঙ্গ। তিনি আগ্রহ নিয়ে ভারতীয় শিল্পীদের পোশাক পরিচ্ছদাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। প্রৌঢ় কথা বলার সুযোগ পেয়ে দারুণ খুশি।

প্রৌঢ় বলেন, বাদ্য এবং নৃত্য শিল্পীদের পোশাক পরিচ্ছদ আলাদা ধরনের। বাদ্যযন্ত্রীদের মাথায় কালো টুপি, লম্বা সাদা আলখাল্লা। পাজামার রং বেগুনি। সাদা আলখাল্লার উপর আবার পট্টবস্ত্রের লাল টকটকে ঢিলা জামা।

নৃত্যশিল্পীগণ জোড়া বেঁধে বেঁধে প্রদর্শন করে নৃত্য। তাদের মাথায় মস্ত লম্বা চুল। চুল গুলি আবার চূড়া করে মাথায় উপরে বাঁধা। ওদের পোশাক, আমাদের সাধু সন্ন্যাসীর মতো গেরুয়া। পায়ে সবুজ রঙের শন দিয়ে তৈরি জুতা।

অন্যান্য আরো কিছু কথাবার্তার পর প্রৌঢ়কে বাদ্যযন্ত্রাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

উৎসাহিত প্রৌঢ়ের মুখে ঝড়ের বেগে কথা শুরু হয়। তিনি বলেন, বাদ্যযন্ত্র নানা ধরনের। ভিন্ন আকৃতি এবং প্রকৃতির। এইসাথে ভিন্ন নাম। যেমন কাঁসি বাঁশি ঢোল। ঢোলের আবার ভিন্ন ভিন্ন নাম। যেমন কিয়ে, মাও-ইউয়ান, টু-টান ইত্যাদি।

প্রৌঢ় বলেন, নলে তৈরি শিঙ্গার নাম 'পি-লি'। যে সকল বাঁশির পিছন দিকে খোদাই করা থাকে সিংহ সেসব বাঁশিকে বলা হয় 'কং-হোউ'। 'পি-পা' হচ্ছে পাঁচ তারের বীণার নাম।

প্রৌঢ়ের কথায় ঝড়ের ভিতর বাণ ব্যর্থ হলেন নাক-গলাতে। ইতিপূর্বে তাঁর আবিষ্কৃত চৈনিক-সংস্কৃত ভাষার সহজ সমীকরণ জ্ঞান থৈ পেল না বাদ্যযন্ত্রগুলির নামের প্রকৃত অর্থ।

বাণ, প্রৌঢ়কে জিজ্ঞাসা করেন তাদের শিল্পীগোষ্ঠী এই নাটকে যোগ দিতে পারবে কিনা? বাণের প্রশ্নের সহজ জবাব এল — তারা একপায়ে খাড়া আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ পেল, বিহঙ্গমা এই শিল্পী দলকে নাটকের খবর দিয়ে তার বাড়ীতে আনিয়েছে। বিহঙ্গমা নাটকে গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে দেখে বাণের ভালো লাগে।

প্রৌঢ় রাজপণ্ডিত বিখ্যাত বাণভট্টকে শ্রোতা পেয়ে মহানন্দে ডগমগ। তিনি আবার পূর্ব প্রসঙ্গ অবতরণ করেন। প্রৌঢ় বলেন, তারা চীনদেশে গিয়ে দেখেছেন সেখানে ভারতীয় সুর প্রচলিত। ভারতীয় রাগ রাগিনী চীনদেশ থেকে আবার জাপান দেশে গেছে। "বোধিসত্ব এবং বইরো" নামে দুটি ভারতীয় রাগিনী জাপানে প্রচলিত। জাপানী শিল্পীগণ এ দুটি সুরের উৎস যে ভারতবর্ষ স্বীকার করে। এই সুরের উৎস হিসাবে 'হন-রো-টোকু' শব্দ ব্যবহার করেন। 'হন-রো-টোকু' জাপানি শব্দের অর্থ চৈনিক ভাষায় 'পাং-লং-টো'। এই শব্দের অর্থ ভারতবর্ষ।

বাণের পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগে। ইতিপূর্বে চীনা সন্যাসীর মুখে শুনেছিলেন, চৈনিক ভাষায় ভারতের নাম 'পাং-লং-টো'।

ইতিমধ্যে বিহঙ্গমার এক কাণ্ডে বাণ উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। বিহঙ্গমা রুপার থালায় পান-সুপারি কর্পূর এনে বাণের সম্মুখে রেখেছে। বাণ মহানন্দে তাম্বুল ভক্ষণ করেন। কান্যকুব্জ বা স্থাম্বীশ্বর অঞ্চলে বলতে গেলে তাম্বুল সংস্কৃতি নেই। প্রৌঢ় চীন জাপানের সঙ্গীতচর্চার বক্তৃতা ভুলে গিয়ে বাণের তাম্বুলচর্চা গভীরভাবে লক্ষ করতে থাকেন।

নাটক নিয়ে আগামীতে কথা হবে বলে আড্ডা ভঙ্গ হয়।

* * *

পরদিন সন্ধ্যায় বাণ বিহঙ্গমার বাড়ীতে গিয়ে দেখেন-বিহঙ্গমা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। বিহঙ্গমার অপেক্ষা নিয়ে দুচারটি কথাবার্তার পর বাণ কঠিন বিষয়ের অবতারণা করেন। বাণ, জিজ্ঞাসা করেন বিহঙ্গমা কি সুখী?

বিহঙ্গমা উত্তর দিতে গিয়ে তার অজান্তে বাণকে 'বাণ' নামে সম্বোধন করে সে বলে সুখী কিনা বলতে পারবে না তবে অবশ্যই জয়ী। অসংখ্য বন্ধনের মাঝেও জয়ী।

রাজকোষের অর্থের বিনিময়ে তাকে চৌষট্টি কলায় শিক্ষিত করে রাজনটীর পদে বহাল করা হয়েছে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে। রাজনটী পদের জন্য তাকে যে চৌষট্টি কলায় শিক্ষিত করা হয়েছে তার মূল লক্ষ ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন মানসিকতার বিভিন্ন পুরুষের মনোরঞ্জন করা। মনোরঞ্জন করার মূল উদ্দেশ্য দুর্বল মুহূর্তে পুরুষের মনের গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করা এবং এই সংবাদ রাজার কানে পৌছে দেওয়া।

বাণ বলেন, বাৎস্যায়ন তার কামসূত্রে লিখেছেন, চৌষট্টি কলায় উৎকর্ষতা লাভ করে শীলবতী রূপবতী এবং গুণান্বিতা গণিকা হতে হয়। গণিকাকে, রাজা এবং গুণীজন শ্রদ্ধা করেন। এই সাথে সকলের কামনার ধন হয়ে ওঠেন।

বিহঙ্গমা বলে গ্রন্থাদির ভাষায় এসব কথাবার্তা অবশ্যই সত্যি। গণিকাগণ রাজকোষ থেকে

নিয়মিত অর্থলাভ করে। অন্যদিকে ব্যক্তিগতভাবে অর্থ উপার্জনের পথ খোলা আছে। রাজা তাদের নানা ধরনের সুখ সুবিধার জন্য, গণিকাধ্যক্ষ নামে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নিয়োগ করেছেন। প্রতিদিন গনিকাধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে নানা ধরনের রাজকর্মচারী গণিকাদের খোঁজ খবরাদি রাখেন। গণিকাগণ প্রতিদিন নানা সংবাদ পরিবেশন করেন।

গণিকাগণ সংবাদ পরিবেশন করে এই সংবাদ অবগত হয়ে বাণ জিজ্ঞাসা করেন তিনি যে বিহঙ্গমার বাড়ীতে যাতায়াত করেন এ সংবাদ কি গণিকাধ্যক্ষ পেয়েছেন ? বাণের প্রশ্নে বিহঙ্গমার মুখে কৌতুকের সূক্ষ্মরেখা প্রস্ফুটিত হয়। বিহঙ্গমা বলে, মহারাজের সভাপণ্ডিত বিখ্যাত বাণভট্ট বিহঙ্গমার গৃহে আগমন করেন এ সংবাদ রাজনটী পল্লীর সকলের জ্ঞাত। এই কথা প্রকাশ করে- বিহঙ্গমার বলেন, পণ্ডিত বাণভট্টের পদধূলিতে বিহঙ্গমার গৃহ ধন্য হয়।

কথা শুনে বাণ থমকে গেলেন। তার চোখে হর্ষদেবের মুখমণ্ডল উঠে ভেসে। হর্ষদেব মুখ টিপে হাসছেন।

বিহঙ্গমা বলে বাণ! আমার সার্থক জীবনের আর একটি সুখের সংবাদ আছে। গুপ্তচর পাঠিয়ে খবর নিয়েছি আমার পণ্ডিত পিতা এই সাথে আমার শিশুর মৃত্যু হয়েছে।" বিহঙ্গমার মুখে নাটকের হাসি চোখে অকৃত্রিম অশ্রুবিন্দু।

* * *

বাণ স্থির করেন রত্নাবলী নাটকের জন্য মহাকাল নাট্যগোষ্ঠী থেকে লোক আনতে হবে। এদের মধ্যে মঞ্চ, কণ্ঠ এবং বাদ্যযন্ত্র শিল্পীদের সাথে থাকবেন নাটক পরিচালক দর্দুরক।

ইতিপূর্বে রাজপ্রাসাদের যে কক্ষে হর্ষদেব তার নাটক পাঠ করে শুনিয়েছিলেন বাণ আনুষ্ঠানিক সংবাদাদি প্রদান করে সে কক্ষে হর্ষদেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। হর্ষ সহজভাবে বাণের প্রস্তাব সমর্থন করেন।

হর্ষদেব হাতে বীণা নিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন। ক্রমে বীণা সম্পর্কে কথাবার্তা শুরু হয়। কথাচ্ছলে হর্ষদেবকে বীণা বাজাতে অনুরোধ করেন। মনে হয় হর্ষদেব যেন এমন কথার অপেক্ষায় ছিলেন। হর্ষের বীণায় বেজে ওঠে সুর। বীণা বেজে চলে বিচিত্র মূর্চ্ছনায় ; আরোহন অবরোহতে পৃথুলা জাতি বেজে চলছে। হর্ষদেব তন্ময় হয়ে বীণা বাজিয়ে চলছেন, সুরের ইন্দ্রজালে স্বপ্ন জগতে বাণ।

বীণার সুরঝঙ্কার স্তব্ধ হয়। সুরের ইন্দ্রজালে স্তব্ধ হয়ে গেছে বাণের বাহ্যিক অনুভূতিও। নিস্তব্ধ বাণ। নিস্তব্ধ হর্ষ। বাক্যলাপ না করে বাণ আপন মনে স্বপ্নের ঘোরে রথে আরোহণ করেন। রথ তার বাড়ীতে পৌছায়। বাণের মনে হয় এই মাত্র ঘুম ভেঙেছে।

* * *

অবন্তীবর্মা গ্রহবর্মার কান্যকুব্জ নগরী নূতন করে সেজে উঠেছে। হর্ষদেবের দ্বিতীয় রাজধানীর উদ্বোধন হবে।

রত্নাবলী সম্পূর্ণ প্রস্তুত। বাসন্তী পূর্ণিমায় রাজসভার অভিনয় মঞ্চে অভিনীত হবে। বাণের

হাতে আছে আর মাত্র পাঁচদিন। তিনি হিসাব করে দেখেছেন হর্ষদেবের রত্নাবলী নাটক পাঠ করা পর কেটে গেছে দীর্ঘ দুবছর আটমাস। তার মনে হয় এই কাল যেন এক লহমায় চলে গেছে।

নাটকের নানা প্রয়োজনে সারা ভারত থেকে এসেছেন নানা জ্ঞানীগুণী এবং কর্মীগণ। মহাকাল এবং অলকা নাট্যগোষ্ঠীর নানা সভ্যদের প্রদান করা হয়েছে নাটকের নানা দায়িত্ব।

লেপ্যকার কুমার দত্ত রত্নাবলী গ্রন্থ রচনার জন্য কান্যকুব্জ পা দিয়েই এখানকার কিছু সংখ্যক লেপ্যকার নিয়ে গঠন করে ছিলেন একটি গোষ্ঠী। কুমারগুপ্তের তত্ত্বাবধানে এই গোষ্ঠী প্রস্তুত করেছে বহুসংখ্যক রত্নাবলীর পুঁথি। বাণের ইচ্ছা অভিনয়ের দুচার দিন আগে পুঁথি বিতরণ করা জ্ঞানী গুণীদের কাছে।

লেপ্যকার কুমার দত্তের মত চিত্রকর বীরবর্মা স্থানীয় চিত্র শিল্পীদের নিয়ে গড়েছিলেন একটি চিত্র শিল্পী গোষ্ঠী। বীরবর্মার নির্দেশনায় প্রস্তুত হয়ে গেছে নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যের চিত্রাবলী।

বংশীবাদক মধুকর এবং পারাবত এই সাথে গায়ক সোমিল ও গ্রহাদিত্যকে কান্যকুব্জের রাজকীয় শিল্পী গোষ্ঠীর দলে ভিড়িয়ে দিয়েছেন। বাণের বিশেষ উদ্দেশ্য এই সুযোগে এরা চীনদেশের সঙ্গীত অনুষ্ঠানে হয়তো যোগ দেবার সুযোগ পাবে।

কান্যকুব্জের শিল্পী গোষ্ঠীর সেই প্রৌঢ় কথা প্রসঙ্গে বলেছেন বছর এক দুইয়ের মাঝে তারা আবার যোগ দেবেন চীনদেশের মহাসঙ্গীত সম্মেলনে।

কান্যকুব্জ নগরীতে রত্নাবলী নাটকের মহলার জন্য বলতে গেলে স্থাপিত হয়ে গেছে ছোটো খাটো একটি পল্লী। সেখানে বহু কাজ। বহু মানুষ। পরিচালক দর্দুরক যেন সেনাপতি।

বছর দুই থেকে বিহঙ্গমা কান্যকুব্জের নাটকের মহলায় যোগ দিয়েছে। সে রাজি হয়নি নায়িকার অভিনয়ে। তার ধারণা বয়স হয়ে গেছে। মহাকাল নাট্যগোষ্ঠীর হরিণিকা নির্বাচিত হয় নায়িকা চরিত্রে অভিনয়ের জন্য। সে ইতিপূর্বে বাণের পার্বতী পরিণয় নাটকে নগণ্য একটি চরিত্রে অভিনয় করেছিল। বিহঙ্গমার আকাঙ্ক্ষা অনুসারে পরিচালক দর্দুরক তাকে দিয়েছেন রাজা উদয়নে পাটরাণীর চরিত্র।

বাণের একটি আকাঙ্ক্ষা থাকে অপূর্ণ। ইচ্ছা ছিল চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমের সুবিখ্যাত পাঠক জয়সেনের কম্বুকণ্ঠে হবে — নাটকের নান্দীপাঠ। তাঁকে পাওয়া যায়নি। নালন্দায় দারুণ ব্যস্ত।

নান্দীপাঠের জন্য পরবর্তী ভাবনায় মনে এল কৃষ্ণদেবের নাম। কৃষ্ণদেব এই সাথে নাট্যকার স্বয়ং হর্ষদেব মহাখুশি।

* * *

নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠার মাত্র চারদিন বাকি। রাজপথের দুই পাশের অট্টালিকা চুন দিয়ে রং করা হয়েছে। প্রতি সৌধে স্থাপিত হয়েছে হর্ষদেবের বৃষলাঞ্ছিত পতাকা। দলে দলে সামন্ত নৃপতিগণের আগমন হচ্ছে। প্রতিজন নৃপতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাসস্থান।

সেদিন তখনো সন্ধ্যা হয়নি। বাণ, একা আপন মনে কান্যকুব্জের রাজপথে পরিক্রমা করছেন। রাস্তার পাশে কাটা হয়েছে মস্ত এক গাছ। গাছ পড়ে যাতায়াত বন্ধ। দুটি হাতি একসাথে টানছে

কাটা গাছ। অনেকের সাথে বাণ দাঁড়িয়ে দেখছেন হাতির কসরৎ। বাণের পাশে দাঁড়িয়ে দুজন চাপা সুরে কথা বলছে মহারাজ অবন্তীবর্মাকে নিয়ে। বাণ উৎকর্ণ হয়ে শুনেন আলাপ। ওরা বলছে প্রথমে শুনেছিল, অবন্তীবর্মার বিধবা পুত্রবধূ রাজ্যশ্রী এসে কান্যকুব্জের ভার নেবেন। রাজ্যশ্রী আসবেন বলে নগরী সাজানো হচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে স্থান্বীশ্বরের সৈনিকগণ তলোয়ার দেখিয়ে প্রতিটি ঘরে উড়িয়ে দিচ্ছে হর্ষবর্দ্ধনের পতাকা। বাণ লক্ষ করেন ওদের কথাবার্তার দারুণ ক্ষোভ। ওরা হর্ষবর্দ্ধনের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। রাজ্যপথে গিজগিজ করছে স্থান্বীশ্বরের সৈনিকগণ।

বাণের মনে হয় কান্যকুব্জের এই আলোক উজ্জ্বল অট্টালিকার অভ্যন্তরে স্বর্গীয় মহারাজা গ্রহ বর্মার প্রজাপুঞ্জ তাদের বুকে জমাট অন্ধকার নিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে।

* * *

ফাল্গুনের বাসন্তীপূর্ণিমা সন্ধ্যায় উদ্বোধন হল নূতন রাজসভা এই সাথে রাজসভার নাটমঞ্চ। হর্ষদেব, দর্শক আসনের মধ্যমণি। তাকে ঘিরে মন্ত্রী সেনাপতি সামন্তনৃপতি বিশিষ্ট রাজকর্মচারী এই সাথে বিশিষ্ট পণ্ডিতজন। বাণ, পণ্ডিতজনের হাতে স্বয়ং রত্নাবলী নাটক পৌছে দিয়ে আমন্ত্রণ করেছেন।

অজস্র সাধুবাদের মধ্যে হর্ষবর্দ্ধনের চার অঙ্কের নাটিকা রত্নাবলীর অভিনয় সমাপ্ত হল।

* * *

নাটক মঞ্চস্থ হবার পর শুরু হল ভিন্ন অধ্যায়। বাণ নিদারুণ ব্যস্ত। দিন কতক পর বিহঙ্গমা খবর দিল চীন থেকে হর্ষদেবের কাছে পত্র এসেছে।

বাণ, হর্ষদেবের কাছে গিয়ে জ্ঞাত হলেন বিষয়। চীনের রাজকুমার 'তাং' হর্ষদেবের কাছে লিখেছেন। রাজকুমারের পিতা চীন সম্রাট 'সুই' বর্তমানে বৃদ্ধ। তার আকাঙ্ক্ষা, আগামী মহা সঙ্গীত সম্মেলনে ভারতীয় সংগীত নৃত্য গোষ্ঠীর অনুষ্ঠান উপভোগ করা। ইতিপূর্বে বিশ একুশ বছর পূর্বে ভারতীয় শিল্প গোষ্ঠী যে সঙ্গীতাদি প্রদর্শন করেছিল তা সম্রাট সুই এর স্মৃতিতে অমর হয়ে আছে ইত্যাদি।

হর্ষদেব বলেন, পত্রের জবাবে তিনি স্থান এবং কাল জ্ঞাপন করতে অনুরোধ করেছেন। বাণ, হর্ষকে নিবেদন করেন তার আকাঙ্ক্ষা। হর্ষদেব সহাস্যে সেই সকল শিল্পীদের নাম জিজ্ঞাসা করলে বাণ চারজনের নাম জ্ঞাপন করেন। এরা হল গায়ক সোমিল ও গ্রহাদিত্য বংশীবাদক মধুকর এবং পারাবত। হর্ষ বলেন, এই চারজন অবশ্যই অন্যান্য শিল্পীদের সাথে চীনদেশে যাবে।

বাণ কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম প্রার্থনা করলে, হর্ষদেব রসিকতা করে বলেন, পণ্ডিতপ্রবর বাণভট্ট জ্ঞান তপস্যার জন্য তার যতদিন ইচ্ছা তত দিনই জ্ঞান দেবী বাণীর সাথে অতিবাহিত করতে পারেন।

* * *

এবারের যাত্রা সওদাগরি নৌকায় নয়। রাজকীয় নৌকার তীব্রগতি অপেক্ষাকৃত স্বল্প দিনের মাঝে এক চৈত্রের প্রথম প্রহরে পৌছালেন, পালিতক ঘাটে।

অজস্র মানুষের অরণ্যের মাঝে মহাবৃক্ষের মত সবার উপরে বায়ুবিকারের মস্তক। সে বাণের গলায় টকটকে পলাশ ফুলের মালা পরিয়ে মহাপণ্ডিত শ্রীশ্রীবাণভট্টের নাম উচ্চারণ করে জয়ধ্বনি দিতে থাকে। বায়ুবিকারের সাথে অজস্র জনতার জয়ধ্বনিতে গঙ্গিনিকার জলরাশি কেঁপে ওঠে।

এর পরের কাণ্ডের জন্য বাণ প্রস্তুত ছিলেন না। বায়ুবিকার বাণকে টেনে বসিয়ে দিল ছোটোখাটো একটি পালঙ্কে। পালঙ্ক ফুলপাতায় সাজানো। দুদিকে মস্ত দুটি বাঁশ বাধা। বাণ, পালঙ্কে বসতে না বসতে বায়ুবিকারের ইঙ্গিতে মোট আটজন ব্যক্তি পালকে বাধা বাঁশে রেখে পালঙ্ক উপরে তুলে ধরে। অসহায় বাণ প্রাণপণে পালঙ্কের দুদিকে হাত ছড়িয়ে পালঙ্কে কিনারা আঁকড়ে ধরেন। একবার তার মনে হয় পালঙ্কে লম্বা হয়ে শুয়ে গেলে কেমন হয়? আবার ভাবেন লাফ মেরে নেমে গেলেই রক্ষা। পালঙ্ক ঘিরে অজস্র লোক প্রীতিকূটের দিকে এগিয়ে চলেন। বায়ুবিকার পালঙ্কে বাঁধা বংশে তার স্কন্ধ প্রদান করেনি। তার অস্বাভাবিক দৈহিক দৈর্ঘ্য প্রতিবন্ধকতার মুখ্য কারণ। জনতার আকাশ ফাটা জয়ধ্বনিতে পথের পাশের গাছগুলি থেকে পাখিরা পালিয়ে আকাশের কিনারা অনুসন্ধান করে।

প্রীতিকূট বিদ্যাশ্রমের মাঠে বাণের পালঙ্ক ভূমিস্পর্শ করে। বাণ হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন।

তিনি অবতরণ করে লক্ষ করেন পালঙ্কের বাহনদের মুখ। এদের মধ্যে আছে ভাষা কবি ঈশান বর্ণ কবি বেনী ভারত, চারণ গায়ক অনঙ্গবাণ সূচিবাণ, কুম্ভকার দামোদর, তাম্রপত্রাদির খোদাইকারক কালিয়া, বাণীর দাদা বিষবৈদ্য ময়ূরক। বাণ অপরিচিত এক জনের মুখের দিকে তাকালে সে বলে তার নাম বক্রঘোন। বাণ বিস্মিত। বক্রঘোন বলে, তার ভাগ্য ভাল। অরণ্যের ভল্লুক তার মুখের ভূগোল পালটিয়ে দিয়েছে। এখন তার পুরোনো দেশের ভূগোলে ফিরে গেলে কেউ চিনবে না।

বায়ুবিকারের গর্জন ওঠে। বিষয় হচ্ছে রাজপণ্ডিত বাণভট্টদেব এখন ক্লান্ত। বিশ্রাম নিবেন। জনতা যেন দয়া করে নিজ নিজ বাটীতো প্রত্যাবর্তন করেন।

* * *

বাণ প্রবেশ করেন অন্তঃপুরে। মালতী পিসি চক্রবাকিকা এই সাথে নানা বয়সী মেয়েরা গিজ গিজ করছে। নিকানো মেঝেতে আলপনা চিত্রণ প্রায় সমাপ্ত। বাণী অঙ্কন করেছে। বাণীর আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রায় সাত বছর বয়স্ক শিশু পুলিন্দা। আল্পনা শেষ হলে বাণীর পিছনে পিছনে চলে যায় পুলিন্দা। বাণ লক্ষ্য করলেন বাণী একটি বারের জন্য ও তাকায়নি তার দিকে।

আল্পনার মাঝখানে কুশাসনে বসলেন বাণ। গুরুজনেরা তার শিরে বাণ দুর্বার অর্ঘ্য এই সাথে তালপাতার পাখায় গঙ্গাজল ঢেলে গঙ্গাজলে বাণের সর্বাঙ্গ করলেন অভিষিক্ত।

গঙ্গাজল ছিটিয়ে মালতী পিসি আঁচল দিয়ে মুছলে তার অশ্রু। বাণের কানে এল মালতী পিসি আপন মনে কেঁদে কেঁদে বলছেন "দাদা দেখলেন না"।

বাণ দীর্ঘ আড্ডার পর মধ্যরাতে এসে দেখেন বাণী দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে আছেন। শয্যার উঠার আগে স্নান করে প্রণাম করেছেন গৃহদেবতা শিবকে। দেবাসনের সিঁদুর দিয়েছেন কপাল সিঁথি এবং শাঁখায়। কাঠের তোরঙ্গ থেকে বের করে পরিধান করেছেন তার বিয়ের লাল পট্টবস্ত্র।

শক্ত করে বাঁধা খোঁপা। খোঁপায় দেবী চণ্ডিকার নির্মাল্য।

বাণের চোখে পড়ে পট্ট-বস্ত্রের ভাজে ভাজে রং চটে গেছে। তার মনে হল তিনি মস্ত অপরাধী। দু-দুটি নাটক করেছেন কত রং বেরঙের মূল্যবান বস্ত্রাদি ক্রয় করেছেন। বিহঙ্গমা হরিণিকা এরা প্রতি দৃশ্যে নব-নব বস্ত্রাদি পরিবর্তন করেছে।

বাণ আবেগের সাথে এই কথা বলে নিজকে অপরাধী রূপে চিহ্নিত করেন। বাণী আঁৎকে উঠে বাণের হাত ধরে বলেন দেবী চণ্ডিকার কৃপায় অমূল্য অলঙ্কার তিনি সর্বদেহে সর্ব অঙ্গে করেছেন পরিধান। তার মতো ধনী নারী কে আছে ? কার আছে বাণের মত অলঙ্কার ? আছে বাণের মতো অলঙ্কার ?

বাণী খোঁপা থেকে দেবী চণ্ডিকার নির্মাল্য বাণের হাতে প্রদান করে বলেন কৃষ্ণা চতুর্দশীতে নির্জলা উপবাস করে দেবীর চরণ থেকে এই নির্মাল্য চয়ন করেছেন।

যুক্ত করে বাণ গ্রহণ করেন নির্মাল্য।

কথা বলে চলেছেন বাণ। নানা কথা নানা প্রসঙ্গ। অদ্য মিলন রজনীর একমাত্র বক্তা বাণ-ভট্ট। শ্রোতা বাণী।

বাণ কথা বলে বলে, পুলিন্দার মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে অনুভব করেন ছোট্ট বালিশটি ভীষণ শক্ত।

বাণী বলেন, এটি বালিশ নয়। পুলিন্দা ভিতরে পুলিন্দার পুঁথি। বাণের মনে পড়ে পুত্রের জন্মলগ্নে তার মুখ দেখে উপহার দিয়েছিলেন সোমদেবের কথাসরিৎসাগর। বাণী বলেন, এই পুঁথি ছাড়া ঘুম হয় না পুলিন্দার। বাণী, তাকে বুঝিয়েছেন তার বয়স যখন চৌদ্দবছর পূর্ণ হবে তখন সে খুলতে পারবে এই গ্রন্থ। সে অপেক্ষা করে আছে কখন তার পূর্ণ হবে চৌদ্দ বছর।

শেষ হয়ে আসছে মিলন রজনী। অনেক অনেক দিন পর বাণের কানে এল শ্বেত ঈগল অঃ-অঃ —আঃ-আঃ-ই-ঈঃ করে ঘোষণা করছে রজনীর শেষ প্রহর। বাণী উঠে গেলেন। তার অনেক অনেক কাজ। দেশ ভেঙে তার অমূল্য অলঙ্কার বাণকে দেখতে আসবে। বাণ সন্ধ্যাহ্নিক করে প্রস্তুত হলেন।

* * *

রত্নাবলী নাটক শেষে বাণ যখন হর্ষদেবের নিকট ছুটি প্রার্থনা করেছিলেন তখন উৎফুল্ল হর্ষদেব বলেছিলেন, যতদিন ইচ্ছা ততদিন বাণ জ্ঞানদেবী বাণীর সাথে অতিবাহিত করতে পারেন।

ইতিমধ্যে দীর্ঘ দুবছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। বাণের কান্যকুব্জ বা স্থাম্বীশ্বরে যাবার নাম নেই। আড্ডা আর আড্ডা।

এই দুবছর কালের বহু ঘটনার মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছে অলকাপুরী নাট্যগোষ্ঠী শূদ্রকের মৃচ্ছ-কটিকম নাটক মঞ্চস্থ করার কালে রাজপণ্ডিত বাণভট্টকে আমন্ত্রণ করে সম্মানিত করা হয়েছে।

অলকাপুরী নাট্যগোষ্ঠীর মতো অঙ্গবস্ত্র প্রদান করে সম্মান প্রদর্শন করেছে মহাকাল নাট্যগোষ্ঠী। মহাকাল নাট্যগোষ্ঠীর একান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও সম্ভব হয়নি কোন ও নাট্য প্রদর্শন।

গোপ্নপল্লীতে আহ্বান করে স্নেহ ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন শ্রীগোপাল।

শ্রীমান পুলিন্দার উপনয়ন সমাপ্ত করে ভর্তি করা হয়েছে চন্দ্রপুর মহাবিদ্যাশ্রমে।

দুবছর কাল অতিক্রমের পর, একদিন, জৈষ্ঠ্যের প্রথম দিকে আদ্যরাজা ভাস্কর বর্মনের আহ্বান এল। বাণকে যেতে হবে বর্মন নৃপতিগণের তস্মিন অর্থাৎ প্রাচীন রাজধানী প্রাগজ্যোতিষ পুরে।

প্রাগজ্যোতিষপুর বর্মন রাজবংশের প্রাচীন রাজধানী। মহারাজস্থিত বর্মন তস্মিনপুর অর্থাৎ প্রাগজ্যোতিষপুর পরিত্যাগ করে গঙ্গিনিকা অর্থাৎ পশ্চিম সাগর তীরের পার্বত্য প্রদেশের কুলাচলে নূতন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। কুলাচল শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে সমুদ্রতীরবর্তী পার্বত্য অঞ্চল। মহারাজস্থিত বর্মন হলেন মহারাজা ভাস্কর বর্মনের পিতামহ।

ভাস্কর বর্মন এই সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত বর্মনের প্রথম জীবনে এই কুলাচল রাজধানীতে ভীষণ ঘটনা ঘটেছিল। বঙ্গদেশের রাজা জয়নাগের গুপ্ত আক্রমণে বন্দী হয়ে ছিলেন দুই সহোদর কুমার ভাস্কর এবং সুপ্রতিষ্ঠিত বর্মন। পরবর্তীকালে ভাস্কর বর্মন প্রার্বত্য প্রাচীন রাজধানী প্রাগজ্যোতিষপুরে রাষ্ট্রশক্তি করেছিলেন কেন্দ্রীভূত।

বাণ প্রাগজ্যোতিষপুরে উপস্থিত হয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হন। তাদের বংশানুক্রমিক আদ্যরাজা ভাস্কর বর্মন স্বয়ং তাকে সংবর্দ্ধনা প্রদান করেন।

রাজকীয় অতিথিশালায় বাণের বাসস্থান নির্দ্ধারিত হয়। অজস্র কাজের ফাঁকে মিতভাষী ভাস্কর বর্মন বাণের সাথে দেখা সাক্ষাৎ এবং কথাবার্তা বলেন।

প্রসঙ্গত বাণ হর্ষবর্দ্ধনের কাব্যপ্রীতি এবং তার রচিত নাটকের কথা বলেন। বাণ লক্ষ্য করেন ভাস্করদেব হর্ষবর্দ্ধনের সাহিত্য শিল্পীপ্রীতি সম্পর্কে নানা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করে চলছেন। বাণের মনে হয় এই জিজ্ঞাসাবাদের পশ্চাতে আদ্যরাজা যেন বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য আছে।

দিনকতকের মাঝে সত্য হল বাণের ধারণা। ভাস্কর দেব বলেন, তার ইচ্ছা হর্ষদেবকে উপহার দেওয়া কিছু শিল্পসাহিত্য। বাণের উপর দায়িত্ব হল অর্পিত। লিখতে হবে হর্ষদেবের জীবন কথা নিয়ে কাব্য অথবা গদ্যসাহিত্য।

বাণ ভালো করেই অজ্ঞাত আছেন রাজার 'ইচ্ছা' কথার সঠিক অর্থ। এই ইচ্ছাই হচ্ছে আদেশ। ভাস্কর বর্মনের ইচ্ছা শুনে বাণ বিচলিত। হর্ষদেব সম্পর্কে বাণের অনুভূতি স্বচ্ছ নয়। সবকিছু লেখা সম্ভব নয়। সব সত্য প্রকাশ পেলে, বাণের জীবন হবে বিপন্ন।

বিনীতভাবে বাণ বলেন, অবশ্য তিনি লিখবেন হর্ষচরিত তবে প্রচলিত কিছু কথা তিনি লিখতে পারবেন না। বাণের কথা শুনে গম্ভীর স্বল্পবাক ভাস্করদেবের মুখমণ্ডল স্মিত হাসিতে ঝকমক করে। বলেন রাজশক্তি অস্ত্রের ঝনঝনা নিতে অন্যদেশের দুর্ভেদ্য দুর্গের শিরে আপন পতাকা উড্ডীন করতে পারে। নির্মাণ করতে পারে আকাশ ছোঁয়া জয়স্তম্ভ। কিন্তু সমস্ত রাজশক্তি তার অদম্য শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করতে পারে ক্ষুদ্রতম একখণ্ড কবিতা। আদ্যরাজা বাণের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন বাণ অবশ্যই আপন হৃদয়ের অনুভূতির বসে সিক্ত করে লিখবেন

হর্ষচরিত গ্রন্থ।

আদ্যরাজার প্রস্থানের পর বাণের মাথায় চিন্তার ঝড়। বক্রঘোনের কথা ভেসে ওঠে ''হর্ষের হাত রক্তরাঙা। দীর্ঘ ঝড়ের পর অনুভূতি শান্ত হয়। স্থির করেন আপোষ করবেন রাজশক্তির সাথে। কিন্তু তিনি তার বক্তব্যকে লিখে যাবেন তীর্যকভাষার অন্তরালে। মূল বক্তব্য বালির অভ্যন্তরে প্রবাহিত হবে নদীধারার মতো। তাঁর অনুভূতি হৃদয় আর্তি , জীবনের সত্যবোধ বিশ্বাস আদর্শকে এমনি কৌশলে রাজশক্তির চোখে ধূলি নিক্ষেপ করে হবে প্রকাশিত। অনাগতকালে, কোনও পাঠকের কাছে হয়তো বা ধরা দেবে পরম সত্য।

বাণ, আড্ডা দিয়ে দিয়ে কাটালেন দীর্ঘ দুমাস। দুমাস পর ফিরে এলেন প্রীতিকূটে।

প্রীতিকূট থেকে দুর্গা পূজার পর যাত্রা করলেন কান্যকুব্জের পথে। রাজকীয় নৌবহর গঙ্গার ধারা ধরে তীব্র বেগে এগিয়ে চলে।

*　　　*　　　*

কান্যকুব্জের ঘাটে পৌঁছার আগেই দেখা যায় গঙ্গাতীরে অজস্র নৌকার ভিড়। গঙ্গা ঘাটের দিকে নৌকা যতই এগিয়ে যায় ততই দেখা যায় বাড়ছেই বাড়ছে নৌকার ভিড়। ছোটো বড়ো মাঝারি নৌকা আর নৌকা। বাণের ধারণা হল গঙ্গাতীরে বিশেষ কোন উৎসব অথবা মেলা। ঘাটে নৌকা বাঁধার উপায় নাই।

বাণের নৌকার রাজকীয় সৈন্যদলের হুঙ্কারে নৌকা কোন ক্রমে তীরের ছোঁয়া পেল।

বাণের উৎসাহ। বলতে গেলে লাফিয়ে তীরে নেমে ভিড়ে গেলেন জনারণ্যে। সংগ্রহ হল সংবাদ। বিচার হচ্ছে। রাজকীয় ধর্ম বিচার দেখার জন্য জড়ো হয়েছে দূর-দূরান্তের জনতা। তিন অপরাধীর বিচার হবে। তিন অপরাধী মরা রথের চালুক্যরাজ পুলকেশীর গুপ্তচর। হর্ষের রাজ্য বিস্তার দক্ষিণ -পশ্চিমে এগিয়ে প্রায় ছুঁয়ে গেছে পুলকেশীর রাজ্যসীমা। পুলকেশী এবং হর্ষবর্দ্ধনের তলোয়ারের ধার পরীক্ষার দিন দূরে নেই।

বাণ জনসমুদ্রের মাঝ দিয়ে সাঁতার কেটে পৌঁছালেন অকুস্থলে। গঙ্গাতীরে তিনটি বিচার মঞ্চ তৈরী হয়েছে। একে একে বিচার হবে।

প্রথম জলপরীক্ষা বিচার। অপরাধী সরাসরি অপরাধ স্বীকার করেনি তাই এই ধর্মীয় বিচার। প্রথম শুরু হল জলপরীক্ষা বিচার। মঞ্চের উপর উঠে এলেন বিচারক। বিচারকের পোশাক এবং পাগড়ি শ্বেতশুভ্র। মস্ত এক দাঁড়িপাল্লা পাথরবোঝাই বস্তা এই সাথে অপরাধীকে মঞ্চে নিয়ে এল একদল কারারক্ষী। অপরাধীর হাত পা বাঁধা। অপরাধীকে অন্য বস্তায় ঢুকিয়ে, বস্তার মুখ বেঁধে চড়িয়ে দেওয়া হল দাড়ি পাল্লার এক দিকে। অন্যদিকে চড়াল বস্তা ভর্তি পাথর। বিচারকের সূক্ষ্ম নির্দেশে পাথর বাড়িয়ে কমিয়ে পাথর এবং অপরাধী ওজন করা হল সমান।

অপরাধী এবং পাথর ভরা বস্তা দুটি এক রশি দিয়ে গলায় গলায় হল বাঁধা। দুটি বস্তা নৌকা করে নিয়ে গেল মাঝ গঙ্গার পবিত্র জলে। পবিত্র জলে ঠেলে দিল একই সাথে দুটি বস্তা।

জলবিচার হচ্ছে যদি লোকটি সত্যি-সত্যিই অপরাধী না হয় পাথরের বস্তা ভেসে উঠবে।

অপরাধী, অভিযোগ থেকে মুক্তি পাবে। সহস্র সহস্র জনতা সম্মিলিত ভাবে চিৎকার দিয়ে উঠল। সহস্র সহস্র মানুষের সাথে বাণ দেখলেন একই সাথে ডুবে গেল দুটি বস্তা। বিচারক রায় দিলেন অভিযুক্ত ব্যক্তি, প্রকৃতই অপরাধী। সে অবশ্যই গুপ্তচর।

জলবিচার শেষ হতে না হতেই অন্য মঞ্চে শুরু হল অগ্নিবিচার। সেই মঞ্চে অন্য বিচারক। একইভাবে অপরাধী তার অপরাধ অস্বীকার করলে অগ্নিবিচারের সম্মুখীন হতে হয়।

অগ্নি বিচারক ভীষণ গম্ভীর। অপরাধীকে প্রাণপণে ঝাপটে আছে কারাগারের দুজন প্রহরী। এক প্রহরী অপরাধীর ডান হাত ধরেছে চেপে। অন্যজন, জ্বলন্ত হাপর থেকে সাঁড়াশি দিয়ে গনগনে লৌহপিণ্ড অপরাধীর ডান হাতে তুলে দিতে চেষ্টা করে। অপরাধী প্রতিবারই হাত সরিয়ে নিচ্ছে। শেষপর্যন্ত অন্য এক প্রহরী অপরাধীর হাত চেপে ধরে। হাতের চেটোতে ফেলে দেওয়া হল উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড অপরাধী চিৎকার করে ফেলে দিল।

সম্পূর্ণ বিচার হচ্ছে অপরাধী গনগনে লৌহ পিণ্ড হাতে নিয়ে চুম্বন করবে এই লৌহ পিণ্ড। হাতে নিয়ে চুম্বন করার পর যদি দেখা যায় অপরাধী হাত এবং ঠোঁট দগ্ধ হয়নি তাহলে প্রমাণিত হবে সে অপরাধী নয়। বিচারক অপরাধীর হাতের চেটো পরীক্ষা করে রায় দিলেন। লোকটি অপরাধী। সে সত্যি সত্যি গুপ্তচব। জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ল।

জনসমুদ্রের ঢেউয়ের মাথার চড়ে বাণ পৌছালেন তৃতীয় মঞ্চে। যথারীতি সেখানে অন্য এক বিচাবক। মঞ্চে মস্ত দাঁড়িপাল্লা, 'এক বস্তা পাথব' অপবাধী এবং কজন কাবাবক্ষী।

তৃতীয মঞ্চে হবে 'ওজন বিচাব'। এই বিচাব হচ্ছে, প্রথমে অপবাধীকে দাঁড়িপাল্লাব একদিকে বেখে অন্যদিকে বাখা হবে সমপবিমাণ ওজনেব এক বস্তা পাথব।

পরবর্তী পর্যায়ে অপবাধীব দেহে বেঁধে দেওয়া হবে বিচার সংক্রান্ত নথিপত্রে লিখিত ভূর্জপত্র। ভূর্জপত্রেব নথিপত্রসহ দ্বিতীয় ওজনে যদি দেখা যায় বর্দ্ধিত নথিপত্রের ওজন অপরাধীব দেহে সংযুক্ত হয়নি তা হলে প্রমাণিত হবে, অপরাধী নির্দোষ।

ওজন বিচাব শুরু হল। সমপরিমাণ পাথরে অপরাধীর দেহের ওজন হল নির্দ্ধারিত। বলতে গেলে এক বস্তা বিচার সংক্রান্ত লিখিত ভূর্জপত্র, অপরাধীর সর্বাঙ্গে রশি দিয়ে শক্ত করে হল ধাঁধা। দ্বিতীয়বাব দাঁড়িপাল্লায় উঠিয়ে দেখা পেল বেড়ে গেছে অপরাধীব ওজন। বিচাবক রায় দিলেন —'গুপ্তচব ।

ইতিপূর্বে বাণ প্রত্যক্ষ কবেননি এমন ধরনের বিচার। বাণের পাশে দাঁড়িয়েছিল জনৈক ব্যক্তি। বাণের মনে হল লোকটি শিক্ষিত। বাণ জিজ্ঞাসা করেন গুপ্তচর প্রমাণিত হলে আইন অনুসারে কী প্রকারের শাস্তি হয়?

লোকটি বলে, গুপ্তচরের শাস্তি আজীবন কারাবাস। গুপ্তচরে মৃত্যুদণ্ড হয় না।

বাণ্ ভাবলেন যাক অনন্ত দুটি লোক বেঁচে গেল। একটির মন্দভাগ্য গঙ্গার জলে সমাধি হয়ে গেছে।

লোকটি বলে গঙ্গার তীরে এমনিকভাবে বিচার হয় নানা ধরনের অপরাধের। সুখ হয় চোর-

ডাকাতের বিচার দেখতে। অপরাধ প্রমাণ হলে এখানেই কেটে দেওয়া হয় অপরাধী হাত অথবা পা। কখনো বা নাক অথবা কান।

লোকটি ভাল শ্রোতা পেয়ে মনের আনন্দে বলে অন্য ধরনের বিচারে অপরাধীর খাবারে মিশিয়ে দেওয়া হয় বিষ। বিষমিশ্রিত খাবার খেয়ে, অপরাধী যদি বেঁচে যায়, তাহলে প্রমাণিত হয় নির্দোষ।

* * *

রত্নাবলী নাটক উপলক্ষে কান্যকুব্জে বাণের জন্য নির্দ্ধারিত হয়ে ছিল মস্ত বাড়ী। বাণ তার বাড়ীতে পৌছালেন। বাড়ীতে একনাগাড়ে তিন দিন তিন রাত্রি বিশ্রাম। স্নানাহ্নিক ভোজন আর ঘুম।

চতুর্থ দিনের সন্ধ্যায় যাত্রা করলেন বিহঙ্গমার উদ্দেশে। সেখানে পৌছে চমকে উঠলেন। বিহঙ্গমার পাশে সেজেগুজে বসে আছেন ভণ্ডী। ভণ্ডী হর্ষবর্দ্ধনের মন্ত্রী তথা দক্ষিণ হস্ত। বাণকে দেখে ভণ্ডীর মুখে চাপা বিরক্তি। বিহঙ্গমা নিস্পৃহ।

ভণ্ডীর কথা ভেবে ভেবে আনমনে নানা পথ পরিক্রমা করে পৌছালেন তার বাড়ীর সম্মুখে। তখন রাত হয়ে গেছে। স্তূপ স্তূপ অন্ধকার। বাড়ীর সামনে জমাট অন্ধকারের মতো ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে। গাড়ি থেকে এক চিলতে অন্ধকার বাণের দিকে এগিয়ে আসে। গুরুদেব ভর্ৎসুর কথা স্মরণ করে তিনি আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন।

কালো বস্ত্রে আচ্ছাদিত বিহঙ্গমা তার পাশে এল। তিনি বিহঙ্গমাসহ প্রবেশ করলেন তার শয়নকক্ষে। দরজা বন্ধ করে কথা শুরু হল।

বিহঙ্গমা বলে, সে বাণের জন্য ভয় পেয়েছে। ভণ্ডীর চোখে দেখেছে ভীষণের ছায়া। হর্ষদেব কান্যকুব্জ অথবা স্থাম্বীশ্বরে নেই। বাণকে বলতে এসেছে দেরি না করে বাণ যেন রাজধানীর বাইরে চলে যান।

হেমন্তের বাতাসে শীতের ছোঁয়া। বিহঙ্গমা এবং বাণ গল্প করছেন বিছানায় বসে। বাণের মাথায় হর্ষচরিত। তিনি নানা প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলেন হর্ষবর্দ্ধন সম্পর্কে। বিহঙ্গমার কথাবার্তায় একটি দুটি করে গ্রন্থের বিষয় বস্তুর কাঁচামাল, জমতে থাকে বাণের ভাণ্ডারে।

মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় কলুঙ্গির প্রদীপ কেঁপে ওঠে। রাত গভীর হয়ে ওঠে। বিহঙ্গমাও বাণের ক্রোপ উত্তরীয়ের ভিতরে আশ্রয়ে নেয়।

রাত্রির তৃতীয় প্রহরের সুযোগ নিলেন বাণ। বাণ, জ্ঞাত আছেন, তৃতীয় প্রহরকে বলা হয় প্রেতপ্রহর। চুম্বন চুম্বনে ভরে দিলেন বিহঙ্গমাকে। শিথিল হল বিহঙ্গমা।

বক্রঘোনের কথার প্রতিধ্বনি উঠে বিহঙ্গমার কণ্ঠে। ভণ্ডী ভীষণ মৃত্যু ছড়িয়ে দিয়েছে কান্যকুব্জ স্থানীশ্বর গৌড়দেশে। হর্ষ ভণ্ডী মাধবগুপ্ত প্রেতপুরীর দরজা খুলে ডেকে এনেছে পিশাচবাহিনী।

বিহঙ্গমা রাত্রির তৃতীয় যামের প্রেতপ্রহারে বাণের বুকে মাথা রেখে কথা বলে চলে স্বপ্ন

ঘোরে।

হঠাৎ কাকের ডাকে তার স্বপ্ন ঘোর ভাঙে। চেতনা ফিরে পেয়ে জড়িয়ে ধরে বাণকে । বলে, তার মুখ দিয়ে অনেক কথা বের হয়ে গেছে। একটি মাত্র কথা যদি বাতাসে ভাসে তা হলে হবে তার নারকীয় মৃত্যু। বিহঙ্গমা বাণের ঠোঁটের কাছে তার ঠোঁট এগিয়ে ফিসফিস করে বলে বাণ যেন চলে যায় দূরে বহু দূরে। তার নিজের পলায়নের পথ নেই। সে জীবিত অবস্থায় মৃত। সতীদাহে তার দেহ ভিন্ন অন্যসব কিছু দগ্ধ হয়ে গেছে। মানুষ হিসাবে বাঁচতে চেয়েছিল কিন্তু হল না। বাণের বুক বেয়ে নামে বিহঙ্গমার তপ্ত অশ্রু। কেঁদে কেঁদে বলে, তাকে যেন ভুলে যায় বাণ। বাণ যেন মনে করে বিহঙ্গমা মরে গেছে।

বিহঙ্গমা কালো কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে অতিদ্রুত শয়নকক্ষের দরজা খুলে বের হয়ে যায়।

বাণ, ভণ্ডীর বাড়ীতে গিয়ে দেখা করেন। তখন সবেমাত্র সকাল হয়েছে। বাণকে স্বাগত করেন। বাণ নানা কথাবার্তার মধ্যে জিজ্ঞাসা করেন হর্ষদেবের ফেরার কাল। ভণ্ডী বলেন, বর্তমান সময়কাল যুদ্ধ বিগ্রহের উত্তম সময়। বৃষ্টি বাদল নেই। মাস ছয় সাত হর্ষদেব রাজ্যবিস্তারে ব্যস্ত থাকবেন। বাণ বিনীত ভঙ্গিতে ভণ্ডীর কথাবার্তা শুনেন। হর্ষদেবের অনুপস্থিতিতে রাজ্যের দায়দায়িত্ব ভণ্ডীর হাতে। তিনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

ভণ্ডী বাণের দিকে তাকিয়ে বলেন রাজসভা, অন্তত আগামী জৈষ্ঠমাস পর্যন্ত বন্ধ। ইচ্ছা করলে বাণ সাম্রাজ্যের ভিন্ন দিকে এবং বিভিন্ন সামন্ত নৃপতিগণের রাজ্য পরিদর্শনে গমন করতে পারেন।

বাণের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় চুপি চুপি বলে বাণ! তুমি রাজধানীতে থাকবে তা ভণ্ডীর ইচ্ছা নয়। ভণ্ডী পেয়েছে বিহঙ্গমাকে ।

বিনীত বাণের মুখ দিয়ে নির্গত হয় 'দেশ ভ্রমণের সুযোগ পেলে আমি ধন্য হব।' ভণ্ডীর আদেশ নির্গত হয়। সভাপণ্ডিত বাণভট্টের দেশভ্রমণের ব্যবস্থা করা হোক।

কান্যকুব্জ থেকে যাত্রা করলেন পশ্চিম দিকে। সভা পণ্ডিতের রাজকীয় পাঁচ ঘোড়ার রথে চড়ে যাত্রা নয়। প্রতিদিন নিত্যনূতন এক ঘোড়ার ভাড়া গাড়ী। প্রতিরাতে পান্থনিবাসে বিশ্রাম । হুণ্ডি ভাঙ্গিয়ে খরচপত্র।

এমনি করে পৌছালেন সংকাশ্য দেশে। ধনধান্যে পুষ্পে ভরা দেশ। পথের পাশে নানা বৌদ্ধ বিহার। গাড়োয়ান জানাল, সংকাশ্য দেশের সুখ সমৃদ্ধির মূলে নাগদেবতা। নাগদেবতার প্রিয় দেশ সংকাশ্য।

পরদিন এই দেশের রাজধানীর পথ-পরিক্রমা করে করে পৌছালেন মস্ত এক বৌদ্ধ বিহারের সম্মুখে। বিহারের চূড়া আকাশ ছোঁয়া। তখন দিনের দুপুরবেলা দলে দলে ভিক্ষু বিহারের ভিতরে প্রবেশ করছে। হঠাৎ এক ভিক্ষু বাণকে জড়িয়ে বলে "তাত বাণ! আপনি এখানে?" পরিচয় দেয় তার নাম ভিক্ষু সুমতি। বাণের বক্ষে বেজে ওঠে গুরু গুরু ধ্বনি। মনে পড়ে এই বালক ভিক্ষু একদিন উম-ইয়ামের সংবাদ নিয়ে এসেছিল। ওর সাথে তিনি গিয়েছিলেন পূর্বসাগরের উত্তর-

পূর্ব কোণের কান্ত-উদক গ্রামে। সেই গ্রামে উম-ইয়ামের সাথে তার শেষ দেখা হয়েছিল অবলোকিতেশ্বর বৌদ্ধ বিহারে। বাণের কণ্ঠ রুদ্ধ। চেষ্টা করে কথা বলতে না।

ভিক্ষু সুমতি তাঁর হাত ধরে প্রবেশ করে বিহারের ভোজনাগারে। সুবিশাল কক্ষে একসাথে প্রায় হাজার খানেক ভিক্ষু। স্থির নিশ্চুপ হয়ে আছে ভোজনের অপেক্ষায়। সুমতি বলে, এই বিহারের ভিক্ষুগণ হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত। নিয়ম হচ্ছে ভোজনকালে কথা বলা নিষিদ্ধ। এমনকী থালা গ্লাসে পর্যন্ত কোন ধরনের শব্দ করা হয় না। বাণ লক্ষ্য করেন ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীগণ এক সাথে পাশাপাশি বসে করছেন আহার। বাণ, ভোজন সমাপ্ত করে তৃপ্ত হলেন।

খাবার দাবারের পর সুমতি, বাণকে নিয়ে গেল মঠের একটি বিশাল কক্ষে। কক্ষে নাগদেবতার আসন। সুমতি কাহিনি বলে নাগদেবতার।

বহু বর্ষদিন পূর্বে এই মঠের ভিক্ষুদের সাথে গোপনে মিশে গিয়েছিলেন এক নাগদেবতা। ভিক্ষুদের মধ্যে কোন্ ভিক্ষুকে ভর করে আছেন নাগদেবতা তা বুঝার ছিল না কোনও উপায়। নাগদেবতাকে বৌদ্ধগণ ও ভক্তি শ্রদ্ধা করে। নাগদেবতা হচ্ছেন মঙ্গলের দেবতা। তার কৃপায় বর্ষা নামে । তার কৃপায় দেশ পূর্ণ ধনধান্যে। তখন স্থির হল ছদ্মবেশী নাগদেবতাকে পূজা দিতে হবে। তিনি ভর করে আছেন মঠের কোন এক ভিক্ষুর দেহে। সুতরাং, মঠের সব ভিক্ষুদেরে ভাল করে খাবার দাবার দিয়ে প্রসন্ন এবং তৃপ্ত করতে হবে।

নাগদেবতাকে তৃপ্ত এবং প্রসন্ন করার পদ্ধতিরূপে মঠের কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন উত্তম আহারাদি প্রদান করতেন ক্রমান্বয়ে তিনজন করে ভিক্ষুকে। এমনি করে মূল ভিক্ষুরূপী নাগদেবতা পেয়ে যেতেন উত্তম খাদ্য।

তৃপ্ত এবং প্রসন্ন নাগদেবতা লক্ষ্মীমন্ত করেন সংকাশ্য দেশকে । তবে প্রতি বর্ষাকালে, নাগদেবতা একবার স্বয়ং এসে দেখা দেন তাঁর নিজস্বরূপে। তখন তাঁর আগমন ঘটে, ছোট সাপের রূপে। সেই সাপের কানের দুই দিকে, দুটি সাদা বিন্দু।

সুমতি, বাণকে এই কক্ষের নাগদেবতার আসন দেখিয়ে বলে এই আসনে প্রতি বর্ষার মূল নাগদেবতার পূজা হয়। মঠের প্রধান ভিক্ষু আসনের উপর নাগদেবতাকে ঘৃতপূর্ণ তাম্রপাত্রে করেন প্রতিষ্ঠা। দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করে প্রধান ভিক্ষুসহ অন্যান্য ভিক্ষুগণ মন্ত্রপাঠ করে করে প্রদক্ষিণ করেন নাগ দেবতাকে। আশ্চর্যের বিষয় পূজা সমাপ্ত হলে, হঠাৎ বিলীন হয়ে যেতেন সকলের দৃষ্টির সমুখ হতে । আর খুঁজে পাওয়া যেত না নাগদেবতাকে।

মঠ থেকে বের হয় দুজন রাজপথে ওঠে । বাণের মনে পড়ে চন্দ্রমৌলি শিবমন্দিরের মহাজ্ঞানী পুরোহিত চন্দ্রগোমী স্বামীর কথা। তিনি প্রসঙ্গ ক্রমে বলে ছিলেন চন্দ্রপুরাদি অঞ্চলের কিরাতদের গুপ্ত পূজাপদ্ধতির কথা। চন্দ্রপুরাদি কিরাতদের নাগদেবতার নাম উ-থেলেন । উ-থেলেন কে তামার পাত্রে নরক্তের নৈবেদ্য প্রদান করে দেওয়া হয় পূজা। সঙ্গোপনে মানুষ ধরে তার নাক দিয়ে তামার শলাকা প্রবেশ করিয়ে সংগ্রহ করা হয় নাগদেবতা উ-থেলেনের জন্য নর রক্তের নৈবিদ্য। কিরাতদের বিশ্বাস উ-থেলেন ধনসম্পদের দেবতা।

বাণ আপনমনে পথ চলেন চন্দ্রগোমী স্বামীর কথা ভেবে। তিনি বলেছিলেন পূর্বভারতীয়

অঞ্চলের কিরাতগণের সর্পদেবতা উ-থেলেনের সামঞ্জস্য পেয়েছেন বৈদিক সর্পদেবতার সাথে। ঋকবেদের সর্পদেবতার নাম ত্রৈতন বা থেতন। কিরাতদের উ-থেলেন বৈদিক ত্রৈতন নামের সাথে যুক্ত হতে পারে। উ-থেলেন নাম 'উ' কিরাতীয় ভাষায় পুরুষ বা বৃহত্তর বাচক উপসর্গ।

পান্থশালায় রাত কাটে নানা গল্পে। প্রতি মুহূর্তে বাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল উম-ইয়ামের কথা জিজ্ঞাসা করা। বারেবারে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হতে যেত ভাবাবেগে। শেষ পর্যন্ত সুমতি আপনিই প্রকাশ করেছিল উম-ইয়ামের কথা। উম-ইয়াম কান্ত-উদক গ্রামের অবলোকিতেশ্বর বিহারে নেই। দূর-দূরান্তে প্রচার করছে করুণাময় বুদ্ধের বাণী। তাঁর ঠিকানা জানা নেই।

সুমতি বলে, তার আকাঙ্ক্ষা করুণাময় বুদ্ধের স্মৃতিজড়িত স্থানসমূহ দর্শন করে পুণ্য সঞ্চয় করা। সুমতির আগ্রহে এবং তাঁর কৌতূহলে স্থির সংকাশ্য দেশ থেকেই ফিরে যাবেন আবার পূর্বদিকে। পূর্বদিকে যাত্রা শুরু হল রাত ভোর হতে না হতে। বাণ উল্টোরথ যাত্রায় পৌছালেন আবার কান্যকুব্জে।

কান্যকুব্জ থেকে গঙ্গার প্রবাহ ধরে শুরু হল যাত্রা। এবারের যাত্রা রাজকীয় নৌ-বহরে। নৌ-বহর পূর্বদিকে চলে চলে পৌছাল পাটলীপুত্র নগরে। সেখানে দিনকতক নিরালম্ব বিশ্রাম। পাটলীপুত্র থেকে পরবর্তী যাত্রার উদ্দেশ্য বুদ্ধগয়া। পাটলী পুত্রের দক্ষিণে উত্তর বাহিনী নদী এসে মিলিত হয়েছে গঙ্গার ধারায়। নদীর নাম ময়ূরী। ময়ূরীর উজান ঠেলে নৌকা চলার পথ নেই। শুরু হয় দুজনের পদব্রজে চলা। এমনি করে পৌছলেন বুদ্ধগয়ায়।

বুদ্ধগয়ায় পৌছে সংবাদ শুনে সুমতির চোখে অশ্রুধারা বিগলিত হল। মাত্র কয়েক বছর আগে গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক ভস্ম করে দিয়েছেন বোধিবৃক্ষ। চোখের জল মুছে মুছে তার উত্তরীয়তে সঞ্চয় করেন বোধিবৃক্ষের কিছু অঙ্গার।

বুদ্ধগয়ার একজন ভিক্ষু লক্ষ করেছিল সুমতি.... ভিক্ষু সুমতির সাথে শুরু করল কথাবার্তা। ভিক্ষু সম্মুখের নিম্ন ভূমিভাগ দেখিয়ে বললো এখানে ছিল নৈরঞ্জনা নদী। বর্তমানে শুকিয়ে গিয়ে পলিমাটির তলা দিয়ে অদৃশ্যভাবে প্রবাহিত হয়ে চলছে। ভিক্ষু বলে, পলিতে গুপ্তভাবে প্রবাহিত হচ্ছে বলে এখন তার নাম হচ্ছে পলিগুপ্ত নদী। সংক্ষেপে আবার কেউ কেউ বলে পলিগু বা ফল্গু নদী।

বাণ বোধিবৃক্ষের জন্য ব্যথা পেলেন। বাণ দুঃখপ্রকাশ করলে ভিক্ষু তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। ভিক্ষু বলেন, আবার বেঁচে উঠবে এই পুণ্য পবিত্র বৃক্ষ। অনেক অনেকদিন আগে অশোকের একজন রাণী যার নাম তিশ্যরক্ষিত, তিনি কেটে ফেলেছিলেন এই বৃক্ষ। কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড! কাটতে না কাটতে দ্বিগুণ বড়ো হয়ে উঠেছিল বৃক্ষ। এরপর বহু বহুবার গাছকে ধ্বংস করার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু গাছ ধ্বংস হয়নি। ভিক্ষুর বিশ্বাসে আবার বেঁচে উঠবে পবিত্র বোধিবৃক্ষ।

আবার দীর্ঘযাত্রা। পৌষের এক অপরাহ্নে পৌছালেন পালিতক নৌঘাটে। সুমতি চলে গেল কান্তিউদক গ্রামের অবলোকিতেশ্বর বিহারে।

বাণ, এক গভীর রজনীতে গেলেন বক্রঘোনের সাথে সাক্ষাৎ করতে। বক্রঘোন অধ্যাপনা পরিত্যাগ করে হয়ে গেছে সন্ন্যাসী। খাসোক পুষ্করিণীর তীরে স্থাপন করেছে তন বাঁশের শিবালয়।

বক্রঘোনের পোষাক গৈরিক, গলায় এবং বাহুতে রুদ্রাক্ষ মালা হাতে ত্রিশূল। বাণ, তার সাথে হর্ষদেব সম্পর্কে নানা প্রসঙ্গে করেন আলাপ আলোচনা। উদ্দেশ্য, হর্ষচরিত গ্রন্থের কাঁচামাল সংগ্রহ। বিহঙ্গমার নাম এবং বক্তব্য থাকে অপ্রকাশিত।

বক্রঘোন বলে —এই শিবালয়ে প্রায়শ উৎকল দেশীয় তীর্থযাত্রীর আগমন ঘটে। তারা অধিকাংশ হীনযান বৌদ্ধ। ওরা হর্ষের উপর চটে আছে। হর্ষ নাকি মহাযান সম্প্রদায়কে তান্ত্রিক আচার আচরণে প্রশ্রয় দিচ্ছে।

বাণ, হর্ষচরিত গ্রন্থ সম্পর্কে ভাস্কর বর্মনের আদেশের কথ্য ব্যক্ত করে বলেন, তিনি লিখতে বাধ্য হর্ষচরিতগ্রন্থ বক্রঘোনের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, তার গ্রন্থে স্থান পাবেনা হর্ষদেব সম্পর্কে মিথ্যাপ্রচার। তিনি শ্লেষাত্মক ভাষায় প্রকাশ করবেন সঠিক হর্ষচরিত্র।

বক্রঘোন জিজ্ঞাসা করেন রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যাকারী রূপে মহারাজ শশাঙ্কের নাম যেভাবে প্রচারিত হচ্ছে বাণের গ্রন্থে কি এমনিভাবে শশাঙ্কের নাম লিখিত হবে? উত্তরে বাণ জোর দিয়ে বলেন, তাঁর গ্রন্থে কখনো লিখিত হবে না এই নাম।

ভোর হবার আগেই প্রীতিকূটে পৌঁছালেন। বাণী তখনো জেগে অপেক্ষা করছেন। প্রদীপের আলো স্তিমিত। বাণ, তার বিলম্বের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলে বাণী বলেন "তুমি যে মহারাজ হর্ষদেবকে নিয়ে গ্রন্থ লিখবে তার জন্য কি সরস্বতী দেবীর কাছে প্রার্থনা করে কবে ভোর করেছ গো!" বাণ আশ্চর্য হয়ে চিন্তা করেন মিথ্যা নয় বাণীর ধারণা। বক্রঘোনের কাছে তো গিয়ে ছিলেন — এমনি উদ্দেশ্য নিয়ে।

বাণীর পাশে বসে তার মাথা এবং কপালে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বলেন- "তুমিই তো আমার বাণী। তুমি সরস্বতী। তুমি কৃপা করলে অবশ্যই সক্ষম হব।"

প্রভাতে ভাস্কর বর্মনের রাজদূত নিয়ে এল, নিমন্ত্রণ পত্র। সেদিনই বাণকে যেতে হবে কোটিবর্ষের পেন্তার ধনগ্রামে। সেখানে কৃষ্ণা চতুর্দশীতে প্রতিষ্ঠিত হবে প্রদ্যুম্নেশ্বর দেবমূর্তি। প্রদ্যুম্নেশ্বর দেব, শিব-নারায়ণের যুগলরূপ।

পেন্তারধনে আদ্যরাজা ভাস্কর বর্মন, শ্রীগোপাল এবং লোহিতাক্ষের সাথে তাঁর দেখা হল। বাণ আদ্যরাজাকে বিনীতভাবে বলেন, হর্ষদেব সম্পর্কে গ্রন্থ রচনার নির্দেশ পুরে রেখেছেন তার হৃদয়ে। আদ্যরাজার নির্দেশে হর্ষ-চরিত গ্রন্থে প্রবাহিত হবে রসের স্রোত ধারা।

* * *

শ্রীপঞ্চমী অনুষ্ঠান মিশে গেছে তার অনুভূতির গভীর স্তরে। মাঘী সপ্তমী এল। বাণ সঙ্গে করলেন বাণী বন্দনা। কুলদেবতা মহেশ্বরের নাম স্মরণ করে ভূর্জপত্রে লিখলেন গ্রন্থ নাম "হর্ষচরিতম"।

শ্রীপঞ্চমীর পুণ্যতিথিতে, মহারাজা হর্ষবর্দ্ধনের সভাপণ্ডিত বশ্যবাণী কবি চক্রবর্তী শ্রীবাণভট্ট গ্রন্থ লিখতে শুরু করবেন সংবাদ প্রচারিত হয়ে গেছে দূর-দূরান্তে।

দেবী সরস্বতীর সম্মুখে কুশাসনে বসে লিখছেন বাণ। পাশে রুদ্রদেব এবং পারশব ভ্রাতা

চন্দ্রসেন। বাণ, চন্দ্রসেনকে কানে কানে বললেন গ্রন্থনাম। চন্দ্রসেন, বায়ুবিকারের কানে পৌছিয়ে দেয় এই নাম। বায়ুবিকার বাণের নামের পূর্বে বিশেষণের পর বিশেষণ যুক্ত করে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে গ্রন্থ নাম ঘোষণা করে । দিকে দিকে গঙ্গিনিকার জোয়ারের কল্লোল ধ্বনির মতো উচ্চারিত হয় -"হর্ষচরিতম-হর্ষচরিতম"। জনকল্লোলধ্বনি শ্রবণ করে শিহরিত হয় বাণের সর্বাঙ্গ। আবেগে বাণের লেখনী কাঁপতে থাকে থরথর করে। কম্পিত হস্তে ভূর্জপত্রে লিখলেন তাঁর উপাস্যদের স্তোত্র।

নমস্তুঙ্গ শিরশ্চুম্বিচন্দ্র চামর চারবে।

ত্রৈলোক্য নগরারম্ভ মূল স্তম্ভায় শম্ভবে।"

অনেক দিন আগে চন্দ্রমৌলী শিবমন্দিরে বাণের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে ছিল এই স্তোত্র। চন্দ্রগোমী স্বামী সেই ক্ষণকে চিহ্নিত করেছিলেন সুফলা মুহূর্ত রূপে। তিনি মন্দিরের মেঝেতে লিখে রেখে ছিলেন সবুজ বিল্বপত্র দিয়ে।

বাণ ডুবে গেলেন ভাবজগতে। অজস্র জনকল্লোল খুঁজে পেল না ভাবজগতে প্রবেশের পথ। শিবস্তোত্রের মত উমা বন্দনা সৃষ্ট হয়েছিল এক সুফলা মুহূর্তে। সে দিন, বিহঙ্গমাকে পার্বতী পরিণয় নাটকের কাহিনি বলে বলে তিনি কেঁদেছিলেন। বিহঙ্গমা তার স্কন্ধের উত্তরীয় খুলে মুছিয়ে দিয়ে ছিল তার অশ্রু। দেব-মন্দিরের নির্মাল্যের মত বিহঙ্গমার শ্বেত শতদলের মত যুগল স্তন দেখে তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল উমাবন্দনা—

"হরকণ্ঠ গ্রহানন্দ মীলিতাক্ষীঃ নমাম্যুসাম।

কালকূট বিষ স্পর্শজাত মূর্ছাগমামিব ।।"

শিবকণ্ঠের আলিঙ্গনে আনন্দ মুকুলিতা তাঁর আঁখি। কালকূট বিষের স্পর্শ জন্মা যেন এক মূর্ছিতা মূর্ছনা।

উমাস্তুতি লিখে শ্লোক গেঁথে প্রণাম জানালেন ব্যাসদেব হরিচন্দ্র প্রবরসেন ভাস কালিদাসকে।

মহারথী কবি সাহিত্যিকগণকে প্রণাম জানিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন আদ্যরাজ ভাস্কর বর্মনকে। লিখলেন —

"আড্যরাজকৃতোত্সাহৈ হৃদয়স্থৈঃ স্মৃতৈরপি

জিহ্বান্তঃ কৃষ্যমানেব ন কবিত্বে প্রবর্ততে

তথাপি নৃপতে র্ভক্ত্যাভীতো নির্বহণাকুল ঃ

করোম্যাখ্যায়িকাম্ভোধৌ জিহ্বাপ্লবন চাপলম।

হর্ষদেবকে নিয়ে আখ্যায়িকা লিখার জন্য আদ্যরাজার নির্দেশ এবং নির্দেশের সাথে আদ্যরাজার কথা, আমার স্মৃতিপটে গেঁথে আছে। কিন্তু সে সব কথা লিখতে আমার জিহ্বা বাঁকা হয়ে উল্টে যায়।

তবু আমি লিখব। নৃপতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং আমার প্রতি তার পরম মমত্ববোধ

সমুদ্রের মতো বিশাল বাঁধা বিঘ্ন অতিক্রম করে এই আখ্যায়িকাকে নিয়ে যাবে সার্থকতার তীরে।

আদ্যরাজার প্রতি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বাণের মুখে দেখা দিল তির্যকহাসি। ভাষায় প্রয়োগ করে শ্লেষবাক্য। আদ্য রাজা ভাস্কর বর্মনকে বলেছেন ভালো ভালো কথা। সেসব কথা বাণের স্মৃতিতে আছে উজ্জ্বল হয়ে। কিন্তু সে সব কথা লিখতে গেলে জিহ্বা বাঁকা হয়ে উল্টে যায়। কারণ হর্ষদেব সম্পর্কে অনেক তথ্য তার জানা আছে যে সব কথা আদ্যরাজার বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।

বাণ, প্রথমে লিখেছিলেন সে সব কথা লিখতে লেখনী বাঁকা হয়ে উল্টে যায়। লিখে মনে হল, এমনি ভাষায় সহজভাবে প্রতিপন্ন হয়ে যায়, বাণের মানসিক চিন্তাধারা। আদ্যরাজা, যেভাবে হর্ষদেবের মহিমাকীর্তন করে লেখার নির্দেশ প্রদান করেছেন বাণের ইচ্ছা তার উল্টো বিষয়ে লিখা। চিন্তা ভাবনা করে লেখনী শব্দ কেটে বসিয়ে ছিলেন জিহ্বা। প্রকৃত পাঠক বুঝে নেবে এর সঠিক অর্থ। কথা বলতে জিহ্বার ব্যবহার হয়। লিখতে জিহ্বার প্রয়োজন নেই। সুতরাং প্রকৃত পাঠক বুঝে নিবে এই জিহ্বার অর্থ প্রকৃত লেখনী।

হর্ষচরিত রচনা স্তিমিত গতিতে চলেছে প্রীতিকূটে খর বৈশাখী শুরু করে দিয়েছে পাগলামি। হর্ষদেবের মোহরাঙ্কিত পত্র নিয়ে এল রাজদূত। হর্ষদেব লিখেছেন পত্র পাঠমাত্র বাণ যেন যাত্রা করেন কান্যকুব্জের উদ্দেশে। বাণের বন্ধু শিল্পীগণের জন্য অপেক্ষা করছে ভারতীয় সঙ্গীত নৃত্য এবং বাদ্যগোষ্ঠী। বাণের নির্বাচিত শিল্পী গোষ্ঠী কান্যকুব্জে পৌছালেই যাত্রা শুরু হবে চীনদেশের মহাসঙ্গীত সম্মেলনের উদ্দেশে।

হর্ষদেব পত্রের একটি অংশে তারা চিহ্ন বসিয়ে ক্ষুদ্র কৃষ্ণ কীটাকৃতি আখরে লিখেছেন বাণের বান্ধব শিল্পীগণ যেন সঙ্গে আনেন তাদের নিজস্ব বাদ্যযন্ত্রাদি।

হর্ষদেবের পত্রটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে গিয়ে তিনি লক্ষ করেন পত্রের এক স্থানে অতি হালকা কালিতে লিখিত হয়েছে "বিশেষ কিছু সমাপ্ত হয়েছে। একান্তে প্রকাশ হবে।" এর অর্থ সহজেই করলেন অনুধাবন নিশ্চয়ই নূতন কিছু রচনা হয়েছে সমাপ্ত।

* * *

বাণ যাত্রা করলেন রাজকীয় নৌবহরে। সঙ্গে গায়ক সোমিল, গ্রহাদিত্য এবং বংশীবাদক, মধুকর, পারাবত। ক্রমে গঙ্গার স্রোত হয়ে উঠে সুতীব্র। উজান ঠেলে এগিয়ে চলে নৌবহর। পর্বত, সমতল, নদীর বুকে বর্ষা নেমেছে। নৌবহর ভরা শ্রাবণে পৌছাল কান্যকুব্জে।

কান্যকুব্জে পৌছানোর দুদিনের মাথায় বাণের বান্ধব শিল্পীগণ ভারতীয় শিল্পীগোষ্ঠীর সাথে যাত্রা করল চীনদেশের উদ্দেশে।

সমগ্র কান্যকুব্জ নগরী সেজে উঠেছে রথযাত্রা উৎসবে। প্রতিটি ঘরবাড়ী সেজে উঠেছে নানা বর্ণের ফুল এবং পাতায়। রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । রাস্তার পাশে নানা খোলা জায়গায় নির্মিত হয়েছে অসংখ্য ঘরবাড়ী এবং তাঁবু। দূর-দূরান্ত থেকে নগরে উপস্থিত হচ্ছে অজস্র মানুষ। অস্থায়ী ঘরবাড়ী তাঁবুতে নগরে আগত মানুষের বসবাস বিশ্রাম ভোজন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা

হয়েছে। বাণ আশ্চর্যান্বিত হয়ে লক্ষ করলেন কান্যকুব্জ নগরীর বিশিষ্ট নাগরিকগণের স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ, স্বেচ্ছায় সেবাকর্মে যোগদান করে সাহায্যে করছেন দূর-দূরান্ত থেকে আগত অজস্র মানুষকে।

নগরীর বাহির থেকে আসছে নানা আকৃতির নানা বর্নের রথ। কোনও রথের আকৃতি দেব মন্দিরের মতো। কোনটি বৌদ্ধমঠাকৃতি। প্রতিটি রথে একাধিক তলা অর্থাৎ একাধিক স্তর বিদ্যমান। ভিন্ন ভিন্ন তলায় ভিন্ন ভিন্ন দেবতা এবং বুদ্ধমূর্তি সাজানো।

কান্যকুব্জ নগরীর প্রধান বৌদ্ধমঠের রথ সর্বাপেক্ষা। বৃহৎ এবং উঁচু। বাণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছেন এই সুবৃহৎ রথের বৈশিষ্ট্য। মস্ত মস্ত কাঠের চাকার উপর এই বৃহৎ রথের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত বুনিয়াদ থেকে উঠেছে মস্ত গোলাকৃতি একটি কাঠের স্তম্ভ। রথের এই স্তম্ভ দেখে বাণের চোখে ভেসে ওঠে লোহিতাক্ষের করণ্ডীপোতের আস্ত এক গাছের মাস্তুলের চিত্র।

রথেব কাঠের স্তম্ভকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে বাঁশের হালকা কাঠামো। বাঁশের এই কাঠামোতে নির্মিত হয়েছে বহু স্তর অর্থাৎ তলা। প্রতিতলায় নানা দেবতা। সর্বোচ্চ তলায় বুদ্ধমূর্তি। বুদ্ধমূর্তির উপরে কাঠের স্তম্ভের শিখরে মস্ত ত্রিশূল। রথ নানা রঙের বস্ত্রে সজ্জিত। প্রতিটি তলার উপরে টাঙানো বর্ণাঢ্য চাঁদোয়া। কান্যকুব্জ নগরীর প্রধান বৌদ্ধমঠের এই রথের উচ্চতা প্রায় একুশ-বাইশ হাত।

শত সহস্র মানুষ রশি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নানা রথ। রথগুলির ভিন্ন ভিন্ন তলায় দেব এবং বুদ্ধ মূর্তিগুলির সাথে দাঁড়িয়ে আছেন সন্ন্যাসীগণ। পথ পার্শের উঁচু উঁচু বাড়ী থেকে, রথেব উপর ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে নানা বর্ণের পুষ্প।

* * *

দিন কতকের মধ্যে এল রাজ আহবান। বাণ পৌছালেন হর্ষদেবের কক্ষে। নাটক পাঠ শুরু করলেন হর্ষদেব। নূতন নাটকের নামে নাগানন্দ। নাগানন্দ পাঁচ অঙ্কের সম্পূর্ণ নাটক।

নাগানন্দ বলিষ্ঠ নাটক। নায়কের নাম জীমূতবাহন। নায়িকা মলয়বতী। নায়ক নায়িকার মধ্যে সুগভীর প্রেম। আদর্শবান যুবক জীমূতবাহন। নানা বাধাবিপত্তির মাঝে এগিয়ে চলে নাট্য কাহিনি।

বাণ রুদ্ধশ্বাসে নাটক শুনছেন। তার মনে হচ্ছিল কাহিনি যেন এক পাগলা ঘোড়া। পাগলা ঘোড়ার সওয়ার নাট্যকার হর্ষদেব। হর্ষদেব প্রচণ্ড শক্তি এবং কৌশলে বল্গা ধরে আছেন।

নায়ক নায়িকার সুগভীর প্রেম মিলিত হল শুভবিবাহের স্রোতে হর্ষদেব এরপর নাটকে উপস্থিত করলেন শিহরণ। আদর্শবান জীমূতবাহন নাগকুলের প্রতি ভালোবাসায় বিগলিত।

নাগকুলের উপর ভীষণ বিপদ নিয়ে উপস্থিত হল গরুড়। জীমূতবাহন তার ভালোবাসার নাগকুলকে রক্ষার জন্য প্রাণ দিলেন গরুড়ের বজ্রনখরে।

নাগানন্দ নাট্য কাহিনি পৌছাল দারুণ পরিস্থিতির সম্মুখে। কেঁদে ওঠে ভালোবাসা। কেঁদে ওঠে দর্শক — এই সাথে মলয়বতী।

ভারতীয় সাহিত্যে নাট্য কাহিনি সমাপ্ত হবার রীতি নেই বিরহ দহনে। মঙ্গল মিলনে সমাপ্ত হল নাগানন্দ নাট্যকাহিনি। দেবী গৌরীর কৃপায় প্রাণের সঞ্চার হল জীমূতবাহনের মৃতদেহে। জীমূতবাহন এবং মলয়বতী আবার মেতে ওঠেন প্রাণের আনন্দে ।

বাণ নাট্যকাহিনির প্রশংসা করেন। হর্ষদেব বলেন বর্তমানে তিনি পাঠ করছেন নানা বৌদ্ধ সাহিত্য। নাট্য কাহিনির বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছেন বৌদ্ধ সাহিত্যের সুবিখ্যাত গল্প নাগানন্দ থেকে।

হর্ষদেব প্রসঙ্গান্তরে বাণকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি শুনেছেন বাণ নাকি কোনও এক দুষ্ট ব্যক্তির দুশ্চরিত্র লিখতে ভীষণ ব্যস্ত ? বাণের মুখমণ্ডলে অকৃত্রিম হাসির আলো হয় উদ্ভাসিত। বাণ উপলব্ধি করেন হর্ষচরিত্রের কথা পৌঁছে গেছে।

বাণের প্রণত ভঙ্গির জোড়হস্ত তার ললাট স্পর্শ করে। এবপর বাণের কাঠ মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হয়—"যদি বাণী কৃপা করেন।"

বাণের ভঙিমা এবং তার মুখে বাণী নাম শুনে হর্ষদেব সহর্ষে হেসে ওঠেন। ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় কক্ষের এখানে ওখানে রাখা সবগুলি বীণার তারে তারে।

দিন কতকের মধ্যে হর্ষদেব তার দ্বিতীয় রাজধানী কান্যকুব্জ পরিত্যাগ করে যাত্রা করলেন প্রথম রাজধানী স্থান্বীশ্বরের পথে। সঙ্গে ভণ্ডী সেনাপতি এবং গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বৃন্দ।

ইতিমধ্যে বিহঙ্গমার সাথে বাণের সাক্ষাৎ আড্ডা এবং অতীত রোমন্থিত হয়েছে ক্রমাগত সম্পূর্ণ একদিন এবং দুরাতব্যাপী। হর্ষদেব চলে যাবার পর এক সন্ধ্যায় বিহঙ্গমার কক্ষে প্রবেশ করে উঠলেন চমকে বিহঙ্গমার কাঁধে বাঁ হাত রেখে বসে আছে এক যুবক। দক্ষিণ হাতে স্ফটিকের মদিরাপাত্র। ভীষণ নেশাগ্রস্ত। বাণ ফিরে গেলেন।

কদিন বাদে বাণের বাড়ীতে বিহঙ্গমার আবির্ভাব। বাণের অনুমান সত্য। বিহঙ্গমার নবাগত শিকার কেউকেটা ব্যক্তি। হর্ষদেবের রাজধানীর নূতন রত্ন। নাম অরুণাশ্ব। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা একই সাথে বুদ্ধিমান। অরুণাশ্ব ধীরে ধীরে হর্ষবর্দ্ধনের কাছে এসে এখন একজন মন্ত্রী হয়ে উঠেছে।

বিহঙ্গমার ভাষায়, অরুণাশ্ব উর্ব্বর ভূমি। বিষবৃক্ষের বীজ সহজে বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়ে, বিষফল প্রদানের উর্বরভূমি। বাণ, বিহঙ্গমার চোখে চোখ রাখেন। বাণের চোখে কৌতুহল। বিহঙ্গমার চোখে লকলকে চিতার আগুন।

বিহঙ্গমা বলে, অরুনাশ্ব নেশার ঘোরে গালমন্দ করেছে বুদ্ধদেব এবং তার ধর্মকে। রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম ফুলে-ফেঁপে উঠার জন্য দায়ী করেছে হর্ষবর্দ্ধনকে।

বাণ জিজ্ঞাসা করেন রাজার বিরুদ্ধে এমনি কথাবার্তা বিহঙ্গমা কি জানিয়েছে গণিকাধ্যক্ষকে?

উত্তরে বিহঙ্গমা বলে "জানাইনি এবং আমি জানাব না। এই বিষবৃক্ষে জলসেচন করে আরো বড়ো করব । ফুল ফোটাব ফল পাকাব। তারপর ....।"

বাণ লক্ষ করেন বিহঙ্গমার চোখে চিতার লেলিহান শিখা এবার শ্মশানের অঙ্গার হয়ে ধক

ধক করে জ্বলছে।

*　　　　*　　　　*

ইতিপূর্বে হর্ষদেব বলেছেন দুশ্চরিত্র রচনার উপযুক্ত স্থান বাণীমন্দির। বাণ যেন বাণীর চরণাদি স্পর্শ করেন, প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে সমাপ্ত করেন চরিত রচনা।

বাণ, হর্ষদেবের নির্দেশ অনুসারে প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের অনুসন্ধানে প্রীতিকূটের বাণী মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা করেন। প্রীতিকূটে যখন পৌছালেন তখনো বর্ষা নামেনি।

বাণের হাতে এখন সময় নষ্ট করার আর সময় নেই। উঠে পড়ে লাগলেন গ্রন্থ নিয়ে। প্রতিটি শব্দ শেখার পর দেখা দেয় সমস্যা। প্রতিটি শব্দের একধিক পরিবর্তন। অজস্র পরিবর্তন। অজস্র কাটাকাটি। প্রতিটি শব্দ যেন নারিকেল। সহজভাবে আস্বাদন করতে গেলে দাঁত যাবে ভেঙে। প্রতিটি শব্দের বাহিরে শক্ত খোসা । খোসার অভ্যন্তরে কঠিন মালা। মালার ভিতর-সুস্বাদু সরস শাঁস।

মধ্যরাতে কখনো বা গোপনে বক্রঘোনের শিবমন্দিরে পরিক্রমা। বক্রঘোন হয়ে উঠেছে ভীষণ। প্রতিশোধস্পৃহায় দুলছে কৃষ্ণসর্পের ফণার মত। উৎকল নিয়ে তার পরিকল্পনা। রাজা শশাঙ্কের রাজ্যে গড়ে তুলা সম্ভব গুপ্তবাহিনী। উৎকল রাজ্যে প্রস্তুত হয়ে আছে বিপ্লবের ভূমি। সেখানে হর্ষের প্রচণ্ড বিরোধী ব্রাহমন। হীনযান বৌদ্ধ সম্প্রদায় এবং রাজশক্তি। নিশীথ রজনী অভিসারে বাণ শ্রোতা, বক্রঘোন বক্তা।

অজস্র কাটাকুটির মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলে হর্ষচরিত। প্রতিপক্ষের ত্রয়োদশী সন্ধ্যায় শ্রীমান পুলিন্দা আসে চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রম থেকে । বাড়ী এসে প্রথমেই বাবার "বাড়ীর লেখা-পড়ার" কতটুকু হল তার বিচার বিশ্লেষণ করে। বাণকে পাঠ করতে হয় স্পষ্ট করে। পুলিন্দা এখনো ভূষণ ভট্ট হয়ে উঠেনি। বয়স দশ-এগারো।

চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমে প্রতিটি পক্ষের চতুর্দশী থেকে প্রতিপদ তিথি পর্যন্ত তিন দিন ছুটি। পুলিন্দার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে, আঠারো মাল্লার ছিপ। চণ্ডক প্রতি ত্রয়োদশী সন্ধ্যা, শোনবিল অতিক্রম করে পুলিন্দাকে প্রীতিকূটে নিয়ে আসে।

হর্ষচরিতের এই অংশের রচনা শুরু হয়েছিল গ্রীষ্মের শেষ ভাগে। বাণের আকাঙ্ক্ষা গ্রন্থ সমাপ্ত করবেন শ্রীপঞ্চমীর পূর্বে। কঠিন ধৈর্য্যে এগিয়ে চলে রচনা। আড্ডার সঙ্গী সাথীদেরে বায়ুবিকার সাবধান করে দিয়ে বলেছে বাণের লেখাপড়ায় কেউ যেন কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। বাণের বাড়ীতে বন্ধুদের আনাগোনা এমনকী বাণের সাথে বাক্যালাপ নিষিদ্ধ । বায়ুবিকার, সকলের দুঃস্বপ্ন এবং আতঙ্ক ।

প্রায় আটমাসের মাথায় শ্রীপঞ্চমীর দিন কতক পূর্বে সমাপ্ত হল হর্ষচরিত গ্রন্থ। এরপর লেপ্যকার কুমার দত্তের পালা। তিনি তাঁর তিনসঙ্গী নিয়ে তিনটি হর্ষচরিত্র গ্রন্থ নকল করেন সুন্দর সাজানো আখরে। লোহিতাক্ষ দিয়েছেন মূল্যবান চৈনিক কাগজ। গ্রন্থ তিনটির উপর হর্ষদেবের বীণাবাদনরত পট অঙ্কন করে চিত্রশিল্পী বীরবর্মা।

বাণ, প্রাগজ্যোতিষপুরে গমন করলেন দুটি পুস্তক নিয়ে। আদ্যরাজা ভাস্কর বর্মনের হস্তে সমর্পিত হল দুটি হর্ষচরিত। আদ্যরাজার চোখে আনন্দের দ্যুতি চকচক করে উঠে । তিনি সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনকে বিগলিত করার মস্ত হাতিয়ার পেয়েছেন।

আদ্যরাজা ভাস্কর বর্মন প্রাগজ্যোতিষপুরের শ্রেষ্ঠ সম্মানসূচক রাজহস্তী সহ নানা মূল্যবান উপহারে ভূষিত করলেন বাণভট্টকে।

আদ্যরাজা উপহার প্রেরণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন তাঁর অসামান্য রাজদূত বৃদ্ধপণ্ডিত হংসবেগের সাথে। পরিকল্পনানুসারে, কামরূপের সুবিখ্যাত কারুশিল্পী নির্মাণ করলেন সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠের একটি আধার। আধারের অভ্যন্তরে মধুগন্ধী কৃষ্ণাগুরু-সহ হর্ষচরিত গ্রন্থ। হর্ষচরিত বহু মহার্ঘ উপঢৌকন সহ সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের হাতে পৌঁছিয়ে দিলেন বৃদ্ধ পণ্ডিত হংসবেগ।

হর্ষচরিত্র সমাপ্ত করে বাণ হয়ে উঠেছেন মুক্তপুরুষ। আড্ডার এসেছে জোয়ার। জোয়ার বিশেষ তিথিতে নয়। প্রতিদিন প্রতিক্ষণে চলে এই জোয়ার।

এমনি এক আড্ডায় যোগদিলেন লোহিতাক্ষ। তিনি লক্ষ করেন একাধিক লোক মাঝেমাঝে এসে খোঁজ করে হর্ষচরিত। বিষয়টি আড্ডায় গা সয়ে গেছে। এমনি কোনও লোক এলে আড্ডার যে কোনও সদস্য ঝটপট উত্তর দেয়—গ্রন্থ নেই।

এমনি এক গ্রন্থ অনুসন্ধানকারীকে ধরেন লোহিতাক্ষ। লোহিতাক্ষ বলেন, দিন পনেরো পর গ্রন্থ পাওয়া যেতে পারে। তবে গ্রন্থের মূল্য অষ্টপণ। অষ্টপণ বিপুল পরিমাণের অর্থ। আড্ডা চমকে উঠে গ্রন্থগ্রাহকের কথা শুনে। সে অষ্ট পণ দিতে রাজি।

সেই মুহূর্তে আড্ডায় বসেই শুরু হয় লোহিতাক্ষের পরিকল্পনা। গ্রন্থানকলকারী লেপ্যকার কুমারদত্তকে উপস্থিত করা হয় আড্ডাখানায়। কুমার দত্ত সহজেই রাজি হলেন তার দল সংগ্রহ করে শুরু করবেন গ্রন্থ নকলের কাজ। চণ্ডক তার দল নিয়ে তালপত্র সংগ্রহ করে লেখার উপযোগী করে প্রস্তুত করবে। বীরবর্মা প্রতিটি গ্রন্থের উপর অঙ্কন করবেন চিত্র।

লোহিতাক্ষ ঘোষণা করেন প্রতিজন লিপিকার পত্র সংগ্রহকারী এবং চিত্রকর তাদের কাজ কর্মানুসারে লাভ করবেন নগদ অর্থ।

লোহিতাক্ষ নিজের হাতে রাখেন আয়-ব্যয়ের দায়িত্ব। বলেন, আর্থিক হিসাব নিকাশের কাজ কর্মের জন্য পাঠিয়ে দেবেন তার একজন বিশ্বস্ত কায়স্থকে।

প্রতিটি গ্রন্থের নকল প্রস্তুত হবার পর গ্রন্থের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করবেন শ্যামল এবং রুদ্র দেব।

দু'দিনের মধ্যে গোপপল্লী থেকে এলেন জনৈক প্রৌঢ় কায়স্থ। তিনি কঠিন হস্তে গ্রহণ করেন আর্থিক দায়দায়িত্ব।

সংবাদ পৌঁছাল দূরদূরান্তে। রাজপণ্ডিত বাণভট্টের সুবিখ্যাত গ্রন্থ হর্ষচরিত সংগ্রহের জন্য ভিড় নাম ওঠে প্রীতিকূটে।

গ্রন্থ নকলকারী নানা ব্যক্তি এই সাথে গ্রন্থ ক্রেতার ভিড় দেখে বাণ মহাখুশি। সহজ আড্ডার

অমূল্য সুযোগ।

বাণ মাঝে মধ্যে গ্রন্থ উপহার প্রদান করেন তার পরিচিত ব্যক্তিবর্গকে। কিন্তু প্রৌঢ় কায়স্থ সুকঠিন হস্তে বাণের উপহার দেওয়া গ্রন্থের মূল্য আদায় করেন বাণের কাছ থেকে।

প্রতিপক্ষে কায়স্থ বাণের হাতে প্রদান করেন বিপুল পরিমাণ অর্থ। বিনা আয়াসে এত অর্থ লাভ? বাণের বিস্ময়!

* * *

এমনি করে গ্রন্থ লেখার পর দশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এই সময় কেটেছে আড্ডায়। মাঝে মাঝে রাজকীয় নৌবহরে চলে যেতেন কান্যকুব্জ অথবা স্থান্বীশ্বরে। কান্যকুব্জ বাসকালে তার রজনী অতিবাহিত হত বিহঙ্গমার সাথে।

ইতিমধ্যে ঘটে গেছে অনেক ঘটনা। পুত্রভূষণ, প্রীতিকূট বিদ্যাশ্রমের অধ্যাপনায় যুক্ত হয়েছে। বক্রঘোন, শিবমন্দির জনৈক চেলার হাতে দিয়ে চলে গেছে উৎকল দেশে। মালতী পিসি চক্রবাকিকা চন্দ্রগোমী স্বামী শ্রীগোপাল এবং করালী মৃত্যু হয়েছে। গুহনদীন পালিয়ে গেছে। প্রীতিকূট বিদ্যাশ্রম সুবিশাল হয়ে উঠেছে।

হর্ষদেবের তাড়া খেয়ে বাণ যখন কান্যকুব্জের যাত্রা করলেন তখন ভূষণভট্টের বয়স তেইশ পার হয়ে গেছে। বাণীর আকাঙ্ক্ষা, এখন পুলিন্দার বিয়ে দিতে হবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাণ শীতের সন্ধ্যায় কান্যকুব্জে পৌঁছে দেখেন নগরে আতঙ্কের ছায়া। হর্ষদেব পরাজিত হয়েছেন পুলকেশীর হাতে। হর্ষদেবের কোনও খবর বার্তা নেই।

রাস্তাঘাটে জ্বলেনি আলো। দোকান পাট বন্ধ। নগর রক্ষীগণ টহল দিচ্ছে খোলা তলোয়ার নিয়ে। আড়ালে আবডালে লুটেরার দল দোকানপাট ভেঙে লুট করছে।

গঙ্গারঘাট থেকে গাড়ি ভাড়া করে যাত্রা করেন বিহঙ্গমার উদ্দেশে। গাড়ি এসে দাঁড়ায় একটি ছোটো বাড়ীর ফটকে। ফটক খুলে দেয় এক তরুণী। আকাশে চাঁদ অথবা রাস্তায় ছিল না আলো। বিহঙ্গমার কুটিরের খোলা দরজা দিয়ে এক চিলতে আলোর রেখা এসে পড়ে তরুণীর মুখমণ্ডলের বাদিকে। বাণের সম্পূর্ণ অপরিচিত মুখ।

কক্ষে প্রবেশ করে দেখেন শুয়ে আছে বিহঙ্গমা। তাঁর পিছনে পিছনে প্রবেশ করে এই তরুণী। বাণ, কানের কাছে তাঁর ঠোঁট রেখে মৃদু কণ্ঠে নাম ধরে ডাকেন বিহঙ্গমাকে। তরুণী অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে।

চমকে উঠে বাণের দিকে চেয়ে থাকেন। বাণের মুখে হাসি। ঘুমের ঘোর কেটে গেলে বাণের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকেন বিহঙ্গমা। তরুণী কক্ষ থেকে বের হয়ে যায় মৃদুমন্দ পদক্ষেপে।

গলতে থাকে দুজনের জমাট কথার স্তুপ। কথা, অনেক কথা।

বিহঙ্গমা বলেন, তরুণীর নাম উপ্পলা। বছর দুই আগে রাষ্ট্রের গণিকা বিভাগ থেকে ক্রয় করছেন। ক্রয় করতে আট হাজার মুক্তিপণ জমা দিতে হয়েছে রাজকোষে। এখন বিহঙ্গমা তার আপন তহবিল থেকে উপ্পলাকে মাসোহারা প্রদান করেন এক হাজার পণ।

ইতিপূর্বেই বিহঙ্গমা বাণের সাথে পরামর্শ করে রাজনটীর পদ ত্যাগ করে মুক্ত হয়েছেন রাজবন্ধন থেকে। নিজের মুক্তির জন্য তিনি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ধারা অনুসারে রাজকোষে জমা দিয়েছেন চব্বিশ হাজার পণ।

রাজনটী পদ থেকে মুক্ত হবার সময় কালে বিহঙ্গমা রাষ্ট্রের মুখ্যরাজনটী পদে ছিলেন অধিষ্ঠিত। মাসোহারা ছিল তিন হাজার পণ এই সাথে ব্যক্তি গত আয়ের পরিমাণ ছিল সুবিপুল। বাণ এই সাথে বিহঙ্গমার কথার নেই বিরতি। এমনি করে সমাপ্ত হয় প্রথম প্রহর। উপ্পলা ধীর পদবিক্ষেপে কক্ষে প্রবেশ করে মেঝের উপর পেতে দেয় সূক্ষ্ম সূচিশিল্পের কারুকার্যমণ্ডিত একটি

আসন। আসনের সম্মুখে স্থাপন করে কাঠের ছোটো ত্রিপদী।

উপ্পলার দিকে দুজনের দৃষ্টি। সদ্যস্নাতা সিক্তচুল, শ্বেত ক্ষৌমবস্ত্র পরিহিতা। কপালে শ্বেতচন্দন পঙ্ক তিলক।

কক্ষ থেকে বের হয়ে পুনর্বার প্রবেশ করে। হাতে দুটি শ্বেতপ্রস্তরের থালা। একটিতে শ্বেত পুষ্পরাশি অন্যটিতে ফলমূল সহ দুগ্ধজাত খাদ্যের নৈবেদ্য। কাঠের ত্রিপদীর উপর নৈবেদ্য স্থাপন করে।

বিহঙ্গমার শয্যায় বসে বাণ গল্প করছিলেন। বিহঙ্গমা বাণের দক্ষিণ হস্তধরে তাঁকে এনে বসিয়ে দেন সূচীশিল্প মণ্ডিত আসনে। উপবিষ্ট বাণের চরণে শ্বেতপুষ্পের অর্ঘ্য অর্পণ করে উপ্পলা। পূজা নিবেদন করে। প্রণত হয় বাণের চরণে।

বাণে সাথে বিহঙ্গমাও নিস্তব্ধ। বাণ অনুভব করছিলেন উপ্পলা যেন প্রণাম করছে তার ইষ্টদেবতাকে। বাণ মুদ্রিত নয়নে উপ্পলার প্রণাম নিবেদন করেন তাঁর আরাধ্য দেবাদিদেব মহেশ্বরের চরণে।

ভাবাবেগে আপ্লুত বাণ এবং বিহঙ্গমা। বিহঙ্গমা, বাণের সম্মুখে উপ্পলার মতো উপবিষ্ট। উপ্পলার মতো বিহঙ্গমার হাত অঞ্জলিবদ্ধ।

বাণ, নিস্তব্ধ পরিবেশে স্থাণুর মত গ্রহণ করেন দেবাদিদেব মহেশ্বরের প্রসাদ।

বাণের ভাবনায় নেমে আসে বিহঙ্গমা। অনেক অনেক আগে বিহঙ্গমা বলেছিল, যদি তার গর্ভে সন্তান জন্ম নেয় তা সেই সন্তানের পরিচয় হবে মাতৃপরিচয়ে। পিতৃপরিচয়ে নয়। বিহঙ্গমার গর্ভে জন্ম নেয়নি কোন সন্তান। বাণের চিন্তায় দেখা দেয় নানা ভাবনা তবে কি আপত্য স্নেহ টেনে এনেছে উপ্পলাকে? অথবা বয়সকালের সঙ্গী? বিহঙ্গমার যৌবন বিগত। বয়স প্রায় সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ। বিহঙ্গমা বাণের দুতিন বছরের ছোটো।

মধ্যরাতে আবার আরম্ভ হয় কথা। উপ্পলাকে নিয়ে মার্জিতা এবং বুদ্ধিমতী। বিহঙ্গমা মুক্তিপণ কথা। উপ্পলা ছিটকে পড়া ব্রাহ্মণকন্যা। উপ্পলা শিক্ষিতা দিয়ে ক্রয় করেছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বিধাননুসারে রাজকোষে জমা দিতে হয়েছে উপ্পলার সেই সময়ের আট মাসের মাসোহারার সমপরিমাণ আটহাজার পণ।

বিহঙ্গমা বলেন, উপ্পলাকে এনেছেন মূলত তিনটি কারণে। প্রথমটি ভালো লাগা দ্বিতীয়টি অবলম্বন এবং তৃতীয় কারণ হচ্ছে বিশেষ একটি উদ্দেশ্য।

বাণ বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে বিহঙ্গমার ইতস্তত ভাব। শেষ পর্যন্ত বলেন, বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে বল্‌গা লাগিয়ে অরুণাশ্বকে বেঁধে রাখা। বিহঙ্গমা লক্ষ্য করেছেন উপ্পলার প্রতি অরুণাশ্বের গভীর দুর্বলতা। অরুণাশ্ব বিহঙ্গমার আকাঙ্ক্ষা পূরণের এক ব্রহ্মাস্ত্র।

বাণের মনে পড়ে বিহঙ্গমার কথা অরুণাশ্ব উর্বর ভূমি। সহজে বিষবৃক্ষে ফলবে বিষফল।

সারারাত চলে গল্প। এমনি করে রাত্রির যাত্রা চলে গভীর থেকে গভীরতম স্তরে।

হঠাৎ নির্দয় সূর্যের রক্ত চক্ষুর খবর ঘোষণা করে কোকিল। বাণ দ্রুত তাঁর রাজকীয় বাড়ীতে গিয়ে সমাপ্ত করেন স্নানাহ্নিক এবং ভোজন।

* * *

প্রভাতী জলযোগ শেষ করতে না করতেই বাণের বাড়ীতে মন্ত্রী অরুণাশ্বের আবির্ভাব। অরুণাশ্বের সাথে সৈন্য-সামন্ত। অরুণাশ্ব বলেন, মহারাজ হর্ষদেব ব্যর্থ আক্রমণ করেছিলেন সম্রাট দ্বিতীয় পুলকেশীকে। তবে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হয়নি হর্ষদেবের।

বাণের জিজ্ঞাসার উত্তরে অরুণাশ্ব পুলকেশী সম্পর্কে বলেন, প্রায় বছর আশি পূর্বে প্রথম পুলকেশী স্থাপন করেন চালুক্য সাম্রাজ্য। প্রথম পুলকেশীর ছিল তিন পুত্র। প্রথম পুত্র তাঁর জীবনকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। অন্য দুই পুত্র যথাক্রমে কীর্তিবর্মা এবং মঙ্গলেশ।

কীর্তিবর্মা প্রথমে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কীর্তিবর্মার অকালে মৃত্যু হলে রাজপদে অভিষিক্ত হন তৃতীয় কুমার মঙ্গলেশ। মঙ্গলেশ রাজা হয়ে সচেষ্ট হলেন তার আপন পুত্রকে সিংহাসনের পরবর্তী অধিকারী রূপে প্রতিষ্ঠার। কীর্তিবর্মার পুত্র, তাঁর খুল্লতাত মঙ্গলেশের প্রচেষ্টা দেখে হলেন সঙ্কিত। কীর্তিবর্মার এই পুত্রের নামই দ্বিতীয় পুলকেশী। দ্বিতীয় পুলকেশী ক্ষমতা দখল করেন। বাণের সাথে কথা বলে বলে ক্রমশ সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন অরুণাশ্ব। তিনি যুদ্ধ বিশ্লেষণে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করে বলেন হর্ষদেব অপ্রস্তুত অবস্থায় নিতান্ত ব্যক্তিগত আবেগের বশবর্তী হয়ে করেছিলেন আক্রমণ।

বাণের জিজ্ঞাসাপূর্ণ দৃষ্টি লক্ষ করে অরুণাশ্ব বলেন, হর্ষদেব বছর কয়েক পূর্বে পুলকেশীর সাম্রাজ্য সীমান্তবর্তী স্বাধীন কাটিয়াবার রাজ্য দখল করেন। কাটিয়াবারের স্বাধীন নৃপতি ধ্রুবসেন পরাজিত হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন প্রতিবেশী গুর্জর রাজ্যে। গুর্জরের নৃপতি দদ্দ ছিলেন পুলকেশীর সামন্তনৃপতি।

ক্রুদ্ধ হর্ষদেব, গুর্জর অধিকার করে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন কাটিয়াবারের পরাজিত নৃপতি ধ্রুব সেনকে। ধ্রুবসেন পরিগণিত হন সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সামন্ত নৃপতিরূপে।

হর্ষবর্দ্ধন পুলকেশীর সামন্ত রাজ্য অধিকার করায় পুলকেশী এবং হর্ষদেবের পরস্পরের শত্রুতা ভীষণাকার ধারণ করে। হর্ষদেব, পুলকেশীর সাম্রাজ্য সংলগ্ন গুর্জরের উপর আপনার আধিপত্য রক্ষার জন্য ধ্রুবসেনের সাথে তাঁর আপন কন্যার বিবাহ প্রদান করেন।

বাণ গভীরভাবে মনযোগ দিয়ে শুনছিলেন অরুণাশ্বের কথা। অরুণাশ্ব রসিকতা করে বলেন, হর্ষদেব এমনি করে সামন্ত নৃপতি ধ্রুবসেনের হয়ে উঠলেন শ্বশুর মশাই। জামাই বাবাজিকে তাঁর ক্ষমতা এবং বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য অপরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করলেন পুলকেশীকে এবং পরিণতি পরাজয়।

বাণ লক্ষ করছিলেন, অরুণাশ্বের বক্তব্য এবং প্রকাশের ভাষা। অরুণাংশের ভাষার মধ্যে

প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল হর্ষদেব সম্পর্কে তাঁর অশ্রদ্ধার সুর। বাণের মনে হল বিহঙ্গমার কথা। সত্যি অরুণাশ্ব উর্বর ভূমি। সহজেই বিষফল উৎপন্ন হবে।

বাণ অতিসাবধানে উত্তর দিচ্ছেন অরুণাশ্বের কথাবার্তার। অরুণাশ্ব বলেন, হর্ষদেব জামাতার রাজ্যে আছেন কুশল মঙ্গলে। কিছুকাল বিশ্রাম গ্রহণ করে ফিরবেন স্থানীশ্বরে। স্থান্বীশ্বরে প্রত্যাবর্তনের সময় তিথি এখনো নির্দ্ধারিত হয়নি।

বাণ উত্থাপন করেন বিহঙ্গমার কথা। অরুণাশ্ব বলেন, বিহঙ্গমার কন্যা উৎপলা চমৎকার একটি মেয়ে। মার্জিতা শিক্ষিতা সুন্দরী এই সাথে অতি সুমধুর তার কণ্ঠস্বর এবং সঙ্গীত।

* * *

ক্রমে কান্যকুব্জের কোলাহল হয় শান্ত। অরুণাশ্ব কঠোর হস্তে স্থাপন করেছেন শৃঙ্খলা। দোকান পাটে বেচাকেনা মঠে মন্দিরে আচার অনুষ্ঠান হয়ে উঠে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

বাণের হাতে নেই কোনও কাজকর্ম বিহঙ্গমা ভিন্ন আড্ডা দিবার নেই অন্যকোন সঙ্গী সাথী।

বাণের এমনি অলস দিনের মালায় হঠাৎ ছিটকে এল একটি ঝকমকে মুহূর্ত। স্থান্বীশ্বর থেকে হর্ষদেব লিখেছেন তিনি বাণের প্রতীক্ষায় দিন গুনছেন।

বাণ যখন স্থান্বীশ্বরে পৌছালেন তখন পঞ্জিকার হিসাবে বর্ষাকাল। স্থান্বীশ্বরে ছিল না বৃষ্টির নামগন্ধ। মাঝে মাঝে শুধু দমকা হাওয়ায় বালির ঘূর্ণিঝড়।

হর্ষদেবের নির্দেশ মতো বাণ প্রবেশ করলেন রাজপ্রাসাদের সেই কক্ষে। হর্ষদেবের একান্ত আপন কক্ষের এলোমেলো অবস্থা দেখে বাণ বিস্মিত। বেত্রাসন বীণা এই সাথে গ্রন্থগুলির উপর ধূলির গেরুয়া প্রলেপ।

বাণের মনোভাব আঁচ করে হর্ষদেব বলেন, বাণের আগমন সংবাদ পেয়ে এই মাত্র উন্মোচিত হয়েছে কক্ষ। হর্ষদেবের এই একান্ত প্রিয়কক্ষে অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

হর্ষদেব স্বয়ং তার উত্তরীয় দিয়ে গ্রন্থ বীণা এবং আসনগুলির ধূলির স্তর অপসারিত করেন।

বাণ লক্ষ করেন হর্ষদেবের অস্বাভাবিক পরিবর্তন। হর্ষদেবের কথাবার্তায় প্রকাশ পায় শান্ত তৃপ্ত এবং নিরাসক্ত মনোভাব। বাণ বিশেষ ভাবে লক্ষ করেন পুলকেশীর সাথে সংগ্রামে পরাজিত হয়ে ও হীনমন্যতা বা লজ্জার কোন ছায়া ছিল না হর্ষদেবের মুখমণ্ডলে অথবা কথাবার্তায়। তিনি মহারথের অধিবাসীদের চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রশংসা করে বলেন মহারথীগণ বীর আদর্শবাদী এবং ধার্মিক।

হর্ষদেব বলেন, পুলকেশী অনুধাবন করেছেন তিনি দৈবাৎ জয়ী হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, হর্ষদেবের মুখমণ্ডলে বিগলিত হয় আত্মগৌরবের ক্ষীণ আভা। পুলকেশী যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে স্বয়ং গ্রহণ করেছেন পরমেশ্বর উপাধি। পরমেশ্বর উপাধি নিয়ে ও সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যের কোনও অংশে আক্রমণের দুঃসাহস করেননি। পুলকেশীর সাম্রাজ্যের উত্তর পশ্চিমে

হর্ষদেবের সাম্রাজ্য। পুলকেশী বর্তমানকালে রাজ্য বিস্তার করছেন আপন সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে।

আলোচনার সমাপ্তিতে হর্ষদেব বাণের মঙ্গলকামনা করেন। বাণ মঙ্গল কামনার ভাষায় চমকিত হলেন। হর্ষদেব বলেছেন "আপনার উপর বর্ষিত হোক ভগবান বজ্রপাণির করুণা।" বাণের চমকিত হবার কারণ হর্ষদেব ইতিপর্বে প্রকাশ্যভাবে মহাযানপন্থী বুদ্ধদেবের বজ্রপাণি নাম উচ্চারণ করেননি।

* * *

স্থান্বীশ্বরে এবার বর্ষাঋতুকালে নেই তেমন বৃষ্টি। দুচার ফোঁটা বৃষ্টির জল বিশুদ্ধ বালি শুষে নেয়। কড়া রোদ। ভীষণ গরম।

বাণের সরস্বতী নদীতীরের বাড়ীতে হাজির হলেন বাণের দুই জোড়া প্রাচীন বান্ধব। মধুকর পারাবত সোমিল গ্রহাদিত্য। ওরা দুবার গিয়েছিল চীনদেশের মহাসঙ্গীত সম্মেলনে। পুরোনো আড্ডার সদস্যগণকে পেয়ে বাণ উচ্ছ্বসিত। অনেক গল্প অনেক কাহিনির উথাল-পাথাল প্রবাহ।

বান্ধবগণ চীনদেশের মহাসঙ্গীত সম্মেলনের প্রসঙ্গে চীনা সম্রাটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সম্রাট 'তাং' এর শিল্প সঙ্গীতপ্রীতির বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত।

বাণের মনে পড়ে রাজকুমার 'তাং' এর কথা। হর্ষদেবের দ্বিতীয় রাজধানী কান্যকুব্জের উদ্বোধনের মহোৎসবের পর, হর্ষদেবের নিকট কুমার 'তাং' এর পত্র এসেছিল। পত্রে লিখেছিলেন, তার বৃদ্ধপিতা সম্রাট 'সুই' এর আকাঙ্ক্ষার কথা। হর্ষদেব, চীন সম্রাট 'সুই' এর আকাঙ্ক্ষানুসারে, তাঁর সাম্রাজ্য থেকে একটি সঙ্গীত নৃত্য যন্ত্র শিল্পী গোষ্ঠীকে পাঠিয়েছিলেন চীনদেশের মহাসঙ্গীত সম্মিলনীতে যোগদানের জন্য। এই শিল্পীগোষ্ঠীতে সংযুক্ত হয়েছিল বাণের এই চারজন শিল্পী।

বাণ, বৃদ্ধ চীন সম্রাট 'সুং' এর কথা জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে ওরা বলে, তাদের মন্দভাগ্য। তাদের চীনদেশে পৌঁছার পুর্বেই বৃদ্ধ সম্রাট 'সুং' চলে গিয়েছিলেন সুরলোকে।

সোমিল বলে, চীনদেশের একটি আধুনিক জনপ্রিয় গান অনুবাদ করে নতুন সুর দিয়েছে। গ্রহাদিত্য বলে, নতুন দেওয়া সুরে মিশ্রিত হয়েছে ভারতীয় এবং চৈনিক রাগিণী। মধুকর এবং পারবত এই প্রসঙ্গে বলে নতুন সুর তাদের বাঁশিতে উঠেছে চমৎকার রূপে।

চৈনিক গানের কথা শুনে বাণের তর সয়না। এখনি শোনাতে হবে। শুরু হয় গান এই সাথে বাঁশি। গান শুনে বাণ মুগ্ধ। বন্ধুদের কাছে বাণের আবদার এই গান প্রীতিকূট বিদ্যাশ্রমের শিক্ষার্থীগণকে শেখাতে হবে।

বাণের উচ্ছ্বাস প্রত্যক্ষ করে চারজন মুগ্ধ। এক এক করে বাণের চারজন শিল্পীবান্ধব বলেন, প্রীতিকূটের শিক্ষার্থীগণকে এই সঙ্গীত অবশ্যই শিক্ষা দিবেন। এই সাথে আদ্য রাজা ভাস্কর বর্মনের সাম্রাজ্যের সর্বদিকে প্রসারিত করবেন এই চৈনিক সঙ্গীত।

দিন কয়েকের মধ্যে বাণের চার বান্ধব চন্দ্রপুরের পথে যাত্রা করেন।

বান্ধবরা হঠাৎ এসে বিদ্যুৎচমকের মত এক ঝলক আনন্দের ছটা ছিটিয়ে গেল চলে। আবার নিঃসঙ্গতার স্তব্ধতা জড়িয়ে ধরে বাণকে।

স্থান্বীশ্বরের পথে ঘাটে সকাল সন্ধ্যা দুপুরে বাণের নিঃসঙ্গ পরিক্রমা। এক দুপুরে প্রচণ্ড রোদ। সারা শরীর বেয়ে ঘাম গলছে। উত্তরীয় দিয়ে ঘন ঘন মুছে চলছেন মুখমণ্ডল। মুখে কপালে ভীষণ জ্বালা।

বাড়ীতে এসে দর্পণে দেখেন অবিরাম ঘর্ষণে কপালের একটি ক্ষুদ্র অংশের ত্বক ছড়ে গেছে। ত্বক ছড়া অংশ সাদা। সাদা অংশে ভীষণ জ্বালা।

শেষপর্যন্ত শ্রাবণ তার বর্ষা চরিত্রের সুনাম রক্ষা করল। বৃষ্টি নামল। ভীষণ গ্রীষ্ম মুখ ঢাকল মেঘের আড়ালে। বিহ্মার বাড়ীতে শুরু হল তার গমনাগমন।

ভাদ্রের প্রথমে, রাজদূত রাজসভার অধিবেশনের খবর নিয়ে হাজির হল।

* * *

সভাপণ্ডিতের রাজকীয় পোশাক পরিচ্ছদ এবং রথে বাণ পৌঁছালেন রাজসভায়। উপবেশন করলেন নির্দ্ধারিত আসনে। তাঁর পাশে সভাপণ্ডিত মাতঙ্গ দিবাকর এবং ময়ূর।

বাণ লক্ষ করেন পণ্ডিত ময়ূর বসে আছেন অবনত মস্তকে। এই গরমেও তার গলা পর্যন্ত উত্তরীয় দিয়ে পেঁচানো। বাণের দৃষ্টি পর্যবেক্ষণ করে পণ্ডিত ময়ূরের মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডলে ছেয়ে আছে শ্বেত কুষ্ঠ।

চমকে উঠে বাণ তার ডানহাত স্থাপন করেন কপালে। রাজসভায় যাত্রাকালে দর্পণে এই মাত্র দেখেছেন, কপালে রয়ে গেছে সেই শ্বেতবিন্দু। তবে কি তাঁর ও ললাটে লিখিত হয়ে গেছে শ্বেত কুষ্ঠ? বাণের দুর্ভাবনা এগিয়ে যাবার পথ রুদ্ধ করে প্রবেশ করেন হর্ষদেব। যথাবিধি শুরু হয় রাজ্যসভার ক্রিয়াকর্ম।

হর্ষদেব সভাসদগণের উদ্দেশে আবেগমণ্ডিত কণ্ঠে বলেন "আজ এই পুণ্যলগ্নে রাজসভার সম্মানিত সদস্যগণের সম্মুখে উত্থাপন করব পরম পবিত্র একটি বিষয়। আমার আশা ভগবান বজ্রপাণির করুণায় অবশ্যই পূর্ণ হবে আমার এই আকাঙ্ক্ষা।"

"ভগবান বজ্রপাণি" শুনে বাণের মত চমকিত হলেন সভাসদগণ। হর্ষদেব এই প্রথম প্রকাশ্য রাজসভায় উচ্চারণ করলেন মহাযানপন্থী বুদ্ধদেবের 'বজ্রপাণি' নাম।

হর্ষদেব ঘোষণা করেন আগামী বৈশাখী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হবে মহামোক্ষ পরিষদের সম্মেলন। এই মহা-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হবে প্রয়াগের গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গমের পবিত্রভূমিতে।

মহাযানপন্থীদের মহামোক্ষ পরিষদের এই সম্মেলনে সুবৃহৎ একটি দানমেলার আয়োজন

করা হবে বলে হর্ষদেব ঘোষণা করেন। প্রসঙ্গত বলেন, দানমেলা উৎসব তাঁদের পুষ্পভূতি বংশের সুপ্রাচীন উৎসব। ইতিপূর্বে তাঁদের পূর্বসূরী সম্রাটগণ সম্পাদন করেছেন তিন তিনটি দানযজ্ঞ। তিনি তাদের রাজবংশের প্রাচীন আদর্শানুসারে আয়োজন করেছেন এই দানযজ্ঞ। তবে ইতিপূর্বে তাদের বংশে অনুষ্ঠিত দানযজ্ঞের তুলনায় পরিকল্পিত প্রয়াগের দানমেলা সুবৃহৎ আকৃতি ধারণ করবে বলে তাঁর বিশ্বাস।

রাজসভা নিস্তব্ধ। সামান্য বিরতির পর হর্ষদেব বলেন, তিনি বিশেষ চিন্তাভাবনা করে মহামোক্ষ পরিষদের সম্মেলনী উৎসব তথা দানমেলার একটি রূপরেখা প্রস্তুত করেছেন।

হর্ষদেব তার স্বহস্তে লিখিত একটি পত্র বের করে উৎসবের রূপরেখার পরিচয় প্রসঙ্গে পাঠ করেন — উৎসবের প্রথম দিনে ভগবান বজ্রপাণির প্রতিকৃতিসহ পরিক্রমা করা হবে নগরী। দ্বিতীয় দিনে আদিত্যদেব এবং তৃতীয় দিনে ঈশ্বর অর্থাৎ দেবাদিদেব মহেশ্বরের প্রতিকৃতিসহ অনুষ্ঠিত হবে শোভাযাত্রা।

হর্ষদেব আগামী উৎসবের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা পাঠ শেষে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেন সভাসদগণের প্রতিক্রিয়া। প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করে তাঁর মুখমণ্ডলে দেখা দেয় স্মিত প্রশান্ত আভা। এরপর পাঠ করেন রূপরেখার পরবর্তী অংশ।

প্রতিদিন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী শ্রমণ ব্রাহ্মণ সাধুসন্ত এবং অন্যান্য ধর্মের ধার্মিকগণ সহ অনাথ আতুর দরিদ্র নরনারীগণকে রাজকোষ থেকে অর্থ বস্ত্র খাদ্য দান করা হবে মুক্ত হস্তে।

দানমেলা দুই মাস কাল ব্যাপী অবিচ্ছিন্নভাবে হবে অনুষ্ঠিত। প্রতি পাঁচ বছরে এক এক বার করে অনুষ্ঠিত হবে মহামোক্ষ সম্মেলন এবং সম্মিলনের সাথে দানমেলা।

হর্ষদেবের রূপরেখা পাঠ শেষ হবার পূর্বেই রাজসভা উল্লাসে ফেটে পড়ে। বাণ লক্ষ করেন রাজসভার আনন্দ উল্লাসের। দিকে নিস্তব্ধভাবে তাকিয়ে আছেন হর্ষদেব। তার চোখ বেয়ে নামছে অশ্রুবিন্দু।

* * *

বাণ চিন্তা করে দেখলেন এখন শ্রাবণ মাস। মহামোক্ষ সম্মেলনীর আর মাত্র বাকী আটমাস সময়। হর্ষদেব ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই কান্যকুব্জে গিয়ে উৎসবের রূপরেখা বাস্তবায়নের কাজে ব্যস্ত হবেন। কান্যকুব্জে গিয়ে উৎসবের প্রস্তুতিকরণ সহজ এবং স্বাভাবিক। কারণ প্রয়াগ তীর্থ কান্যকুব্জের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী।

বাণের মনে হয় প্রস্তুতিপর্বের সময় কালে কান্যকুব্জের রাজসভায় দুএকটি অধিবেশনের সম্ভাবনা আছে।

বাণের অনুমান দেখা দেয় সত্য হয়ে। হর্ষদেব তাঁর সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে বাণকে অনতিবিলম্বে কান্যকুব্জে হাজির হবার নির্দেশ প্রদান করেন।

সন্ধ্যায় বিহঙ্গমাকে এই সংবাদ দিতে গিয়ে দেখেন বিহঙ্গমা এবং উপ্পলা দারুণ ব্যস্ত। জিনিসপত্র তোরঙ্গে রাখছে গুছিয়ে। হর্ষদেব রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তিবর্গের নামের তালিকায় সংযুক্ত করেছেন বিহঙ্গমার নাম। উৎসবের প্রস্তুতিপর্বে যোগদানের জন্য হর্ষদেব আমন্ত্রণ করেছেন, কান্যকুব্জে।

বিহঙ্গমার প্রতি হর্ষদেবের শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব প্রত্যক্ষ করে বাণ আহ্লাদিত। বাণ তাকে আলিঙ্গনে বন্দী করে রাজসম্মানের গৌরব লাভের জন্য অভিনন্দিত করেন। আলিঙ্গনে আবদ্ধ বাণ এবং বিহঙ্গমাকে দেখে উপ্পলা ধীর পদক্ষেপে কক্ষ থেকে বের হয়ে যায়।

উপ্পলা কক্ষ থেকে নির্গত হলে বিহঙ্গমার মুখমণ্ডলে তির্যক হাসির রেখা উঠে ঝলসে। সে তির্যক হাসির শানিত ছুরি মিশিয়ে বাণের কানে কানে বলে — "বিহঙ্গমার বিন্দুমাত্র মূল্য নেই হর্ষের কাছে। হর্ষ জানেন, বাণভট্ট এবং অরুণাশ্বের টিকি বাঁধা আছে বিহঙ্গমার নাভিমণ্ডলে। বিহঙ্গমার সাথে গ্রথিত উপ্পলা। দুই নারী তৃপ্ত করবে দুইটি পুরুষকে। এমনিভাবে সুসম্পন্ন হবে হর্ষের বাসনা।"

আশ্বিনের মাঝামাঝি বাণ পৌঁছালেন হর্ষদেবের দ্বিতীয় রাজধানী কান্যকুব্জ নগরে। হর্ষদেব নিদারুণ ব্যস্ত। রাজসভার অধিবেশনের নাম গন্ধ নেই।

এক সন্ধ্যায় বিহঙ্গমার বাড়িতে পৌঁছালে বিহঙ্গমা চমকে ওঠেন। বাণের কপাল সাদা হয়ে গেছে। ইতিপূর্বে সে বাণের শ্বেতচিহ্ন দেখে ভেবে ছিল শ্বেতচন্দন পঙ্কে ললাট চর্চিত।

বাণ বলেন, মহামোক্ষ উৎসবকাল পর্যন্ত তাকে থাকতেই হবে কান্যকুব্জে। উৎসবের পর উজ্জ্বল আলোকে পরিপূর্ণ মঞ্চ থেকে হবে তার চিরপ্রস্থান। জীবনের শেষ দিনগুলি তার কাটবে চন্দ্রপুরের কৃষ্ণ অরণ্যের মধ্যে পরিপূর্ণ নিঃসঙ্গভাবে।

বিহঙ্গমা, বাণকে আলিঙ্গনে বন্দী করে বলেন — 'বাণ! তুমি কেন নিঃসঙ্গ হবে? আমি চিরদিন থাকব তোমার সাথে। তুমি আমার দেহের আত্মা। তুমি আমার আত্মার অনুভূতি।" দুজনের কপোল বেয়ে নামে অশ্রুরাশি।

বাণের শ্বেতকুষ্ঠে পূর্ণ ললাট চুম্বনে চুম্বনে পূর্ণ করে বিহঙ্গমা রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন 'আমার দেহ দিয়ে অবগুণ্ঠিত করে রাখব তোমার দেহ। আমার প্রতি অঙ্গ মিশে থাকবে তোমার প্রতি অঙ্গে। আমার আত্মার সাথে মিশিয়ে রাখব তোমার আত্মা। কোনও ব্যথা কোনও দুঃখ আমার দেহ আত্মা ভেদ না করে পৌঁছাতে পারবে না তোমার দেহে অথবা তোমার আত্মায়। বাণ! তোমাকে আমি আগলে রাখব কঠিন বন্ধনে। আমাকে অতিক্রম না করে মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না তোমার কাছে।" দুজনের কপোল বেয়ে অশ্রু ধারাবর্ষণ।

* * *

গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গমে পায়ে পায়ে নেমে এল বৈশাখী পূর্ণিমা। মহামোক্ষ সম্মিলনে এলেন রাজা মহারাজা। যোগ দিলেন বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ জৈন তন্ত্রোচারে সমর্পিত প্রাণ-মহাত্মাগণ। একতারা নিয়ে এলেন পর্যটক মস্করীবৃন্দ। বণিকগণ এসে খুললেন অজস্র বিপণি।

আচলে কাজল আর সৌধ্ররেণু বেঁধে এল গণিকাসংঘ। ভালো মানুষের সাজে সেজে এল গাঁট কাটার দল। এল অন্ধ বধির খঞ্জ এবং কুষ্ঠরোগে বিগলিত অঙ্গধারী শত সহস্র জনসংঘ। বিশেষ উল্লেখ্য এই সকল সর্বশ্রেণীর নরগোষ্ঠীর ভিতর মাছির মত মিশে রইল রাজকীয় গুপ্তচর বাহিনী।

উৎসবে কামরূপের সম্রাট ভাস্কর বর্মন ছিলেন হর্ষদেবের সম্মানিত মিত্র নৃপতি। এই সাথে হর্ষের সাম্রাজ্যের নানা দিক থেকে উপস্থিত হয়েছিলেন বহু সামন্ত নৃপতি। হর্ষদেবের জামাতা সামন্ত নৃপতি ধ্রুবসেন সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত। ধ্রুবসেন হর্ষদেবের সর্বক্ষণের সঙ্গী।

নিঃসঙ্গভাবে বাণ প্রত্যক্ষ করেন, দুমাসব্যাপী উৎসব। হর্ষদেব রাজকোষ শূন্য করে সমাপ্ত করলেন উৎসব।

উৎসব শেষে সর্বশ্রেণীর মানুষের মুখে একই সুরে একই কথা হর্ষদেব, তাঁর অঙ্গের অলঙ্কার বস্ত্রাদি সবকিছু দান করে — "ভগিনী রাজ্যশ্রীর নিকট হইতে একখানি পুরাতন বস্ত্র চাহিয়া পরিধান করিয়াছেন।"

* * *

শ্রাবণের মাঝামাঝি বাণ রাজকীয় নৌবহরে যাত্রা করেন প্রীতিকূটের পথে। প্রয়াগের নৌঘাট থেকে মধ্যরাতে যাত্রা শুরু হয়েছে সঙ্গোপনে। গোপনীয়তার কারণ বিহঙ্গমা। বাণের আশংকা বিহঙ্গমা যদি চড়ে বসে নৌকায়। যদি আঁকড়ে ধরে থাকে বাণকে?

শ্রাবণের জলধারায় গঙ্গা যৌবনবতী। নৌবহর স্বাভাবিক ভাবে এগিয়ে চলে দ্রুত বেগে। তাড়া নেই ঘরে ফেরার। ঘাটে ঘাটে থেমে থেমে নৌকা স্রোতের টানে ভেসে চলে। পথে বর্ষা বিদায় নিয়ে শরৎ এল। পথে কেটে গেল শারদীয়া দুর্গোৎসবের তিথি।

এমনি করে রাজকীয় নৌবহর এক শারদীয় প্রভাতে পৌঁছায় অযোধ্যার নৌঘাটে। নৌঘাটে অজস্র নৌকা। ঘাটে ভিড়ে নৌবহর। নৌবহরের পাশে প্রায় শতাধিক যাত্রী বোঝাই মস্ত এক বাণিজ্য নৌকা। নৌকায় নানা ধরনের যাত্রী। বাণের চোখে পড়ে যাত্রীদের ভিড়ে উজ্জ্বল কাষায় বস্ত্রধারী এক সন্ন্যাসী। বাণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করে সন্ন্যাসীকে। চৈনিক আকৃতির দিব্যকান্ত সন্যাসী। সুস্থ সুপুষ্ট স্বর্ণাভ দেহধারী সন্যাসীর মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় প্রশান্তি।

অল্পক্ষণের মাঝে বিশাল বাণিজ্যনৌকা শতাধিক যাত্রী নিয়ে নোঙর তুলে। বাণিজ্যনৌকা স্রোতের টানে এগিয়ে চলে 'হয়মুখের' রাজধানীর পথে।

বাণের রাজকীয় নৌবহর অযোধ্যার ঘাট থেকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলে হঠাৎ গঙ্গার বুকে নেমে আসে ঘূর্ণিঝড়। আকাশ ভরা ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি। কৃষ্ণমেঘে খরবিদ্যুৎ রেখা। গুরু গুরু মেঘ গর্জন। গঙ্গার জলে উথাল পাথাল ঢেউ।

মাঝিমাল্লা শক্ত কাছি দিয়ে তীরে বেঁধে রাখে নৌকা। কিছুক্ষণের মাঝে শরতের আকাশ উঠে ঝলমল করে। ঘূর্ণি ঝড়ের বিধ্বংসী চিহ্ন ছড়িয়ে থাকে আশেপাশে। মস্ত সব গাছগাছালি উপুড়

হয়ে পড়ে আছে গঙ্গার তীরে।

মধ্যদিনের প্রথম দিকে বাণের নৌবহর গঙ্গার স্রোতে সাঁতার কাটতে শুরু করে। নৌবহর গরবিনী রাজহংসীর মত স্রোতের টানে ভেসে চলে পূর্ব দিকে।

গঙ্গার একটি বাঁক পার হতে না হতেই বাণের এই সাথে মাঝিমাল্লার চোখে পড়ে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে নোঙর করে আছে সেই বাণিজ্যনৌকা। যে নৌকায় ছিল শতাধিক যাত্রী। যাত্রীগণ তীরে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে রাজকীয় নৌবহরকে ডাকছে।

বাণের চিন্তাধারা সহজ সমীকরণে সিদ্ধান্তে পৌছায় এ বিষয়টি অতি সাধারণ। খানিক আগের প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে নৌকা বিগড়ে গেছে।

ভীষণ কাণ্ডের কথা তীরে নেমে জানা গেল। বাণিজ্য নৌকা যেই না নদীর বাঁকে পৌঁছেছে তখনই ভীষণ কাণ্ডের শুরু। ডাকাতদলের ছয়টি হাল্কা ছিপ নৌকা ঘিরে ফেলে। হাতে নানা অস্ত্রপাতি। যাত্রীবোঝাই নৌকা নিয়ে এল তীরে। তীরে নিয়ে এসে নৌকার যাত্রীদের যথা সর্বস্ব নিল কেড়ে। ডাকাতদলে ছিল এক পুরোহিত। ডাকাত পুরোহিতের চোখ পড়ে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর উপর। ডাকাত পুরোহিত পরীক্ষা টরীক্ষা করে রায় দেয় এই সন্ন্যাসী উপযুক্ত বলি। সন্ন্যাসীর কোথাও কোনও খুঁত নেই। সর্বাঙ্গ সুন্দর বলি।

পুরোহিতের ইঙ্গিতে ডাকাতরা গঙ্গার জল দিয়ে বলি দেবার স্থান লেপে পুঁছে হাড়িকাঠ পোঁতে। যাত্রীগণ সেই হাড়িকাঠ দেখায়।

আতঙ্কিত হয়ে বাণ শুনছিলেন কাহিনি। জিজ্ঞাসা করেন সন্ন্যাসী তখন কী করেছিলেন? যাত্রীগণ সবাই একসাথে কথা বলতে চায়। ভীষণ সরগোল। বাণের রাজকীয় দেহরক্ষীপ্রধান এগিয়ে এসে সামাল দেয় পরিবেশ।

সর্দার গোছের একজন যাত্রী বলে, বলি দেবার কথাবার্তা শুনে বিন্দুমাত্র ভয় পাননি সন্ন্যাসী ঠাকুর।

বাণের প্রশ্ন ডাকাতরা কেন বৌদ্ধ সন্যাসীকে বলি দিতে গেল? উত্তরে সর্দারযাত্রী বলে, ডাকাতদল দুর্গাপূজার পর সেদিনই প্রথম ডাকাতি করতে বের হয়েছিল। ওরা ডাকাতির প্রথম দিনে নরবলি দিয়ে দুর্গাঠাকুরকে সন্তুষ্ট করে।

সর্দারযাত্রী একটু থেমে কণ্ঠস্বর নামিয়ে বলে, এসব অঞ্চলে দুর্গাপূজার পর ভীষণ 'টুগ্গা" ডাকাতরা ডাকাতি করতে বের হয়। কিন্তু শতাধিক যাত্রীবোঝাই বাণিজ্য নৌকাডাকাতির কথা কোন দিন শোনা যায়নি।

সর্দারযাত্রী এরপর সন্ন্যাসী প্রসঙ্গে বলে, ডাকাতরা সন্ন্যাসী ঠাকুরকে গঙ্গাজলে চুবিয়ে হাঁড়িকাঠের সামনে দাঁড় করায়। ডাকাত পুরোহিতের হাতে মস্ত এক সিঁদুরের টিপ দেওয়া খাড়া। সন্ন্যাসী মুখে চোখে ছিল না কোনও ভয়ের চিহ্ন। তিনি জোড়হাতে ডাকাত পুরোহিতকে বলেন,

তিনি ভাগ্যবান। তার এই নশ্বর দেহ দেবতা "তু কিয়ের" চরণে হবে অর্পিত। তার মানব জন্ম সার্থক।

বাণ, তাঁর চীনা ভাষা সমীকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে 'তু-কিয়ে' শব্দের অর্থ 'দুর্গা' বলে অনুমান করেন।

যাত্রী বলে, সন্ন্যাসী ঠাকুর বিনীতভাবে তাঁর নশ্বর দেহের ধ্বংসের পূর্বে মুহূর্তে খানিক সময় প্রার্থনা করেন। তার আকাঙ্ক্ষা, ইষ্টদেবতার কাছে প্রার্থনা করা। সন্ন্যাসীঠাকুর বলেন, তিনি সুদূর চীনদেশ থেকে ভগবান বুদ্ধের পবিত্র জন্মভূমিতে এসেছেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল, ভগবান বুদ্ধের করুণার বাণী চীনাভাষায় অনুবাদ করে চীনা ভক্তদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তার আকাঙ্ক্ষা এ জন্মে পূর্ণ হল না। তিনি ভগবান মৈত্রেয় দেবের কাছে প্রার্থনা করবেন, তার পরবর্তী জন্ম যেন হয় এই পুণ্যভারতভূমিতে। পরবর্তী জন্মে যেন পূর্ণ হয় আকাঙ্ক্ষা।

বাণ লক্ষ করলেন সর্দার যাত্রী সুন্দর ভাষায় গুছিয়ে কথা বলছে। বক্তাকে ঘিরে আছে যাত্রীদল সেই সাথে মাঝি মাল্লারা। সবাই নিশ্চুপভাবে কথা শুনছে।

সর্দার যাত্রী বলে, সন্যাসী ঠাকুর পদ্মাসন করে বসে আরম্ভ করলেন প্রার্থনা। তাঁর মুখমণ্ডলে ভেসে উঠে উজ্জ্বল আলো এবং আনন্দের আভা। অস্ফুট কণ্ঠে প্রার্থনা।

হঠাৎ শুরু হয় ভীষণ ঝড়। নীল আকাশ ছেয়ে গেল কালো মেঘে। মুহূর্তের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘূর্ণিঝড়। প্রচণ্ড তুফানে এক এক করে ভেসে যায় ডাকাতের ছয় ছয়টি ছিপ। উপড়ে পড়তে থাকে মস্ত মস্ত সব গাছ। ভীষণ বজ্রপাত। ডাকাতরা 'দুগ্গা দুগ্গা' বলে চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ে সন্ন্যাসী ঠাকুরের পায়ে। বলে তারা পাপ করেছে। তারা পাপী।

ঝড় ভীষণ হয়ে ওঠে। গঙ্গার বুকে উথাল পাথাল ঢেউ। যাত্রী বলে, সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডলে ছিল না কোনও ভয়ের ছায়া ক্রোধের চিহ্ন। তিনি ডাকাতদের ক্ষমা করে আদেশ দিলেন যাত্রীদের সব জিনিসপত্র ফিরিয়ে দিতে। ডাকাতরা ফিরিয়ে দিল। ধীরে ধীরে ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাত থেমে গেল।

ডাকাতরা এখন কোথায় জানতে চাইলে সর্দারযাত্রী বলে রাজপতাকা সহ নৌবহর দেখে ওরা পালিয়ে গেছে জঙ্গলে।

বাণের মনে পড়ে অযোধ্যা নৌঘাটে দেখা সন্ন্যাসীর কথা। তিনি সন্ন্যাসী কোথায় জিজ্ঞাসা করেন। যাত্রীদল খানিক দূরের একটি বটগাছ দেখিয়ে বলে, সন্ন্যাসী ঠাকুর সেখানে ধ্যান করছেন। তিনি যাত্রীদলের কাছে প্রার্থনা করে বলেছেন যাত্রীগণ যেন তাঁকে খানিক সময় ভিক্ষা প্রদান করেন। তিনি ভগবান মৈত্রেয়দেবের কাছে প্রার্থনা করবেন। সকল যাত্রীর প্রতি জোড়হাতে অনুরোধ করে বলেছেন তার প্রার্থনাকালে, কেউ যেন ব্যাঘাত সৃষ্টি না করেন।

বাণের দৃষ্টি যায় সেই বটগাছের দিকে। তার মনে হয় বৃক্ষমূলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মহাযজ্ঞ। যজ্ঞের নির্ধূম অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে আছে বটবৃক্ষ মূলে।

বাণ সন্ন্যাসীর নাম জানতে চাইলে বহু কণ্ঠে উচ্চারিত হয় হিউয়েন-সাং। হিউয়েন-সাং।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সাথে বাণের পরিচয় হল না। বাণিজ্য নৌকার যাত্রীদের তীরে রেখে বাণের নৌবহর গঙ্গার স্রোতে গা ভাসায়।

* * *

অগ্রহায়ণের এক দুপুরে, বাণের নৌকা পৌছাল। পালিতক ঘাটে অজস্র মানুষ। বাণের চোখে পড়ে ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন বাণী। বাণীর পাশে ভূষণ। ভূষণের দিকে বাণের দৃষ্টি পড়ে। ভূষণ পঁচিশ বছরে ঝকঝকে যুবক।

বাণকে স্বাগত করার জন্য বাণী ইতিপূর্বে কোন দিন পালিতক ঘাটে উপস্থিত থাকেননি। এবার উপস্থিত হবার বিশেষ কারণ পুত্র ভূষণের বিবাহ। স্বয়ং বাণী ভূষণের জন্য পছন্দ করে রেখেছেন কন্যা। সামনে পৌষমাস। পৌষে বিবাহ নিষিদ্ধ। এই অগ্রহায়ণ মাসে আছে আর মাত্র একটি বিয়ের দিন। বিয়ের শেষ তারিখটি আর দূরে নেই। বাণীর ইচ্ছা পালিতকঘাটেই বাণের সাথে বিয়ের কথা পাড়তে। না হলে বন্ধু-বান্ধবের সাথে আবার কোন জরুরি কাজে যাবেন জড়িয়ে। ভুলে যাবেন বিয়ের কথা।

বাণীর তর সয়না। দেরী হলে কন্যাটি যদি হাতছাড়া হয়ে যায়? এই সর্বাঙ্গসুন্দরী এবং গুণবতী প্রথম দেখেছিলেন কাদম্বরী দেবকুলিকায়। সেদিন দেবীমন্দিরে কৃষ্ণা চতুর্দশী পূজার দারুণ ভীড়। বাণী, দেবীর প্রসাদী ফুলের আকাঙ্ক্ষায় মন্দিরপ্রাঙ্গণে ভিড়ের মধ্যে খাচ্ছিলেন হাবুডুবু। তখন এই মেয়েটি এনে দিয়েছিল প্রসাদী ফুল। প্রসাদী ফুলের সাথে দেবীর প্রসাদ মস্ত একটি নারিকেলের নাড়ু।

মেয়েটি দুই হাতে আগলে বাণীকে সামলিয়ে বের করেছিল ভিড়ের মধ্য থেকে। ভিড় থেকে বের করে পৌছে দিয়েছিল কাদম্বরী ঘাটের নোঙর করা নৌকায়। কাদম্বরী নৌঘাটের আশেপাশে বহু শুঁড়ির দোকান। ঘাটের কাছে এখানে ওখানে ছিল অজস্র মাতাল। বাণী আশ্চর্য হয়ে দেখেছিলেন অধিকাংশ মদ্যপ ভূমিতে কপাল ছুঁইয়ে এই মেয়েটিকে প্রণাম করছে।

মুগ্ধ বাণী খোঁজ খবর দিয়ে জেনেছিলেন মেয়েটি কাদম্বরী দেবকুলিকার একজন জ্ঞানী পুরোহিতের কন্যা। বাণীদের পালটি ঘর।

বাণী তার জীবনে এই প্রথম মস্ত এক কাজে হাত দিলেন। কাজে হাত দিবার পূর্বে মনে ছিল দ্বিধা, ছিল দ্বন্দ্ব। এমনি সময় কালে হঠাৎ হৃদয়ে উপলব্ধি করেন মহাশক্তির অনুভূতি। কুক্কুট দেবী চণ্ডিকা স্বয়ং যেন তাকে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিচ্ছেন।

মহাশক্তি স্বরূপিনী বাণী আর অপেক্ষা করেন না তার স্বামী পুত্রের মতামতের। স্বয়ং স্থির করেন পুত্র ভূষণের বিবাহ।

বিবাহ সম্পন্ন হল এক সপ্তাহকালের মধ্যে। বিয়ের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন লোহিতাক্ষ।

ভূষণের বিবাহকালে বাণের ভাবসাব ছিল যেন বিয়ে তারই হচ্ছে। দারুণ সাজগোজে আড্ডা স্ফূর্তি। সাজগোজের সময় কালে শ্বেতচন্দন পঙ্কে তার সমগ্র ললাট চর্চিত করতে ভুল হয়নি।

বাণ তাঁর বান্ধব গোষ্ঠীতে নূতন আর এক মক্কেলের আমদানি করেন পুত্র ভূষণের বিবাহ উপলক্ষে। বান্ধব হলেন বাণের সদ্য রোজগার করা বেয়াই মশাই শ্রীযুক্ত ধনেশ্বর স্বামী। বেয়াই মশাই কাদম্বরী দেবকুলিকার পুরোহিত।

প্রসঙ্গত ধনেশ্বর স্বামী বলেন, ময়ূর শাল্মল অগ্রহার অঞ্চলে তার একজন কাকা বাস করতেন। কাকার নাম সাধারণ স্বামী।

এই নাম বাণের বিশেষ পরিচিত। তিনি ছিলেন ভাস্কর বর্মনের ময়ূর শাল্মল দানপত্রের পট্টকপতি। তাম্রপত্র সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব ছিল পট্টকপতি সাধারণ স্বামীর উপর।

বাণের মুখে পট্টকপতি সাধারণ স্বামীর নাম শুনে ধনেশ্বর স্বামী বলেন, প্রাচেতসে বাজসনেয়ী পট্টকপতি সাধারণ স্বামী তাঁর খুল্লতাত হলে বেশ ভালো হত। পট্টকপতি সাধারণ স্বামী ছিলেন মস্তভূমির অধিকারী। আস্ত দুই দুটি অংশের সম্পূর্ণ অধিকারী। খুল্লতাতের হাতে এত বিশাল পরিমাণের ভূমি থাকলে এখন তাকে আর মাতাল ঠেঙিয়ে দিন কাটাতে হত না।

ধনেশ্বর স্বামী হেসে হেসে বলেন, তার খুল্লতাত ছিলেন ভারদ্বাজো বাজসনেয়ী সাধারণ স্বামী। ভাস্কর বর্মনের দানপত্রে খুল্লতাতের নামে লেখা ছিল একটি অংশের মাত্র এক চতুর্থাংশ ভূমি।

বাণের মুখে দেখা দেয় প্রশান্ত হাসি। বলেন, ভারদ্বাজো বাজসনেয়ী সাধারণ স্বামী ছিলেন সকলের শ্রদ্ধেয় পুরুষ। তিনি মধ্যবয়সে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে চলে গিয়ে ছিলেন রামগিরি বৌদ্ধমঠে।

ইতিপূর্বে ধনেশ্বর স্বামীর বক্তব্য "মাতাল ঠেঙিয়ে দিন কাটানোর" এই সাথে শৌণ্ডিক পল্লীর মাতালগণ ধনেশ্বর স্বামীর কন্যাকে কেন ভূমিতে লুটিয়ে প্রণাম করেছিল এই কথা বাণ জিজ্ঞাসা করেন।

ধনেশ্বর স্বামীর সারা মুখে ভেসে উঠা হাসি দেখে বাণ অনুমান করেন বাণের জিজ্ঞাসার বিষয়টি তার বেয়াই মশায়ের প্রিয় কোনও বিষয়বস্তু। বেয়াই মশাই বলেন, বিষয়টি জলবৎ তরলং। কাদম্বরী এবং তার আশেপাশের মস্ত এলাকাজুড়ে একটি অলিখিত বিধান আছে। পরস্পরের ঝগড়াঝাটি মিটিয়ে ফেলতে হলে যেতে হবে কাদম্বরী ঘাটের শৌণ্ডিকপল্লীতে। সেখানে গিয়ে একে অন্যকে গিলাতে হবে হাঁড়ি হাঁড়ি সুরা। সুরা শেষ করে দুজন যাবে মন্দিরে। মন্দিরে গিয়ে কাদম্বরী দেবীকে সাক্ষী রেখে দুজনে প্রতিজ্ঞা করবে, আর ঝগড়াঝাটি নয়। এখন থেকে বন্ধুত্ব হবে দুজনের মধ্যে। আর কোনোদিন বন্ধুত্ব ভাঙা যাবে না।

মদ্যপদের এই প্রতিজ্ঞায় থাকতে হয় কাদম্বরীদেবীর একজন পুরোহিতকে। কাদম্বরী দেবকুলিকার এই পুরোহিত হলেন স্বয়ং ধনেশ্বর স্বামী।

ধনেশ্বর স্বামী বলেন, মাতালদের মধ্যে পরস্পরের বন্ধুত্ব পাকা হয়ে এলে ওরা মাঝে মাঝে মন্দিরে এসে দেবীকেও পুরোহিতকে জানায় প্রণাম। পুরোহিতের সাথে প্রণাম লাভ করেন পুরোহিতের গোটা পরিবার।

এমনিভাবে তার কন্যা নবমিত্র গোষ্ঠীর পরিচিত হয়ে ওঠে। যত্রতত্র ঘটা করে প্রণাম ঠুকে। বিশেষ করে শোণ্ডিকাগারের মধুপান করলে আর তো কথাই নেই।

মাতালদের অলিখিত বিধান শুনে বাণের মনে হয় তার কৈশোরের স্মৃতি। বন্দরপুরে দেখেছিলেন অভিজ্ঞান শকুন্তলম নাটক। নাট্যকাহিনির পঞ্চম দৃশ্যে ছিল জনৈক ধীবর মাছের পেটে আবিষ্কার করে রাজা দুষ্মন্তের আংটি। আংটি দেখে কোটয়াল ধীবরকে ধরে নিয়ে যায় রাজার কাছে। রাজা তার হারিয়ে যাওয়া অভিজ্ঞান ফিরে পেয়ে পুরস্কৃত করেন ধীবরকে।

দুষ্মন্তের বালক ছিল কোটোয়াল প্রধান। সে ধীবরকে বলে এই অর্থ দিয়ে পান করা যাক মদ্য। মদ্যপান করে শৌণ্ডিক পল্লীর দেবী কাদম্বরীকে সাক্ষী রেখে পরস্পরের বন্ধুত্ব করা হোক সুদৃঢ়।

ধনেশ্বর স্বামী বলেন তিনি পাঠ করেছেন শকুন্তলা গ্রন্থ। ধনেশ্বর স্বামী খানিক চিন্তা ভাবনার পর, রাজশ্যালকের বক্তব্যের উদ্ধৃতি প্রদান করেন।

" ....কাদম্বরী সাক্ষী কম স্নাকং প্রথম সৌহৃদ মিষ্যতে; তত্ শৌণ্ডিকারণমেব গচ্ছামঃ।"

নূতন বান্ধবের মুখে উদ্ধৃতি শুনে বাণ তাঁকে আবেগে জড়িয়ে ধরেন। বলেন, কালিদাস সকলের প্রিয় কবি।

কালিদ. : সহজতম ভাষায় গভীরতম বাণী প্রস্ফুটিত ফুলের মধুরসে আ.্ করে বিলিয়ে দিয়েছেন আশেপাশের গ্রামগঞ্জ নগরে। কাছাকাছির অলকাপুরী মহাকাল কনকলস দশান শ্রীগৌরী আম্রপৌত রামগিরি সানুমান এই সাথে আরো বহু বহু স্থানের গৃহে গৃহে আস্বাদিত হচ্ছে কালিদাসের মোহিনী গ্রন্থরাজি।

* * *

বিয়ের পর প্রায় মাসেক কাল হয় গত। পৌষ নেমেছে জাঁকিয়ে। কাছের এবং দূরের আত্মীয় স্বজনরা বলতে গেলে সবাই চলে গেছেন তাঁদের বাড়ীঘরে।

পুত্র ভূষণের বিয়ের উল্লাসে আতসবাজির মত জ্বলে উঠেছিলেন বাণ। মাসেক কালের মধ্যে সেই আতসবাজি একমুঠি ছাই হয়ে লুটিয়ে পড়ল প্রীতিকূটের অঙ্গনে।

শ্বেতচন্দন পঙ্কে আর আচ্ছাদিত হয় না ললাটের শ্বেতকুষ্ঠের দন্তরাশি। বিষাদগ্রস্ত বাণ। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। প্রাঙ্গণের বেতের কেদারায় বসে থাকেন পৌষের রোদে। দক্ষিণের আকাশে চণ্ডিকা মন্দিরের পতাকা লোলিহান রক্ত জিহ্বার মত লকলক করে।

চিকিৎসা শুরু হয় শুরু করেন বিপ্রবৈদ্য ময়ূর। চন্দ্রপুর মহাবিদ্যাশ্রমের আয়ুর্বেদ শাখার

অধ্যাপকগণ নিত্যপরামর্শ করেন বাণের বন্ধু তথা বাণীর দাদা বিষ বৈদ্য ময়ূরের সাথে। অধ্যাপকগণের নির্দেশ মতো লোহিতাক্ষ আহরণ করেন নানা খনিগহ্বর থেকে নানা ধাতু নানা বস্তু। চণ্ডক নৌকা ভর্তি করে কুড়িয়ে আনে গন্ধমাদন অরণ্যের নানা ঔষধির লতাপাতা মূল। রাজকীয় আড়ম্বরে চলে চিকিৎসা। বাণের দেহে ধরা দেয় না সুফলের কোনও চিহ্ন। কপাল বেয়ে ছেয়ে গেছে সারা দেহে। বাণের সমগ্র দেহ শ্বেতকুষ্ঠের দংষ্ট্রা ক্ষত।

ভূষণের বিয়ের প্রায় বছর আড়াই পরে স্থাম্বীশ্বর থেকে একখানিপত্র এল। লিখেছেন সভাপণ্ডিত ময়ূর। পত্রের সাথে একখানি পুস্তিকা। পণ্ডিত ময়ূর লিখেছেন বাণের অসুস্থতার সংবাদে তিনি বিচলিত। তবে তিনি স্বয়ং এই ভীষণ রোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে পুনরায় রাজসভায় যোগ দিয়েছেন।

পণ্ডিত ময়ূর আরো লিখেছেন, পত্রের সাথে প্রেরিত পুস্তিকার নাম 'সূর্য শতক'। অসুর পন্থী তপস্যীগণের উপদেশে রচিত হয়েছে এই গ্রন্থিকা। গ্রন্থিকায় সূর্যদেবের অশেষ মহিমায় গুণগান করে তিনি একশতটি শ্লোক করেছেন রচনা। গ্রন্থিকা সমাপ্তির পর সূর্যদেবের অশেষ কৃপায় তিনি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত।

মহাজ্ঞানী বাণভট্টের নিকট তাঁর রোগমুক্তির কামনায় গ্রন্থিকাটি প্রেরিত হল এই লিখে পণ্ডিত ময়ূর সমাপ্ত করেছেন তার দীর্ঘপত্র।

মধ্য বৈশাখের প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। বাণের চোখে ঘুম নেই। এপাশ ওপাশ করে শেষ হয় আগুনে রাত। সে রাতে বাণী ছিল না তার পাশে। ফাল্গুনের শেষ থেকে বাণী তালপাতার পাখা নিয়ে বাণের পাশে থাকতেন বসে। বাণীর এমনি রূপ স্থিরচিত্র হয়ে গেঁথে বসে গিয়েছিল বাণের হৃদয়ে। সে রাতে তাঁর দেহে ছিল না শান্তির শীতল স্পর্শ। চোখের সামনে ছিল না বাণীর সাবিত্রী রূপ।

রাতের অন্তিমলগ্নে, গঙ্গিনিকার বাতাস কক্ষের ক্ষীণ প্রদীপশিখায় আরম্ভ করে চঞ্চল নৃত্য।

উষালগ্নে কক্ষে প্রবেশ করেন বাণী। আঁচল থেকে এক অঞ্জলি রক্তজবা ছড়িয়ে দেন বাণের মাথা কপাল বুকে। চণ্ডিকার নির্মাল্য জলে ভেজা রক্তজবা।

বাণ উঠে বসেন। বাণীর সারা কপাল জুড়ে সিঁদুর। আজ কৃষ্ণা চতুর্দশী। সারা রাত চণ্ডিকার চরণে মাথা কুটেছেন বাণী। হে আদ্যাশক্তি মহাদেবী! আয়ু দাও আরোগ্য দাও! আমার একমাত্র ঐশ্বর্যের দেহ থেকে দূর করে দাও মালিন্য।

স্তিমিত কুলাঙ্গির প্রদীপ। কক্ষের অভ্যন্তরে আলো আঁধারির লুকোচুরি। বাণী, শিয়রের উপরের কুলঙ্গি থেকে বের করেন গ্রন্থলিখার বিশুষ্ক তালপত্র। তালপত্রে সাথে মসী আর লেখনী। বাণীর কণ্ঠে ধূর্জটির বিষাণধ্বনি।

মন্ত্রমুগ্ধ বাণ, বাণীর অমোঘ নির্দেশে তালপত্রিকায় লিখেন গ্রন্থিকার নাম 'চণ্ডী-শতক' স্তোত্র।

বাণী বলেন, তিনি স্বপ্নাদিষ্ট। বাণকে দেবী চণ্ডিকার মহিমা কীর্তন করে লিখতে হবে একশত স্তোত্র। বাণ হবেন সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত।

বাণ, চণ্ডিকার গুণকীর্তন করে লিখা আরম্ভ করেন 'চণ্ডী শতক স্তোত্র' গ্রন্থিকা। বিষবৈদ্য ময়ূর সে সাথে বিদ্যাশ্রমে চন্দ্রপুর বৈদ্যগণের চলে নিরলস চিকিৎসা।

বাসগৃহের ক্ষুদ্র একটি প্রকোষ্ঠে বাণী স্থাপন করেছেন মঙ্গল-চণ্ডীর আসন। প্রতিদিন ভাঁজ করা একটি চালতা পাতায় বাসের তিনটি কাঠি আড়া-আড়ি গেঁথে কাঠি তিনটির পাঁচটি মাথায়, রক্তজবা গেঁথে নির্মাণ করতেন মঙ্গল-চণ্ডীর প্রতিরূপ। মাঙ্গলিক প্রতিরূপের সম্মুখে বসে পাঠ করেন বাণের সদলিখিত চণ্ডী-শতিকার স্তোত্র। পূজা পাঠ শেষে চালতা পাতায় স্থাপিত সিঁদুর থেকে সিঁদুর নিয়ে লেপন করেন তাঁর শাখা ললাট এবং সীমান্তরেখায়। একটি কাঠিতে ভূমিতে প্রোথিতা প্রতিরূপা চণ্ডিকা বাণীর অঙ্গুলী স্পর্শে নৃত্য কারেন যেন সজীব হয়ে।

মঙ্গল-চণ্ডীর ব্রত সুরু হয়েছিল বৈশাখী অমাবস্যায়। সেদিন লিখিত হয়েছিল গ্রন্থিকার প্রথম শ্লোক। দিন কতকের অন্তরে অন্তরে রচিত হতে থাকে একাধিক শ্লোক। বাণী প্রতিদিন পাঠ করেন প্রথম থেকে।

বাণীর পাঠ বাণের ভালো লাগে। প্রতিদিন বাণীর পিছনে বসে শ্রবণ করেন বাণীর ললিত কণ্ঠের উচ্চারণ। পাঠ শুনে মনে হয় প্রতিটি শ্লোক যেন পেয়ে গেছে তার পূর্ণ স্বরূপ। পাঠের পর বাণের উদ্ধত লেখনী শ্লোক কাটাকাটির আর সুযোগ পায় না। শ্লোক থাকে অক্ষত।

আশ্বিনের প্রথম দিকে সংকলিত হয়েছে একাত্তরটি স্তোত্র। বাণীর পিছনে বসে বাণ শুনছেন সেদিনের শেষ স্তোত্র — "চক্ষুর্দিক্ষু ক্ষিপত্যাশ্চলিত কমলিনী চারুকোষাভিতাম্রং

ভদ্রং ধ্যানানুযাতং ঝটিতি বলয়িনো মুক্তবাণস্য পানেঃ।

চণ্ড্যাঃ সব্যাপসব্যঃ সুরবিপুষু শরান্ প্রেরয়ন্ত্যা জয়ন্তি

ক্রুট্যন্ত বঃ পীনভাগে স্তনবলনভরাৎ সন্ধয়ঃ কঞ্চুকস্য।"

পাঠ শেষ হলে বাণের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় অস্ফুট আনন্দ। আপন মনে উচ্চারণ করেন স্তোত্রের একটি অংশ - 'ঝটিতি বলয়িনো মুক্ত বাণস্য পানেঃ।"

বাণের আনন্দধ্বনি শুনে, বাণী জোড়হস্তে দেবী মঙ্গলচণ্ডীর প্রতিমূর্তির দিকে তাকিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে প্রার্থনা করতে থাকেন।

বাণ তার দক্ষিণ হস্তের দিকে তাকিয়ে ধারণার কথা প্রকাশ করেন বাণীকে। বাণী তার দুই করপল্লবের মধ্যে রেখে বাণের দক্ষিণ হস্ত করেন পরীক্ষা। পরীক্ষা করে করে প্রকোষ্ঠের বাইরে গিয়ে, বাণের হাত তুলে ধরেন শরতের সোনারোদে। বাণী বাণের দক্ষিণ করতলে তার মুখ রেখে কাঁদতে থাকেন। বাণের করতলে জমে ওঠে অশ্রুবিন্দু। বাণী সজলচোখে বলেন, মহাশক্তি দেবী চণ্ডিকার কৃপা হয়েছে। ফুটে উঠেছে আরোগ্যের চিহ্ন।

একশত স্তোত্র সমাপ্ত হয় মাঘী পঞ্চমীর তিনদিন পূর্বে। বাণের ভাবনায় দেবী চণ্ডিকা। শ্রীপঞ্চমীর পূজালগ্নে প্রীতিকূট বিদ্যাশ্রমে বেজে উঠে শঙ্খ ঘন্টা কাঁসর। বাণের অনুভূতিতে তীব্র শিহরণ। ভাবাবেগে তাড়িত বাণ গ্রন্থিকায় যুক্ত করেন আরো দুটি স্তোত্র।

একশত দুটি স্তোত্রে সম্পন্ন হয় বাণভট্টের গ্রন্থিকা 'চণ্ডীশতক স্তোত্র'। আরোগ্যের পথে বাণ এগিয়ে চলেছেন দ্রুত।

*　　　　*　　　　*

পাঁচ বছরের মাথায় বাণ সম্পূর্ণ রোগমুক্ত। দেহ থেকে শ্বেতকুষ্ঠের শেষ চিহ্ন সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে হর্ষদেবের মহামোক্ষ সম্মিলনীর সময় হয়ে গেছে। বাণ শতমাল্লার দ্রুতগামী রাজকীয় নৌকায় পৌছালেন প্রয়াগের ত্রিবেণী তীর্থে।

তীর্থ ঘাটে নৌকা ভীড়তে না ভীড়তে জনৈক ব্যক্তি বাণকে প্রণাম করে। সেই ব্যক্তি বাণের হাতে একটি পত্র দিয়ে বলে, দেবী বিহঙ্গমা নির্দেশ দিয়েছেন পত্রখানি পণ্ডিত বাণভট্টের হস্তে প্রদান করতে। বাণ পাঠ করেন। বিহঙ্গমা লিখেছেন মহারাজা হর্ষদেবের নির্দেশে তিনি দ্বিতীয় মহামোক্ষ সম্মিলনে যোগদানের জন্য প্রয়াগে এসেছেন। হর্ষদেব, বিহঙ্গমার নিকট সভাপণ্ডিত বাণভট্টের রোগমুক্তি এবং মহামোক্ষ সম্মিলনে বাণভট্টের যোগদানের সংবাদ অবগত হয়েছেন।

পত্রে আরো লিখেছেন তিনি অবস্থান করছেন তার পূর্ব বাসস্থানে। তাঁর সাথে আছে কল্যানীয়া উপ্পলা। মহাপণ্ডিত বাণভট্ট যদি অনুগ্রহ করে তাঁর কুটিরে আগমন করেন তাহলে বিহঙ্গমা এই সাথে উপ্পলা ধন্য হবে।

বাণ নৌঘাট থেকে সরাসরি উপস্থিত হলেন বিহঙ্গমার বাসভবনে। অশ্রুবর্ষণের ঘনঘটায় কেটে যায় প্রথম দর্শনের সুদীর্ঘকাল। বিহঙ্গমা বলে, নৌঘাটে রাখা তার চর প্রতিদিন এসে একই খবর দিয়েছে সভাপণ্ডিত বাণভট্টদেবের নৌকা পৌছায়নি নৌ-ঘাটে। সংবাদ শুনে বিহঙ্গমার প্রতিদিনের অশ্রুবর্ষার প্লাবনকাহিনি সরস ভাষায় বর্ণনা করে উপপলা।

অঘুম রাত। বিহঙ্গমা এবং বাণের কথা আর কথা। কথা গড়িয়ে নামে মহামোক্ষ সম্মেলনে।

বিগত মহামোক্ষ সম্মেলনের পরবর্তী অধ্যায় শুনে বাণ হতবাক। বিহঙ্গমাকে পরবর্তী অধ্যায়ের সংবাদ দিয়েছে অরুণাশ্ব।

প্রথম মহামোক্ষ সম্মিলনের প্রায় মাস ছয়-সাত আগে অরুণাশ্বকে প্রদান করা হয় এক ভীষণ গুরুদায়িত্ব। অরুণাশ্বের হাতে গুরুদায়িত্ব এসেছিল রাষ্ট্রের সুউচ্চ রাজকর্মচারী গোষ্ঠীর মাধ্যমে। এই গুরুদায়িত্ব প্রদানে অথবা গুরুদায়িত্বের বিষয়বস্তু সম্পর্কে হর্ষদেবের হাত ছিল কিনা এই প্রশ্নের উত্তর এখনো অবগত হতে পারেনি অরুণাশ্ব।

হর্ষদেবের সাম্রাজ্যের এবং প্রতিটি করদসামন্ত ও মিত্র রাজ্যের গুপ্তচর বাহিনীর মধ্যে

বিশেষ একটি সম্মিলিত গুপ্তচর বাহিনী গঠনের দায়িত্ব অর্পিত হয় অরুণাশ্বের উপর। এই সম্মিলিত বাহিনীর বিশেষ কাজ দানমেলায় হর্ষদেব যে সকল মূল্যবান সামগ্রী দান করবেন তার উপর নজর রাখা।

বিশেষ গুপ্তচর বাহিনী দানগ্রহীতাগণের সঠিক নামধাম সংগ্রহ করে বিজ্ঞাপিত করে দান গ্রহীতাগণের বসবাস স্থানের প্রশাসন বিভাগে দানগ্রহীতাগণের নিকট থেকে নানা উপায়ে হর্ষদেব প্রদত্ত দান সামগ্রী আদায় করে। আদায় করা সামগ্রী সামন্ত করদ অথবা মিত্র রাজাগণ পুনরায় উপহার প্রদান করেন হর্ষদেবকে। এমনিভাবে পাঁচ বছরের মধ্যেই আবার দান করা সামগ্রী ফিরে এসে পূর্ণ হয়ে উঠেছে রাজভাণ্ডার।

কাহিনি শুনে বাণ স্তব্ধ। বিহঙ্গমা বলেন, বিগত দানমেলার দান সামগ্রীর সিংহভাগ জমা হয়ে গেছে প্রয়াগের উল্টোদিকের কেশীদুর্গে। এবারের মেলায়, সে সকল হারাধন মহারাজ আবার দান করবেন মুক্তহস্তে।

স্তব্ধ বাণের কণ্ঠে হঠাৎ উচ্চারিত হয় 'বিনিপাত'। বাণের মুখে উচ্চারিত ভীষণ অভিশাপ শুনে চমকে উঠে বিহঙ্গমা। বাণের মুখে কখনো উচ্চারিত হয়নি এমনি বিধ্বংসী অভিশাপ-'ধ্বংস হোক'।

* * *

মহামোক্ষ সম্মেলন শেষে আরম্ভ হল দানমেলা। হর্ষদেব উঁচু দানমঞ্চে দাঁড়িয়ে অকাতরে বিলিয়ে দিচ্ছেন, মণি মাণিক্য হীরাপান্না। জয় জয় রবে অজস্র মানুষ করছে প্রণাম। দীন দরিদ্র সাধারণ মানুষ মহার্ঘ্য সম্পদ পেয়ে, দুহাত উর্ধে তুলে মঙ্গল কামনা করছে সর্বরিক্ত হর্ষদেবের। দানগ্রহীতা দীন দরিদ্র উৎফুল্ল মানুষকে অনুসরণ করছে গুপ্তচরবাহিনী।

বাণ আনুষ্ঠানিক ভাবে সাক্ষাৎ করলেন হর্ষদেবের সাথে। আবার ছুটি। আবার প্রীতিকূটের পথে উল্টোরথের পালা। আষাঢ় মাসের মধ্যভাগে ফিরে এলেন প্রীতিকূটে।

* * *

বর্ষার কমণ্ডলু নিয়ে এল শ্রাবণ। বৃষ্টি বৃষ্টি , অঝোর বৃষ্টি। শোনবিলের উত্তর পশ্চিম কোণের তীর ছাপিয়ে জল ধেয়ে নেমে এল শুষ্ক কৌশিকার বুকে। শুষ্ক কৌশিকার বুকে জেগে ওঠে উদ্দাম স্রোত। স্রোতধারা উত্তর দিকে এগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে খাসোক পুষ্করিণীর দেহে। খাসোক পুষ্করিণীর উত্তর-পূর্ব কোণ প্লাবিত করে জলরাশি নামে গঙ্গিনিকার স্রোতে। এমনি এক শ্রাবণের ভোরে বাণের দরজায় হাজির হলেন চন্দ্রপুর বিষয়ের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ব্যক্তিবর্গ জ্ঞাত করলেন ভাস্কর বর্মনের আকাঙ্ক্ষার কথা। আকাঙ্ক্ষা, চন্দ্রপুর অঞ্চলের কিছু পুরোনো স্থানের নাম সংস্কার করা।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বলেন, ইতিপূর্বে আদ্যরাজা লক্ষ করেছেন পণ্ডিত বাণভট্ট কিছু সংখ্যক অসুন্দর স্থান নাম পরিবর্তন করে সুন্দর নাম প্রদান করেছেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, কুতকুট

থেকে প্রীতিকূট্ট, মারা থেকে ময়ূর এবং উডুম্বরী থেকে ডুম্বরী নাম।

আদ্যরাজার স্থান নাম সম্পর্কে আগ্রহ বাণের ভালো লাগে। মুখবন্ধে বাণ সবিনয়ে বলেন, তিনি সমাগত জ্ঞানীগুণী জনের চিন্তাভাবনার জন্য কয়েকটি নাম বলতে পারেন।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সঙ্গে নিয়ে এসেছিল একজন রাজকীয় কায়স্থ। কায়স্থ তার লেখনী এবং মসী সহ লেখা পত্র প্রস্তুত করেন।

বাণ বলেন, দুর্বোধ্য 'উডুম্বরী' নাম পরিবর্তন করে যদিও ডুম্বরী করা হয়েছে, তবু ও সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়নি। ডুম্বরী অতি নিকৃষ্ট ফল। নিকৃষ্ট ফলের পরিবর্তে এই স্থানের নাম কোন বিশেষ উত্তম ফলের নামে রাখা যেতে পারে।

বাণ সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং সংস্কৃতিতে বিল্ব হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ফল। বিল্বফলের অনুসরণে ডুম্বরী অঞ্চলকে 'শ্রীফল' নামে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তবে উডুম্বরী অঞ্চলের একটি বিশেষ স্থান'' ''কাদম্বরী'' দেবীর স্থান নামে চিহ্নিত। এই বিশেষ স্থানটির নাম 'কাদম্বরী' থাকা বাঞ্ছনীয়।

বাণের প্রস্তাব শুনে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের কণ্ঠে নির্গত হয় আনন্দ ধ্বনি। কায়স্থ লিখেন ডুম্বরী অঞ্চলের নূতন নাম শ্রীফল।

বাণ বলেন, 'বরাকতটী' নাম লোকমুখে হয়ে উঠেছে। 'বর্কতটী'। বর্কতটী নাম অর্থশূন্য। অর্থশূন্য বর্কতটী নামের ধ্বনি অনুসরণে এই অঞ্চলের অর্থযুক্ত নাম দেওয়া যেতে পারে 'ব্যাঘ্রতটী'।

সকলের মুখের আবার উল্লাস ধ্বনি। কায়স্থ তার লেখনী তুলে বাণের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'বর্কতটী' অঞ্চলে আবার ভীষণ বাঘের উপদ্রব। ব্যাঘ্রতটী নাম সার্থক।

কালিকাশ্বভ্র এবং কাদম্বরী দেবকুলিকার দক্ষিণ দিকের সুবিশাল অঞ্চলের বিশেষ কোনও নাম নেই। সাধারণের মুখে এই অঞ্চলে চণ্ডিকারণ্য নামে পরিচিত। ময়ূর শাল্মল অগ্রহারের ময়ূর নামের অনুসরণে কোন কাব্যিকপক্ষীর নামানুসারে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ নানা পাখির নাম বলেন। কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে কোনও নাম গৃহীত হয় না। বাণ, গভীর চিন্তাভাবনা করে, কাব্যিক পাখির নাম বলেন ''ক্রৌঞ্চ''। আনন্দ উৎফুল্ল হয়ে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ ''ক্রৌঞ্চ'' নাম গ্রহণ করেন।

বাণ বলেন, চণ্ডিকা অরণ্যের শেষ দক্ষিণে চণ্ডিকাতীর্থ। তীর্থক্ষেত্রের অন্য প্রতিশব্দ ''শ্বভ্র'' সুতরাং চণ্ডিকারণ্যের নাম হতে পারে ''ক্রৌঞ্চ শ্বভ্র''।

বাণ পালিতকগঞ্জ সম্পর্কে বলেন, এই নাম লোকমুখে বালিতক এবং পালিতক নামে উচ্চারিত হয়। বাণের প্রস্তাব রাজকীয় দলিল দস্তাবেজে সঠিকভাবে এই নাম ''পালিতক'' লিখা বাঞ্ছনীয়।

অম্লপোতা নাম সম্পর্কে বাণের অভিমত, এই নাম আম্রপোতা হলে স্থান নামের স্বাভাবিক

অর্থ প্রকাশিত হবে।

বাণ এমনিভাবে আরো নানা স্থান নদী-পাহাড়-হ্রদের নূতন নামকরণ করেন। কায়স্থ সযত্নে লিখে রাখেন।

*　　　　*　　　　*

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যাবার পর তার মনে জেগে ওঠে আজন্ম পরিচিত প্রকৃতি। হৃদয়ে ভেসে উঠে নদী পাহাড় গাছপালা ফুলপাখি নগর গ্রামগঞ্জ। পরিচিত প্রকৃতি সজীব মানুষ হয়ে যেন তাঁর সাথে বলতে চায় কথা। জানাতে চায় তাদের সুখ দুঃখ আনন্দ।

হৃদয়ে জেগে ওঠে শাল্মলী অঞ্চল। ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে দান করা আদ্য রাজবংশের প্রাচীনভূমি। শাল্মলী অঞ্চল যেন এক মহাশাল্মলী বৃক্ষ। শত সহস্র কবি সাহিত্যিক পণ্ডিত পাখীগণ ভিড় করে আছেন শাখায় শাখায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

তার কৈশোর যৌবনের উপবন চন্দ্রপুর যেন এক প্রাণোচ্ছল যৌবনের দূত। পালিতকগঞ্জ তার চোখে এক মহাজ্ঞানী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। পিগুার নৌবন্দর যেন প্রেমে পাগল মুণি। মহাজ্ঞানী কোন এক ঋষির পুত্র যেন হরিকেল নগরী।

বরাক মেঘনার দিগন্তগামী প্রচণ্ড প্রবাহ যেন দুই টগবগে ঘোড়ার আরোহী। বরাক মেঘনা দুই সম্রাটের ভীষণ দুই সেনাপতি।

ইন্দ্রেশ্বরের সাগরসম জলরাশির পূর্ব দিগন্ত শিখরে প্রতিদিন উদিত হয় সপ্তাশ্ব বাহিত সূর্যরথ। এই ইন্দ্রেশ্বর যেন এক রাজকীয় দামাল অশ্ব। গন্ধমাদন পর্বত যেন এক মহাগজ।

বাণের মনে পড়ে কালিন্দি পুষ্পভদ্রা নদীর কথা। কালিন্দি পুষ্প ভদ্রা ওরা কথা বলে। ওরা যেন রসিকা এবং শুদ্ধ চারী নারী। যাবা বন্দর শুদ্ধাচারী মহাজ্ঞানী কোন এক মুনি।

বাণের সম্মুখে, এক সাথে ভিড় করে আসে তার প্রিয় প্রকৃতির, গ্রামগঞ্জনগর ফুলপাখি এই সাথে প্রিয় সব মানুষ। বাণের অনুভূতিতে মানুষ এবং প্রকৃতি এক হয়ে ওঠে। তার চারদিকে জীবন্ত হয়ে মানুষ এবং প্রকৃতি কথা বলে। বলে — "বাণ! বন্ন! আমাকে ভুলে যেয়ো না আমি! আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমার স্পর্শ তোমার গন্ধ আমার গায়ে লেগে আছে। বাণ! তুমি আমার। তুমি একান্ত আমার।"

বাণ অনুভব করেন তার চতুর্দিকে কোলাহল। ভীষণ শব্দ। প্রকৃতি গ্রামগঞ্জ নগর এবং প্রিয় মানুষ চিৎকার করে তাকে ডাকছে বন্ন-বাণ-বাণভট্ট।

অস্থির বাণ টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে ঝাঁপিয়ে নামেন পথে। দুটি চরণ তাকে বহন করে নিয়ে চলে দক্ষিণ দিকে।

নিস্তব্ধ পথিক বাণের হৃদয় এবার কথা বলে। "জন্মেছি এই সুন্দর দেশে। আমি ধন্য! আমার সত্তার সাথে মিশে থাকা - হে নদী। হে পাহাড়! গ্রামগঞ্জ নগরী! হে আমার পূর্বজ এবং বন্ধুজন

আমি তোমারে সাথে নিয়ে লিখব অমর প্রেমকথা। আমার প্রেমকথায় তোমরা সব দয়া করে এসো। আমি শুধু তোমাদের একান্ত বন্ন বাণ বাণভট্ট।"

ইতিমধ্যে তিনি পায়ে পায়ে পৌছে গেছেন প্রীতিকূট বিদ্যাশ্রমের মাঠে। টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে বাণকে দেখে ছুটে আসেন আশ্রমের অধ্যাপকগণ। অধ্যাপকগণের মধ্যে পুত্র ভূষণভট্ট।

বাণকে বাড়ী নিয়ে আসে ভূষণ। প্রবেশমাত্র তেড়ে আসেন বাণী। কথা নেই বার্তা নেই, ভর দুপুরে বৃষ্টি বাদলের মাঝে বের হয়ে গেছেন। কোন দিকে কোথায় গেলেন কেউ জানে না। ছাতাটি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়নি।

স্বাভাবিক হলেন বাণীর তাড়া খেয়ে। ফিরে এলেন বাস্তব জগতে। বাধ্য ছেলের মত সলজ্জ বাণ, স্নানাহ্নিক এবং ভোজন করে লম্বা হলেন শয্যায়।

দুপুরের টিপটিপ বৃষ্টি, পুষ্ট হল অপরাহ্নে। গঙ্গিনিকার বাদল বাতাস পেয়ে পুষ্পবৃষ্টি হল বলিষ্ঠ। বৃষ্টির শব্দ এই সাথে গঙ্গিনিকার বাদল হাওয়ার দুরন্তপনা। মাঝে মেঘের গুরু গুরু মৃদঙ্গ ধ্বনি।

বাণ বিছানার বসে ভাবছেন কাব্যিক প্রেমকাহিনীর কথা। তার আত্মা প্রকৃতি গ্রামগঞ্জ নগরী পাহাড়-নদীর কাছে নিবেদিত। সবাইকে নিয়ে লিখতে হবে প্রেমকথা।

অবিরাম ঝড় বৃষ্টির মাঝ দিয়ে গড়িয়ে এল মধ্যরাত। বাণের চোখে ঘুম নেই। শেষ নেই ভাবনার। কোন সে প্রেমকাহিনির মধ্যে মিশিয়ে রাখবেন প্রকৃতি নগর গ্রামগঞ্জের আত্মা?

বাণের ভাবনার রাজ্যে প্রবেশ করেন বাণী। বাণ বলেন, তার চাই গভীরতম প্রেমকাহিনি। বাণী মনে করিয়ে দিলেন প্রেমাকাহিনির কথা। যে কাহিনি অনেক দিন আগে এমনি এক মধ্যরাতে বলেছিলেন বাণ। বাণের মনে পড়ে। ভূষণের শিয়রে রাখা গ্রন্থ নিয়ে উঠেছিল কথা।

সে রাতে তিনি বাণীকে বলেছিলেন "কথাসরিৎসাগরের শক্তি যশ লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গের" প্রেমকাহিনি।

বাণ উঠে বসেন। এখনই চাই কথাসরিৎসাগর গ্রন্থ। বাণী বলেন, সে গ্রন্থ এখনো লাল কাপড়ে জড়িয়ে আছে ভূষণের শিয়রে। বাণ বিস্মিত। ভূষণ এখনো শিয়রে রাখে?

বাণের ভীষণ তাড়া। এখনই কথাসরিৎসাগর চাই। বাণী বলেন, আগামী ভোরে দেবেন এনে। ওরা তাদের কক্ষে শুয়ে আছে।

বাণ, ভূষণকে তুলেন ডেকে। গভীর ঘুম ভেঙে ভূষণ হতচকিত। বাণ সংগ্রহ করেন গ্রন্থ। বাবাকে অনুসরণ করেন ভূষণ। বাণ তার কক্ষে এসে লাল বন্ধনী বস্ত্র থেকে বের করেন গ্রন্থ। ভূষণ জিজ্ঞাসা করেন গ্রন্থের কোন্ তরঙ্গ বাবার প্রয়োজন।

বেতের মোড়ায় বসে ভূষণ কথাসরিৎসাগর গ্রন্থের তৃতীয় তরঙ্গের কাহিনি গড়গড় করে

মুখস্থ বলে চলেন। সমগ্র গ্রন্থ ভূষণের সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ। এই গ্রন্থ ভূষণের প্রিয় এবং পবিত্র।

কথা সরিৎসাগর গ্রন্থের শক্তি যশ লম্বক তৃতীয় তরঙ্গে বাণ পেয়ে গেলেন এক আশ্চর্য সুন্দর প্রেমকাহিনি।

প্রেমকাহিনি নিয়ে শুরু হয় পিতা পুত্রের গল্প। ঈগলের কণ্ঠে ঘোষিত হয় রাত্রির তৃতীয় প্রহর। বাণী বিছানা থেকে নেমে ভূষণের লম্বা চুল মুঠিতে ধরে টেনে নিয়ে যান তাদের কক্ষে। শ্রাবণের উচ্ছ্বাস ডুবিয়ে জেগে উঠে ভূষণ বাণী এবং বাণের উচ্ছল হাসি।

* * *

সে রাতে বাণের চোখে নামেনি ঘুম। শেষ রাতে স্নানাহ্নিক করে বসে আছেন গ্রন্থ নিয়ে। অপেক্ষা করছেন ভূষণের। ভূষণ এলে শুরু হল পরিকল্পনা। বাণ বলেন, কথাসরিৎসাগরের এই কাহিনির কঙ্কালে তিনি সংযুক্ত করবেন রক্তমাংস। রক্তমাংসের জীবন্ত কাহিনির মধ্যে যুক্ত করবেন তার ভালোবাসার প্রকৃতির দেহ এবং আত্মাকে।

ভূষণ বলেন, এই গ্রন্থের তৃতীয় তরঙ্গের কাহিনি কথাসরিৎসাগর গ্রন্থের লেখক সোমদেবের ভাষায় এমনিভাবে আরম্ভ হয়েছে।

"হিমালয়ের সন্নিকটে এক রোহিনি বৃক্ষ ছিল।" ভূষণের কথা শুনে বাণ বলেন, সোমদেবের লিখিত "হিমালয়" নামের বদলে তিনি লিখবে বিন্ধ্যঅটবী। কারণ বিন্ধ্যঅটবী প্রীতিকূটের দক্ষিণ দিকের পরিচিত এবং নিকটবর্তী পর্বত। অন্যদিকে সোমদেব লিখিত "রোহিনি বৃক্ষের" পরিবর্তে হবে শাল্মলী বৃক্ষ। শাল্মলী অঞ্চলে প্রীতিকূট অবস্থিত।

বাণ বলেন, সোমদেবের কুলপতি পু স্ত্য এবং মরীচি।

তার প্রেমকাহিনীতে পুলস্ত্যের স্থানে নাম হবে যাবালি এবং মরীচি স্থলে হবে হারীত।

সহাস্যমুখে পুত্রের দিকে তাকিয়ে বাণ জিজ্ঞাসা করেন কেন যাবালী এবং হারীত নাম রাখা হল।

ভূষণ সহজভাবে বলেন যাবালী নাম, পূর্ব সাগরের যাবা বন্দরের এবং হারীত নাম গঙ্গিনিকার উত্তর তীরের হরিনগর পুরীর নাম অনুসারে রাখা হয়েছে।

বাণ উঠে গিয়ে, ভূষণের পিঠে হাত রেখে বলেন "বাঃ উত্তর শুদ্ধ হয়েছে।" ভূষণ তার পিঠে বাল্যকালের বাবার স্পর্শ অনুভব করে।

পিতাপুত্রের এমনি কথাবার্তা আলাপ আলোচনার মাঝ দিয়ে সৃষ্টি হতে থাকে নূতন নূতন নাম। সোমদেব সৃষ্ট নামের বদলে প্রতিটি চরিত্র পেল বাণের ভালোবাসার প্রকৃতি গ্রামগঞ্জ মানুষের নাম।

সোমদেবের নায়ক ছিলেন সোমপ্রভ। নায়কের পিতা ছিলেন জ্যোতিপ্রভ। বাণের কৈশোর

যৌবনের উপবন চন্দ্রপুর নায়কের দেহ নিয়ে হয়ে গেল চন্দ্রপীড়। চন্দ্রাপীড়ের সাশ্যে তার পিতার নাম হল তার তারাপীড়।

সোমদেবের কাহিনিতে নায়কের অশ্বের নাম আশুশ্রবা। সোমদেব সম্ভবত এই নাম, সমুদ্র মন্থনে প্রাপ্ত ইন্দ্রের অশ্ব "উচ্চৈঃশ্রবা" নামের সাদৃশ্যে রেখেছেন। পিতা পুত্র আশুশ্রবা নামের মধ্যে অনুভব করেন দেব রাজ ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের দ্যুতি।

বাণ সমাধিস্থ হয়ে গেলেন, চিন্তার অতলে। পিতার জাগরণের অপেক্ষায় থাকেন পুত্র ভূষণ।

বাণ কল্পস্রোতে ভেসে ভেসে উপস্থিত হলেন তার কৈশোরের চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমের উপবনে। বালক ব্রহ্মচারীগণের সাথে তিনি যজ্ঞশালার প্রাঙ্গণে প্রতীক্ষারত। সম্মুখে ইন্দ্রেশ্বরের পূর্বদিগন্তের উদয় শিখরের উর্দ্ধে পাটলবর্ণের ব্রাহ্ম্য মুহূর্তের আকাশ। আশ্রমের ঋষিগণ যজ্ঞশালার প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান। ঋষিগণ ইন্দ্রেশ্বর উদয়গিরির দিকে তাকিয়ে জোড় হস্তে আহ্বান করছেন সকল তামসহর জ্যোতির্ময় সূর্যকে। ঋষিকণ্ঠের প্রার্থনায় জবাকুসুম সংকাশ অরু সূর্য তার সপ্তাশ্ববাহিত রথে, ধীরে আরোহন করেন ইন্দ্রেশ্বরের উদয়গিরি শৃঙ্গে।

বাণের কল্পনায় জেগে ওঠে তার যৌবনের দূত নায়ক চন্দ্রাপীড় ইন্দ্রেশ্বরের উদরগিরিতে আবির্ভূত এমনি এক আলোকদীপ্ত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে এগিয়ে যাচ্ছেন ঝঞ্ঝার বেগে।

অতল থেকে ভেসে ওঠেন বাণ। উৎসুক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন ভূষণ। উদ্ভাসিত বাণের মুখমণ্ডল। তার নায়কের অশ্বের নাম হবে, তার ভালোবাসার ইন্দ্রেশ্বর নামের আধারে "ইন্দ্রায়ুধ।"

সোমদেবের কাহিনির অশ্বের আশুশ্রবা নামের স্থানে বাণের প্রেমকাহিনির নায়কের অশ্বের নাম হল "ইন্দ্রায়ুধ"।

ইন্দ্রায়ুধ নাম রেখে বাণের মনে হল জননী জন্মভূমির অন্তত এক বিন্দু স্তনামৃতের ঋণ হল পরিশোধ।

ইন্দ্রেশ্বর বিখ্যাত বন্দর। তেমনি এক বন্দর "পিণ্ডার আবার স্মৃতির জলে অবগাহন। আবার ফিরে যাওয়া কৈশোরের উপবনে। চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমের গ্রীক অন্ধমুনি অগস্তি বলছেন পিণ্ডার বন্দরের প্রাচীনকথা। সুপ্রাচীন কালে, পিণ্ডার অঞ্চলে ছিল মস্ত এক দেবমন্দির। মন্দিরের দেবতা প্রদ্যুম্নেশ্বর।

মন্দির ভূমির পাশ দিয়ে গঙ্গা পদ্মা মেঘনা বরাক লোহিত্যের জলরাশি নেমে যেত দক্ষিণ সমুদ্রে। দূর দেশদেশান্তরের সমুদ্র পথিক নাবিকগণ এখানে এসে পূর্ণ করে নিত তাদের জলভাণ্ডার সুমিষ্ট জলে।

বহু নদীর সুবৃহৎ সঙ্গমক্ষেত্র, শবর ভাষায় নাম হল "উ-ডি-উম-বারি"। শবর ভাষায় এই শব্দের অর্থ "বৃহৎ পানীয় জলের ভাণ্ডার।" দেশে বিদেশে এবং তাম্রপত্রে এর নাম হয়ে গেল উডুম্বরী।

দেবতা প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির ভূমির পাশে গড়ে ওঠে মস্ত এক আন্তর্জাতিক বন্দর। বন্দরের নাম প্রদ্যুম্নেশ্বর বন্দর। গ্রীক নাবিকগণের মুখে প্রদ্যুম্নেশ্বর নাম হয়ে গেল প্রভামার বন্দর। রাজকীয় ভূমিদানের তাম্রপত্রে, প্রদ্যুম্নেশ্বর নামের পাশে বন্দরের নাম লিখিত হল প্রভামার বন্দর। কালের রথচক্রের ঘর্ষণে "প্রভামার" নাম ক্ষয়ে ক্ষয়ে হয়ে গেছে পিণ্ডার বন্দর।

প্রীতিকূটের অদূর দক্ষিণের পিণ্ডার বন্দর সর্বত্যাগী প্রেমিক সন্ন্যাসী বেশে বাণের হৃদ-কমলে আশ্রয় নেয়। পিণ্ডার বলে — বাণ! আমি ভালোবাসি মানুষকে। দূর দূরান্তের দেশ দেশান্তরের মানুষকে ভালোবেসে করি আলিঙ্গন। আমাকে যেয়ো না ভুলে। বাণ! তোমার হৃদয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই সর্বত্যাগী এক প্রেমিক রূপে।

প্রেমিক পিণ্ডার বন্দর বাণের লেখনীতে প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হল ঋষি পুণ্ডরীক নামে।

সোমদেবের কাহিনির শুদ্ধাচারী নারী মনোরম প্রভার প্রেমিক রশ্মি মান। ভালোবাসার সুতীব্র বিদ্যুৎ দংশনে মৃত্যু হয়েছিল প্রেমিক রশ্মিমানের। বাণের ভালবাসার কাহিনিতে রশ্মিমান হয়ে গেল ঋষি পুণ্ডরীক।

পুণ্ডরীক নামের সাথে সোমদেবের সৃষ্ট প্রেমিকা মনোরথ প্রভার নাম বাণের লেখনীতে হল মহাশ্বেতা। মহাশ্বেতা বেদ বেদাঙ্গ বিদ্যাস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বাণী-বাগেশ্বরী।

বৃষ্টির বিরাম নেই। দিগ্-দিগন্তের প্রকৃতি বাণের সাথে কথা বলে। এমনি এক ভাদ্রের অপরাহ্নে তিনি কাঁধে ছাতা নিয়ে নামেন পথে। পথ জনহীন। প্রীতিকূট বিদ্যাশ্রম কুত্তকুট্ট মন্দির অতিক্রম করে এগিয়ে চলেন দক্ষিণ দিকে। পথ কর্দমাক্ত। প্রতিপদক্ষেপে পা গেঁথে যায় আঠালো কাঁদায়। বপ্প ঘোষ বাট ঘাটে নেই কোনও যাত্রী। নেই মাঝিমাল্লা নৌকা।

মেঘের আড়ালে ঢেকে আছে পূর্ব-দিগন্তের চন্দ্রপুর পাহাড়। স্ফীত হয়ে উঠেছে শোন বিলের গর্ভ। ঘাটের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের বাঁধ ফেটে শোনবিলের গর্ভের জলরাশি দুরন্ত দামাল শিশুদের মত ঝাঁপিয়ে নামছে, শুষ্ক কৌশিকার বুকে। শোনবিল হয়ে উঠেছে ভয়াল অন্তহীন পূর্ব সাগর। ঢেউ রাশি এসে আঘাত হানছে তীরে।

ভীষণ শব্দ। বৃষ্টির শব্দ। ঢেউয়ের শব্দ। ভেসে আসে দূর-পশ্চিম সমুদ্র গর্জনের সাথে পাগলা হাওয়ার হুঙ্কার।

পূর্ণ বর্ষায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে নদী খাল, বিল, পুকুর। পূর্ণ হয়ে উঠেছে বাণের ভালোবাসার বরাক মেঘনা নদী।

নির্জন ঘাটে অপরাহ্নের নীল ছায়ায় তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় বরাক আর মেঘনা। ওরা বাণের কানে নীল মেঘের অম্বরে আচ্ছাদিত মৃদঙ্গের মন্দ্র স্বরে বলে "বাণ! আমরা এসেছি। আমরা বরাক আর মেঘনা। মনে পড়ে বন্ধু! তোমার সেই বল্গাবিহীন যৌবনের কথা? পূর্ণ বর্ষায় আমাদের উচ্ছল বুক বেয়ে উল্কাবেগে ছুটে যেত তোমার নৌকা। বাণ! আমরা তোমার দুর্দম

যৌবনের বন্ধু। আমাদেরে মনে রেখো বাণ! মনে রেখো।"

রোমাঞ্চিত বাণ। তাঁর চোখে ভেসে ওঠে, স্রোত তরঙ্গমুখর দুই নদী। অজস্র অজেয় সৈনিক নিয়ে ধাবমান হচ্ছে দিগন্ত বিজয়ে বরাক আর মেঘনা। বাণের অনুভূতিতে হয়ে উঠে মহাবলী দুই সেনাপতি। বহমান অনন্ত জলস্রোতধারা যেন অন্তবিহীন সৈন্যরাশি।

এমনিভাবে এক মেঘমেদুর সন্ধ্যায় বাণের কাহিনির নায়ক চন্দ্রাপীড়ের সেনাপতির নাম ' মেঘনাদ" রূপায়িত হল মেঘনা নদীর মেঘচ্ছায়ায়। তারাপীড়ের সেনাপতি বরাক নদীর ধ্বনি তরঙ্গে হল "বলাহক"।

গান গেয়ে গেয়ে প্রবেশ করেন প্রীতিকূট গৃহে। ভিজে গেছে সর্বাঙ্গ। বাণী আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেন বাণের দেহ। সুবোধ বালক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি।

প্রতিদিন সৃষ্ট হয়, পরিচিত প্রকৃতি গ্রামগঞ্জ নগরী মানুষের নামে নবনব চরিত্র নাম।

এমনি করে সৃষ্ট হল প্রীতিকূটের নিকট দক্ষিণের কৈলাস পর্বতের নামে 'কৈলাস' চরিত্র। কৈলাস তারাপীড়ের ভৃত্য। কৈলাস পর্বতের অপরূপা নদী পুষ্প ভদ্রার নামে ভক্তিশীলা নারদ কন্যার নাম হল "ভদ্রাদেবী।" কালিন্দি নদীর নামে হল পরিহাস মুখরা পক্ষিণীর নাম "কালিন্দি"। প্রীতিকূটের কাছাকাছি স্থান নাম থেকে সৃষ্ট হল - কেয়ূর 'গন্ধ মাদন' 'পত্র লেখা' শুকনাস এবং আরো অনেক অনেক চরিত্র।

বাণ স্বভাবত আড্ডাবাজ। অনবরত কথা বলা তাঁর স্বভাবধর্ম। বিছানায় এসেও তার কথার শেষ নেই। বাণী নীরব শ্রোতা। মাস দুয়েক ধরে কথার বিষয় তার প্রেমকাহিনির নূতন চরিত্র নাম। কিভাবে নূতন চরিত্র নাম আবিষ্কার করেছেন তার বিবরণীর বিরাম বিহীন বকবক।

এমনি এক রাতে বাণী জিজ্ঞাসা করেন কাহিনির সব চরিত্র নাম নতুন হয়ে গেল কিন্তু নায়িকা নামের পাত্তা নেই কেন? বাণীর প্রশ্নে থমকে গেলেন। থেমে গেছে বক-বক।

মুখ খুলেন শেষ পর্যন্ত। বলেন, সোমদেবের নায়িকার নাম মকরন্দিকা। মকরন্দিকা নামের স্থানে আপন নাম প্রতিষ্ঠার দাবীদার আছেন অনেকজনা। বাণীর জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেন "অনেক জন" অর্থ তার অনেক প্রিয় নগ-নগরী জনপদ।

বাণীর চোখে ভেসে ওঠে তাঁর বৌমার মুখমণ্ডলও। বৌমার তনু দেহ। বৌমার ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণ্য মুগ্ধ করে দেবতার দৃষ্টি। বৌমা যেন দেবী কাদম্বরীর এক পরম আশ্চর্য সৃষ্টি। দেবী ভগবতী কাদম্বরীর করুণায় ওকে পেয়েছেন কাদম্বরী দেবকুলিকায়।

বাণী, বাণের কানে ঠোঁট চেপে বলেন - "তোমার প্রেমকাহিনির নায়িকার নাম হোক কাদম্বরী।"

বাণ উঠে বসে বাণীর দক্ষিণ করপল্লব তাঁর দুটি কর পল্লবের মধ্যে স্থাপিত করে জোড় হস্তে গুনগুন করে দেবাদিদেব শম্ভুকে প্রণাম করেন।

'নমস্তুঙ্গ শিরশ্চুম্বি চন্দ্র চামর চারবে।

ত্রৈলোক্য নগরান্তমূল স্তম্ভায় শম্ভবে।"

পরম এক প্রাপ্তিতে বাণ মুগ্ধ। সে রাতে তার কণ্ঠে ছিল না তার পরম প্রিয় বক-বকম স্বর তরঙ্গ। বুকের মধ্যে ধ্বনিত হয় বিগত জন্মের প্রথম প্রেম। কাদম্বরী কন্যা উম-ইয়াম। নিস্তব্ধ বাণ।

প্রভাতে ভূষণকে বিজ্ঞাপিত করেন তার সিদ্ধান্ত। সোমদেবের নায়িকা মকরন্দিকা তার কাহিনিতে নাম গ্রহণ করবে " কাদম্বরী।" নায়িকার কাদম্বরী নাম অনুসারে ভালোবাসার এই গ্রন্থের নাম হবে কাদম্বরী।

*　　　　*　　　　*

গ্রামে গ্রামে বার্তা রটে গেল মহাপণ্ডিত বশ্যবাণী চক্রবর্তী বাণভট্ট প্রেমকাহিনি লিখছেন। কাহিনি গ্রন্থের নাম কাদম্বরী। দূর-দূরান্ত থেকে বাণের বন্ধু এবং ভক্তবৃন্দ আসে ছুটে। আড্ডাপ্রাণ পায়। চণ্ডক গ্রন্থের জন্য "শ্লা" প্রস্তুত করে রেখেছে। শবরদের ভাষায় "শ্লা" অর্থ পত্র। একাধিক লেখনী এই সাথে পাত্র পূর্ণ মসী প্রস্তুত। কিন্তু "শ্লা"তে লেখনী স্পর্শের সুযোগ পাচ্ছে না। এত বন্ধুবান্ধব আসছে। বাণের কথা বলা একান্ত আবশ্যক। অন্যদিকে প্রতিটি "শ্লা", বাণের তাম্র লেখনীর মন্থনে, শ্লোকে গর্ভবতী হবার কামনায় থরথর করে কাঁপছে।

একদিন আড্ডায় হাজির হলেন বাণের পুরোনো বান্ধব। নালান্দা থেকে এসেছিল নাম জয়সেন। বাণ মহাখুশী।

বাণ নালন্দা মহাবিদ্যাশ্রমের পণ্ডিতদের কথা জিজ্ঞাসা করেন। জয়সেন নালান্দার বিখ্যাত জ্ঞানী পণ্ডিত হিসাবে উল্লেখ করেন ভদ্ররুচি স্থিরমতি এবং শীলভদ্রের নাম। জয়সেন পণ্ডিতদের নাম উল্লেখ করে বলেন, এই সব মহাজ্ঞানী পণ্ডিতদের সাথে মাঝে মধ্যে সাক্ষাৎ হয়। মাঝে মধ্যে সাক্ষাতের কারণ পণ্ডিতগণ বাস করেন নালন্দা মহা বিদ্যাশ্রমের অধ্যাপক আবাসে। অন্যদিকে তিনি স্বয়ং বাস করেন যষ্ঠীবনে। যষ্ঠীবন নালন্দা মহাবিদ্যাশ্রমের সামান্য পূর্বদিকের একটি গ্রাম।

বাণ হঠাৎ করে জিজ্ঞাসা করেন যষ্ঠীবনে কি বন্ধুবর জয়সেনের নিজস্ব ভূমিবাড়ী বর্তমান? বাণের প্রশ্নে খেপে ওঠেন জয়সেন। ক্ষেপে উঠার কারণ ভূমিবাড়ীর সম্পর্কে বাণের জিজ্ঞাসা। ক্রুদ্ধ জয়সেন বলেন, তিনি ব্রাহ্মণ নন। তিনি ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় দান গ্রহণ করে না। এই প্রসঙ্গে বলেন, এই যে দুই কুমার রাজা যারা বিশাল সাম্রাজ্য গড়েছেন এই কুমার রাজা তাকে ভূমিদান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি দানগ্রহণ করেননি।

বাণ সহজ কথায় বন্ধুকে শান্ত করেন। জয়সেন নালান্দার এক চীনা সন্ন্যাসীর সাথে তার পরিচয় প্রসঙ্গে চীনা সন্ন্যাসী নাম বলেন হিউয়েন সাং। বাণ হিউয়েন নাম প্রসঙ্গে বলেন সেই ভুগ্নি ডাকাত কাহিনি। ডাকাতরা বলি দিতে গিয়েছিল এই চীনা সন্ন্যাসীকে।

জয়সেন বলেন, হিউ-য়েন-সাং মাঝে মাঝে যষ্ঠীবনে এসে গল্প সল্প করেন। গল্পের বিষয় বেদ জ্যোতির্বিদ্যা ভূবিদ্যা গণিত হেতুবিদ্যা যোগ যাদু চিকিৎসা ইত্যাদি। চীনা সন্ন্যাসী সেসব

কথাবার্তা লিখে রাখেন।

জয়সেন বলেন একবার তার ডাক পড়েছিল গয়ার এক ধর্মসভায়। সঙ্গে গিয়েছিলেন হিউয়েন সাং। গয়ার ধর্মসভায় নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনার পর দেখানো হয়েছিল মস্ত কোনও এক জন্তুর হাড়গোড়। হাড়গোড় দেখানো হয়েছিল মস্ত সে জন্তু সম্পর্কে ধ্যান-ধারণার জন্য। হিউয়েন সাং এদিকে ওদিকে ঘুরে ঘুরে হাড়গোড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে কীসব লিখে রাখছিলেন তার পুস্তিকায়।

বাণ গম্ভীরভাবে বলেন, জয়সেন নিশ্চয়ই চীনা সন্ন্যাসীর সে সব লেখাজোকা পাঠ করেছিলেন খুব সহজে।

বাণের কথায় গুমোট কাটে। আড্ডা কেঁপে উঠে জয়সেনের উচ্চ হাসির শব্দে।

দিন কতক পর, জয়সেন চলে গেলেন কঙ্গোদ অর্থাৎ উৎকল রাজ্যে। যাবার আগে দেখা করে গেলেন আদ্য রাজা ভাস্কর বর্মনের সাথে।

* * *

আড্ডায় আড্ডায় শারদীয় পূজা হল সমাপ্ত। শারদীয় পূজা শেষে বাণ- 'শ্লা''তে লেখনী স্পর্শ করাতে বাধ্য হলেন। বাধ্য করেছেন বাণী, ভূষণ এবং লোহিতাক্ষ।

বাণের লেখনী এক আঁচড়ে শেষ করতে পারে না কিছু। প্রতিটি শব্দ ভেঙে একটির ভিতর অন্য আর একটি শব্দের উপাদান প্রবেশ করিয়ে তৈরি হচ্ছে নূতন নূতন শব্দ। কাহিনির গুরু গম্ভীর বক্তব্যের মধ্যে ছদ্মবেশে অনুপ্রবেশ করে তার একান্ত ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ ঘৃণা ক্রোধ আ. দ পরিচিত মানুষের নায় মানুষে চরিত্র। একই বাক্যকে নানা অ. ! বিস্তারিত করা বাণের আনন্দ বাণের কৌশলে হীরক কাঠিন্য এই সাথে হীরক দ্যুতি নিয়ে সৃষ্ট হচ্ছে কাদম্বরী। প্রতিটি শব্দ প্রতিটি বাক্য ভিন্ন ভিন্ন কোণে তীক্ষ্ণ হীরক দ্যুতির মত বিকিরণ করে কিরণ কিরিচ।

ছত্র কয়েক লিখেই পাঠ করতে দেন পুত্র ভূষণকে। পিতা পুত্রের বিশ্লেষণ এবং দুজনের চিন্তা ভাবনা এবং আনন্দ উচ্ছ্বাস।

বাণের হর্ষচরিত গ্রন্থ পাঠক মহলে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন লোহিতাক্ষ। কাদম্বরী গ্রন্থের চাহিদা অনেক বেশি। হর্ষচরিত নকল এবং বন্টন করার পদ্ধতি অনুসারে গঠিত হল বিপুল সংস্থা। এবার হর্ষচরিত গ্রন্থের মত একই সাথে সমস্ত গ্রন্থ নকল করা নয়। কাদম্বরী গ্রন্থ যতটুকু লিখিত হবে, খেপে খেপে সেই অংশ গ্রাহকের হাতে দেওয়া হবে পৌঁছিয়ে। ভিড় করে এল অজস্র গ্রাহক। আর্থিক দায়দায়িত্বে লোহিতাক্ষ নিযুক্ত করেন তাঁর দপ্তরের জনৈক অভিজ্ঞ কায়স্থকে।

নিজস্ব কক্ষে বসে বাণ চলছেন লিখে। বাবার পাশে বসে থাকেন ভূষণ। ভূষণ বাবার হাতে এগিয়ে দেন পত্র লেখনী মসী।

বাণ এক অপরাহ্নে লক্ষ করেন ভূষণ লেখনী দিয়ে পত্রের উপর কীসব করছে আঁকাবুকি।

পুত্রের হাত থেকে নিয়ে পত্রটি পাঠ করেন। ভূষণ লিখেছে — "আমি বাগীশ্বর পিতৃদেবকে প্রণাম করি। বহু পুণ্যের ফলে তাঁর দেহ থেকে জন্ম হয়েছে আমার। বাবা আমার লিখেছেন কাদম্বরী।"

লেখনী রেখে বাণ দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে বলেন "ওগো! এসো এসো! শীঘ্র এসো।"

হতভম্ব বাণী সামনে এলে পত্রখণ্ড দেখিয়ে তিনি বলেন " দেখো! দেখো! তোমার পুলিন্দা কী লিখেছে।" বাণী পাঠ করেন।

বাণ জড়িয়ে ধরেন বাণীকে।

স্তব্ধ ভূষণ। করপল্লব অঞ্জলিবদ্ধ করে গুণগুণ করে উচ্চারণ করেন "পার্বতী - পরমেশ্বর দুটি অর্দ্ধদেহের অলক্ষ্য সংযোজনে হয়ে গেছে একটি মাত্র দেহ। আমি ভূষণ। আমি পুলিন্দা। এক দেহে স্থিত পার্বতী পরমেশ্বরকে আমি প্রণাম করি।"

কাহিনির প্রারম্ভে শত শত পাখির আবাস স্থল রূপে শাল্মলী বৃক্ষের রূপ অঙ্কিত। মাতৃহারা পক্ষী শাবকের ভাবনায় তিনি মিশিয়ে দিয়েছেন তার বেদনা। বাণ তার আত্মপরিচয় লিখেছেন - "তার শৈশবকালে মা চলে গিয়েছিলেন স্বর্গে। তার পিতাই ছিলেন মা এবং বাবা।" বাণের ভাষায় চিন্তা করছে শাল্মলী বৃক্ষের মাতৃহারা পক্ষীশাবক। পক্ষী শাবকের বাবা একই দেহে শিশুপক্ষীর মা এবং বাবা।

এরপর ভীষণ এক মৃগয়া চিত্র। ব্যাধ সর্দার নির্দয়ভাবে হত্যা করছে অরণ্যের জীবজন্তু পশুপাখি। ভীষণ এই ব্যাধের নাম দিয়েছেন মাতঙ্গক।

মাতঙ্গক নাম নিয়ে পিতাপুত্রের সরস সংলাপ। মাতঙ্গক নাম রেখে হর্ষদেবের সভাপণ্ডিত এই সাথে তার প্রতিপক্ষ পাণ্ডিত মাতঙ্গ দিবাকরকে নিলেন এক হাত।

কামরূপের প্রবর সেন প্রাকৃত ভাষায় লিখিত " সেতু বন্ধাখ্য" গ্রন্থের লেখক। প্রবর সেন তাঁর গ্রন্থে রামের বসবাসভূমি এবং তার দক্ষিণ দিকের ভূঅঞ্চলকে রামসীতার বনবাস অঞ্চল রূপে চিত্রিত করেছেন। বাণ সেতুবন্ধাখ্য গ্রন্থ অনুসারে তার ভালবাসার সজীব প্রকৃতিকে রাম সীতার বনবাস কাহিনির সাথে দিয়েছেন মিশিয়ে। বাণ লিখেছেন তাঁর আবাস অঞ্চলের আশেপাশে তখনো বিদ্যমান ছিল রামসীতার স্মৃতি ধন্য নানা ধরনের চিহ্ন।

একদিন বাণের কক্ষে মহা হুলুস্থুলু। হাসি-ঠাট্টা আলাপ আলোচনা। ভূষণ ধরে এনেছেন তার মাকে। বাণ লেখনী বন্ধ করে মিটি মিটি হেসে তাকিয়ে আছেন মা-পুত্রের দিকে। ভূষণ বাণের সদ্য লিখা একটি পত্র থেকে শুরু করেন পাঠ —

"কর্ণীসুত কথেব সন্নিহিত বিপুলা চল শশোপগতাচ,

কল্পান্ত প্রদোষ সন্ধ্যেব প্রনৃত্ত নীলকণ্ঠা পল্লবারুনাচ, অমৃত মথন বেলেব শ্রীদ্রুমোপশোভিতা বারুণী পরিগতাচ, প্রাকৃতিব ঘন শ্যামলাক শতহ্রদানং কৃতাচ।"

পাঠ করে ভূষণ মার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন।

"তুমি কী বুঝলে মা?"

বাণী ঃ "না বাবা! আমি কিচ্ছু বুঝি নি।"

ভূষণ ঃ "বাবা, আমাদের ব্রাহ্মণ্যাধিবাসের দক্ষিণ দিকের পাহাড় পর্বতাদির বর্ণনায় লিখেছেন, কর্ণীসুতের কাহিনির শশকআদিতে পরিপূর্ণ বিপুল অচল। বিপুল অচল অর্থ মস্ত বড়ো পর্বত।"

বাণী নিরীহভাবে, কর্ণীসুত সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করলে, ভূষণ বলেন, কর্ণী সুত জনৈক লেখক। তিনি চৌর্যবৃত্তি নিয়ে লিখেছেন দারুণ কাহিনি।

চৌর্যবৃত্তির সাথে সম্পর্কটা কোথায়?"

বাণীর কথা শুনে পিতা পুত্র পরস্পরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন রহস্যপূর্ণভাবে। বাণী, স্বামীপুত্রের চোখে রহস্য পূর্ণদৃষ্টি দেখে আবার তার আগের কথার রেশ টেনে বলেন — মস্ত পর্বতের বর্ণনায় রহস্য কোথায়?

ভূষণ ঃ "পর্বতের বর্ণনায় কর্ণীসুতের উল্লেখ করে, তোমার এই আত্মজউক্ত তিনটি নামের উল্লেখ করেছেন। এরা হল বিপুল অচল এবং বাবার বাল্যবন্ধুর নাম শশ। বাবার এই প্রিয় বাল্যবন্ধু ছিলেন চৌর্যবৃত্তিতে পারদর্শী। বিপুল এবং অচল হচ্ছে তোমার দুই নাতি।"

ভূষণের কথা শুনে, হাসতে হাসতে বাণী কক্ষের মেঝের উপর বসে পড়লে, ভূষণ এগিয়ে এসে তাঁকে বসিয়ে দেন বেতের মোড়ায়।

বাণীর সর্বক্ষণের সঙ্গী তাঁর দুই নাতি বিপুল এবং অচল। বিপুল প্রায় পাঁচ এবং অচল চার বছরের শিশু। জোড়া বেঁধে দুজন বাণের কক্ষে প্রবেশ করে, সুযোগ করে হাতিয়ে নেয় বাণের ময়ূর পাখার রঙীন লেখনী। লেখনী না পেয়ে যখন তখন ওঠে বাণের হুঙ্কার। বাণী সামাল দেন পরিস্থিতি।

বাল্যকালে বাণী দেখেছেন শশাকে। তার লম্বা হাতের নানা কাহিনি সর্বজন পরিচিত। কিন্তু শশ নামের সাথে তাঁর আদরের নাতি দুটির নাম গেঁথে দেওয়া বাণীর পছন্দ হয় না।

বাণীর মনোভাব শুনে ভূষণ বলেন — 'মা! তুমি হয়তো জান না, শশ কাকা এখনো বাবার প্রিয়বন্ধু। শশ কাকা, সাহস পান না বাবার সাথে দেখা করতে। কবছর আগে তিনি, তাঁর ছেলেকে পাঠিয়ে খরিদ করে নিয়েছেন চারশটি হর্ষচরিত গ্রন্থ। সে সব গ্রন্থ দেশ জুড়ে বিক্রি হচ্ছে। "সম্ভবত তাই তার প্রিয় বাল্যবন্ধুর নামের সাথে তো তোমার দুই নাতির নাম দিয়েছেন গেঁথে।" "সম্ভবত তাই, তাঁর প্রিয় বাল্যবন্ধুর নামের সাথে তো পরবর্তী আলোচনার বিষয় হয় বাণের পত্রে লিখিত "কলপান্ত প্রদোষ সন্ধ্যেব প্রনৃত্ত নীলকণ্ঠা পল্লব বারুণাচ" অংশ নিয়ে।

ভূষণ উদ্ধৃতাংশের গভীর গোপন তাৎপর্য, পিতার সামনে বিশ্লেষণ, করেন উদ্ঘাটন।

বাণ, বাক্যের আড়ালে নানা শব্দের বিচিত্র গুচ্ছ দিয়ে নির্মাণ করেছেন, তার প্রিয় জন্মভূমির চিত্রমালা। জন্মভূমি ময়ূর শাল্মল অগ্রহারের রূপ এই বাক্যমালায় গ্রথিত।

নীলকণ্ঠা শব্দ চিহ্নিত করছে, ময়ূর শাল্মল নামের "ময়ূর" শব্দটিকে।

উজ্জ্বল শাল্মলী ফুলের শোভা নিয়ে, শাল্মল অঞ্চল তার লাল রঙের রূপ করছে উদ্ঘাটন। শাল্মলের লাল রং যেন, কল্পাশুের অর্থাৎ কল্পকালের শেষ লগ্ন সন্ধ্যার রুদ্র-রুধির বর্ণ।

ভূষণ, বাণীকে বলেন, ময়ূর শাল্মল অঞ্চল, তার পিতার লেখনীতে এমনিভাবে, নীল-লোহিতে হয়ে উঠেছে চিরভাস্বর।

ভূষণের কথা শুনে বাণীর চোখে ভেসে ওঠে উত্তরায়ন সংক্রান্তির পিঠে পার্বণের ছবি। কঠিন শ্রমে নারিকেলের খোসা উন্মোচন করে বের করতে হয় মধুর কোমল শাঁস। শাঁস দিয়ে তৈরী হয় পিঠা। ভূষণ তেমনিভাবে, কঠিন অংশ ছেদন করে উন্মোচন করছে মধুর কোমল নারিকেলের শাঁস।

"অমৃত মথন বেলেব" উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে ভূষণ বলেন, এই শব্দ মালায় অঙ্কিত হয়েছে, গঙ্গিনিকা এবং শোনবিলের বেলাভূমির শুভ্র বালুকারাশি। এই শ্বেতশুভ্র চরভূমি যেন, সমুদ্র মন্থনে উত্থিত শুভ্র শ্বেত অমৃত রাশি।

"শ্রী দ্রুমোপশোভিতা" প্রসঙ্গে বলেন, এই শব্দ রাশিতে তার পিতা পরিচ্ছন্নভাবে "শ্রীফল" নামক অঞ্চলের কথা ব্যক্ত করেছেন।

ভূষণ "শ্রীফল" অর্থ বিল্ব ফল এবং শ্রীদ্রুমের অর্থ বিল্ববৃক্ষ রূপে ব্যাখ্যা করে বলেন, মাস কতক আগে, তাঁর পিতা চন্দ্রপুরের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে, পুরোনো অঞ্চলের নব নামকরণ করেছেন। পুরানো নামের মধ্যে ছিল বিশাল উডুম্বরী বা ডুম্বরী অঞ্চল। ডুম্বরী এক ধরনের নিকৃষ্ট ফল। তাই ডুম্বরী অঞ্চলের একটি অংশের নামাকরণ করা হয়েছে "শ্রীফল"।

মা ছেলের কথায় নাক গলান বাণ। গর্বের সাথে বলেন, ইতিমধ্যে রাজকীয় তাম্রপত্রাদিতে "শ্রীফল" নাম লিখা শুরু হয়ে গেছে।

বাণ, ভূষণকে বলেন, এই উদ্ধৃতির মধ্যে অন্য একটি নাম আছে। ভূষণ আবার করেন পাঠ কিন্তু হদিস পান না। বাণ নিজে উদ্ধৃত করেন - "ঘন শ্যামলাক শত হৃদাসং কৃতাচ।"

মা ছেলে এক সাথে আবিষ্কার করেন বাণের প্রিয়তম নাম শামল। কনিষ্ঠ শ্যামল, বাণের বিশেষ প্রিয়পাত্র, একথা সর্বজনজ্ঞাত।

*　　　*　　　*

এক সকালে বাণ লিখেছেন। পাশে ভূষণ। এমন সময় শোনা যায় ঢোলের শব্দ। বাণের পরিচিত গোপালের ঢোলের শব্দ। বর্তমানে, লোহিতাক্ষ গোপাল পদে অধিষ্ঠিত। ঢোল বাজিয়ে ঘোষণা করা হচ্ছে যুদ্ধের সংবাদ এই সাথে ঘোষিত হচ্ছে স্থানীয় গোপপ্রধানগণের জরুরি অধিবেশনের স্থান এবং কাল।

কিছুক্ষণের মাঝে শ্রীতিকূট প্রাঙ্গণে গোপাল পদের আনুষ্ঠানিক প্রথাগত বেশে, অশ্ব থেকে

অবতরণ করেন লোহিতাক্ষ। দুই বন্ধুর উষ্ণ আলিঙ্গন। ভোজন এবং সংক্ষিপ্ত বিশ্রামের আড্ডা।

লোহিতাক্ষ সরস ভাষায়, আদ্য রাজা ভাস্করের যুদ্ধ অভিযানের কথা বন্ধুর কাছে ব্যক্ত করেন। সরস ভাষা বলার কারণ, এই যুদ্ধে কামরূপের চন্দ্রপুরাদি অঞ্চলের নেই কোন আশঙ্কা। হাজার হাজার যুদ্ধনৌকায়, ভাস্কর, গঙ্গিনিকার জল ঢেকে দিয়েছেন। মূল যুদ্ধ হবে কঙ্গোদ অর্থাৎ কলিঙ্গ ভূমিতে।

বাণ যুদ্ধের কারণাদি জানার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে, লোহিতাক্ষ এই যুদ্ধের এক সুবৃহৎ পটভূমিকা চিত্রিত করেন সংক্ষিপ্তভাবে।

লোহিতাক্ষ বলেন, বছর দশেক আগে দ্বিতীয় পুলকেশীর হাতে পরাজিত হয়েছিলেন হর্ষবর্দ্ধন। পুলকেশী "পরমেশ্বর" উপাধি গ্রহণ করে শুরু করেন তার সাম্রাজ্য বিস্তার। রাজ্য বিস্তার করে করে পৌছে গেলেন কলিঙ্গ দেশে। কলিঙ্গ দেশের পূর্বাংশে তখন শশাঙ্ক ছিলেন রাজা। শশাঙ্ক এবং পুলকেশী সন্ধি করে মিলে মিশে থাকেন কলিঙ্গ দেশে। বর্তমানে বসন্ত রোগে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তার পুত্র নরেন্দ্র হয়েছেন পূর্ব কলিঙ্গের রাজা।

ইতিপূর্বে কলিঙ্গ দেশে পৌছানোর আগে দ্বিতীয় পুলকেশী পল্লবরাজ মহেন্দ্রকে পরাজিত এবং বন্দী করে দখল করেছিলেন পল্লব রাজ্য।

বাণ মহেন্দ্র বর্মনের পরাজয় কাহিনি সম্পর্কে বলেন, বিষয়টি তার জ্ঞাত। সেই সময়ে কান্য কুব্জে আয়োজিত হয়েছিল মস্ত এক উৎসব। হর্ষদেব উৎসবে হাজির হবেন বলে কান্যকুব্জ নগরী সেজে উঠেছিল দারুণভাবে। কিন্তু হর্ষদেব হাজির হলেন না উৎসবে। কারণ তার প্রিয় বান্ধব পল্লব রাজ মহেন্দ্র বর্মাকে পুলকেশী বন্দী করে নিক্ষেপ করেছিলেন কারাগারে।

লোহিতাক্ষ বলেন পরবর্তী কাহিনি অতিগোপনীয়। হর্ষদেব, অতি গোপনে বন্ধু মহেন্দ্র বর্মার পুত্রকে শক্তি এবং অর্থ যোগাতেন। বন্ধুপুত্র নরসিংহ বর্মা ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করে পুলকেশীর রাজ্য করেন আক্রমণ। আক্রমণে নাস্তানাবুদ হয়ে পুলকেশী দাক্ষিণাত্যের পূর্ব দিকে ক্রমশ হটে যাচ্ছেন।

কলিঙ্গ দেশ সম্পূর্ণ অরক্ষিত। উৎকলের পিছনে নেই পুলকেশীর সুরক্ষা কবচ। শশাঙ্কের পুত্র নরেন্দ্র সদ্য সিংহাসনে আরোহন করে হয়ে গেছেন হতভম্ব।

বাণ বলেন, তাহলে আদ্য রাজা ভাস্কর দেব নিশ্চয়ই আক্রমণ করবেন কলিঙ্গ রাজ্য।

লোহিতাক্ষ বাণের বক্তব্য প্রসঙ্গে বলেন, তিনি যুদ্ধ সম্পর্কে যতটুক আঁচ করছেন, তাতে মনে হয় ভাস্কর দেব কলিঙ্গ দেশ সরাসরি আক্রমণ না করে, শুধুমাত্র অবরোধ করে রাখবেন গঙ্গিনিকা অর্থাৎ পশ্চিম সাগর।

বাণ লোহিতাক্ষের এমনি ধারণার কারণ জিজ্ঞাসা করলে লোহিতাক্ষ বলেন, যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি যতটুকু সংবাদ সংগ্রহ করেছেন তাতে মনে হচ্ছে হর্ষদেব উত্তর দিকে মগধ অঞ্চল

দখল করে মগধ থেকে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে এসে শশাঙ্কের অর্থাৎ বর্তমানের নরেন্দ্রের রাজ্য গঞ্জাম দখল করবেন। হর্ষদেব গঞ্জাম কব্জা করে এই দিক থেকে চেপে ধরবেন পুলকেশীকে। অন্যদিক থেকে পুলকেশীকে আক্রমণ করবেন মহেন্দ্র বর্মনের পুত্র নরসিংহ বর্মন।

লোহিতাক্ষের যুদ্ধ বিশ্লেষণ শুনে বাণ জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে গঙ্গিনিকা অবরোধের কারণ কি?

লোহিতাক্ষ বলেন, নানা কারণে গঙ্গিনিকা অবরোধ করা হয়েছে। প্রথম কারণ হর্ষদেব এবং মহেন্দ্র বর্মনের দুই দিক থেকে চেপে ধরা পুলকেশী হঠাৎ করে পূর্বদিকে এগিয়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করতে পারেন। পূর্বদিকে পালাতে গেলে পশ্চিম সাগর অর্থাৎ গঙ্গিনিকা অতিক্রম করে সরাসরি ভাস্কর বর্মনের কামরূপ রাজ্যে ঢুকে যেতে পারেন। এমনি সম্ভাব্য পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য ভাস্কর দেব অজস্র নৌসৈন্য সমবেত করেছেন গঙ্গিনিকায়।

গঙ্গিনিকার অবরোধের অন্যতম কারণ গঞ্জাম অঞ্চলে, হর্ষবর্দ্ধনের যুদ্ধ বাহিনীর যুদ্ধ সামগ্রী খাদ্য ইত্যাদি সরবরাহ একান্ত আবশ্যক। ভাস্কর দেব এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

* * *

মাসকাল সময়ের মধ্যে জানা গেল এই যুদ্ধের পরিণাম। নরসিংহ বর্মা দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্য দখল করে তাকে করেছেন হত্যা। গঞ্জাম এবং মগধের বিস্তারিত অঞ্চল হয়েছে হর্ষদেবের করতলগত। হর্ষদেব বিশেষ গৌরাবান্বিত — কারণ নালন্দা তার সম্পূর্ণ হস্তগত।

* * *

এক সন্ধ্যায় জনৈক পূজারী এসে বাণের হাতে প্রদান ক... একটি বেলপাতা। পূজারী বলে, সন্ন্যাসী বক্রঘোন পাঠিয়েছেন পরমেশ্বরের আশীর্বাদ। বাণ উপলব্ধি করেন বক্রঘোন এসে গেছে তার খাসোক পুষ্করিণীর তীরবর্তী মন্দিরে।

শেষ রাতে বাণ উপস্থিত হলেন মন্দিরে।

বক্রঘোন হর্ষবর্দ্ধনের কঙ্গোদ বিজয়ের পরবর্তী ঘটনা প্রকাশ করে। হর্ষবর্দ্ধন গঞ্জাম বিজয় করে প্রবেশ করেছিলেন কঙ্গোদ দেশের অভ্যন্তরে। কঙ্গোদ অর্থাৎ কলিঙ্গের এক বিরাট জনতা তাকে করেছিল ঘেরাও। ঘেরাও কারীগণ মূলত হীনযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়। হীনযানীদের অভিযোগ, হর্ষবর্দ্ধন নালন্দা দখল করে সেখানে শুরু করে দিয়েছেন কাপালিক চর্চা।

বক্রঘোন বলে, হীনযানীদের দলে ভিড়ে সেও ছিল এই ঘেরাও দলের মাঝে।

বাণ জিজ্ঞাসা করেন, হর্ষদেবের কথা। ঘেরাও অবস্থায় হর্ষদেব কী করেছিলেন এবং কি বলেছিলেন?

বক্রঘোন বলে ঘেরাও অবস্থায় হর্ষ মহাযানী মতবাদ নিয়ে নানা কথা বলেছিল। তর্ক জমে ছিল ভীষণভাবে। শেষ পর্যন্ত হর্ষ ঘোষণা করে হীনযান এবং মহাযান মতবাদ নিয়ে তর্কযুদ্ধ

আহ্বান করা। তর্কযুদ্ধে স্থির হবে — কোন্ মতবাদ শ্রেষ্ঠ।

ভোর হবার পূর্বে বাণ ফিরে আসেন প্রীতিকূট ভবনে।

* * *

দীর্ঘদিন বাণের লেখনী স্পর্শ করেনি পত্র। যুদ্ধের হৈ হট্টগোলে লেখালেখি সম্পূর্ণ বন্ধ।

বক্রঘোনের সাথে কথাবার্তার পর বাণের মনে রাজা মহারাজা সম্রাটদের আচার আচরণ এবং মানসিকতা সম্পর্কে নানা চিন্তার উদয় হয়। রাজাদের ভীষণ মানসিকতায় তাদের প্রতি বীত শ্রদ্ধ হয়ে উঠে তার মন। নৃপতিগণ শঠ-প্রবঞ্চক। বাণ স্থির করেন, এসব কথা তিনি লিখবেন। বিশেষ করে লিখবেন হর্ষবর্দ্ধন সম্পর্কে। বক্তব্য প্রকাশিত হবে গূঢ় রহস্যময় ভাষার অন্তরালে।

অনেক দিন পর লিখতে বসলেন। বাণের পাশে ভূষণ। ভূষণ লেখনী মসী এবং লেখার পত্র প্রস্তুত করে রেখেছেন। বাণ তার লেখার আসনে বসে স্থির করেন, আজ ভীষণ কিছু লিখবেন।

কাদম্বরী কাহিনীতে এসে গেছে চন্দ্রাপীড়ের রাজপদের অভিষেক উৎসব। মহারাজা তারাপীড়ের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী শুকনাস রাজধর্ম এবং রাজনীতি সম্পর্কে চন্দ্রাপীড়কে উপদেশ দেবেন। বাণের লেখনী গর্জন করে ওঠে পত্রের বুকে।

গর্জন করে তার লেখনী বলে — "চন্দ্রাপীড়! আমি দেখেছি রাজলক্ষ্মীর হাত থেকে মদিরা পান করে রাজাগণ মনে করেন তাদের চেয়ে জ্ঞানী পুরুষ বিশ্বভুবনে আর নেই। তারা সাধু পুরুষদের বাঁকা হাসির সাথে বলেন — পাগল! উন্মাদ!; জুয়াখেলা তাদের কাছে এক নির্মল আনন্দ। মৃগয়া হচ্ছে সাধারণ দৈহিক ব্যায়াম। মদ্যপান করা — তাদের সুখকর বিলাস। পরস্ত্রীকে সম্ভোগ করা — সূক্ষ্ম এক সুনিপুণ কলাবিদ্যা। দেবতাকে অস্বীকার করা — প্রকৃত মহাজ্ঞানীর লক্ষ্মণ।"

বাণ লিখছেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে। একটি তালপত্র শেষ হলে অন্যটিতে শুরু করেন।

"রাজা মহারাজাগণ, নিজদের সম্পর্কে ভাবেন, তারা হচ্ছেন মস্ত এক সর্ব্বশক্তিমান দেবতা। তারা অনুভবন করেন তাদের ললাটের মধ্য স্থলে বিদ্যমান গনগনে এক তৃতীয় নয়ন। ক্ষমতার দম্ভে সৎ মানুষগণকে পুড়িয়ে ভস্ম করে এই তৃতীয় চক্ষুর গনগনে আগুন।"

সৎ মানুষগণকে তৃতীয় চক্ষুর আগুনে ভস্ম করার কথা লিখে তিনি অনুভব করেন তাঁর সর্ব দেহে এক ভীষণ অগ্নিদাহ। পিপাসা পায়। গলা কাঠ হয়ে উঠে পিপাসায়। কিন্তু কোন এক দুর্বার শক্তির অমোঘ নির্দেশে লেখনী পত্রের উপর গর্জন করে এগিয়ে চলে —

"এইসব রাজাদের গুরু হচ্ছে, তন্ত্রাভিলাষী কাপালিক। এইসব রাজ গুরুগণ মারণ মন্ত্র-তন্ত্রে ভীষণ ক্রুর। ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র আবিষ্কারের সাধনায় কাপালিক শিষ্য নৃপতিগণ নিমগ্ন। নৃপতিগণের আকাঙ্ক্ষা এবং কামনা হচ্ছে ভীষণতম মারণাস্ত্রের রক্তাক্ত ব্যবহারে অজস্র মানুষের ভয়ঙ্কর মৃত্যু। রাজাদের হৃদয়ে দয়া নেই, মায়া নেই। ওরা হত্যার নেশায় উন্মাদ। ওরা হত্যার

বিভীষিকা ছড়িয়ে দেয় সর্বদিকে। এমন কি যে ভ্রাতা তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে সেই নির্মল প্রাণের ভ্রাতাকে হত্যা করে নিষ্ঠুরভাবে।"

"ভ্রাতাকে হত্যা করে নিষ্ঠুরভাবে।" লিখে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে "বক্রঘোন! বক্রঘোন!" বলে চীৎকার করে উঠেন।

চীৎকার শুনে ছুটে আসেন বাণী চণ্ডক এবং ভূষণ। বাণী এগিয়ে এসে হাত থেকে লেখনী নিয়ে বসিয়ে দেন আসনে। বাণ, স্বপ্ন ভেঙ্গে জেগে উঠেন।

* * *

বাণ ক্লান্ত। কান্তি তার সর্ব দেহমনে। সপ্তাহ কেটে গেল একটি আঁক পড়েনি পত্রে। বাণের চোখে বক্রঘোনের অক্ষিকোটরের অভ্যন্তরের করাল দৃষ্টি জ্বলাজ্বল করে। কর্ণে ধ্বনিত হয় বক্রঘোনের কণ্ঠের হিস্ হিস্ শব্দ "হর্ষের হস্ত ভ্রাতৃরক্তে রঞ্জিত।"

বাণের আনমনা ভাব লক্ষ করেন বাণী এবং ভূষণ। শেষ পর্যন্ত ভূষণ সরাসরি বাবাকে তাঁর দুশ্চিন্তা এবং আনমনা ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করে। অসহায় বাণ প্রকাশ করেন তাঁর মানসিক দ্বন্দ্ব এবং যন্ত্রণার কথা।

বাবার স্বীকারোক্তি শুনে, অভিমানে রুদ্ধ হয় ভূষণের কণ্ঠ। অভিমানে রুদ্ধ প্রায় কণ্ঠে ভূষণ বলেন, হর্ষচরিত গ্রন্থ তিনি তার অক্ষরজ্ঞান কাল থেকে করছেন অধ্যয়ন। প্রতিটি শব্দ প্রতিটি বাক্য তাঁর কণ্ঠস্থ। প্রতিটি শব্দ প্রতিটি বাক্য প্রাণবন্ত হয়ে তাঁর হৃদয়ের গভীরতম দেশে, হাসে কাঁদে কথা বলে।

ভূষণ বলে, বাবা ইচ্ছা করে এক নিষ্ঠুর সত্যকে শব্দ এবং বাক্যের আড়ালে রেখেছেন গোপন করে।

ভূষণ সজল চোখে অঞ্জলিবদ্ধ করপল্লবে বলে — "বাবা! তুমি নীলকণ্ঠ! কঠিনতম সত্যের হলাহল পান করে তুমি নীলকণ্ঠ।"

ভূষণ হর্ষচরিতের পঞ্চম উচ্ছাস পাঠ করে করে প্রশ্ন করেন — "মহারাজা প্রভাকর বর্দ্ধনের মৃত্যুর পূর্বেই মহারাণী যশোবতী অগ্নিতে প্রবেশ করে আত্মহত্যা করলেন কেন?"

ক্ষুব্ধ ভূষণ বলেন, "আমি জানি, আমার পিতা বাণভট্ট জ্ঞানী পণ্ডিত। তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। আমার মহাজ্ঞানী বাবা ভালো করে জ্ঞাত আছেন যে আত্মহত্যা মহাপাপ। এই পাপকে শোক দুঃখ বেদনা এসব মিথ্যা কথার ছলনায় ঢেকে রাখলেন কেন?"

উত্তেজিত ভূষণ হর্ষচরিত পাঠ শুরু করেন। এই অংশে তার পিতার লেখনী, হর্ষবর্দ্ধনের মনোভাব চিত্রিত করেছে। হর্ষদেব বলছেন —

"প্রজাধর্ম যদি প্রবজ্যা নেয়? — নিক।"

"মানবতা যদি বিধবার মত বেণী বাঁধে? — বাঁধুক।"

"রাজলক্ষ্মী যদি আশ্রমে যেতে চান? — যান।"

"এখন সত্যবাদিতা ঘুমাবে। শাস্ত্র বিফল। অসিমাত্র বিক্রম।"

হর্ষবর্দ্ধনের মানসিকতা পাঠ করে করে নিদারুণ আবেগে কম্পিত হতে থাকে ভূষণের কণ্ঠ।

ভূষণ বলেন, তার পিতা হর্ষবর্দ্ধনের বক্তব্যের মধ্যে আপন মনোভাব করেছেন প্রকাশ। প্রভাকর বর্দ্ধনের মৃত্যুর পর রাজ্যের ভীষণ পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে হর্ষদেবের কণ্ঠে চাপিয়ে দিয়েছেন আপন হৃদয়ের অভিব্যক্তি।

বাণ উপলব্ধি করেন, তাঁর পুলিন্দা তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে বিচারের কাঠগড়ায়।

উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে ভূষণ। সে ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস বের করে পাঠ করতে থাকে রাজ্যবর্দ্ধনের সংলাপ। রাজ্যবর্দ্ধন হর্ষকে বলছেন — "গ্রহণ করো রাজ্যলক্ষ্মী। ত্যাগ করলাম আমার অস্ত্র।" বাণ তখন এমনি ভাষায় বসিয়েছেন সংলাপ। "আমি তো দাদার মধ্যে আগে কখনো, এমন প্রভুত্ব করার বাসনা দেখিনি। যে বাসনা নিষ্ঠুর। নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য একান্ত নিষ্ঠুর।"

ভূষণ পিতার দিকে তাকিয়ে বলেন, পিতা হর্ষের মুখ দিয়ে রাজ্যবর্দ্ধনের সন্দেহের কথা বলিয়েছেন এমনি ভাষায় — "নিশ্চয়ই কোন অসহিষ্ণু ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে কিছু লাগিয়েছে।"

চণ্ডক কক্ষে ছিল। তার অনেক কাজের মধ্যে একটি হচ্ছে বাণকে তাম্বুল কুটে দেওয়া। বাণের দাঁত ঝরঝরে।

চণ্ডক খবর দেয় বাণীকে। বাপ বেটায় ঝগড়া লেগেছে। ছুটে এসে বাণী প্রথমেই ভূষণকে অভিযুক্ত করে বলেন — "পুলিন্দা! স্বভাব তোর পাল্টাল না। ভুল করিস পাঠ আবার চেঁচিয়ে তর্ক করিস।"

ভূষণ বলেন — "দেখোতো মা! এমনি ঘটনা ঘটা কি উচিত? এই বলে ভূষণ পাঠ করেন — "প্রভাকর বর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর বহু বল্লভ ভৃত্য সুহৃদ সচিব স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করে চলে গেলেন সুদূর তীর্থাশ্রমে সন্ন্যাসী হয়ে। কেউ বা গেলেন হিমালয়ের তুষার শিখরে অথবা অনেক দূর প্রদেশে। কেউ বা বাস করতে লাগলেন বনকরীদের সাথে বিন্ধ্যাচলের জঙ্গলে।

ভূষণের পাঠ কান পেতে শুনে বাণী বলেন — "মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধন ভালো মানুষ ছিলেন। তাই তার মৃত্যুর পর ও মনের দুঃখে সবাই চলে গেছে রাজ্য ছেড়ে।" বাণী এই কথা বলে খানিক ভেবে ভূষণের মুখের দিকে তাকিয়ে — বলেন — "কিন্তু.....।"

বাণীর এই "কিন্তু" শুনে ভূষণ এবং বাণ একই সাথে বলে উঠেন "কিন্তু — কী?"

বাণী বলেন — "প্রভাকর বর্দ্ধনের মৃত্যুকালে তাঁর ছেলেরা ছিল ছোটো! ওদেরে ফেলে

রেখে বড়োদের চলে যাওয়া ঠিক হয়নি।"

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ভূষণের মুখ। ভূষণ বলেন —"মা! তুমি ঠিক ধরেছ। আমার বাবা জেনে শুনে রাজ্যের অরাজকতা এবং হর্ষবর্দ্ধনের নিষ্ঠুরতার ছবি আঁকার চেষ্টা করেছেন রেখে ঢেকে, আড়ালে আবডালে। বাবা ভালো করে জানতেন হর্ষবর্দ্ধন এবং তার দুষ্টচক্র মিথ্যাপ্রচার চালিয়ে সাধারণ মানুষের মনে বিশ্বাস সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল এই বলে যে, রাজ্য বর্দ্ধনের হন্তা হচ্ছে গৌড়ের সর্পরাজ অর্থাৎ নাগ। আমার বাবা ভালো করে জানতেন এই মিথ্যাপ্রচারের কথা। তাই মা! তোমার এই আয্যউত্ত, কথার মারপ্যাচে, তার নিজস্ব সত্যের সতীত্ব রক্ষা করেছেন মাত্র। তাই রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যাকারী সম্পর্কে লিখেছেন — "চণ্ডালেও এমন কাজ করে না। নাম গ্রহণ করব না এই পাপীটার। পাপপঙ্কে লিপ্ত হবে আমার জিহ্বা।"

তিনজন কক্ষের অভ্যন্তরে সম্পূর্ণ স্তব্ধ। কিছুক্ষণ পর স্তব্ধতা ভঙ্গ করে ভূষণ বলেন — "হর্ষচরিত গ্রন্থ সাহিত্যের নানা অলঙ্কারে সাজানো গলিত শবদেহের স্তূপমাত্র। মাস কয়েকের মধ্যে রাজপরিবারে বয়ে গেছে মৃত্যুর স্রোত। স্রোতে প্রবাহিত প্রভাকরবর্দ্ধন রাজ্যবর্দ্ধন যশোবতী রসায়ন গ্রহবর্মার শবদেহ।'

বাণের দিকে তাকিয়ে অভিমান- কম্পিত কণ্ঠে বলেন - "বাবা! কঠিনতম সত্যকে কেন তুমি একা আস্বাদন কর[illegible] কেন বাবা! অন্তত তোমার পুলিন্দাকেও অংশীদার করলে না?"

বাণের চোখে অশ্রু- সার্থক তার গ্রন্থ লেখা। তার পুলিন্দা, ভাষার অরণ্য ভেদ করে প্রবেশ করেছে সত্যের কঠিনতম দুর্গে। দুর্গে প্রবেশ করে, তার পুলিন্দা প্রত্যক্ষ করেছে সাহিত্যের বাগেশ্বরী প্রতিমা।

*　　　*　　　*

মাস খানেক পর এক মধ্যদিনের প্রথম ভাগে প্রীতিকূট প্রাঙ্গণে উঠে অশ্বক্ষুর ধ্বনি। বাণ বের হয়ে দেখেন লোহিতাক্ষ টান টান হয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে। দুজনের মুখভরা হাসি। ঘোড়ার পিঠে বসে থেকেই বলেন "দারুণ খবর আছে।"

বাণের কক্ষে বসে লোহিতাক্ষ বলেন — "ভাস্করদেব এক কাণ্ড করে বসেছেন। চীনা পণ্ডিত হিউয়েন সাংকে রক্ত চক্ষু দেখিয়ে এনেছেন কামরূপে।"

বাণের চোখে কৌতুহল। কোন প্রশ্নের আগেই লোহিতাক্ষ বলেন — " হর্ষদেবের কঙ্গোদ বিজয়ের পর পরই ভাস্কর দেব নালান্দায় পত্র পাঠিয়ে হিউয়েন-সাংকে আমন্ত্রণ করেন কামরূপে। উত্তর দিলেন হিউয়েন-সাং এই মুহূর্তে তার কামরূপ দর্শন সম্ভব নয়। হাতে দারুণ সব কাজকর্ম। পত্র পেয়ে আদ্যে রাজা রেগে টং। আদ্য রাজা ভাস্করের দ্বিতীয় পত্র গেল নালান্দায়। এবার অনুরোধ নয়, হুকুম। হিউয়েন সাংকে আসতেই হবে কামরূপে। না এলে ভাস্কর দেব স্বয়ং যাবেন। সঙ্গে থাকবে তার হস্তীবাহিনী। হস্তীবাহিনী চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে নালান্দা।

শেষপর্যন্ত নালন্দা মহা বিদ্যালয়ের কুলপতি শীলভদ্রের পরামর্শে হিউয়েন সাং এসেছেন

কামরূপে।"

দুজনের মধ্যে কথা ওঠে শীলভদ্রকে নিয়ে। শীলভদ্র চন্দ্রপুরের রাজকীয় বিদ্যাশ্রমে লোহিতাক্ষের একশ্রেণী উপরে অধ্যয়ন করতেন। শীলভদ্রের সাথে বন্ধুত্ব ছিল লোহিতাক্ষের। লোহিতাক্ষের সাথে শীলভদ্রকে বাণ দেখেছেন দুচারবার। শীলভদ্র ছিলেন সমতটের রাজপুত্র।

বাণের জিজ্ঞাসা হিউয়েন-সাং কি সে কাজ নিয়ে ছিলেন এমন ব্যস্ত? আদ্য রাজাই বা কেন আনালেন জোর করে?

লোহিতাক্ষ উত্তরে বলেন — "হিউয়েন-সাং ব্যস্ত ছিলেন হর্ষদেবের কাজ নিয়ে। হর্ষদেবের কঙ্গোদ বিজয়ের পর সেখানকার হীনযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায় হর্ষদেবকে ঘেরাও করেছিল। হীনযানীদের অভিযোগ হর্ষদেব কেন নালন্দা বিহারে বৌদ্ধধর্মের নামে শুরু করেছেন কাপালিক ধর্মচর্চা? ঘেরাও অবস্থায় হর্ষদেব ঘোষণা করেন তর্কযুদ্ধের কথা। পরবর্তী তর্কযুদ্ধে স্থির হবে বৌদ্ধধর্মের কোন "যানের মতবাদ শ্রেষ্ঠ।"

বক্রঘোনের কথা বাণের মনে পড়ে। বক্রঘোন বিস্তারিত ভাবে বলেছিল কঙ্গোদ যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়। বাণ সম্পূর্ণভাবে চেপে গেলেন বক্রঘোন প্রসঙ্গ।

লোহিতাক্ষ বলেন, হর্ষদেব তর্কযুদ্ধেব প্রধান বক্তারূপে মনোনীত কবেন, হিউযেন-সাং কে। নালন্দা বিহারে মহাযানপন্থী অন্যান্য পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন প্রাজ্ঞরশ্মি সিংহরশ্মি এবং সাগরমতী। কিন্তু প্রতিপক্ষ হীনযান মতবাদ সম্পর্কে এই সকল বিখ্যাত পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল ভাসাভাস এবং অস্বচ্ছ।

বাণ জিজ্ঞাসা করেন হিউয়েন সাং চৈনিক বৌদ্ধ পণ্ডিত। তাঁকে হর্ষদেব কেন এত গুরুদাযিত্ব প্রদান করলেন?

লোহিতাক্ষ বলেন, মাস কতক আগে, জনৈক ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় পণ্ডিত হিউয়েন সাং এর নিকট তর্কযুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল। হিউয়েন সাং, মস্ত এক জ্ঞানীপুরুষ।

পরাজিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় পণ্ডিত নালন্দা বিহারের কাছে বাস করতেন এক গ্রামে। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় পণ্ডিত হলেও ব্রাহ্মণ নন। তিনি ক্ষত্রিয়।

বাণ জিজ্ঞাসা করেন ক্ষত্রিয় পণ্ডিতের নাম। লোহিতাক্ষ বলেন, ক্ষত্রিয় পণ্ডিতের নাম মনে নেই তবে কামরূপের অধিবাসী এবং অধ্যয়ন করেছেন চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমে।

বাণের মুখ দিয়ে নির্গত হয় জয়সেনের নাম। লোহিতাক্ষ বলেন — "সত্যিই এই পণ্ডিতের নাম জয়সেন। জয়সেন তার তর্কযুদ্ধের আগে কামরূপে এসে ভাস্করদেবের সাথে সাক্ষাৎ করে গেছেন।

দুজনের মধ্যে জয়সেন প্রসঙ্গে কথা উঠে। লোহিতাক্ষ ছাত্র অবস্থায় দেখেছেন জয়সেনকে। লোহিতাক্ষ তার কণ্ঠস্বর নামিয়ে বলেন, তার বিভাগের বিভিন্ন গোপ জয়সেন সম্পর্কে পরিবেশন

করেছে নানা তথ্য।

বাণ বলেন, জয়সেন তার প্রীতিকূট এসেছিলেন এবং হিউয়েন সাং সম্পর্কে দারুণ প্রশংসা করেছেন।

লোহিতাক্ষ বলেন, সে খবর তার জ্ঞাত। এই সাথে গোপদের বাচনে জানা গেছে হর্ষবর্দ্ধনের সভাপণ্ডিত বাণভট্টকে জয়সেন তিনি বিশ্বাস করেন না। তাই রেখে ঢেকে কথা বলেছেন।

বাণ, লোহিতাক্ষের দিকে তাকিয়ে ভাবেন লোহিতাক্ষের কথা। লোহিতাক্ষ রাজা অথবা সম্রাট নন। তবু তাঁর কর্মপদ্ধতি রাজনীতি সম্পর্কীয়। বাণ সাবধান হলেন।

লোহিতাক্ষ বলেন, জয়সেন নাকি ভাস্করদেবের সাথে সাক্ষাৎ করে গেয়ে গেছেন ব্রাম্মাণ্য ধর্মের গৌরব কথা। প্রসঙ্গত হর্ষদেবকে চিহ্নিত করে গেছেন — ব্রাম্মাণ্যধর্মের শত্রুরূপে।

জলযোগের ব্যবস্থাসহ কক্ষে ভূষণ প্রবেশ করলে জয়সেন প্রসঙ্গ ত্যাগ করে কথা ওঠে হিউয়েন-সাং প্রসঙ্গে।

লোহিতাক্ষ এখন হিউয়েন-সাংকে নিয়ে ব্যস্ত। কামরূপের নানা গৌরবপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত করাতে হবে হিউয়েন সাংকে। অপরাহ্নে বিদায় নেবার আগে লোহিতাক্ষ বলেন, তিনি আবার এসে বাণকে হিউয়ন-এর কামরূপ ভ্রমণ বৃতান্ত জানাবেন।

লোহিতাক্ষ যাবার পর ইতিমধ্যে কেটে গেছে মাস দেড়-দুই। বাণের লেখনী নম নম করে চন্দ্রাপীড়কে দিগ্‌বিজয়ে পাঠিয়ে পৌঁছে দিয়েছে পূর্বভারতের সুবর্ণপুরের জয়স্কন্ধাবারে। বাণ, কর্ণসুবর্ণের নাম দিয়েছেন সুবর্ণপুর।

সুবর্ণপুর থেকে মস্ত এক লাফ . চন্দ্রাপীড় তার অশ্ব ইন্দ্রায়ুধের পৃষ্ঠে আরোহণ করে উপস্থিত হয়েছেন বাণের একান্ত ভালোবাসার জন্মভূমিতে।

বাণ, এখানে আবার সঠিকভাবে ভূগোল অনুসরণে সুবর্ণপুর থেকে পশ্চিম সাগর অর্থাৎ গঙ্গিনিকার উপর দিয়ে পম্পা সরোবরের তীরবর্তী শিবমন্দিরের দূরত্ব লিখেছেন— পনেরো যোজন। এই মন্দির বাণের নানা স্মৃতি বিজড়িত শিব মন্দির। মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপিত হয়েছিল প্রায় দেড়শত বছর পূর্বে। সম্রাট বুধগুপ্তের শাসনকালে লিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন শ্রেষ্ঠী রিভু পাল।

কাদম্বরী কাহিনির নায়ক চন্দ্রাপীড়কে শিব মন্দিরের কাছে এনে আবার তাঁর লেখনীর যোগ নিদ্রা। জমে না আড্ডা। জানে সবাই মহাপণ্ডিত বাণভট্ট কাদম্বরী গ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত। সহজে কেউ ঘেসে না তাঁর ধারেকাছে। হাঁফিয়ে ওঠেন বাণ।

এক ভোরে ঘোষণা করেন তাকে এখনই যেতে হবে গোপপল্লী। ভীষণ জরুরী সমস্যামূলক কাজ আছে লোহিতাক্ষের সাথে।

পালিতক থেকে ছিপ পূর্ণ বেগে এগিয়ে সন্ধ্যায় পৌছায় গোপ্পপলী নৌঘাটে। ভীষণ জরুরি সমস্যামূলক কাজটি ছিল হাত পা ছড়িয়ে আড্ডা দেওয়া। আড্ডা শুরু হল।

আড্ডায় উঠে হিউয়েন সাং বিষয় বিবরণী। বিবরণী প্রদান করেন স্বয়ং লোহিতাক্ষ। লোহিতাক্ষ বলেন "চীনা সন্ন্যাসী এক দারুণ ব্যক্তি। সহজ সরল এই সাথে মস্ত জ্ঞানী। সব কথাবার্তা টুকে রাখেন। টুকে রাখেন বলা ঠিক নয়, তিনি এঁকে রাখেন।"

লোহিতাক্ষের টুকে রাখেন এবং এঁকে রাখেন কথা নিয়ে দুবন্ধুর হাসি ঠাট্টা তামাসা।

লোহিতাক্ষ বলেন এক সন্ধ্যায় চীনা সন্ন্যাসীর আড্ডায় গিয়ে দেখেন তিনি মস্ত এক প্যাঁচানো কাগজ খুলে খুলে কীসব লিখছেন। লোহিতাক্ষের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেন, তিনি কোন্ পথে কামরূপে প্রবেশ করেছেন সেসব কথা লিখছেন।

বাণ হেসে হেসে জিজ্ঞাসা করেন সন্ন্যাসীর লেখা দুচারটে নাম ধাম কি এখনো টিকে আছে লোহিতাক্ষের ঘিলুর মধ্যে।

বাণের সরস ঘিলু শব্দ শুনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন লোহিতাক্ষ। এরপর হাসির মাঝখানেই বলেন, নিশ্চয়ই তার ঘিলুতে টিকে আছে। যেমন যাত্রা শুরু হয়েছিল "কা-চু-হু-খি-লু" থেকে।

বাণ তার চীনা ভাষা সমীকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করে বলেন, যাত্রা শুরু হয়েছিল কাজঙ্গল থেকে।

লোহিতাক্ষ পরবর্তী নাম বলেন — "পুন-ন-ফ-টন-ন।" বাণ ধ্বনির গোলকধাঁধা ভেদ করে বলেন — পুণ্ড্রবর্দ্ধন।

লোহিতাক্ষ বলেন, এরপর সন্ন্যাসী তাঁকে দেখিয়েছিলেন একটি নদীর নাম। চীনা আখরে আঁকা হয়েছে মস্ত নদী। রসিক সন্ন্যাসী তাঁকে এই চীনা লিপিতে লেখা নদীর নাম কী হতে পারে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। লোহিতাক্ষের উত্তর ছিল সন্ন্যাসী ঠাকুর মস্ত বড়ো এক নদী অতিক্রম করে প্রবেশ করেছিলেন কামরূপে। মস্ত বড়ো নদী লোহিত্য-টৌহিত্য হতে পারে।

উত্তর শুনে, সন্ন্যাসী বলেছিলেন এক আশ্চর্যজনক কথা। এই মস্ত বড়ো নদী হচ্ছে মেঘনা নদী। গ্রীক ভাষায় "মেঘা" অর্থ সুবৃহৎ। শুধু মেঘনা নয়, পদ্মা নামটিও নাকি গ্রীক শব্দ।

বাণ তখন চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমের গ্রীক অন্ধমুনি অর্গাস্তর কথা বলেন। তিনি বলেছেন, চন্দ্রপুর অঞ্চলের বহু স্থান নাম গ্রীক নাবিকগণ দিয়েছেন। এমনকী চন্দ্রপুর শোনবিল এসব নামগুলিও নাকি গ্রীক ভাষা থেকে সৃষ্ট হয়েছে।

নানা কথাবার্তা, আলাপ হয় আদ্য রাজা এবং চীনা সন্ন্যাসীর কথাবার্তা নিয়ে।

লোহিতাক্ষ বলেন, বর্তমান কালে কামরূপের হাটে মাঠে বাটে ছেলে বুড়ো সবাই যে চীনা গান নিয়ে পাগল এই গানের কথা আদ্যরাজা জিজ্ঞাসা করেছিলেন হিউয়েন-সাংকে।

বাণ, লোহিতাক্ষের কথা শেষ হতে না হতেই বলেন সোমিল এবং গ্রন্থাদিত্য চীনদেশের মহাসঙ্গীত সম্মেলনে গিয়ে সেখানে আবিষ্কার করেছিল এই গান। গানটি অনুবাদ করে এবং সুর দিয়ে প্রচার করেছিল কামরূপের আনাচে কানাচে। বাণের কথা শেষ হলে লোহিতাক্ষ বলেন,

সন্ন্যাসী ঠাকুর এই গানের উৎস কথায় বলেছিলেন গানটি এক বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় চীনা রাজকুমারকে নিয়ে রচিত। সন্ন্যাসী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে বলেন, বছর পনেরো ষোলো আগে এই কুমার নিজের জীবন বিপন্ন করে জঘন্য অত্যাচারী বিদ্রোহীগণকে দমন করে সাধারণ মানুষদের, শান্তি এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এই রাজকুমার হচ্ছেন শান সম্রাট কাও-য়েৎ-সু-য়ের দ্বিতীয় রাজকুমার।

লোহিতাক্ষ বলেন, ভাস্করদেবের বিশেষ আগ্রহ ছিল কুলাচল প্রাসাদ সংলগ্ন দেবস্থান নিয়ে। প্রথমে তিনি স্বয়ং সন্ন্যাসী ঠাকুরকে নিয়ে গিয়েছিলেন এই দেবস্থানে। একই ভূমিতে এক দেবাঙ্গনের গায়ে গায়ে অন্য দেবতার মন্দির দেখে সন্ন্যাসী হতবাক। অসুর সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব — শৈব শাক্ত গানপত্য মাতৃকা ইত্যাদি বহুবিধ ধর্মীয় মতবাদের মধ্যে আবার প্রতিটি মতবাদের অজস্র শাখা প্রশাখা দেখে সম্পূর্ণ স্তম্ভিত। তিনি বলেন, একই ভূমিখরেড খণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন অজস্র দেবদেবীর একত্র অবস্থান ইতিপূর্বে কোথাও দেখেননি।

ভাস্কর দেব তখন বলেছিলেন, সিন্ধু দেশের অর্থাৎ ভারতবর্ষের নানা ধর্মীয় মতবাদকে একই দৈবী অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠার জন্য এই অঞ্চলে নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। এই পরীক্ষা নিরীক্ষা সাগ্নিক এবং অসুরপন্থী পণ্ডিতগণ কামরূপ অঞ্চলে প্রায় শতবর্ষব্যাপী সাধনা করছেন। পণ্ডিতগণ পূজায় সংযুক্ত করেছেন মন্ত্র এই মন্ত্রপাঠ করে আরম্ভ করতে হবে যেকোন দেবদেবীর পূজা। মন্ত্রে পঞ্চদেবতাকে আহ্বান করে জল প্রদান করে, করতে হবে সন্তুষ্ট। এমনি পূজাপদ্ধতি এবং মন্ত্রের ফলশ্রুতি রূপে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় বৈরিতা হ্রাস পেয়ে সৃষ্ট হচ্ছে প্রীতির সম্পর্ক। পঞ্চদেবতাকে প্রদানের জন্য জল শোধন করা হচ্ছে — সিন্ধু দেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষের বিভিন্ন নদীর নাম উচ্চারণ করে।

বাণ উচ্চারণ করেন নদীগুলির নাম গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী। নদীসমূহের নাম উচ্চারণ করে বলেন বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের মিলন প্রচেষ্টা তার জ্ঞাত। চন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমের মুনি ঋষিগণ এই সম্মিলিত ধর্মের নাম কোনও বিশেষ দেবদেবীর নামে চিহ্নিত করেন নি। সহজ ভাষায় এর নাম দিয়েছেন সিন্ধুদেশীয় অর্থাৎ ভারতীয় ধর্ম।

তবে কামরূপাদি অঞ্চলের ভাষায় "শষস" এই তিনটি বর্ণ উচ্চারিত হয় আবেস্তাগ্রন্থের ভাষার মত শুধুমাত্র 'হ' ধ্বনি রূপে। তাই সমগ্র দেশে "সিন্ধুধর্ম" উচ্চারিত হচ্ছে "হিন্দুধর্ম রূপে"— বাণের চোখে ভেসে উঠে, চন্দ্রমৌলী লিঙ্গমন্দিরের চতুর্দিকে অজস্র দেব-দেবীর মূর্তি এই সাথে মন্দিরের সারি। স্থির করেন — এই দেব-লীলাভূমি তার কাদম্বরী গ্রন্থে অবশ্যই চিত্রায়িত করবেন।

মশগুল আড্ডা গলিয়ে চুপি চুপি মস্ত রাত জমে গেছে। আড্ডা ভঙ্গের পূর্ব চিহ্নরূপ দুজনের দেহ ভঙ্গীমার অদল বদল শুরু হলে হঠাৎ এক প্রশ্ন উত্থাপন করেন বাণ। চীনা সন্ন্যাসী কি শুধুমাত্র সহস্র দেবতার কথাই লিখেছেন? বৌদ্ধ জৈন এসব ধর্মের কথাবার্তা কি লিখেননি।

লোহিতাক্ষের মুখে রাজনৈতিক হাসি দেখা দেয়। বলেন, ভাস্কর দেব এ বিষয়ে দারুণভাবে

ছিলেন সতর্ক। কামরূপের নানা বৌদ্ধবিহারের পাশ ঘেঁষে চীনা সন্ন্যাসীর নৌকা ঘোরাঘুরি করেছে। কিন্তু চেপে রাখা হয়েছে বৌদ্ধ মঠ বিহার মন্দিরের কথা। তাই সন্ন্যাসী স্পষ্ট লিখেছেন "কামরূপে বৌদ্ধধর্মের প্রচলন প্রায় নেই।

পরদিন আড্ডা শুরু হল দিনের প্রথম প্রহরে। সঙ্গদোষে আড্ডার নেশায় লোহিতাক্ষকে ও ধরেছে প্যাঁচিয়ে। মাঝে মাঝে আড্ডায় প্রবেশ করে লোহিতাক্ষের যুবক পুত্র নিয়ে যাচ্ছে কাজকর্মের নির্দেশ। লোহিতাক্ষের পুত্রকে দেখে বাণের মনে হয় যেন, শ্রীগোপাল যুবক বেশে ফিরে এসেছেন।

লোহিতাক্ষ বলেন, কামরূপের আবহাওয়া গাছগাছালি নিয়ে লিখেছেন এখানকার ভূমি স্যাঁতসেতে। অজস্র সুপারি নারিকেল কাঁঠাল গাছ। অজস্র দীঘি পুকুর ডোবা। রাজধানীর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ঝরনা। অধিবাসীদের গায়ের রং শ্যামলা। মাঝারি উচ্চতা। মধ্যভারতীয় অঞ্চলের মত এদের মুখের ভাষা।

বাণ জিজ্ঞাসা করেন, এই অঞ্চলের মানুষের জ্ঞান- গরিমা সম্পর্কে সন্ন্যাসীর ধারণার বিষয়।

লোহিতাক্ষের মুখে দেখা দেয় সূক্ষ্ম হাসির রেখা। বলেন, লিখেছেন এই অঞ্চলের মানুষ অধ্যয়ন জ্ঞানচর্চায় পারদর্শী তবে ভীষণ রগচটা। যখন তখন খেপে ওঠে। লোহিতাক্ষ রগচটা প্রসঙ্গ টেনে বলেন, বহুদেব দেবতার অঞ্চলের মানুষ বৌদ্ধধর্ম এবং এই ধর্মের সাধু-সন্ন্যাসীগণকে তেমন পছন্দ করে না। তাই প্রকাশ্যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে দুচার কথা বলে দিয়েছে।

দু-চার কথা বলে দিয়েছে — এই কথা নিয়ে বাণ প্রশ্ন করেন। লোহিতাক্ষ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আপন মনে কিছু ভাবনা চিন্তা করেন। এরপর সহজভাবে বলেন, তিনি তার গোপদের মাধ্যমে খবর পেয়েছিলেন কামরূপের ব্রাহ্মণগণ চীনা সন্ন্যাসীর উপর খেপে আছে। এমনকী তারা হত্যা পর্যন্ত করতে পারে এই সন্ন্যাসীকে।

গুপ্ত সংবাদ পাঠিয়ে দেওয়া হয় আদ্যরাজার কানে। খবর পেয়ে তিনি গেলেন ঘাবড়ে। কারণ ইতিমধ্যে চীনা সন্ন্যাসী নিয়ে হর্ষদেব এবং আদ্য রাজার মধ্যে আদান প্রদান হচ্ছিল নানা ধরনের চিঠিপত্র।

হর্ষদেব লিখেছিলেন "অতি দ্রুত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ঠাকুর মহাশয়কে প্রেরণ করিবেন।" উত্তরে আদ্য রাজা লিখেছিলেন "বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ঠাকুর মহাশয়কে প্রেরণ করা অপেক্ষা ভাস্কর বর্মনের কাটা মুণ্ডু অতিদ্রুত পাঠানো সহজতম।" এই পত্রের সহজ এবং সরস উত্তর দিয়েছিলেন হর্ষদেব — "তবে তাই হোক! একটি সুবর্ণ নির্মিত থালা পাঠিয়ে দিচ্ছি। এই থালায় আপনার মুণ্ড প্রেরণ করে বাধিত করবেন।"

এমনি অবস্থায় গুপ্তচর বিভাগের সংবাদ পেয়ে তিনি ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে যুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়েছে। গাঙ্গিনিকা ছেয়ে তখনো ছিল তার নৌবহর। স্বয়ং ভাস্কর বর্মন এবং তার ত্রিশ হাজার যুদ্ধ নৌকার নৌবহর সন্ন্যাসী ঠাকুরের নৌকা ঘিরে এগিয়ে গেল — হর্ষদেবের সাম্রাজ্য সীমার দিকে।

লোহিতাক্ষ বলেন, এখানেই সমাপ্ত হয়নি সন্ন্যাসী ঠাকুরের যাত্রাকাহিনী। দিন কতকের মধ্যে নৌবহর পৌছাল কাজঙ্গাল অর্থাৎ রাজমহলের রাজপ্রাসাদে। রাজপ্রাসাদে ভাস্করদেব এবং সন্ন্যাসী ঠাকুর প্রবেশ করেন বিশ্রামের জন্য।

অন্যদিকে হর্ষদেবের চিন্তার শেষ নেই। হীনযানী এবং মহাযাত্রীদের তর্ক যুদ্ধের তারিখ পার হয়ে গেছে। চীনা সন্ন্যাসী না এলে তর্কযুদ্ধ অসম্ভব। তাই স্বয়ং হর্ষদেব এগিয়ে এলেন কামরূপের দিকে।

সেদিন ভর দুপুর। ঠা-ঠা করছে রোদ। কাজঙ্গল প্রাসাদে ভাস্কর দেব এবং সন্ন্যাসী ঠাকুর বিশ্রামরত। হর্ষদেব তখন চুপিচুপি পা টিপে প্রবেশ করেন চীনা সন্ন্যাসীর কক্ষে। প্রবেশ করে, ভাস্করদেবকে এই বলে খবর পাঠালেন —সন্ন্যাসী ঠাকুর ভাস্কর দেবকে ডাকছেন।

ভাস্কর দেব প্রবেশ করে হতবাক। সন্ন্যাসী ঠাকুর এবং হর্ষদেব, তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছেন মিটিমিটি করে। তারপর পরম উচ্ছ্বাসে দুই বন্ধুর ঘন আলিঙ্গন।

ভাস্কর দেবের বয়স এখন পয়ষট্টি এবং হর্ষদেব সবেমাত্র পঞ্চাশ অতিক্রম করেছেন।

* * *

প্রীতিকূটে ফিরে এসে, কাদম্বরী লেখার পাঁয়তারা কষে কষে দিন কতক গেল কেটে। তারপর সবেমাত্র লেখার বাসনায় বসি বসি অবস্থায় এলেন লোহিতাক্ষ। তিনি কক্ষে প্রবেশ করেই বলেন তার মস্ত এক ভুল হয়ে গেছে। চীনা পণ্ডিত সম্পর্কে তিনি এতসব বলেছেন কিন্তু আসল কথাটিই বলেননি। সেটি হচ্ছে চীনা পণ্ডিত স্বয়ং কাগজে লিখে একটি সংস্কৃত শ্লোক তাঁকে উপহার দিয়েছেন।

শ্লোকটির বিষয় সম্পর্কে বলেন, এটি চীন দেশের বিখ্যাত "তাও" ধর্মের দার্শনিক মতবাদ। "তাও" ধর্ম বিষয়ে কথা তুলেছিলেন আদ্যরাজা। চীনা পণ্ডিত তখন বলেছিলেন অতি সত্তর তিনি চীনদেশে ফিরে যাবেন। সেখান গিয়ে "তাও" দর্শন, সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করে আদ্য রাজার কাছে প্রেরণ করবেন।

লোহিতাক্ষ বলেন, তাও দর্শন সম্পর্কে কথাবার্তা বলার কালে চীনা পণ্ডিত তাও দর্শনের দুটি শ্লোক লিখেছিলেন। দুটির মধ্যে একটি দিয়েছিলেন আদ্য রাজাকে অন্যটি দিয়েছেন তাঁকে।

বাণ, লোহিতাক্ষের হাত থেকে চৈনিক কাগজ খণ্ড নিয়ে পাঠ করেন।

সৃজনের অনাদিগর্ভ হতে পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু পুঞ্জ।

স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে, চির ধাবমান অনন্ত পথে, রূপে অরূপে।

আমি চেয়ে থাকি আমি দেখি চেয়ে পরিপূর্ণ বস্তুপুঞ্জ

আবার, বারবার ফিরে আসে তার আদিম গর্ভগৃহে।

আকাশে উদ্ধত বাহু বিকশিত তরু

ফিরে ফিরে আসে তার প্রথম গর্ভবীজে।

সৃষ্টির অন্তহীন চক্রে, সব ফিরে আসে

মহাকাল ভ্রমণ শেষে তার সৃষ্টির প্রথম ভ্রূণে।

সৃষ্টির লোকে লোকে আমার প্রকাশ

সৃষ্টির লোকে লোকে আমার বিলয়

সৃষ্টির অনন্তলোকে আছি আমি

আমি আর অনন্তলোক, আমরা অভিন্ন।

বাণের পাঠ শেষ হতে না হতেই দরজায় হাজির হলেন চন্দ্রপুর বিষয় অঞ্চলের বিভিন্ন গুলের অর্থাৎ দেবকুলের পুরোহিত গোষ্ঠী। উদ্দেশ্য বিভিন্ন চণ্ডিকাগুলে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পূজাপদ্ধতি এবং মন্ত্র প্রচলিত সে সব সংস্কার করে একটি সম্মিলিত পূজাপদ্ধতি প্রণয়ন।

জনৈক পুরোহিত বলেন, তিনি সৌভাগ্যবশত পেয়ে গেছেন, মহাপণ্ডিত বাণভট্ট বিরচিত চণ্ডীশতক স্তোত্রগ্রন্থ। পুস্তক পাঠ করে তার মনে হয়েছে বিভিন্ন চণ্ডিকাগুলের মন্ত্র বিধিগুলি "হিন্দুধর্মের" আদর্শে একটি বন্ধনে আবদ্ধ করা বাঞ্ছনীয়।

বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে কিছুদিন সময় প্রার্থনা করেন বাণ। বাণের বাসভবনে পরিত্যাগের পূর্বে পুরোহিতগণ চণ্ডীশতক স্তোত্র গ্রন্থের এক একটি নকল প্রার্থনা করেন।

লোহিতাক্ষ, ব্রাহ্মণগণের প্রস্তাব লুফে নিয়ে পুঁথি নকল এবং এ বিষয়ে কাজকর্মের জন্য কাদম্বরী গ্রন্থাংশ নকল করার গোষ্ঠীর সাথে অন্য আর একটি গোষ্ঠী নির্মাণের পরিকল্পনা তৎক্ষণাৎ করে নিলেন।

পরবর্তী ঘটনা হচ্ছে যখন তখন পুরোহিতগণের বাণের কক্ষে প্রবেশ এবং জ্ঞানগর্ভ আলোচনা। আলোচনা বিষয় চণ্ডিকা মাহাত্ম্য এবং প্রতিবেশীগুলের পুরোহিতের আকাট মুর্খতা। বাণ, তিক্ত কটু ঝাল মধুর ইত্যাদি নানা স্বাদের কথার সর্বভুক প্রাণী। আড্ডা দারুণ ভাবে জমে ওঠে।

ভূষণ এবং বাণীর তাড়া খেয়ে মাঝে মধ্যে কাদম্বরী গ্রন্থের দু-চার ছত্র লিখে আবার ডুবে যান চণ্ডিকাপূজাবিধি সংস্কারের জমাট আড্ডায়।

পুরোহিতগণের ধারণা তাঁরা স্বয়ং চণ্ডিকার জ্যেষ্ঠপুত্র। তাঁর মতামতই সর্বশ্রেষ্ঠ। পুরোহিত গণের মাথায় সংস্কার কর্ম জট বেঁধে স্তূপ স্তূপ হয়ে বসবাস করে। তবে সংস্কার সমিতি বহু সংখ্যক চণ্ডী শতক স্তোত্রগ্রন্থ খেল।

এমনি ভাবে বছর দুই তিন কাল বাণের আয়ুর উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণের মহাকাল

সিন্ধুতে মিশে গেল।

এক মধ্যদিনে স্বয়ং ভাস্কর বর্মনের দূত এলেন প্রীতিকূট ভবনের দরজায়। ভাস্কর দেব লিখেছেন, তৃতীয় মহামোক্ষ সম্মেলন সমাগত। তিনি অচিরাৎ তার কুলাচল প্রাসাদ থেকে গমন করবেও প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে। মহাপণ্ডিত বাণভট্ট যদি তাঁর সাথে প্রয়াগ তীর্থে গমন করেন, তা হলে তিনি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হবেন।

বাণ, "আহ্লাদিত হবেন" এর অর্থ ধবে নিলেন রাজ আদেশ। তাকে অবশ্যই যেতে হবে।

মাস কতকের মধ্যে, ভাস্কর দেবেব সাথে বাণ পৌছালেন প্রয়াগের নৌঘাটে। অজস্র নৌকায় কালো হয়ে আছে ঘাটের বিস্তারিত অঞ্চল। উৎসব আরম্ভের আর ছয়দিন বাকি।

*　　　　*　　　　*

প্রয়াগের নৌঘাটে স্বয়ং হর্ষবর্দ্ধন এসে রাজকীয় সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন ভাস্করদেবকে। হর্ষবর্দ্ধনের সাথে ভাস্করদেব গমন করেন রাজপ্রাসাদে। নিজস্ব রাজকীয় বাসভবনে গমন করেন বাণ।

বাণ খবর পেলেন তর্কযুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন হিউয়েন-সাং। পরাজিত হীনযানী বৌদ্ধগণ হিউয়েন সাংকে উপাধি দিয়েছে — " মোক্ষদেব"। অন্যদিকে হিউয়েন সাং এর স্বপক্ষীয মহাযান পন্থীগণ তাঁকে "মহাযানদেব" উপাধি প্রদান করে সম্মানিত করেছে।

সন্ধ্যায় পৌছালেন বিহঙ্গমার কুটিরে। বাণের অপেক্ষা ছিলেন তিনি। বিহঙ্গমা যেন এক প্রাণহীন কায়া। ধবধবে সাদা চুল। বলিবেখা মুখমণ্ডলে। বাণ বিহঙ্গমার চক্ষুমূলের গভীরে প্রত্যক্ষ করেন, ঘন ভস্মাবৃত বহ্নিরেখার শিখা।

উপ্পলা যন্ত্র চালিতার মত এসে বাণের সম্মুখের ত্রিপদীর উপব রেখা যায় ফল মূল জল।

দুজনের কথা একটু আধটু করে রাতের সাথে এগিয়ে চলে শ্লথ পদক্ষেপে। মধ্যরাতে ওঠে অরুণাশ্বের কথা। অরুণাশ্ব প্রসঙ্গে বিহঙ্গমার অক্ষিকোটরের ঘন ছাই অপসারিত হয়ে জেগে ওঠে রক্তবর্ণ অঙ্গার। বিহঙ্গমা বলেন, বিষবৃক্ষ পুষ্ট হয়েছে। পরিণত হয়েছে ফল। এখন শুধুমাত্র কালকূটের অগ্নিদাহের প্রতীক্ষা।

তর্কযুদ্ধ প্রসঙ্গে হর্ষবর্দ্ধনের পঙ্কিল কূটকৌশলের কাহিনি প্রকাশ করেন বিহঙ্গমা। এই পঙ্কিল কাহিনি, বিহঙ্গমাকে বলেছেন হর্ষদেবের মন্ত্রী অরুণাশ্ব।

হিউয়েন সাং গুপ্তভাবে সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন হীনযানীদের তর্কযুদ্ধের গুপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র লুকিয়ে আছে দক্ষিণ দেশীয় বৌদ্ধপণ্ডিত প্রাজ্ঞগুপ্তের গ্রন্থে। হর্ষবর্দ্ধন এই গুপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র সংগ্রহের দায়িত্ব প্রদান করেন মন্ত্রী অরুণাশ্বকে। অরুণাশ্ব গুপ্তচর বাহিনীর মাধ্যমে প্রাজ্ঞ গুপ্তের গুপ্তগ্রন্থ হাতিয়ে প্রদান করেন হর্ষবর্দ্ধনকে।

গ্রন্থের সাতশত শ্লোক গলাধঃকরণ করে তর্ক যুদ্ধে জয়ী হন চীনা বৌদ্ধপণ্ডিত হিউয়েন

সাং।

খানিক স্তব্ধতার পর বিহঙ্গমা বাণের কানে ঠোঁট লাগিয়ে বলেন, বাণ যেন অতিক্রান্ত পরিত্যাগ করেন হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যসীমা।

বাণ, এ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসার পূর্বেই বিহঙ্গমা বলেন অরুণাশ্বের সাথে বাণের দুই বন্ধুর যোগাযোগ হয়েছে। বন্ধুরা হচ্ছে বক্রঘোন এব পণ্ডিত জয়সেন।

বাণ সম্পূর্ণ স্তব্ধ। ভোর হবার আগেই বাণ পৌছে গেলেন তার বাসভবনে।

মহামোক্ষ সম্মিলনী উৎসব হল শুরু। উৎসবের সূচনার রাজপথে শোভাযাত্রা। নিঃসঙ্গ বাণ, একা রাজপথ পাশ্বে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করেন মহাশোভাযাত্রা। হাজার হাজার মানুষ। শত সহস্র হাতি ঘোড়া রথ। বিচিত্র রঙ্গের চীনাংশুক বস্ত্রে আবৃত মস্ত এক হাতি। হাতির পিঠে সুবর্ণে নির্মিত বুদ্ধমূর্তি। হাতীর এক পাশে হর্ষদেব অন্য পাশে ভাস্কর বর্মনের সুসজ্জিত হস্তীদ্বয়। হর্ষবর্দ্ধন এবং ভাস্কর বর্মনের হাতে সুবৃহৎ পতাকা। হর্ষদেব শক্র অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্রের সাজে সজ্জিত। ব্রহ্মার বেশে ভাস্করদেব।

বাণ গুটিয়ে নিয়েছেন আপনাকে। লক্ষ লক্ষ মানুষ উৎসবের আনন্দে মগ্ন। অজস্র মানুষের ভিড়ে তিনি একা নিঃসঙ্গ। একা একা ঘুরে ফিরেন অজস্র জনতার মাঝ দিয়ে। জনতার মাঝে থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করেন প্রতিটি বস্তু। অজস্র মানুষের অজস্র ভাবভঙ্গিমা। কান পেতে শুনেন মানুষের ছোটো বড়ো তুচ্ছ কথাবার্তা।

গুরুদেব ভর্ৎসুর মূর্তি হৃদয়ে ভেসে ওঠে বারবার। গুরুদেবের কথা বেজে ওঠে প্রাণে। গুরুদেব বলেছিলেন, পৃথিবীর সব ঘটনা সব দৃশ্য সব শব্দ গন্ধ স্পর্শ অমৃত লোকের ভালবাসায় পরিপূর্ণ। মহাবিশ্বের সব কিছু নিয়ে পরিপূর্ণ জীবন।

দিনের পর দিন ঘুরে ফিরেন এখানে ওখানে কাছে দূরে। এমনি করে একদিন দানমেলার ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখছেন হর্ষদেবের দান। উঁচু দানমঞ্চে দাঁড়িয়ে হর্ষদেব অকাতরে বিলিয়ে দিচ্ছেন সোনা রুপা হীরামণি পান্না। দান লাভ করে সহজ মানুষের আনন্দ উল্লাস। আনন্দ উচ্ছল মানুষের চারদিকে অরুণাশ্বের গুপ্তচর।

হঠাৎ চমকে ওঠে আশেপাশের মানুষ। চমকে ওঠেন হর্ষদেব। দানমঞ্চের চতুর্দিক থেকে চীৎকার উঠে — "আগুন — আগুন!" চতুর্দিকে চীৎকার চেঁচামেচি হুলুস্থুলু। মুহূর্তের মধ্যে দানমঞ্চের পিছন থেকে উদ্‌গীরণ্ হতে আরম্ভ হয় ধুম্রপুঞ্জ। দান মঞ্চের কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে গেলেন হর্ষদেব। হর্ষদেবের কথা ভেবে, দানমঞ্চের সিঁড়ির দিকে দ্রুত এগিয়ে গেলেন বাণ। চতুর্দিকে নরদেহের জমাট প্রাচীর। প্রাচীর ভেদ করা সম্ভব হয় না পণ্ডিত বাণভট্টের।

ক্রমে আগুন নিভে আসে। হর্ষদেব সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন দান মঞ্চে। সিঁড়ি বেয়ে কিছু উঠেছেন মাত্র, এমন সময় বিকট চীৎকার করে ছুরি হাতে এক ঘাতক হর্ষদেবকে হত্যা করার জন্য তাঁর পিছনে পিছনে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে।

বাণ বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকেন ঘাতকের ভীষণ মূর্তির দিকে। বাণের চোখে পড়ে, হর্ষদেব দানমঞ্চের কাঠের সিঁড়ির মধ্যখানে বসে বাঁ হাতে সিঁড়ি ধরে ডান হাত বাড়িয়ে, ঘাতকের ছুরি সুদ্ধ হাত কব্জা করে ফেলেছেন। চোখের পলকে সৈনিক এবং প্রহরীর দল আষ্টেপৃষ্ঠে শৃঙ্খলিত করে ঘাতককে।

সীমাহীন বিশৃঙ্খলা ভেদ করে হাজির হলেন জনাকয়েক সামন্তনৃপতি এই সাথে হর্ষদেবের জামাতা সামন্তনৃপতি ধ্রুবসেন।

ধ্রুবসেনসহ সামন্ত নৃপতিগণের হাতে কোষমুক্ত তরবার। এই মুহূর্তে ওরা নিহত করবেন রাজবিদ্রোহী ঘাতককে। হর্ষদেব সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে আসেন সামন্ত নৃপতি এবং ঘাতকের মাঝখানে। হর্ষদেব ওকে সমর্পণ করেন বিচারকের হাতে।

বাণ লক্ষ করেন এই ভীষণ হৈ হট্টগোলের মাঝে চীনা সন্ন্যাসী হিউয়েন-সাং দানমঞ্চের সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিকের ঘটনাবলী নিরীক্ষণ করছেন।

বিচারের প্রকাশ্য আয়োজন এবং ফলাফল ঘোষণা হল ঘটনার সাতদিন পর। প্রকাশ্য বিচারের পূর্বেই, ঘাতকের পরিবেশিত তথ্যানুসারে বন্দী করা হয়েছে পাঁচশত রাজদ্রোহী ব্রাহ্মণকে। বিচারে পাঁচশত বিদ্রোহীকে দেওয়া হল নির্বাসনদণ্ড।

বিচারে প্রকাশ পেল ব্রাহ্মণগণের পরিকল্পিত এই বিদ্রোহেব উদ্দেশ্য ছিল হর্ষবর্দ্ধনকে হত্যা করা। বৌদ্ধধর্মী হর্ষবর্দ্ধন ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভীষণ শত্রু। বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণ্যধর্মকে রক্ষা করা।

হর্ষদেবের ভীষণ ব্যস্ততার মাঝে বাণ একদিন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে, বিদায় প্রার্থনা করেন।

প্রীতিকূটে যাত্রার পূর্বে সাক্ষাৎ করেন বিহঙ্গমার সাথে। সন্ধ্যায় বাণ প্রবেশ করেন বিহঙ্গমার কুটিরে।

বিহঙ্গমার দেহে শ্বেত চীনাংশুক বস্ত্র। কপালে শ্বেতচন্দন পঙ্ক তিলক। কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ বীজমালা। সর্বশুক্লা বিহঙ্গমা পুঞ্জীভূত বিষাদের প্রতিমা।

বাণের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করে তাকে শয্যার উপর উপবিষ্ট করেন বিহঙ্গমা। উপবিষ্ট বাণের পদ্মাসনের কেন্দ্রীভূত দুটি চরণে তাঁর মুখমণ্ডল রেখে প্রণামের ভঙ্গিমার দেহ স্থাপন করেন শয্যার উপরে।

দুজনের কণ্ঠে নেই কোন ধ্বনি। বাণ অনুভব করেন, তাঁর চরণে উষ্ণ অশ্রুর বর্ষাধারা। কেটে যায় দীর্ঘপ্রহর। ধীরে ধীরে বিহঙ্গমার বিনত দেহ বন্নবীব তুলে ধরেন তার সম্মুখে।

কোন্ সে সুদূর দিগন্ত থেকে মৃদু কণ্ঠে ভেসে আসে বিহঙ্গমার কণ্ঠ — "বাণ! ফিরে যাও। ফিরে যাও। আমার তোমার আর কোনও দিন হবে না দেখা। আজ তোমার আমার মিলনের শেষ

যামিনী। তারপর বিচ্ছেদ! বাণ! অনন্তবিচ্ছেদ।"

বাণের কণ্ঠে নেই কোনও ভাষা। নেই কোন ধ্বনি। বিহঙ্গমা বলেন, "এবার আমার সতী হবার মাহেন্দ্রক্ষণ হাজির হয়ে গেছে বাণ! মহাঅগ্নি প্রজ্বলিত হবে। ভীষণ এই অগ্নিতে আহুতি দেবে আমার এই পঙ্কিল ঘৃণিত দেহ।"

বাণ চমকে উঠে বিহঙ্গমাকে বন্দী করেন তার বাহু পাশে। বিহঙ্গমার কানে ঠোঁট রেখে বলেন, "না! না! বিহঙ্গমা! না! তুমি অগ্নিশুদ্ধা, তুমি পবিত্রা। তুমি আমার বিহঙ্গমা।

এমনি করে ভোর হয়। বাণের যাত্রার সময় সমাগত।

বিদায়ক্ষণে গবাক্ষপথে বাণ প্রত্যক্ষ করেন উদীয়মান গ্রীষ্মের ভীষণ সূর্য। বিহঙ্গমা উদিত সূর্যের দিকে তাকিয়ে আপনমনে মন্ত্রের মত গুনগুন করে উচ্চারণ করে "হে সপ্তাশ্ব বাহিত অরুণ তোমার ভীষণ অগ্নিদাহে ভস্মীভূত করো মহাপাপের মহাআবর্জনা।"

বাণ, বিহঙ্গমার স্বগত কথনে উপলব্ধি করেন বিহঙ্গমা অজ্ঞাতসারে ভীষণ বিপ্লবের অগ্নিপুরুষ রূপে কল্পনা করছে অরুণাশ্বকে।

বাণ প্রীতিকূটে ফিরে এলেন। শ্রাবণের ধারা রসে গঙ্গিনিকা তখন পূর্ণগর্ভবতী। ভূষণ এবং বাণী লক্ষ করেন প্রীতিকূটে ফিরে এসে বাণ হয়ে উঠেছেন অস্বাভাবিক গম্ভীর এবং আত্মস্থ। ভাবনার গভীর জগতে হয়ে থাকেন সমাধিস্থ। গভীর স্তব্ধতার মাঝে কাদম্বরী কাহিনি এগিয়ে চলে।

ভূষণ লক্ষ করেন কাদম্বরীর ভাষায় নূতন বৈশিষ্ট্য। হর্ষচরিতের ভাষায় ছিল তলোয়ারের চকচকে ধার। কাদম্বরীর ভাষায় এসেছে পুষ্পের স্নিগ্ধতা। প্রতিটি পুষ্প স্বরূপা শব্দে বিকশিত হচ্ছে বহু পুষ্পের রূপরস স্পর্শ। প্রতিটি শব্দ যেন অনাঘ্রাত শিশির সিক্ত নির্মল।

বাণের লেখনী পৌঁছে গেছে কাদম্বরীর ভালোবাসার ভুবনে। মহাশ্বেতার সাথে চন্দ্রাপীড় এসেছেন, গন্ধর্ব রাজধানী হেমকূটে। চন্দ্রাপীড় প্রবেশ করেন নায়িকা কাদম্বরীর কন্যান্তঃপুরে। কন্যান্তঃপুরের অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ চন্দ্রাপীড়।

বাণের লেখনী চিত্রিত করে চন্দ্রাপীড়ের বিস্ময় "এ যেন পূর্ণ একটি স্ত্রীময় জগৎ; এ যেন পুরুষহীন স্বর্গ এ যেন পঞ্চম নারী যুগ।"

বাণের লেখনী কাদম্বরীর রূপে বিমুগ্ধ লেখনী চিত্রিত করে কাদম্বরীর অসামান্য চিত্ররূপ —

"ক্ষীণ পুণ্য শৈশব তাকে ছেড়ে দিতে চায় না। কাদম্বরীর অঙ্গে অঙ্গে বয়ঃসন্ধির লুকোচুরির খেলা। সুকঠোর গুরু নিতম্বে স্পর্শকাতর কাঞ্চির কী সুখরোমাঞ্চ। কটির মধ্য দিয়ে তনু রোমরাজির নবমঞ্জরী মন্মথের হাতে যেন ত্রিভুবনের বিজয় প্রশস্তির বর্ণাবলী।"

পাশে উপবিষ্ট ভূষণ লক্ষ করেন পিতা সমাধিস্থ। সমাধিস্থ পিতার ময়ূর পাখার লেখনী কোনও এক অরূপের পাখায় ভর দিয়ে ভেসে চলেছে রূপাতীত পূর্ণতার মোক্ষধামের পথে।

ময়ূরপাখায় ভর করেছে বাণের ফেলে আসা রূপ রস গন্ধ স্পর্শময় সমগ্র অতীত। ভর করেছে বর্ষা বসন্ত শরৎ হেমন্ত। উম-ইয়াম বিহঙ্গমা বাণী। কাদম্বরী মিশে গেছে পার্বতী পরিণয়ের উমার বয়ঃসন্ধির তনু দেহে। মিশে গেছে চৌষট্টি কলার রূপ সাজে মোহিনী বিহঙ্গমার মাঝে। মিশে গেছে চণ্ডিকা ব্রতচারিণী সর্বশুদ্ধা বাণীর ধ্যানরত যুক্ত করপল্লবে।

অরূপের স্তব্ধ মূর্চ্ছনায় চিত্রিত কাদম্বরী এবার চন্দ্রাপীড়ের সাথে মিলিত হবে। লোক লোকান্তর সুদূর নক্ষত্র লোক বাণের লেখনীর কানে কানে ভালোবাসার কথা বলে। যুগ-যুগান্তরের লোকলোকান্তরের চিরবহমান ভালবাসার নির্যাস মেখে লেখনী অঙ্কন করে প্রথম প্রণয়ের নিকুঞ্জবন।

"কাদম্বরী তার রক্ত পদ্মকোরক করতলের উপর একখানি পান্নার মতো তাম্বুল রেখে চন্দ্রাপীড়ের দিকে প্রসারিত করে দিলেন লাজকম্প্র থরথর পাণি। নির্গত হয় ঘন ঘন তপ্ত নিঃশ্বাস।"

তারপর দুজনের হাতের স্পর্শ। করপল্লব দুটির স্পর্শে দেবলোক সুরলোক গন্ধর্ব লোকে জাগে শিহরণ। ভালবাসা! ভালবাসা! অনঙ্গ ভালবাসার অঙ্গহীন স্পর্শে লেখনী স্তব্ধ। স্তব্ধ বাণ।

ভালোবাসা! স্তব্ধ লেখনী স্বপ্নের ঘোরে আবার এগিয়ে চলে কল্পলোকের পথে। বাণের আজন্ম ভালবাসায় আচ্ছাদিত কল্পলোকের ফুল পাখি ফল নদী খাল বিল পুকুর অখ্যাত চির অবহেলিত লতাপাতা কাঁটাগাছ, সবকিছু তরলিত হয়ে, লেখনীর চোখ দিয়ে পত্রের উপর দিয়ে বয়ে যায় ঋতুর পর ঋতু। স্বপ্নমগ্ন বাণ।

*　　　　*　　　　*

গ্রীষ্মের এক তপ্তদীর্ঘ রাতের শেষলগ্নে বাণের দরজায় শব্দ করে করে কে ডাকে — "বাণ! বাণ!"

ডাক শুনে চমকে ওঠেন বাণ। "বাণ" নাম ধরে কে ডাকতে পারে? দরজা খুলে দেখেন মস্ত এক জমাট ছায়া। দরজা খোলা হলে দুই হাতে মস্ত এক লাঠির উপর ভর করে ছায়ামূর্তি বাণের দিকে এগিয়ে আসে। কক্ষের ক্ষীণ প্রদীপালোক স্পর্শ করে ছায়া স্পষ্ট হয়। সুদীর্ঘ আকৃতি। দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু। সুদীর্ঘ বংশদণ্ডের মাঝখানে উপর নিচে দুই হাত রেখে লাঠির উপর শরীরের ভর রেখে বলে — "বাণ! জরুরি কথা আছে।"

বাণ, বায়ুবিকারকে চিনতে পেরে বলেন — "তাত! আপনি এত রাতে? আসুন! ভিতরে আসুন।"

কক্ষে প্রবেশ করে, বায়ুবিকার কাটা গাছের মত এলিয়ে পড়েন শয্যায়। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বাতব্যাধিতে শয্যাগত। বাণের সাথে শেষ দেখা হয়েছিল বছর দুই তিন আগে।

বাণ উপলব্ধি করেন বিষয় গুরুতর। না হলে পালিতক থেকে দুই আড়াই ক্রোশ, লাঠির উপর ভর করে বাতব্যাধি আক্রান্ত দেহকে ঠেলে আনার প্রয়োজন ছিল না।

বাণের কক্ষে রাখা মাটির কলসির প্রায় সবটুকু জল বলতে গেলে এক নিঃশ্বাসে পান করে

তার আসার জরুরি কারণ ব্যক্ত করে বলেন পালিতকে হুলুস্থুলু কাণ্ড। সবাই বলছে, যুদ্ধ বেঁধেছে। রাজধানী কুলাচলের ঘাট থেকে শতশত যুদ্ধ নৌকা গঙ্গিনিকার উজান ঠেলে উত্তরে যাচ্ছে। এমনি সব কথাবার্তা শুনে স্বয়ং তিনি লাঠিতে ভর করে হাজির হলেন পালিতক ঘাটে। তখনো শতশত যুদ্ধনৌকা ঝোপঝাপ করে উত্তরে যাচ্ছে। আদ্য রাজার নৌবহর কেন এবং কোথায় যাচ্ছে কেউ জানে না।

চিন্তিত হলেন বাণ। বর্মন সাম্রাজ্য আক্রমণ করার মতো কোনও শক্তি ধারে কাছে নেই। তবে কী হল?

বাণ ডেকে তুলেন চণ্ডককে। ভোর হবার পর বাণের গাড়ি পৌঁছাল পালিতক ঘাটে। তখনো গঙ্গিনিকার উজান ঠেলে নৌবহর যাচ্ছে উত্তর দিকে।

এই অঞ্চলের গোপপ্রধানগণ প্রায় সবাই ঘাটে হাজির হয়েছেন। মুখে মুখে জিজ্ঞাসা কার সাথে যুদ্ধ?

প্রথম প্রহরেই দেখা গেল মস্ত ছিপ তীরবেগে ছুটে আসছে পারের দিকে। ছিপের উপরে তৈরি হস্তী লাঞ্ছিত বর্মন রাজবংশ পতাকা। মুহূর্তে মধ্যে ঘাটে এল গোপদের অধিকর্তা 'গোপালের' রাজকীয় নৌকা। নৌকা থেকে লাফিয়ে নামলেন লোহিতাক্ষের পুত্র এই সাথে গোপাল দপ্তরের কর্মচারীবৃন্দ।

গোপাল দপ্তরের ঢোলবাদক ঢোলে কাঠি দিল। বিভিন্ন অঞ্চলের গোপ প্রধানগণ পালিতক ঘাটে ইতিপূর্বেই হয়েছিল হাজির।

ঘোষণা করলেন স্বয়ং লোহিতাক্ষের পুত্র। গোপ প্রধানগণ যেন প্রস্তুত থাকেন। যুদ্ধ বিস্তারিত হতে পারে বর্মন সাম্রাজ্যে। গুপ্তচর খবর দিয়েছে হর্ষদেবের বিদ্রোহী মন্ত্রী, হর্ষদেবকে নিহত করে দখল করেছে তাঁর সাম্রাজ্য।

সংবাদ শুনে বাণের দেহে দেখা দেয় কম্পন। বিস্তারিত সংবাদের জন্য সেই মুহূর্তেই যাত্রা করেন গোপ্পলীর পথে। বাণের তেত্রিশ বৈঠার নৌকা অপরাহ্নে পৌঁছাল গোপ্পলী ঘাটে।

লোহিতাক্ষের কাছে নেই বিস্তারিত সংবাদ। সঠিক সংবাদ এবং হর্ষদেবের সাম্রাজ্যের অবস্থার মূল্যায়নের জন্য আদ্যরাজার গুপ্তচর বাহিনী কর্মব্যস্ত। লোহিতাক্ষ অপেক্ষা করে আছেন কখন কী খবর আসে।

লোহিতাক্ষ বলেন, আদ্য রাজা তাঁর একান্ত বান্ধবের পরিণতি শুনে আতঙ্কিত। তাঁর বিশ্লেষণে হর্ষদেবের হত্যাকারী বর্মন রাজবংশের পরমশত্রু। হর্ষদেবের সাম্রাজ্য দখলের পর আক্রমণ করবে ভাস্করের সাম্রাজ্য। তাই চলছে যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব। নৌবহরে পাঠিয়েছেন সৈনিক এবং সামগ্রী। ভাস্করের বাহিনী আগলে রাখবে তার সাম্রাজ্য সীমান্ত।

দশদিনের মাথায় ভাস্করদেবের গুপ্তচর বাহিনী খবর নিয়ে এল হর্ষদেবের মন্ত্রী অরণাশ্ব বিদ্রোহ করে হর্ষদেবকে হত্যা করে দখল করেছে সাম্রাজ্য। অরুণাশ্বের সাথে যোগ দিয়েছে বহু ছোটো বড়ো রাজকর্মচারী, সৈন্যসামন্ত এবং বহু প্রজা। বিদ্রোহীগণ মূলত ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী এবং

হীনযানপন্থী বৌদ্ধ। হর্ষদেবের বহু বন্ধুবান্ধব বিশ্বাসী রাজকর্মচারী আত্মীয়স্বজন এবং মহাযান পন্থী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সম্প্রদায় হয়েছে অরুণাশ্বের কালমৃগয়ার শিকার। শুরু হয়েছে অরুণাশ্বের ধ্বংসলীলা।

হর্ষদেবের রক্তে রঞ্জিত নখর সে রাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গভীর নিদ্রায় সুপ্ত কিছু মানুষের বুকে। সেদিন সবেমাত্র হর্ষদেবের রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন চীন সম্রাটের রাজদূত ওয়াং-হিউ-তাও। রাজদূতের সাথে তার দেহরক্ষী বাহিনী। দীর্ঘপথপরিক্রমা শেষে সে রাতে সবাই পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিলেন করুণাময় বুদ্ধের পুণ্যভূমিতে।

অরুণাশ্বের রক্তাক্ত নখর ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল গভীর নিদ্রায় সুষুপ্ত মানুষদের। গভীর অন্ধকারে মিশে পালিয়ে গিয়ে বেঁচেছিলেন শুধুমাত্র একজন। তিনি স্বয়ং রাজদূত ওয়াং-হিউ-তাও।

বাণ বলেন, তিনি শুনেছেন এই রাজদূতের নাম। লোহিতাক্ষ বলেন, এই রাজদূত ইতিপূর্বে বার তিনেক চীনসম্রাটের বিশেষ কাজ নিয়ে এসেছিলেন হর্ষদেবের সাম্রাজ্যে। এমনকী হিউয়েন সাং চীন দেশে ফিরে যাবার পর লি-উই-পিয়েও নামক একজন চৈনিক রাজদূত হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যে এসেছিলেন। এই রাজদূতকে চীনদেশ থেকে ভারতবর্ষে পথ দেখিয়ে এসেছিলেন ওয়াং-হিউ-তাও।

রাজদূত লি-উই-পিয়ের কার্যকাল সমাপ্ত হলে চীন সম্রাট এই ওয়াং-হিউ-তাওকে হর্ষদেবের রাজসভায় চীনের রাজদূতরূপে প্রেরণ করেছিলেন।

চীনা রাজদূত পালিয়ে গিয়ে বেঁচে আছেন কিনা এই কথা জিজ্ঞাসা করলে লোহিতাক্ষ বলেন তিনি সংবাদ পেয়েছেন চীনা ,.জদূত পালিয়ে গিয়ে পৌঁছে গেছেন নেপাল রাজ্যে। নেপাল মিত্র রাজ্য। নেপালের রাজা এবং তিব্বতের রাজা আত্মীয়তাসূত্রে গ্রথিত। অন্যদিকে তিব্বতেব রাজার সাথে চৈনিক সম্রাটের মধুর সম্পর্ক। লোহিতাক্ষ সামান্য চিন্তাভাবনা করে বলেন, হর্ষদেবের সাম্রাজ্যের উত্তর দিকের নেপাল তিব্বত এবং চীনদেশের সম্মিলিত বাহিনী অরুনাশ্বকে আক্রমণ করতে পারে।

ভাস্করদেবের পরবর্তী কার্যপ্রণালী কী হতে পারে এই সম্পর্কে বলেন ভাস্করের পরবর্তী কার্যপ্রণালী যদিও অজ্ঞাত তবু অনুমান করা যায় অরুণাশ্বের সাথে ভাস্করদেবের মিত্রতা সম্ভব নয়। ভাস্করদেব হর্ষদেবের মিত্র। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে অরুণাশ্বের শত্রু। অরুণাশ্বের শত্রু চীন দেশ। সুতরাং চীনদেশ হবে ভাস্করের মিত্র।

* * *

বুকে এক ভীষণ বোঝা নিয়ে বাণ ফিরে এলেন প্রীতিকূটে। মাস খানেক পর বাণ খবর পেলেন নেপাল তিব্বত এবং চীনাবাহিনী সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করছে অরুণাশ্বকে।

ভাস্করদেব তার প্রিয়বান্ধবের হত্যাকারীর বিরুদ্ধে সাহায্যের বলিষ্ঠ বাহু প্রসারিত করে

দিলেন সম্মিলিত বাহিনীর দিকে।

ভাস্করের যুদ্ধ নৌবহর গঙ্গিনিকার উজান ঠেলে, এগিয়ে চলে উত্তর দিকে। নৌকায় যুদ্ধের সরঞ্জাম। যুদ্ধের নানা রসদ খাদ্য ঘোড়া গরু অস্ত্রশস্ত্র।

মাস দুয়েক পর খবর এল সম্মিলিত বাহিনী অরুণাশ্বকে শৃঙ্খলে বেঁধে নেপালের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তিব্বতের দিকে।

লোহিতাক্ষ খবর দিয়েছেন বাণকে এই যুদ্ধের ফলাফলে ভাস্কর দেব মহাখুশি। মহাখুশি হবার অন্য কারণ হল তাঁর হাতে এসে গেছে চীনদেশীয় "তাও" দর্শন সম্পর্কীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থ নিয়ে কথাবার্তা হয়েছিল হিউয়েন-সাং এর সাথে।

হিউয়েন-সাং তার কথা অনুসারে "তাও" দর্শন, সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করে পাঠিয়েছিলেন — নূতন রাজদূতের সাথে।

গভীর অন্ধকারে অরুণাশ্বের ঘাতকগণ চীনা রাজদূত এবং তার দেহরক্ষীগণকে আক্রমণ করার মুহূর্তে হঠাৎ ঘুম ভেঙে পালিয়ে গিয়েছিলেন রাজদূত ওয়াং-হিউ-তাও। কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা, পালিয়ে যাবার সময় এই গ্রন্থটি সঙ্গে নিয়ে পালিয়েছিলেন।

শেষপর্যন্ত হিউয়েন-সাং অনুবাদিত এই গ্রন্থখানা অক্ষত অবস্থায় পৌছায় ভাস্করদেবের হাতে। ভাস্করদেব তাই মহাখুশি।

*　　　*　　　*

নানা ঘটনায় বাণ বিষাদগ্রস্ত। ভালো লাগে না। কিছুই ভালো লাগে না। আপন মনে বসে বসে কাটে দিন রাত্রি। মাঝে মাঝে প্রবৃত্তি ঠেলে নিয়ে বসায় লেখার আসনে। মসীলিপ্ত লেখনী হাতে চেপে পত্রের দিকে তাকিয়ে, ডুবে যান কোন এক স্মৃতির রোমন্থনে। হঠাৎ করে প্রবৃত্তি তার হাতের লেখনীকে বুলিয়ে দেয় শুষ্কপত্রের বুকে। লেখনী শুকিয়ে খাক হয়ে পত্রের বুকে আঁকে না কোনও চিহ্ন।

ভীষণ ঘটনার শুরু হয়েছিল এক বৈশাখী রজনীর শেষলগ্নে। সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন বায়ুবিকার। ঋতুর পর ঋতু অতিক্রম করে আবার ফিরে আসে প্রখর বৈশাখ।

বৈশাখের এক প্রভাতে বেতের কেদারায় বসে আছেন গৃহপ্রাঙ্গণে। পাশে দাঁড়িয়ে ভূষণ কথা বলে বলে অনুভব করেন বাবা কোনও এক স্বপ্নের গভীর অতলে ডুবে গেছেন। গভীর অতল থেকে ভেসে ওঠে, ভূষণের কথার প্রতি উত্তর "উ-আ" অস্পষ্ট ধ্বনি। বৈশাখী সূর্য খ্যাপা ঘোড়ায় চেপে, লাফিয়ে আসে মধ্যাকাশের দিকে।

ভূষণের চোখে পড়ে মা এগিয়ে আসছেন। হাতে লাল কাপড়ে মোড়া পুঁটুলি। ভূষণের আজন্ম সাথী সোমদেবের কথাসরিৎসাগর গ্রন্থের পুঁটুলি। এই গ্রন্থ থেকে সৃষ্টি হয়েছে কাদম্বরীর ভ্রূণ।

পুত্রের হাতে পুঁটুলি তুলে দিয়ে আদেশ করেন পুঁটুলিশুদ্ধ গ্রন্থ গঙ্গিনিকার জলে বিসর্জন দিতে।

ভেঙে যায় বাণের কক্ষ বিলাসের যোগনিদ্রা। পিতা পুত্র লক্ষ করেন বাণীর ভীষণ রূপ। বাণের চোখে ভেসে উঠে প্রচণ্ডা-চামুণ্ডা-চণ্ডী রূপ। বাণীর এমনি ভীষণ রুদ্ররূপের কারণ পিতাপুত্র সহজেই অনুভব করেন।

পুত্রের হাত থেকে পুঁটুলি নিয়ে সেই মুহূর্তেই বাণ প্রবেশ করেন তার কক্ষে। ভূষণ প্রস্তুত করে দেন লেখনী শুষ্কপত্র এই সাথে মসীপাত্র।

দিন কতকের মাঝে গতি লাভ করে লেখনী। কাহিনি চলে এগিয়ে। কাদম্বরীর ভালোবাসায় মুগ্ধ নায়ক পিতা তারাপীড়ের জরুরি পত্র পেয়ে ফিরে গেছেন তার সাম্রাজ্যের রাজধানী উজ্জয়িনী নগরীতে। কাদম্বরী রয়ে গেছেন তার পিতৃগৃহ হেমকুটে। হেমকুটে তাঁর সাথে আছেন চন্দ্রাপীড়ের প্রিয় বান্ধবী পত্রলেখা।

পত্রলেখার কথা ভেবে ভেবে তাঁর মনে বিহঙ্গমা বাসা বাঁধে। বিহঙ্গমা কি বেঁচে আছে? বেঁচে আছে কি কল্যাণী উৎপলা?

বিহঙ্গমা বাণেব বুকের পিঞ্জরে পাখা ঝাপটায়। তাব কানে বজ্ররবে ধ্বনিত হয় বিদায় লগ্নের কথা — ফিরে যাও বাণ! ফিরে যাও! আজ তোমার আমার মিলনের শেষ রজনী। তারপব বিচ্ছেদ অনন্ত বিচ্ছেদ।

বজ্রনাদে ঘোষিত হয বিদাযলগ্নের প্রার্থনা - "হে সপ্তাশ্ববাহিত অরুণ! তোমার ভীষণ অগ্নিদাহে ভস্মীভূত কব মহাপাপের আবর্জনা।" প্রতিধ্বনিত বজ্রনাদে ধ্বনিত হয় - "মহা অগ্নিতে আহুতি দিবে আমার পঙ্কিল ঘৃণিত দেহ।"

জ্যৈষ্ঠেব মধ্যাহ্ন সূর্য জ্বলছে মধ্য আকাশে। গর্জন করছে খ্যাপা ঘূর্ণি হাওয়া।

বাণের চোখে ভেসে ওঠে মহাশ্মশানের লেলিহান অগ্নিশিখা। প্রজ্জ্বলিত চিতায় আরোহণ করছে রক্তাম্বর পরিহিতা সালাঙ্কাবা বিহঙ্গমা। বিহঙ্গমা জ্বলছে। ভীষণ অগ্নিদাহ। বাণেব দেহ জ্বলছে অগ্নিদাহে।

দেহ ছিটকে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। পাশে নেই ভূষণ। বাণের দেহ কক্ষ ছেড়ে নেমে আসে প্রাঙ্গণে। জৈষ্ঠ্যের আকাশ ছেয়ে জ্বলছে বিহঙ্গমার চিতা।

বাণের দেহ বয়ে নিয়ে চলছে পাদুকাহীন চরণদ্বয়। নিশির ডাক ডেকেছে জৈষ্ঠ্যের অগ্নিস্রাবী দ্বিপ্রহর। দেহ এগিয়ে চলে দক্ষিণ পথে।

পথ পার্শ্বের প্রতিটি বাড়ীর সীমান্তরেখার মাদার গাছের সিঁদুরে ফুল চিতাগ্নি হয়ে জ্বলছে। তুষানল হয়ে পুড়ছে পথের বালুকা। ডোবা পুকুরের জল সুড়ে গেছে গ্রীষ্মের অগ্নিদাহে। অর্জুন গাছে গাছে কুররা পাখির তীক্ষ্ণ চীৎকার।

নিশীথে পাওয়া বাণ চলেন এগিয়ে। সামনে চরভূমি। লবণাক্ত শুষ্ক বালুকা নিয়ে খেলছে ঘূর্ণিঝড়। কুন্ডলি পাকিয়ে আকাশে উঠছে খ্যাপা বাত্যার জটা।

বাত্যার হাহাকারের সাথে করাল গ্রীষ্মের করতালি উঠছে বাঁশের ঝাড়ে। ভীষণ শব্দ করে মূলিবাঁশ ফাটছে।

সম্মুখ দিকে এগিয়ে চলেন বাণ। সামনে নীল জল। নীল - নীল। নীল রঙের মাঝে সাঁতার কাটছেন বাণ। দেহে নেই দহন জ্বালা। প্রশান্তি নেমে আসে অঙ্গে অঙ্গে। নীল মায়ায় সাঁতার কেটে কেটে পৌঁছে গেলেন তাঁর কৈশোরের দ্বীপে। আর জ্বালা নেই দেহে। প্রশান্তি নেমে আসে অঙ্গে অঙ্গে। নীলরঙে সাঁতার কেঁটে পৌঁছে গেলেন, তার কৈশোরের দ্বীপে।

কৈশোরের সবুজ মায়ায় আবৃত দ্বীপে দাঁড়িয়ে আছেন কিশোর বাণ। সম্মুখে নীল জলরাশি। জলরাশির উপর দিয়ে ভেসে আসে রাজহংসী পানসি। বাণের পাশে একে একে এসে দাঁড়ায় তার কৈশোরেব সব বন্ধুজন। বাণের সাথে সবাই দেখছে নীলজলে ভাসা শ্বেতশুভ্র পানসি।

কূলে ভিড়ে পানসি। পানসি থেকে নেমে এল নির্মোক স্বচ্ছডবকাবসনে আধোঢাকা স্তম্ভিত পুষ্পবাণ সুবাসের সুর-সুন্দরী।

বাণের কিশোর কবি বন্ধু ঈশান-কবিতা বলছে — "কং তুংগথনুকিখত্তেন পুত্তি দারটিঠআ পলোএসি

উন্নাসিঅ কলস নিবেসিঅগঘ কমলেন মুহেন।"

"ওগো কন্যা! পূর্ণ কলস দুটির উপব পদ্মেব মত দুটি স্তন রেখে, কারপথ চেয়ে আছে?"

বাণের সম্মুখে এসে দাঁড়াল তাব সব বন্ধুবা।

বন্ধুরা সবাই মিলে তাঁকে কাঁধে তুলছে। কাঁধে রেখে গান গেয়ে গেয়ে এগিয়ে চলেছে নীল আলোকপথে। নীল পদ্মগন্ধে ছেয়ে গেছে দিগ-দিগন্ত। প্রগাঢ় হয় নীল রং। প্রগাঢ় হয় নীল গন্ধ। ঘুম নামে চোখে।

চোখ মেলে দেখেন তিনি বিছানায় শুয়ে। কুলুঙ্গিতে প্রদীপ শিখা। মণিবন্ধ টিপে সম্মুখে বসে আছেন বাণীর দাদা বিষবৈদ্য ময়ূরক। পাশে স্তম্ভিত হয়ে আছেন বাণী চন্দ্রষেণ ভূষণ এই সাথে আরো অনেক।

পবদিন ভোব থেকে শুরু হয় মানুষেব ভীড়। দলে দলে মানুষ আসছে মহাপণ্ডিত বাণভট্টকে দর্শন করতে। মুখে মুখে রটে গেছে পণ্ডিত বাণভট্ট অসুস্থ হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন, আগুনের মত বালির চরে। জেলেরা কাঁধে করে নিয়ে এসেছে।

আবার বাণ স্তব্ধ। বাণী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ভূষণ বর্ষাকালের অপেক্ষায়। ভূষণ লক্ষ করেছেন, বর্ষায় বাণের মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

বর্ষা এল। আষাঢ় অতিক্রম করে শ্রাবণে নামে অঝোরে ধারা। শোনবিলের কাড়া দিয়ে জল নামে শুষ্ক কৌশিকার বুকে। ভূষণ বাবার হাতে ধবে পৌছালেন কলকল স্রোত মুখর কাড়ার ধারে। পিতা পুত্র অবগাহন করেন শ্রাবণ ধারাপাতে। দুজন গান গেয়ে ফিরে আসেন প্রীতিকূটে। বাণী

মঙ্গলচণ্ডীকে প্রণাম করে আঁচল দিয়ে অশ্রু মোছেন।

*　　　　*　　　　*

বাণের লেখনী আবার গান গায় পত্রের বুকে মুখ রেখে। ইতিপূর্বে লিখেছিলেন চন্দ্রাপীড়, বাবার জরুরি পত্র পেয়ে চলে গেছেন উজ্জয়িনীপুরে। কাদম্বরী রয়ে গেছে তার পিতৃগৃহ হেমকুটে। চন্দ্রাপীড়, কাদম্বরী সাহচর্যের জন্য রেখে গেছেন তার একান্ত সহচারী পত্রলেখাকে। যথা সময়েকাদম্বরীকে উজ্জয়িনীতে নিয়ে যাবার জন্য রেখে গেছেন তাঁর সেনাপতি মেঘনাদকে।

বাণ ঘন শ্রাবণধারায় সিক্ত হয়ে প্রশান্ত চিত্তে ধরেন কাদম্বরীর কথা। এবাব চিত্রিত হবে, ভালোবাসায় বিলীন কোনও এক নারী হৃদয়ের মর্মকথা।

কাদম্বরীর ভালোবাসার গভীরতম অধ্যায়ে এসে লেখনী হয়ে উঠেছে স্নিগ্ধ কোমল মধুরসে আপ্লুত। ভাষায় নেই হর্ষচরিত গ্রন্থের ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ জ্বালা। নেই ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ। নেই ব্যঙ্গের বিগলিত গন্ধ।

কাদম্বরীর ভাষা অতি সঙ্গোপনে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলে পূর্ণতার দিকে। প্রতিটি শব্দ লিখে, বাণ আস্বাদন করেন তার মাধুর্য তার কোমলতা গভীরতম হৃদয়ের অব্যক্ত কথা।

এক একটি শব্দ লিখে শব্দের দিকে তাকিয়ে কান পেতে অনুভব কবেন তার অনুরণন। এমনি করে কেটে যায় প্রহরের পর প্রহব, দিনের পব দিন।

পাশে থেকে ভূষণ অনুভব করেন তাঁর পিতার তন্ময় স্বরূপ। কথা নেই তার মুখে। শ্বাস প্রশ্বাসে সচেতন সংযত। বাবা ধ্যান করছেন। ধ্যান করছেন পরমসুন্দরের।

বাণ ।লখছেন, চন্দ্রাপীড়ের মন উদ্‌ঘাটনের অনুভূতি। লেখনী চিত্রিত করছে প্রতি মুহূর্তের প্রতীক্ষাচিত্র। চন্দ্রাপীড় অপেক্ষা করে আছেন এখনই পৌছাবে কাদম্বরীর অশ্বযান উজ্জয়িনীর প্রাসাদদ্বারে। কান পেতে আছেন অশ্বক্ষুরধ্বনির।

লেখনী এমনি করে অঙ্কন করে চন্দ্রাপীড়ের প্রতীক্ষার চিত্ররূপ। এখন তখন করে ব্যর্থ প্রতীক্ষায় কেটে যায় দিন।

দিন দিন করে জমে ওঠে মাস। কাদম্বরীর নূপুরধ্বনি প্রাসাদ অঙ্গনে বেজে উঠে না।

দীর্ঘ বিরহ্ দহন মাঝে হঠাৎ একদিন এল কাদম্বরীর পত্র। কাদম্বরী তাঁর ভালোবাসার কথা লিখেছেন চন্দ্রাপীডের কাছে। পত্র নিয়ে এসেছে পত্রলেখা।

বাণ আবার গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। তিনি লিখবেন কাদম্বরীর ভালোবাসার কথা।

মাসের পর মাস বয়ে গিয়ে এসেছে মাঘ মাস।

ধ্যানস্থ বাণ কক্ষে একা। ভূষণ ব্যস্ত। আগামীকাল শ্রীপঞ্চমী। শ্রীপঞ্চমী, প্রীতিকূট বিদ্যাশ্রমের মহোৎসব তিথি।

নিস্তব্ধ বাণ ভালোবাসার অনঙ্গ রূপে ধ্যানরত। অপরাহ্ন গড়িয়ে প্রীতিকূটের উপর গাছগাছালির ছায়া প্রগাঢ় হয়ে নামে। বাণের কক্ষে জমে ওঠে সন্ধ্যার নীলাভ ছায়া।

ভূষণের স্ত্রী দুই করতলের মাঝে প্রদীপ রেখে প্রবেশ করেছেন কক্ষে। প্রজ্জ্বলিত করেন, ধ্যানরত বাণের সম্মুখের পিলসুজে রাখা দুটি প্রদীপ।

দীপালোকে উদ্ভাসিত বৌমার মুখমণ্ডল প্রত্যক্ষ করে বাণের মুখে বিচ্ছুরিত হয় আনন্দদ্যুতি। বাণ জিজ্ঞাসা করেন বিপুল অচল এবং বাণীর কথা।

বৌমা বলেন পূজা নিয়ে সবাই মন্দিরে ব্যস্ত। পূজা মন্দিরে বাণীকে টেনে নিয়ে গেছে বিপুল এবং অচল। সবাই মিলে ফুলপাতা দিয়ে সাজিয়ে তুলছে মন্দির।

বাণের মুখে দেখা দেয় স্নিগ্ধ হাসি। বলেন — "শেষপর্যন্ত শশ শিষ্য- বিপুল অচল, বাণীকে শুদ্ধ চুরি করে নিল?"

বাণের কথা শুনে বৌমার মুখে ছলকে ওঠে হাসি।

পরম প্রসন্নতায় ভরে উঠে বাণের মন। বাণী, তাঁর এই বৌমাকে জড়িয়ে কল্পনা করেছিল নায়িকার নাম "কাদম্বরী"। বৌমা কাদম্বরী দেবকুলিকার কন্যা। বাণীর কথার সাথে, বাণের মনে হয়েছিল আর একটি নাম — "উম-ইয়াম"। কাদম্বরী, উম-ইয়ামের জন্মভূমি।

কক্ষের বাইরে দারুণ কোলাহল হট্টগোল। আগামীকাল শ্রীপঞ্চমী। বাণ লেখনী রেখে প্রবেশ করেন মন্দিরে।

বিপুল অচলসহ বাণী দারুণ ব্যস্ত। ফুল পাতা লতা দিয়ে সাজানো হচ্ছে মন্দির।

হঠাৎ অচলের চোখে ধরা পড়ে বাণ। বিদ্যুৎবেগে দুভাই এসে বাণকে টেনে নিয়ে এল মন্দিরে। তাদের হুকুম অনেক ফুলপাতা রয়ে গেছে। বাণকে কাজে হাত না দিলে চলবে না।

বিপুল অচল এবং বাণীর সাথে তিনি যোগ দিলেন। ফুল লতা সাজানোর কাজে। বাণের কাজকর্ম দেখে দুজনের বিস্ময়। এত সুন্দর সাজাতে পারে দাদু। সাজাতে সাজাতে বেশ রাত হয়ে গেছে। বাণীকে বলেন, আজ রাতে তার নিরম্বু উপবাস। শ্রীপঞ্চমীর প্রথম লগ্নে দেবী ভারতী চরণে অর্পণ করবেন পুষ্পাঞ্জলি।

* * *

বাণ আবার নিমগ্ন হন গভীরতম ধ্যানে। বাণের কানে দূর থেকে ভেসে আসে ভালোবাসার বীণা ঝঙ্কার। বীণা ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে আসে মধ্যযামিনী।

মাঝে মাঝে মনে হয় কে যেন নূপুর নিক্কণে তাঁর পাশ ঘেঁষে আসে আবার চলে যায়। বাতাসে ভেসে আসে শ্বেত পদ্মগন্ধ।

বাণের লেখনী শ্বেতপদ্মমধু পান করে কাদম্বরীর ভালোবাসার গন্ধ ছড়াতে আরম্ভ করে।

কাদম্বরী লিখেছেন —

"কেমন করে এক নারী, যে নারী সদ্য ফোটা

ফুলের মতো, যার মধ্যে ভালোবাসাকে রূপ দিবার জন্য

এখনো সাহস সৃষ্টি হয়নি; সেই নারী কোন্ সাহসে

ভালোবাসার কথা লিখে পাঠাবে?

তাছাড়া আমি লিখবই বা কী কথা?

যদি লিখি "হে প্রিয়! আমি কি তোমার প্রিয়তমা?"

তাহলে, একথা হবে স্থূল বোকা প্রশ্ন।

যদি লিখি "তোমাকে স্ববলে আঁকড়ে রাখব আমার হৃদয়ে।"

তাহলে হবে, রুচিহীনার দাম্ভিক উক্তি।

যদি লিখি "তোমাকে আমার কাছে আসতেই হবে কিন্তু!"

তাহবে, রূপসীর রূপ গর্ব্বের উলঙ্গ প্রকাশ মাত্র।

যদি লিখি — "আমি নিজেই চলে আসব তোমাব কাছে।"

তাহবে, নিতান্ত চটুল নারীর উক্তিমাত্র।

যদি লিখি ঃ— "হে প্রিয়! আমার গভীব ভালোবাসা,

আমার মৃত্যুর মাধ্যমে উপলব্ধি করবে তুমি।"

তা হবে, অসম্ভব একটি কথার, কথামাত্র।

বাণ, প্রতিটি কথা লিখে, লেখনী রেখে অনেক অনেকক্ষণ ভেবেছেন বসে বসে। এমনি করে শেষ হয়ে গেছে রাত।

শেষ ছত্র লিখে বসে বসে ভাবছেন; মৃত্যুর মাঝ দিয়ে ভালোবাসা উপলব্ধির কথা।

"মৃত্যু, একটি কথার কথামাত্র।"

তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে বসে ভাবেন চারিদিকের রূপরসগন্ধ স্পর্শে ভরা প্রকৃতির কথা। লেখনী কথা বলছে। বলছে ভালোবাসার রূপসী গ্রামগঞ্জ নদী পাহাড়ের কথা। চন্দ্রপুর শাল্মলী পালিতক মেঘনা বরাক পুষ্প ভদ্রা কথা বলছে।

ফুল পাখি অবহেলিত কন্টকী গুল্ম লতা স্পন্দিত হচ্ছে হৃদয়ে। কুররা পাখীরা হাঁকছে অর্জুন ডালে।

শ্রীপঞ্চমীর প্রভাত এসেছে। বোধন হচ্ছে দেবীর। শঙ্খ ঘন্টা দেবীর নূপুর হয়ে গুঞ্জন করছে। দেবী আসছেন ব্রহ্মালোক থেকে। মাদার ঘেটু আকন্দের গন্ধ মেখে দেবী আসছেন। বাণের অধর-ওষ্ঠ কেঁপে কেঁপে উচ্চারিত হয় —

"তরলয়সি দৃশং কিমুঙগুকাম কলুষ মানস বাস লালিতে

অবতর কলহংসী বাপিকাং পুনরসি যাস্যপি পঙ্কজালয়ম" (হ.চ)

"মানস সরসের কলহংসীর মতো দেবী স্বচ্ছ নির্মল নীর ব্রহ্মালোক পরিত্যাগ করে, নেমে আসছেন পৃথিবীর পল্বল সরসে।"

বীণা ধ্বনিত হচ্ছে। নূপুরগুঞ্জন করছে। ঘুম নামছে। ধীরে ধীরে মাথা প্রণত হয়, কাদম্বরীর পত্রের দেহে। "মৃত্যু তো কথার কথামাত্র।" সদ্য লেখা অখরে ললাট স্পর্শ করে। ঘুম। গভীর ঘুম।

কুন্দেন্দু তুষার হার ধবলা দেবীকে বসন্ত চ্যুতপুষ্পে দিচ্ছে অঞ্জলি।

বাণী এসে বলেন, "ওঠো! ওঠো!! অঞ্জলি দিবে উঠ!"

ছুটে এল ভূষণ। হাজার হাজার মানুষ। দূর-দূরান্তে বিদ্যুৎ বেগে খবর গেল — 'মহাপণ্ডিত বাণভট্ট, শ্রীপঞ্চমীর পুণ্যলগ্নে মহাশ্বেতার শ্বেতপদ্ম বিলীন হয়ে গেছেন।

নিস্তব্ধ ভূষণ, বাণের চরণে মস্তক রেখে শপথ করেন আগামী শ্রীপঞ্চমী পূর্বে, তিনি সমাপ্ত করবেন, পিতার অপূর্ণ গ্রন্থ।

কৃষ্ণাদ্বিতীয়ার প্রভাতে ভূষণ ভট্ট পিতার লেখনী নিয়ে বসলেন কাদম্বরী গ্রন্থ নিয়ে। লেখনী হাতে নিয়ে প্রত্যক্ষ করেন পত্রের উপর গঙ্গিনিকার তরল তরঙ্গ টলমল করছে। কপোল বেয়ে, পত্রের উপর ঝরে পড়ে বিন্দু বিন্দু অশ্রু।

ভূষণের পেছনে বাণী। বাণীর দিকে তাকিয়ে, ভূষণের চোখে ভাসে, মা এবং বাবার আলিঙ্গণা-বদ্ধ রূপ।

ভূষণের লেখনী পত্রের উপর সৃষ্টি করে —

"পার্বতী পরমেশ্বর সৃষ্টির যারা মূল দুটি অর্দ্ধ দেহের মিলনে রূপায়িত হয়েছে একটিমাত্র তনু। আমি তাঁদেরে প্রণাম করি।

ভূষণের চোখের জলে ঝাপসা হয়ে যায় সবকিছু। বাণী আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেন তার

পুলিন্দার অশ্রু ধারা।

ভূষণ লিখেন —

"আমার বিগত জন্মের বহু পুণ্যে যে দেহ থেকে

আমি হয়েছি সৃষ্ট সেই বাগীশ্বর পিতৃদেবকে

প্রণাম করি।"

দিনরাত বাগীশ্বর বাণভট্টের পুত্র ভূষণের লেখনী চলে।

আবার এল শ্রীপঞ্চমী। ভূষণভট্ট পূর্ণ করেছেন তার শপথ।

বাণী ভূষণ চোখের জলে দেবী ভগবতী ভারতীর চরণে সদ্যসমাপ্ত গ্রন্থ সমর্পণ করে অঞ্জলি প্রদান করেন।